Registered No. C. 134

No. 465. May, 1902.

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ। ৪৬৫ সংখ্যা। বৈশাখ—১৩০৯। মে—১৯০২। ৭ম কল্প। ৩য় ভাগ

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 465. May, 1902.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪০ বর্ষ। ৪৬৫ সংখ্যা।

বৈশাখ—১৩০৯। মে—১৯০২।

৭ম কল্প। ২য় ভাগ।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু
৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩১
† এ	মে	জুন	জু	আ	সে
‡ ১৪	১৫	১৫	১৭	১৭	১৭
ম	বু	র	ম	শু	সো
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০
বু	বৃ	সো	বৃ	র	ম

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩০৯ সাল।

ইং ১৯০২—১৯০৩।

শকাব্দা ১৮২৪।

সংবৎ ১৯৫৯—৬০।

ব্রাহ্মাব্দ ৭৩—৭৪।

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শ	সো	ম	বৃ	শু	র
৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
১৮	১৭	১৬	১৫	১৩	১৫
বু	শ	সো	বৃ	র	র
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১
শু	র	বু	শ	শ	ম

সো	বৃ	র	বৃ	র	বু
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ
বু	শ	ম	শ	ম	শু
বৃ	র	বু	র	বু	শ
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র
শ	ম	শু	ম	শু	সো
র	বু	শ	বু	শ	ম

§ ১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

শ	সো	ম	বৃ	শু	র
র	ম	বু	শু	শ	সো
সো	বু	বৃ	শ	র	ম
ম	বৃ	শু	র	সো	বু
বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
বৃ	শ	র	ম	বু	শু
শু	র	সো	বু	বৃ	শ

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃএঃ,	৫	৪	২	২৯	২৮	২৭
পূঃ	৯	৮	৬	৪	৩	৩১
কৃঃএঃ,	২১	১৯	১৮	১৫	১৩	১১
অঃ	২৪	২৩	২১	১৮	১৭	১৫

শুঃএঃ-শুক্ল একাদশী, পূঃ-পূর্ণিমা। কৃঃএঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা

⁂ পরীক্ষা-৯ইবৈশাখ মঙ্গলবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার পূর্ণিমা। ২৪এ বৈশাখ বুধবার, ২৩এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অমাবস্যা।

*বৈ-বৈশাখ সোমবারে আরম্ভ ও ৩১এ শেষ।

†এ-এপ্রেল মঙ্গলবারে আরম্ভ ও ৩০এ বুধবারে শেষ।

‡১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§১লা বৈশাখ সোমবার, ২রা মঙ্গলবার ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ২রা শুক্রবার ইত্যাদি।

বৈ সোম-১, ৮, ১৫, ২২, ২৯

জ্যৈষ্ঠ বৃ-১, ৮, ১৫, ২২, ২৯

এপ্রেল ম-১,৮, ১৫, ২২, ২৯।

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২টী স্তম্ভে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃএঃ	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫
পূঃ	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯
কৃঃএঃ	১০	৯	১০	১০	১১	১০
অঃ	১৪	১৩	১৪	১৪	১৫	১৫

⁂ পরীক্ষা—২৫এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার, ২৫এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শুক্ল একাদশী। ১০ই কার্ত্তিক সোমবার, ৯ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার কৃষ্ণ একাদশী। এইরূপ মধ্য স্তম্ভের সংখ্যার সহিত মাস ও বারের স্তম্ভ মিলাইয়া লইলে মাস, বার ও তিথি ঠিক্ হইবে।

নববর্ষ।

যে মঙ্গলময় বিধাতার অপার করুণায় এই শুভ নববর্ষে বামাবোধিনী ৪০ বর্ষে প্রবেশ করিল, কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণিপাত করিয়া আমরা বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। তিনি নব বল ও নব উৎসাহ বিধান করিয়া আমাদিগকে তাঁহার সেবায় পুনরায় প্রবর্ত্তিত করুন্ এবং আমাদের পথের বিঘ্নবাধা সকল অপসারিত করিয়া আর এক বৎসরের জীবনের ব্রতপালনে আমাদিগকে সমর্থ করুন্। গত ৪০ বৎসরের মধ্যে এদেশের নারী জাতির অবস্থা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা অভূতপূর্ব্ব ও আশাতীত। বামাবোধিনী অনেক বার ইহার স্মরণ ও আলোচনা করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। কবে তাহার পূর্ণ সমালোচনা করিয়া ভগবৎকৃপায় সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদানপূর্ব্বক আপনার জীবন সার্থক করিবেন, আশা-নেত্রে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। বামাবোধিনীর অনুগ্রাহক গ্রাহক গ্রাহিকা, লেখক লেখিকা ও হিতৈষী বন্ধুগণ সকলে একহৃদয় হইয়া ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা করুন, বামাবোধিনী নির্ব্বিঘ্নে আর এক বৎসর জীবন ধারণ করিয়া ইহাঁর প্রাণের সকল শুভ আশা যেন পূর্ণ করিতে পারেন।

১

শান্তি-দাতা পিতা, তুমি,
চির-ভরসা আমার।
লইনু শরণ দেব,
অভয় পদে তোমার!
মঙ্গল ইচ্ছার স্রোতে
ঢালিয়া দিলাম প্রাণ,
আদেশের দাস হ'য়ে
রব সদা তব স্থান!

২

যে ভাবে রাখিবে যথা,
তথায় সুখে থাকিব,
তোমার আশ্রিত জেনে,
তোমারে সদা ডাকিব।
এক পা'ও না চলিব,
না বলিবে যতক্ষণ—
কোন দিকে, কোন পথে,
নাহি করিব গমন!

৩

দেখিতে না পাই আমি,
দেখাও আলো তোমার!
কুয়াসায় দিশা-হারা,
নয়নে হেরি আঁধার।
হাত ধরে ল'য়ে চল,
কোলেতে টানিয়া রাখ,
একা যেতে ভয় পাই,
সাথী হ'য়ে সঙ্গে থাক!

৪

কাছে আজ, তবু কেন
দেখিতে না পাই মুখ?
খুলে দাও দিব্য চক্ষু,
ভুলে যাই সব দুখ!

কবে দেখিব সে দেশ
চির-শান্তির নিলয়—
নাহি যথা দিবারাতি,—
কেবল আলোকময়!

৫

একান্ত অধীন দীন—
দাস—অনুদাস-দাস।
ভেঙ্গে দাও ভ্রম—ভুর,
পুরাও মনের আশ!

চরণে ধরিয়ে রব
মরণে কি ভয় আর?
শান্তিদাতা পিতা, তুমি,
চির-ভরসা আমার!

নব বর্ষে নব সাধ।

১

লঘু হাসি দীর্ঘ অশ্রু দিয়ে
পুরাতনে করিনু বিদায়;
আজি এই নবীন বরষে
বিশ্বরাজ! প্রণমি তোমায়।

২

নব রবি হাসিছে আকাশে,
নব গীতি গায় পাখিগণ,
নবীনতা-মাখা ভূমণ্ডল
আমারে রেখ না পুরাতন।

৩

নব সাধ নবীন উদ্যমে
নব জীবনের পথে লহ,
নবীন আশার কথা আজি
নূতন করিয়া মোরে কহ।

৪

দিনে দিনে কত দিন যায়,
খেলাইছ কত শত খেলা,
এ বিরহ-জলধির শেষে
আছে এক মিলনের বেলা।

৫

দিন, মাস বর্ষ চলে যত,
সে দিন নিকটে আসে বুঝি,
এক দিন দিবে তুমি মোরে
সমস্ত জীবন যাহা খুঁজি।

৬

কোন্ সুখ চা'ব তবে আর—
যা পেয়ে তোমাতে রহে মন,
তাই মোরে দিও দয়াময়!
আর কিছু নাহি প্রয়োজন।

৭

দিতে চাও দুঃখ দিও নাথ,
সহিতে শকতি দিও আগে—
জগতের সব "ভাল" চেয়ে
তোমারেই যেন ভাল লাগে।

৮

হবে যদি সে শুভ মিলন
এক দিন তোমায় আমায়,
যোগ্যতর করিও আমারে,
এই ভিক্ষা মাগি রাঙা পা'য়।

৯

যে রূপ তোমার মনোমত,
সেই রূপে আমারে গড়িও;
যে হৃদয় তুমি ভালবাস,
সেই হৃদি ভালবেসে দিও।

১০

এই সাধ নব বরষের,
দয়াময়! পূরাও কামনা,
প্রাণ মোর জীর্ণ পুরাতন,
আজি এই নূতন বাসনা।

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন পঞ্জিকার ফলাফল—এ বৎসর মঙ্গল রাজা ও শুক্র মন্ত্রী। রাজফল বড়ই মন্দ, তবে মন্ত্রিফল শুভ। ভাল মন্ত্রীর গুণে রাজার দোষ কাটিয়া যায়।

ইংলণ্ডেশ্বরের রাজ্যাভিষেক—লণ্ডনে রাজা ৭ম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিরাট আয়োজন হইতেছে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে বিলাত মহোৎসবময় হইবে। জগদীশ্বর ইংলণ্ডরাজ আমাদের সম্রাট্‌কে দীর্ঘায়ু ও সর্ব্ব সুখে সুখী করুন্।

শুভ প্রস্তাব—মহীশূর মহারাজের অভিষেক উপলক্ষে মহীশূর রাজ্যের নানা স্থানে শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম।

মূকবধির বিদ্যালয়-গৃহের ভিত্তি স্থাপন—গত ৮ই এপ্রেল মাননীয় ছোট লাট সারজন উডবরণ এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন, অনরেবল বোল্‌টন সাহেব বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করেন এবং অনরেবল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ছোট লাটকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। উক্ত দিবস প্রাতে এই শুভ ঘটনার প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক ভগবানের মহিমাকীর্ত্তন হয়।

আদর্শবস্তী প্রতিষ্ঠা—ভাগ্যকুলের জমীদার রাজা শ্রীনাথ রায় ও ভ্রাতৃগণ ভবানীপুর এলগিন রোডে শ্রমজীবীদিগের বাসের জন্য যে পাকা গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছেন, গত ৮ই এপ্রেল ছোট লাট বাহাদুর তাহারও প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

পেসোয়ার দরবার—এপ্রেল মাসের শেষে লর্ড কুর্জ্জন পেসোয়ারে এক বৃহৎ দরবার করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর গৌরব—সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু লণ্ডনের রয়াল সোসাইটীর সভ্য পদে বৃত হইয়া F. R. S. উপাধি পাইয়াছেন। ইনি অনেকগুলি তাড়িত যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা, সম্প্রতি "Curvograph" কর্ভোগ্রাফ নামক এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন।

তাঁহারা যে সময় ভারতে আগমন করেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, সুতরাং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় যাবতীয় গ্রন্থ আলোচনাভাবে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। বেদ বেদাঙ্গ উপনিষদের সহিত পুরাণ সকলও উপেক্ষিত হইয়াছিল। সুতরাং দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার আর উপায় ছিল না। যাঁহারা রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ পাঠ করেন নাই অথবা পড়িয়া তাহার মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হন নাই, তাঁহারা দেশের প্রাচীন ইতিহাস কি প্রকারে অবগত হইবেন? পুরাণ সকল কবি-কল্পনা দ্বারা অতিরঞ্জিত বলিয়া কি তাহাদের মূল আখ্যায়িকা অমূলক? রামায়ণে অনেক অদ্ভুত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তা বলিয়া রাম ও রাবণ সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বিবৃত আছে, তাহা কি কল্পনা-সম্ভূত? অথবা তৎপরবর্ত্তী যুগে কুরুপাণ্ডব, বৃষ্ণিবংশ প্রভৃতি যে সকল রাজবংশের কথা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, তাহার কি প্রমাণ নাই? আমরা পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও অপরাপর গ্রন্থের সহিত ভারতীয় পুরাণ প্রভৃতির তুলনা করিতে চাহি না। পাশ্চাত্য গ্রন্থসকল অত্যন্ত আধুনিক। এমন কি পৃথিবীর সৃষ্টিকাল পঞ্চসহস্র বৎসর বলিয়া প্রধান ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলে উক্ত হইয়াছে। বাইবেলের পূর্ণাবয়ব গ্রন্থনকালও দুই সহস্র বৎসরের অনধিক। প্রমাণ হইয়াছে নব বিধান (নিউটেষ্টামেণ্ট) ঈশার মৃত্যুর চারি শত বৎসরের পরে সঙ্কলিত বা লিপিবদ্ধ হয় এবং খ্রীষ্টীয় বহু শতাব্দীর পরে ভূমধ্য সাগরের উভয় কূলে কোন প্রকার বর্ণমালা রচিত হয় নাই বা প্রচলিত ছিল না। সম্প্রতি ক্রীট দ্বীপে ও মিশরের প্রোথিত নগরাংশ ও ভগ্নাবশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতীত হইয়াছে যে প্রায় তিন সহস্র বৎসর গত হইল, ঐ সকল স্থানে সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকল ভাষা-জ্ঞাপক অক্ষররূপে ব্যবহৃত ছিল। বর্ণমালাও এক প্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন বটে, কিন্তু ইহা নিয়মাধীন সুস্পষ্ট ব্যক্ত চিহ্ন। পূর্ব্বোক্ত চিহ্ন সকল দুর্ব্বোধ ও অব্যক্ত। নিরক্ষর বর্ব্বর দেশ সকলে এখনও ইহা প্রচলিত দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা যে কোন পুস্তকাদি রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। অনুসন্ধান দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে প্রথম চিন-সম্রাট ফাউসি (Fousie) খ্রীষ্ট পূর্ব্ব দুই সহস্র আট শত অব্দে চিন দেশে বর্ণমালার সৃষ্টি করেন। চতুর্থ সম্রাট য়ায়ু (Yaoo) খ্রীঃ পূঃ ২২২৮ অব্দে দণ্ডবিধি ও ব্যবস্থাবলী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যবস্থাবলীর অধিকাংশ ভারতের ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত। ইহাতেই অনুমিত হইতে পারে ভারতে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লিখিত ভাষা প্রচলিত ছিল। জাপানে এক গ্রন্থ পঞ্চ সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত বলিয়া সংরক্ষিত আছে। পঞ্জিকার গণনানুসারে বর্ত্তমান কলিযুগের ৫০০২ বৎসর গত হইয়াছে। হিন্দু গণনানুসারে ইহার বহুকাল পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মীকি মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শোচনীয় মৃত্যু—গত ২রা বৈশাখ ডেপুটী কন্‌ট্রোলার জেনারেল বাবু রজনীনাথ রায়ের লোকান্তর গমনে আমরা বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি। ইনি বহুগুণে ভূষিত ছিলেন এবং অতি উচ্চ পদে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। জগদীশ্বর ইহাঁর আত্মার কল্যাণ করুন্ এবং ইহাঁর বিধবা পত্নী ও পুত্র কন্যাদিগকে শান্তি দান করুন্।

শিক্ষা-বিভাগ—বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের হস্তে এ বৎসর ৪২॥ লক্ষ টাকা অর্পিত হইয়াছে তন্মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা ভারত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দান। ডিরেক্টরের সাহায্যার্থ একজন ডেপুটী ডিরেক্টর নিযুক্ত হইবেন।

বুর যুদ্ধ—বুর প্রতিনিধি কয়েকজন সন্ধির জন্য পুনরায় চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধ এখনও ঘোরতর বেগে চলিয়াছে। বুরদিগের সৈন্যসংখ্যা এখনও ৮ সহস্র। সেনাপতি বোথা, ডিলারে, ডি ওয়েট প্রভৃতি এক এক দল সৈন্য লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে ইংরেজ সৈন্যের মোয়াড়া লইতেছেন।

নেটালে ভারতবাসী—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত সন্তানের সংখ্যা কম নহে। গত বৎসর (১৯০১) এক নেটাল হইতে ১২৭১৯টী মণিঅর্ডার যোগে ১২,৩১,৯০৫ টাকা ভারতবাসীদিগের আত্মীয়গণের নিকট আসিয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গ—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গিধোড়ের মহারাজা স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ দানার্থ গবর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন এই প্রশ্ন করেন। তাহাতে শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী ম্যাকফার্সন সাহেব বলেন এ সম্বন্ধে ডিরেক্টর এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিতেছেন। যে যে স্থানের স্থানীয় লোকে সাহায্য করিবেন, গবর্ণমেণ্টও সেখানে উপযুক্ত সাহায্য দান করিবেন। স্ত্রীশিক্ষা-হিতৈষিগণ এ সময় উদ্যোগী হউন্।

কাচ পাত্রের কারখানা—বোম্বাইয়ের নীলকণ্ঠ ওয়াগেল অসাধ্য সাধন পূর্ব্বক বিলাত হইতে কাচপাত্র নির্ম্মাণের কৌশল শিখিয়া আসিয়াছেন। এ দেশে শীঘ্র একটী কারখানা খুলিবেন।

পেনেল মোকর্দ্দমা—পেনেল পদচ্যুতির কাগজ পত্র পার্লেমেণ্টে গিয়াছে। সেখানে ইহার পুনর্বিচার হইবে।

আর্য্য সাম্রাজ্যের প্রাচীনত্ব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে মাসিডনরাজ আলেক্‌জাণ্ডারের পঞ্চনদ প্রদেশ আক্রমণের পূর্ব্বে ভারতের কোন ইতিহাস নাই। সেকন্দরের সহচর গ্রীকদিগের এরূপ ধারণা হওয়া সম্ভব, কারণ তাঁহারা ভারতের অল্পাংশ মাত্র দেখিয়াছিলেন এবং যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাও বুঝেন নাই অথবা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। বিশেষতঃ

যদি ঋগ্বেদই পৃথিবীতে প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া অধুনা নির্ণীত হয়, (কারণ আমাদের শাস্ত্রমতে সামবেদই আদিগ্রন্থ, যজুঃ দ্বিতীয় এবং ঋক তৃতীয় গ্রন্থ) তাহা হইলেও তাহার রচনাকাল রামায়ণের বহুকাল পূর্ব্ব ধরিতে হইবে। রামায়ণে সূর্য্যবংশীয় কোন কোন সম্রাট ও লঙ্কেশ্বর রাবণ সপ্তদ্বীপ-সম্বলিত সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি ছিলেন বলিয়া প্রকীর্ত্তিত আছে। ইহাঁদের সময়ে পৃথিবী চতুঃসাগরে বেষ্টিতা বলিয়া বর্ণিত, যথা উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সাগর। * ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, তখন অন্ততঃ একটী মহাসাগরের অস্তিত্ব ছিল না। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের গণনানুসারে নির্ণীত হইয়াছে যে, ১১,৫০০ একাদশ সহস্র পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের পশ্চিমে আটলাণ্টিক নামে একটী মহাদেশ ছিল। তাহা য়ুরোপ ও আফ্রিকার সহিত সংযুক্ত ছিল। † সে সময় ভারত মহাসমুদ্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। লঙ্কা তখন একটী প্রকাণ্ড দ্বীপ ছিল, এবং আসিয়া ও আমেরিকার মধ্যস্থ ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপই উক্ত মহাদেশদ্বয়ের উপকূলের সহিত পরস্পর সংযুক্ত ছিল। এখনও বেরিং প্রণালী স্বল্পতোয়া একটী সামান্য প্রণালী মাত্র। ইহার বিস্তার ছত্রিশ মাইল। তাহাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে সমাকীর্ণ। সেই জন্য রুসীয়া তাহার উপর রেলওয়ে সেতু নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতেই প্রতীত হইতেছে যে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য সময়ে অথবা দশাননের রাজত্বকালে য়ুরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা এক অবিচ্ছিন্ন মহাদেশ ও মহারাজ্য ছিল। আমেরিকার অন্তঃপাতী আলাস্কা দেশে রাম সীতার পূজা এবং কালিফর্ণিয়া ও মেক্সিকোর মধ্যে হিন্দুকীর্ত্তি কলাপের ভূরি ভূরি ভগ্নাবশেষই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পোলেনেসিয়ার অন্তর্গত তাহিতি(টেহিটী) দ্বীপেও হিন্দুকীর্ত্তির চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রতীত হয় যে, এককালে সমস্ত পৃথিবীই এক মহান্ আর্য্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। আধুনিক ভূবেত্তাদিগের মতে পৃথিবী ক্রমশঃ জলমগ্ন হইতেছে, প্রমাণ আটলাণ্টিক প্রভৃতি দ্বীপ সকলের বিলোপ ও য়ুরোপের ক্রমশঃ নিমজ্জন। ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, কারণ বাল্মীকি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীবের মুখে যে সকল দেশের বর্ণনা করিয়াছেন, আজি তাহাদের অধিকাংশের অস্তিত্ব দেখা যায় না। অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর আয়তনের সহিত আর্য্যসাম্রাজ্যের আয়তন আরও বিস্তৃত ছিল।

* "আটলাণ্টিক মহাদ্বীপ ও খণ্ড প্রলয়" প্রস্তাব দেখ। বা, বো, ৪৩০-৩১ সংখ্যা—২১৪ পৃষ্ঠা।

† রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্য।

(যুদ্ধান্তে কুরুক্ষেত্রে)

কৃষ্ণ। প্রিয়সখা যুধিষ্ঠির!
যুধিষ্ঠির। দেব জনার্দ্দন!
কৃ। কেন এ নিশিতে হেথা বিষাদ-মগন?
বাজিছে উৎসব-শঙ্খ; কত পৌরজন
ভারত-সম্রাটে আজি করিতে বরণ
আসিয়াছে। তুমি কেন এ হেন বিজনে?
যু। জ্ঞানময় প্রভু তুমি; শিখালে অর্জ্জুনে
কর্ম্মযোগ; নব গীতা করিলে প্রচার।
সে গীতা অপরা প্রভু। শিখাও এবার
পরাতত্ত্ব পরাগীতা শান্তির সোপান।
নিষ্কাম নহেক দেব, কর্ম্ম-অনুষ্ঠান।
রুধির-প্রবাহে আজি চির নিমজ্জিত
ভারতের সুখ শান্তি; কলঙ্কমণ্ডিত
এ ছার সমর-কীর্ত্তি সৌভাগ্য প্রতাপ।
রহিল যুগান্তব্যাপী অনন্ত বিলাপ।
কৃ। নিষ্কাম রাজার ধর্ম্ম—প্রজার রঞ্জন;
ধর্ম্মের আসন তব রত্নসিংহাসন।
বিনাশিলে ধর্ম্মযুদ্ধে দুষ্ট রিপুগণে;
ভারত শাসন কর শিষ্টের পালনে।
যু। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, বীর অনুচরে
কেন বিনাশিনু দেব! এ কাল সমরে?
বিনাশিনু জ্ঞাতি গুরু বন্ধু পরিজন;
এই কি দুষ্টের নাশ, শিষ্টের পালন?
নিহত সন্ততি যত দেখিনু নয়নে;
লুপ্ত কুরু-পাণ্ডু-নাম সমরপ্রাঙ্গণে।
মুকুট কণ্টকময় সন্তাপে গঠিত,
শোণিত-রঞ্জিত ছত্র পাপ-কলুষিত;
অনাথের শ্বাস-ভরা চামর ব্যজন,
নির্ম্মিত জীবন-রত্নে রত্ন সিংহাসন।
এই কি নিষ্কাম ধর্ম্ম করিনু সকলে?
এই কি লভিনু ফল কর্ম্মযোগফলে?
এই যদি রাজ্যভোগ, প্রভু জনার্দ্দন,
এ ছার সাম্রাজ্যে মোর নাহি প্রয়োজন।
মেঘাবৃত চন্দ্রিকার ছায়া ধূসরিত
সুবিস্তীর্ণ মরুক্ষেত্র, শোণিত-প্লাবিত—
বেষ্টিত কুহেলি পূর্ণ দূর দিগ্‌বলয়ে—
নিষ্প্রভ জীবনশূন্য আজি এ সময়ে।
অনুচ্চ পলাশ বৃক্ষ ধীরে আন্দোলিয়া,
কুরুপাণ্ডবের রক্তে তৃষা প্রশমিয়া
বহিছে পবন উষ্ণ দহিয়া হৃদয়।
এই কি দুষ্টের নাশ প্রভু দয়াময়?
কৃ। কৌরবের নৃশংসতা অত্যাচার যত
ভুলিলে কি যুধিষ্ঠির? বনবাসে কত
সহিলে যন্ত্রণা সবে নাহি কি স্মরণে?
উদিত জগতে শান্তি তব ধর্ম্ম-রণে।
শোণিতে অর্জ্জিত শান্তি কর সুরক্ষিত।
লহগো শাসন-দণ্ড, বিশ্বহিত-ব্রত।
যু। কি লাভ লভিবে পৃথ্বী আমি রাজা হলে?
আমরা কি প্রপীড়িত করিনি দুর্ব্বলে?
করেনি কি সুশাসন রাজা দুর্য্যোধন?
কে আমি ধরিব দণ্ড প্রভু নারায়ণ?
পাণ্ডবের শত্রু সুধু ছিল দুর্য্যোধন,
আমরা জগত-শত্রু; করিনু দহন
বিশ্বের প্রশান্ত শান্তি জ্বালি যুদ্ধানল।
মঙ্গলের নামে প্রভু একি অমঙ্গল?

করিতাম স্বার্থনাশ যদি প্রাণপণে—
পাণ্ডবের নাম যদি লুপ্ত হত বনে—
তিল মাত্র ক্ষতি তাহে ছিল না ধরার ;
লভিতাম শ্রেষ্ঠ সুখ পুণ্য অমরার।
সমর-দুন্দুভি নাদ, যোদ্ধার হুঙ্কার,
রথের ঘর্ঘর ধ্বনি, অস্ত্রের ঝঙ্কার,
মুমূর্ষু বীরের শ্বাস, আর্ত্তের ক্রন্দন,
নিয়ত পশিছে কর্ণে। দুঃসহ স্বপন !
কৃ। অতীতের তরে বৃথা এ অনুশোচনা ;
জগতের হিত-ব্রত করহ সাধনা।
সকলি কর্ম্মের ফল নশ্বর জগতে।
ভারত প্লাবিত কর পুণ্যকর্ম্ম-স্রোতে।
যু। দেব দেব ! দেখিতেছি মম কর্ম্ম ফলে
ভাসে অনাথিনী নারী নয়নের জলে।
তোমার ভারত রাজ্য, জগত তোমার,
তুমি কর দয়াময় শাসন তাহার।
ওহে দেব কর্ম্মাতীত, সত্য সনাতন,
সাম্রাজ্যে আমার আর নাহি প্রয়োজন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বিপ্রবিনোদী বেদে।*

এই জাতীয় বেদে পরাশর-ধৃত জাতিমালার অন্তর্গত নহে। ইহাদের ব্যবসা সামান্য বেদিয়ার অনুরূপ হইলেও ইহাদের জাত্যভিমান অত্যধিক। ইহারা যজ্ঞসূত্র ধারণ করে এবং ব্রাহ্মণের বাটী ভিন্ন অন্যত্র আহার করে না। দর্শকগণের মধ্যে অন্ততঃ একজন ব্রাহ্মণ না থাকিলে ইহারা যাদুক্রীড়ায়ও প্রবৃত্ত হয় না। সচরাচর কথাবার্ত্তায়ও ইহারা অনেক সংস্কৃত শব্দ ও শ্লোক ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের উৎপত্তি বিষয়ে এক জন ব্রাহ্মণ মান্দ্রাজ মেল সংবাদ পত্রে যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ অনুবাদ করিয়া পাঠিকাদিগকে উপহার দিলাম, তাঁহারা পাঠ করিয়া আমোদিত হইবেন।

পুরাকালে কৃষ্ণানদী তীরস্থ অমরাবতী নগরে জনৈক চোলা বংশীয় নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সভাস্থ সমস্ত পণ্ডিতই জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এমন কি দেশের যাবতীয় শিক্ষা কার্য্য জৈনদিগেরই হস্তে ন্যস্ত ছিল। রাজা একদা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে বারাণসী নগরে গিয়া তত্রত্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত আলাপ করিয়া পরম আপ্যায়িত হন এবং প্রত্যাগমন সময়ে কয়েক জন পণ্ডিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া আইসেন। তিনি তাঁহাদিগকে বহুতর সম্মান, উচ্চ উচ্চ পদ

---

* মোচিক্যাং রজকাজ্জাতা বরুড়ো নট এবচ। জাতিমালা (পরাশর-ধৃত।)
মুচীর গর্ভে ধোপার ঔরসে বরুড় (বাইতি) ও নট অর্থাৎ বেদের উৎপত্তি।

ও প্রভৃত অর্থ প্রদান করেন। ইহাতে সভাস্থ জৈন পণ্ডিতেরা অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত হন এবং আগন্তুকদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। শেষে স্থির হইল যে, বিচারে যে পক্ষের জয় হইবে, তাহারাই দেশে থাকিতে পারিবে, প্রতিপক্ষকে দেশত্যাগী হইতে হইবে। রাজা বারাণসীর ব্রাহ্মণদিগের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি গোপনে তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া একটী মৃণ্ময় পাত্র স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা পূর্ণ করিয়া গভীর রজনীতে রাজ-সিংহাসনের নিম্নে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। প্রতিপক্ষ যদি তাহা বলিতে পারে, তাহাদের জয় লাভ হইবে। প্রভাতে উভয় পক্ষ সভাস্থ হইলে জৈন পণ্ডিতদিগকে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন করা হইল। সকলেই সোৎসুক হইয়া তাহাদিগের মুখ পানে তাকাইয়া রহিল। মুহূর্ত্তেক মধ্যে প্রধান জৈন পণ্ডিত উঠিয়া বলিল যে, রাজাসনের নিম্নে স্বর্ণপূর্ণ মৃত্তিকা পাত্র নিহিত আছে। বারাণসীর পণ্ডিতদিগের মুখ বিবর্ণ হইল। এইরূপ আখ্যায়িকা—তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া বিশ্বেশ্বরের স্তব আরম্ভ করিলেন। বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগের সাহায্যার্থে দুইটী বালককে প্রেরণ করিলেন। তাহারা ব্রাহ্মণদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া মৃণ্ময় পাত্রে কালসর্প আছে বলিয়া প্রতিপক্ষের বাক্য খণ্ডন করিতে পরামর্শ দিল। উভয় পক্ষের উত্তর লিপিবদ্ধ হইল। রাজাজ্ঞায় সিংহাসনের তলদেশ খনন করা হইল, মৃণ্ময় পাত্র দৃষ্ট হইল। কিন্তু যেমনি তাহার আচ্ছাদন উন্মুক্ত করা হইল, অমনি ভীম গর্জ্জনে কালসর্প ঊর্দ্ধফণা ধরিয়া দোলিতে লাগিল। এই প্রকারে সুবিজ্ঞ জৈন পণ্ডিতেরা ভোজবাজী দ্বারা পরাভূত হইয়া সেই রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রাহ্মণেরা জয়ী হইয়া আগন্তুক বালকদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং রাজাও সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা আরও প্রত্যুপকার বাসনায় তাহাদিগের বংশাবলীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিলেন। তদবধি ইহারা ব্রাহ্মণ জাতির অনুগত এবং আপনাদিগকে "ব্রাহ্মন-বিনোদী" বলি অভিহিত করিয়া থাকে। উক্ত দুই বাজীকর বালকই এই "ব্রাহ্মণ বিনোদী বোদয়ার" আদি পুরুষ। *

* Theosophy for January 1902.

স্বর্গগতা মাতৃদেবী অপূর্ব্বসুন্দরী ঘোষ।*

আজ আট মাস হইল আমার পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণী ইহসংসার ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁর অভাবে আমাদের গৃহ শূন্য ও ঘোর

* ঝামাপুকুর নিবাসী বাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের পত্নী। ৩ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের লেন।

অন্ধকারময়! শত অনুসন্ধানেও তাঁহাকে আর পাইব না; তবে তাঁহার গুণরাশি মনে হইলে বিমল আনন্দ অনুভব করি বলিয়া আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

জননীদেবী সে কালের বাগবাজারের "ব্রহ্ম" উপাধিধারী দত্ত বংশোদ্ভবা ছিলেন। তখনকার সময়ে দত্ত মহাশয়েরা ধনে ও মানে কলিকাতার মধ্যে এক প্রসিদ্ধ বংশ ছিলেন। জননীদেবী যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখনও ইঁহাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। মার মুখে এরূপ গল্প কতবার শুনিয়াছি যে, তাঁহার শৈশবাবস্থায় যে দাসী তাঁহাকে অঙ্কে ধারণ করিত, তাহাকে দেশী বস্ত্র পরিতে হইত; কারণ, কোন সময়ে তাঁহার পিতামহ দাসীকে মোটা কাপড় পরিয়া তাঁহার আদরের পৌত্রীকে কোলে লইতে দেখিয়া দপ্তরখানায় বলিয়াছিলেন যে, যে দাসী কন্যাপালনে নিযুক্তা, তাহাকে যেন দেশী বস্ত্রে পরিহিতা রাখা হয়, তাহা না হইলে "মেয়ের গায়ে ছড় যাইতে পারে।" এরূপ হইবার কারণও বিদ্যমান রহিয়াছে; বংশের মধ্যে আমার দাদা মহাশয়ের দুই কন্যা ব্যতিরেকে আর কেহই ছিল না, তাহাতে আমার মা আবার কনিষ্ঠা ছিলেন। যাহাহউক, এইরূপ ভালবাসার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত তিনি বিবাহিত জীবনে পদার্পণ করিলেন। সমৃদ্ধির ক্রোড় হইতে মানুষ যখন হীনাবস্থ পরিবারের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন তাহার সকল বিষয়েই একটা অস্ফুট অভাব অনুভূত হয়। সে অভাবের অনুক্ষণ পূরণ না হইলে মনকে বিমর্ষ করিয়া তুলে। এ ক্ষেত্রে মা'র আমার সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটিল। শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার প্রকৃতি এমন সুন্দরভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, যখন যে অবস্থায় পড়িতেন, তখনই সেই অবস্থায় আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া রাখিতেন। কাজেই স্বামিগৃহে আত্মীয়বর্গের নিকট শীঘ্রই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। পারিবারিক কার্য্যে সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করা তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। তাঁহার শ্বশুরের অল্প আয় সত্বেও সংসারে অল্প দিনের ভিতর এরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, তাহা অনুমানে সম্যক্ বুঝা যায় না। পারিবারিক জীবনে এমন নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। তাঁহার শ্বশুরকুলে আত্মীয়ের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। কিন্তু আজীবন এরূপ সমভাবে তাঁহাদিগের সকলকার পরিচর্য্যা করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। বড় মানুষের ঘর হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে আসিলে সকলেরই মনের মধ্যে একটা দাম্ভিকতা বাড়িয়া যায়। সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, সে দোষ মাতাঠাকুরাণীকে লেশমাত্রও স্পর্শ করে নাই। কুমারী-জীবনে পিতৃগৃহে সাংসারিক কার্য্য তাঁহাকে কিছুই দেখিতে হইত না। তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি যে, তিনি রন্ধন কার্য্য পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না; কিন্তু

ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁহাকে শিখিতে হইয়াছিল। একবার তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ডাউল চড়াইয়া সাংসারিক অন্য কি কার্য্যে ব্যস্ততা নিবন্ধন তাঁহাকে উহা নামাইতে বলিয়াছিলেন। তিনি তখন সদ্য-পরিণীতা কুলবধূ, রন্ধন-বিদ্যার কিছুই ধার ধারিতেন না। কাজেই তিনি মহাসমস্যায় পড়িলেন; আবার ওদিকে "জানি না" বলিলে তখনকার দিনে সকলেই নিন্দা করিবেন। এই ভয়ে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে খুব অধিক পরিমাণে লবণ ও মরিচ বাটা দিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আদেশ পালন করিলেন। অবশ্যই ভোজন বেলায় তাহা কাহারও মুখে উঠিল না; কিন্তু এই অপারদর্শিতাই ভবিষ্যতে রন্ধন বিদ্যায় তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট শিল্পী করিয়া তুলিয়াছিল।

তাঁহার শ্বশুরের সামান্য মাত্র আয় ছিল; কাজেই সে আয়ে ৭।৮টি পুত্রের ভরণ পোষণ ও তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা করা তাঁহার পক্ষে বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিল! আর্থিক ব্যাপারে সাহায্য করার ভার ঠাকুরদাদার কনিষ্ঠের উপরেই ন্যস্ত হইল। সে কালে তিনি রাজসরকারে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে কনিষ্ঠ দাদামহাশয়ের আংশিক সাহায্য সত্ত্বেও অনেক সময়ে দাদামহাশয়কে ছেলেদের সাময়িক অভাব নিবৃত্তির নিমিত্ত আকুল হইতে হইত। কনিষ্ঠ এ সব বিষয়ে মুক্তহস্ত হইলেও তিনি শালীনতা বশতঃ সকল সময় সকল কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতে পারিতেন না। এ সময়ে তাঁহার পুত্রবধূই তাঁহাকে অকাতরে সাহায্য করিত। কতবার এমনও দেখা গিয়াছে যে, ঠাকুর মা একেবারে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া বিরলে ক্রন্দন করিতেছেন, আর মা আমার তাঁহার অভাব পূরণার্থ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন! তাঁহার নিজের হস্তে না থাকিলেও লোকের নিকট হইতে ঋণ করিয়াও আত্মীয়বর্গের অভাব মোচন করিতেন। একবার আমার কোন আত্মীয় ঋণের দায়ে জড়িত হইয়া পড়েন; মা জানিতে পারিয়া তাঁহার অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া তাঁহাকে দায় হইতে মুক্ত করেন। শুধু আত্মীয়বর্গের জন্য নহে, পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় কোনরূপে সুস্থির থাকিতে পারিত না; এই জন্যই হীনাবস্থ প্রতিবাসীবর্গ চিরকালই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিত। আবার এ দিকে বাবার আয়ও নিতান্ত অল্প ছিল; তাহা দ্বারা সুশৃঙ্খলে সংসার নির্ব্বাহ করিয়া কোথা হইতে তিনি স্বীয় ক্ষমতানুসারে বদান্যহৃদয়ের পরিচয় দিতেন, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনুধাবন করিবার শক্তি নাই। বাস্তবিকই, ভগবানের অনুগ্রহ না থাকিলে লোকে কেন তাঁহার সংসারকে "সোণার সংসার" বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে? কষ্টে সহিষ্ণুতা প্রকাশ করা তাঁহার জীবনের আর একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল। পারিবারিক জীবনে সহিষ্ণুতার নিত্য প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বল্পাধিক পরিমাণে

উপলব্ধি করিতে সক্ষম। যাঁহাদের সহিত একত্র বসবাস করিতে হয়, তাঁহারা সকলেই নির্দ্দোষ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, অকপট ও নিষ্কলঙ্ক-স্বভাব হইবেন এরূপ আশা করা যায় না। তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক ভ্রান্তির জন্য যদি আমরা সর্ব্বদা অসন্তোষ প্রকাশ করি, তাহা হইলে সুখের ছায়াও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই জন্য তাঁহাদের দোষগুলি দূর করিবার নিমিত্ত আমাদিগের সচেষ্ট হওয়া উচিত, তাহাতেও যদি তাহার নিরাকরণ না হয়, তাহা হইলে পারিবারিক শান্তির জন্য আমাদের তাহা সহ্য করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। মাতাঠাকুরাণী জীবনে এ সহ্য গুণের পরাকাষ্ঠা বহুবার বহুকার্য্যে দেখাইয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যে ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বহুল করিতে অনেকেই বিশেষ পটু ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কেমনই মধুর প্রকৃতি ছিল যে, তিনি ঐ সমস্ত কথা গায়ে মাখিতেন না—হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। তাঁহার কোন কোন আত্মীয়-পত্নীরা তাঁহার সহিত অনেক সময় সামান্য কথায় বাক্যালাপ বন্ধ করিতেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁহারাই আবার তাঁহার সেবায় পরাস্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক স্বকৃত অপরাধের ক্ষালন করিতেন। যাহা ন্যায়, যাহা সত্য, চিরকালই তিনি তাহার পক্ষপাতী ছিলেন। জীবনে যাহা সৎ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাঁহার পুত্র কন্যার মধ্যেও সেই ভাব পরিস্ফুট করিতে সতত যত্নবতী থাকিতেন। মাতা যেমন সন্তানের জীবন গঠনে সিদ্ধ-হস্ত, সংসারে আর কেহই সেরূপ নহেন। প্রতিকার্য্যে সন্তান মাতার জীবনেরই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে এবং সুফল লাভে তাঁহারই আশীর্ব্বাদ শিরে গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়। এরূপ উপদেষ্টাকে যাঁহারা অবহেলা করেন, তাঁহাদিগের পরিণাম সহজেই অনুমেয়।

মা'র একটী বিশেষ গুণ ছিল; সেটি বৈরাগ্য। বেশবিন্যাসের প্রতি তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না; ভোজ বা আমোদ-স্থলের নিমন্ত্রণে পারত পক্ষে তিনি যাইতে চাহিতেন না। যদি বা কোন রকমে সম্মত হইলেন ত সামান্য পোষাকেই তথায় যাইতেন; আহারাদির ব্যবস্থায়ও উহা নিয়ত লক্ষিত হইত। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "মাটীর দেহ মাটীতে মিশাইবে, তবে কাহার জন্য এত যত্ন করিব?"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাবার অর্থকৃচ্ছ্রতা-নিবন্ধন সংসারে ঝি চাকরের বাহুল্য কিছুই ছিল না। সাংসারিক প্রায় সমস্ত কার্য্যই মা'কে করিতে হইত। পরিশ্রমে তিনি কখনও কাতর হইতেন না। দিনে হউক, রাত্রিতে হউক, পরিশ্রমের পরিমাণ অল্পই হউক বা অধিক হউক, গৃহে পরিজনবর্গের সেবার্থে হউক বা অতিথি আগন্তুকের পরিচর্য্যার্থেই হউক, কখনও বিমুখ ছিলেন না। তাঁহার দৈনিক জীবন হইতেই ইহা প্রতিপন্ন হয়। অতি প্রত্যূষেই তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন এবং স্নানান্তে আহ্নিকাদি কার্য্য সমাপন

করিয়া রন্ধনশালায় আহারাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, এবং তথাকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভোজনান্তে বেলা ২ ঘটিকার সময় উপরে উঠিতেন। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া রামায়ণাদি পুরাণ গ্রন্থ পাঠ বা কোন সারগর্ভ সাহিত্যের আলোচনা করিয়া বেলা ৫টার সময় আবার পরিজনবর্গের আহারাদির আয়োজনে ব্যাপৃত হইতেন। শেষে সকলকে ভোজন করাইয়া রাত্রি ১১টার সময় আবার বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিতেন। মা আমার খাটিয়া খাটিয়া সারা হইতেন, কিন্তু কখনও তাঁহাকে "শ্রান্তি বোধ করিতেছি" এ কথা বলিতে শুনি নাই। আত্মীয়ভোজন প্রভৃতি বাড়ীর কোন বৃহৎ ব্যাপারেও মা'কে অশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার সে উদ্যম, সে উৎসাহ দেখিলে তাঁহার পরার্থপরতাকেই ধন্য ধন্য করিতে হয়। আত্মীয়বর্গের গৃহে কোন কার্য্যে তাঁহার যাইতে বিলম্ব হইলে সকলেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু একবার মা তথায় উপস্থিত হইলেই শত বিশৃঙ্খলার মধ্যে মন্ত্রবলে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইত; ইহাই তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব। এখন তাঁহার অভাবে শুধু আমাদের গৃহে নহে, আত্মীয়বর্গ সকলকারই গৃহে হাহাকারের একটা অস্ফুট ধ্বনি শ্রুত হইতেছে।

মা'কে কখনও কাহারও প্রতি রূঢ় কথা বলিতে শুনি নাই। তাঁহার প্রকৃতি বড়ই মিষ্ট ছিল। এই জন্য লোকেও তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। আমার দাদা শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার যখন বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁহারই অনুরোধে এ দেশীয় কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবার ও ইউরোপীয় দুই তিনটি মহিলার সহিত তিনি পরিচিতা হয়েন। তাহার পর এই সমস্ত পরিবারে তাঁহার এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল যে, কিছু দিন তাঁহারা যদি মাকে না দেখিতে পাইতেন, ত ছুটিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, এবং মা'র ওই বিদেশিনী বন্ধুদিগের মনে তাঁহার বিনয়, নম্র ব্যবহার ও প্রকৃতি-মধুর স্বভাব দেখিয়া এমনই একটা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে, হিন্দু রমণীমাত্রেই তাঁহাদিগের বন্ধুর ন্যায় সরলপ্রকৃতি। এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্ত না হইলেও তাঁহাদিগেরই সরলতার পরিচায়ক। যখনই তাঁহারা স্বদেশ হইতে এই প্রবাসে আসিতেন, তখনই মায়ের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিমন্ত্রণাদি রক্ষা না করিয়া দেশে ফিরিতেন না। মাও তাঁহাদিগের ক্ষণিক অবস্থিতিকালে সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকট যাতায়াত করিতেন। বিলাতে তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূতা। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে শীতের সময় যখন তাঁহারা শেষবার এ দেশে আসিলেন, তখন একদিন তাঁহাদিগের পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে মা দেখা করিতে গিয়াছিলেন। এ স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে ইংরাজীতে অনভিজ্ঞতা-

বশতঃ মা সাধারণতঃ বাঙ্গালা ও হিন্দীতে কথাবার্ত্তা কহিতেন। কথাপ্রসঙ্গে আমাদের দেশের মিষ্টান্নের কথা উঠিল; তাহাতে মিস্ নো—নামক তাঁহাদিগের জনৈক বন্ধু বলিয়া উঠিলেন যে, ইংরাজী মিষ্টান্নের শ্রেষ্ঠত্বের সহিত এ দেশীয় দ্রব্যের কোন তুলনাই হইতে পারে না। ইহাতে মা কথায় কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারা যায় না বলিয়া, তাঁহাদিগকে একদিন দেশীয় মিষ্টান্ন খাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। ঐ দিনে মা অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ক্ষীর ও ছানার কয়েকটি মিষ্টান্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। যথা সময়ে তাঁহারা উহা ভোজন করিয়া দেশী মিষ্টান্নেরই জয় ঘোষণা করিয়া গেলেন। মাও পরিতোষের সহিত তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া আপ্যায়িত হইলেন। মায়ের এই উদারতা, স্নেহমমতা ও ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া আমার দাদাকে লক্ষ্য করিয়া মিস্ মৃ—সর্ব্বদা বলিতেন যে, "এমন মায়ের ছেলেরা যে ভাল হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?" দাদার যে সমস্ত ব্রাহ্ম বন্ধু আমাদের বাড়ী নিত্য আসিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনিও তাঁহাদিগকে আদর যত্ন করিতে ত্রুটি করিতেন না। আত্মীয়বর্গ এই জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে ব্রাহ্ম বলিয়া উপহাস করিত; কিন্তু তাহাতে তিনি কখনও কর্ণপাত করিতেন না। সকল দেশে সকলকালে উদার হৃদয়ের ব্যবস্থাই এইরূপ, তাহাতে তিনি কেন ক্ষুণ্ণ হইবেন?

নিজে তাদৃশী শিক্ষিতা না হইলেও তিনি কখনও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। দাদার বিবাহ সময়ে তাঁহার সঙ্কল্পই ছিল যে, শিক্ষিতা বধূ ঘরে আনিবেন, এবং তাঁহার এ সঙ্কল্পও পূর্ণ হইয়াছিল। ইদানীন্তন আমার কন্যাদিগের শিক্ষাকার্য্য তিনি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

পরিচিত বন্ধুদিগের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার উদার মত অনেকেরই জানা ছিল; নিজে হিন্দু হইলেও অপর ধর্ম্মের কখনও নিন্দা বা বিপক্ষতাচরণ করেন নাই। তাঁহার প্রৌঢ়া আত্মীয়াদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে কতবার তীর্থযাত্রায় প্রণোদিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার মনের একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, "সর্ব্বমিদম্ ব্রহ্মময়ম্ জগৎ;" তবে আর তীর্থ যাত্রায় ফল কি? ঘরে বসিয়া ব্রত বা তীর্থযাত্রার ফল লাভ করিতে ত পারি; তবে সুদূর প্রবাসে যাইবার আবশ্যকতা কি? হিন্দুর গৃহে যে রমণী প্রৌঢ়াগণের সমক্ষে এ কথা বলিতে পারেন, তাঁহার ধর্ম্মমত কতদূর উদার ও উন্নত!

শেষ জীবনে তাঁহার স্বাস্থ্য নিতান্ত ভগ্ন হইয়াছিল; ইদানীং ঐ ভগ্ন স্বাস্থ্যেই সমস্ত কার্য্য দেখিতেন। পরিশেষে গত ১৫ই জুলাই তিনি মূত্রকৃচ্ছ্রতা রোগে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল ; ভিষকবর্গের শত চেষ্টায়ও কোন ফল ফলিল না। ক্রমেই অবসন্ন হইতে লাগিলেন। শেষে ইংরাজী ১৯০১ সালের ৩১এ জুলাই, বাঙ্গালা ১৫ই শ্রাবণ, বুধবার রাত্রি ১১॥০ টার কিছু পরেই আমাদিগের ঘরে বিষাদরাশি ঢালিয়া, সন্নিকৃষ্ট প্রতি হৃদয়ে হাহাকার ধ্বনি তুলিয়া, মা আমার অনন্তধামের পথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অমূল্য জীবন প্রদীপ অসময়ে নির্ব্বাপিত হইল; কিন্তু যে শোকাগ্নি তিনি আমাদিগের হৃদয়ে জ্বালিয়া গেলেন, তাহা চিরকালই ধূ ধূ করিয়া জ্বলিবে। এখন তাঁহার অমর আত্মা স্বর্গে চিরশান্তি লাভ করুক, এই আমার করুণ প্রার্থনা।

শ্রীমতী শরৎশশী দত্ত।

সঙ্ঘামিত্রা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

সঙ্ঘা। ভেবেছিনু পুষ্পোদ্যানে
নিমগ্ন হইব ধ্যানে,
ফুটিবে প্রাণের পদ্ম জ্ঞানের সলিলে ;
সখীরা যে সে আশায়, নিরাশ করিল হায় !
একটু নির্জ্জন স্থান কোথাও না মিলে !
(ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া)।
কত দিন এই ভাবে দিন মোর কেটে যাবে?
কত দিন রব আমি পড়ি সমস্যায়?
আকুল অধীর চিত্ত ;—এক দিকে শুনি নিত্য
।বশ্বের অযুত কণ্ঠ ডাকিছে আমায়।
উন্মত্ত সমীর সম প্রতিক্ষণ প্রাণ মম
জগতের দ্বারে যে গো ছুটে যেতে চায়।
অন্য দিকে মাতা মোরে বেঁধেছেন স্নেহ-ডোরে,
রেখেছেন বন্দী যেন সংসার-কারায় !
এক দিকে নিরন্তর ধরিত্রী মাতার স্বর
ধ্বনিত হ'তেছে এই হৃদয় মাঝারে—
বলিতেছে "কন্যা, আয়, অন্তহীন এ ধরায়
সেবাব্রতে সমর্পণ কর আপনারে।"
অন্য দিকে জননীর অশ্রুসিক্ত ম্লান
পুণ্য প্রীতি-উচ্ছ্বসিত নির্ম্মল বয়ান—
জননীর স্নেহ-আর্দ্র করুণ ক্রন্দন,
সংসারের পানে মোরে করে আকর্ষণ।
কোন্ পথে যাব আমি ? শাক্য ভগবান্
অন্তরে নিয়ত শুনি বিশ্বের আহ্বান,
পিতার ক্রন্দনে হায় ! হইয়া বধির
ভিক্ষু বেশে হইলেন রাজ্যের বাহির।
তেমনি কি সঙ্গোপনে সন্ন্যাসিনী-সাজে
আমিও যাইব চলি জগতের কাজে ?
রমণী যে শক্তিহীনা ; দুর্ব্বল এ মন,
জননীর অচ্ছেদ্য সে স্নেহের বন্ধন

কিরূপে করিব ছিন্ন? অগ্রজ আমার,
সৌম্যমূর্ত্তি রম্যকান্তি প্রিয়পুত্র তাঁর—
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে সন্ন্যাসীর বেশে,
গিয়াছেন চলি দূর সিংহল প্রদেশে।
আহা, বড় ব্যথা বাজিয়াছে সুকুমার
জননী-হৃদয়ে। হায়, আমিও আবার
নির্ম্মমের মত যদি সেই মাতৃ-প্রাণে
আঘাত করিয়া যাই, শান্তির সন্ধানে,
তবে শোকে ম্লান মোর মাতার হৃদয়
ছিন্ন পদ্ম সম হবে শতধা নিশ্চয়।

(কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া)।

দূর হোক সঙ্কল্প আমার। শুনিব না
ধরণীর করুণ ক্রন্দন। যাইব না
প্রীতি লয়ে জগতের দ্বারে। আপনারে
মায়ার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখিব সংসারে।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)।

অসীম ধরায় কে যাবে কোথায়?
নরনারী কেহ ভাবিতে না চায়;
যার যেথা মন সেথা অনুক্ষণ
সুখের আশায় স্রোত সম ধায়।
এই বিশ্ব মাঝে এসেছে কি কাজে
কেন এ জীবন, জুড়াবে কোথায়?
কিছু না বুঝিয়া দিতেছে সঁপিয়া
অমূল্য হৃদয় মরণের পায়।
কবে মানবের যাবে অন্তরের
সুখের লালসা মোহের স্বপন,
বুঝিবে জগতে খেতে নিদ্রা যেতে
করে নাই কেহ জনম ধারণ।
হায়, কত দীন অন্নবস্ত্রহীন,
পাপে মনস্তাপে কাঁদে অসহায়;
কেহ কাছে গিয়া পুণ্য প্রীতি দিয়া
স্নেহে কি তা'দের নয়ন মুছায়?
বিপুল সমাজ, কত আছে কাজ,
দিতে হবে প্রাণ বিশ্বের সেবায়;
কেন নর নারী, সুখ সুখ করি
দুঃখ ডেকে আন' প্রাণের তৃষায়।

সন্ধ্যা। কে গায় কে গায় গান? এ কিরে কুহকে প্রাণ
আচ্ছন্ন আবার! বল, কে তুমি দেবতা,
করুণ মধুর স্বরে আহ্বান করিছ মোরে?
শুনেছিলে বুঝি হীন সঙ্কল্পের কথা?
তাইকি করুণ গীতে চাহ মোরে ফিরাইতে?
ভয় নাই, পড়ি গিয়া জননীর পায়;
[illegible] মা আমার, কন্যা আমি নই আর,
ভুলে যা স্নেহের স্মৃতি, ভুলে যা আমায়।
নহিলে জনম তোর কাঁদিয়া হইবে ভোর;
হায় মা, তনয়া আমি, অতি অভাগিনী;
জন্মেছিনু অবনীতে শুধু তোরে কষ্ট দিতে,
অশ্রুনীরে ভাসাইতে, করিতে দুঃখিনী!

(ক্রমশঃ)

নৈসর্গিক আশ্চর্য্য কুজ্ঝটিকা-স্ফোট।

পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে কখন কখন যে মহান্ তরঙ্গ-বেগ ইহার ত্বকের অব্যবহিত নিম্নে প্রতিঘাত করিয়া ভীষণ গম্ভীর শব্দ উৎপাদন করে, তাহা অনেকেই

অবগত আছেন। এই শব্দ সচরাচর ভূকম্পের বা আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের অব্যবহিত পূর্ব্বেই শ্রুত হওয়া যায়। ইহা ভাবী বিপৎপাতের ও অমঙ্গলের অমোঘ চিহ্ন। স্থলের ন্যায় জলেও কোন কোন স্থানে এরূপ শব্দ সময় সময় শ্রুত হয়। পার্ব্বতীয় উপকূলে আগ্নেয় ক্রিয়ামূলক এরূপ শব্দোৎপত্তি আশ্চর্য্যজনক নহে, কিন্তু সমতল উপকূলের সান্নিধ্যে সমুদ্রমধ্যে যে কি কারণে এরূপ শব্দ উত্থিত হয়, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। লিমবর্গের সমতল উপকূলে সময় সময় এইরূপ শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে। কোথা হইতে এই শব্দ উৎপন্ন হয়, কেহই এ পর্য্যন্ত তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই। নাবিকেরা ইহাকে কুজ্ঝটি-স্ফোট বলিয়া থাকে। কুজ্ঝটিকার সহিত ইহার সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু যখন কুজ্ঝটিকা থাকে না, পরিষ্কার আকাশের নিম্নেও এরূপ শব্দের নির্ঘোষ শ্রুত হইয়াছে। ইহা দুরস্থ কামানধ্বনির অনুরূপ ; হঠাৎ বজ্রনাদের ন্যায় দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে। কখন কখন যুগপৎ দুই তিনবার শব্দ শ্রুত হয়, কখন বা পৃথক্ পৃথক্ শনৈঃ শনৈঃ ৬।৭টী শব্দ হইয়া থাকে। অষ্টেণ্ড বাতীঘরের রক্ষক অনেক বৎসর ধরিয়া তত্রত্য উপকূলসমীপে এইরূপ সামুদ্রিক শব্দ শুনিয়াছিলেন। বোলন নগরে পরিষ্কার দিবসে অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় ১০।১২ বার পুনঃ পুনঃ এরূপ শব্দ শ্রুত হইত। ইহা তোপের অনুরূপ নহে—খনি-উৎখাত বা দূরস্থ ভীষণ বজ্রনাদ স্বরূপ। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে ডার্টমুর নগশ্রেণীতেও এইরূপ শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে। আম-সামার ও নাকুশ পর্ব্বতেও সর্ব্বদা এইরূপ অদ্ভুত তোপধ্বনি শুনা যায়। নিউবার্ণস্থইক—চারলট প্রদেশের উপকূলে গ্রীষ্মকালে মধ্যে মধ্যে সমুদ্রের উপরিভাগে এরূপ তোপধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। সেণ্টজন নগরের সাত মাইল দূরে পাসামাকোডি উপসাগরে এইরূপ শব্দ সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়—এ স্থলের জলরাশির গভীরতার ইয়ত্তা নাই। ইহা অতলস্পর্শ। গ্রাণ্ডমানান ও মরুনগের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানেও এইরূপ শব্দ সর্ব্বদা শুনা যায়। আমেরিকার অন্তঃপাতী নিউইয়র্ক প্রদেশের সেনেকা হ্রদে এইরূপ তোপধ্বনি শ্রুতি হয়। একজন পরিব্রাজক বর্ণনা করিয়াছেন—"হ্রদ যেন ভীষণ গর্জ্জনে চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতমালার সহিত সম্ভাষণ করিতেছে, এবং পর্ব্বত সকলও স্পষ্টরূপে প্রতিধ্বনি প্রতিদান করিতেছে।"

কোন কোন স্থলে কিছুকাল ধরিয়া এইরূপ ভীষণ শব্দ উত্থিত হইয়া পরে একেবারে নিস্তব্ধ হইয়াছে। হডসন্ উপসাগরে কনেকটিকট নদীর সঙ্গম-সন্নিধানে প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে (১৭২৮ হইতে) ভীষণ তোপধ্বনি হইয়া আবার বন্ধ হয়। ব্রিটিস্ গায়েনার ঈশানোর নিকট ১৮৩৮ হইতে ১৮৭২ অব্দ পর্য্যন্ত গভীর তোপধ্বনি শ্রুত হইত। পরিষ্কার

দিবসেই এই ব্যাপার সংঘটিত হইত। অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় যে, দক্ষিণদিকস্থ পর্ব্বতাঞ্চল হইতেই শব্দ উত্থিত হইত। অষ্ট্রেলিয়ার জিপলণ্ড প্রদেশেও এরূপ শব্দ শ্রুত হয়। ইহা অনেকটা বন্দুকের শব্দের ন্যায়।

আমাদের দেশে বরিশাল জেলার উপকূলে এইরূপ কামানধ্বনি শ্রুত হয়। ইহাকে "বরিশাল তোপ" বলিয়া থাকে। ইহা সমুদ্র হইতে ৩২।৩৩ ক্রোশ দূরে শ্রুত হয়। একবারে ৩টী শব্দ হইয়া থাকে। ইহা ঠিক্ দূরস্থ তোপধ্বনির অনুরূপ। অন্যান্য স্থানে গ্রীষ্মের সময় যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, এখানে প্রায় বর্ষাকালেই সেইরূপ হইয়া থাকে। যখন দিবস মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টি বর্ষিত হয়, প্রায় সেই সময়, বিশেষতঃ অপরাহ্ণে এই গভীর শব্দ হইতে থাকে। কখন কখন রাত্রি ৮।৯ টার সময়ও শব্দ হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরের এই স্থানে সমুদ্রগর্ভে একটী গভীর খাত আছে, তাহা সেণ্টজন নদের সঙ্গমস্থল পাসামাকোড়ি উপসাগরের ন্যায় অতলস্পর্শ। অনেক চেষ্টা করিয়াও এখানকার গভীরতার পরিমাণ করিতে পারা যায় নাই। এই খাত যে কতদূর পর্য্যন্ত জল ও স্থলভাগের নিম্নদেশে প্রসারিত আছে, তাহারও নির্ণয় হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, এই খাতের উত্তর দিকের সমুদ্র-তলদেশের কিয়দংশ ধসিয়া খাতমধ্যে নিপতিত হইয়াছে, তজ্জন্য বঙ্গদেশের দক্ষিণ উপকূলের অধিকাংশ দেশ বসিয়া গিয়াছে। এই স্থানই বর্ত্তমান সুন্দরবন। পূর্ব্বে ইহা একটা প্রকাণ্ড জনপদ ছিল। ভগ্ন অট্টালিকা, দেবমন্দির, তড়াগ ও রাশি রাশি ধ্বংসাবশেষই তাহার প্রমাণ। এই দুর্ঘটনা প্রযুক্তই এতদ্দেশ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখনও জোয়ারের সময় এখানকার অধিকাংশ স্থলভাগ প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা জলমগ্ন থাকে। এই খাতের দুর্ব্বিপাকে এই স্থান বসিয়া গিয়া জলমগ্ন হইতেছে অথবা যে নিগূঢ় কারণে বর্ত্তমান য়ুরোপখণ্ড ক্রমশঃ নিমজ্জিত হইতেছে, এখানেও তাহার ক্রিয়া চলিতেছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক এই ভীষণ শব্দ যে উক্ত খাত হইতে নির্গত হইয়া থাকে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এন অন্তরীপ হইতে মেইনের পূর্ব্বাংশে সোল দ্বীপ সকলে সর্ব্বদাই এরূপ শব্দ শ্রুত হয়। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে প্রতি মিনিটে তিন চারি বার তোপধ্বনির ন্যায় গম্ভীর নাদ হইয়া থাকে। রাত্রিতে কিম্বা শীতকালে কখনই এরূপ হয় না। এখানে সমুদ্র-গর্ভ প্রায় ৮ মাইল (৪ ক্রোশ) পরিমিত স্থান ১৮ সেদমেরও উপর গভীর। পোর্টস্‌মাউথ বাতীঘর ও সোল-দ্বীপ সকলের মধ্যবর্ত্তী পিস্‌কাটেকোয়া নদী-সঙ্গম স্থলেও এইরূপ ভীষণ শব্দ শ্রুত হয়, কিন্তু তাহা নিয়মিত নহে। গ্রীষ্মকালে পরিষ্কার ও উষ্ণ অপরাহ্ণে যখন দক্ষিণানিল মন্দ মন্দ প্রবাহিত হয়, প্রায় সেই সময়েই দূরস্থ তোপধ্বনির ন্যায় গম্ভীর সামুদ্রিক শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর অন্যান্য উপকূলেও এইরূপ সামুদ্রিক শব্দের কথা শুনা যায়, কিন্তু অদ্যাপি ইহার কারণ নির্ণীত হয় নাই।

বিজ্ঞানবিৎ মস্যুর ভন-ডি বোক বলেন, "বায়ুমণ্ডলে তাড়িতাধিক্যে এইরূপ শব্দের উৎপত্তি হয়,"—কিন্তু তাহা হইলে ইহা স্থানীয় হয় কেন? [illegible] সম্ভব। মস্যুর রিগেটের মতে ইহা পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ শব্দ। ভূ-গর্ভস্থ উষ্ণ তরল দ্রব্য রাশি রাশি ভূ-ত্বককে সবেগে আঘাত করিয়া এরূপ শব্দ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ডিন ষ্টানলির মতে ইহা সমুদ্রের উপরিভাগস্থ বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণজাত শব্দ। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী কারণ অনুমিত হইয়া থাকে ; যথা—

(১) সামুদ্রিক জোয়ার ভাঁটার কার্য্য।

(২) উপকূলস্থ পর্ব্বতে তরঙ্গের প্রতিঘাত।

(৩) নদীর সমুচ্চ তীরের প্রপতন (ভাঙ্গন)।

(৪) পর্ব্বতশৃঙ্গের সমুদ্রগর্ভে পতন।

(৫) গহ্বর বা পর্ব্বত-কন্দরে বদ্ধ বায়ুর নির্ঘোষ।

(৬) পার্ব্বতীয় প্রদেশে সমুদ্র-শব্দের প্রতিধ্বনি। তরঙ্গের আঘাত প্রতিঘাতে সমুদ্রের স্বাভাবিক শব্দ সর্ব্বদাই উত্থিত হয়। ইহা তোপের শব্দ নহে, জলের কল্লোল নিনাদ, এক ক্রোশের অধিক শুনা যায় না।

(৭) ভূগর্ভস্থ বা সামুদ্রিক মগ্ন আগ্নেয়ের উন্মুক্ত ধূমরাশির শব্দ ইত্যাদি।

কোন কোন স্থলে ইহার কোন কোনটী কারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত কারণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।*

* "Scientific American" 29-8-96.

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের অসাবধানতা।

প্রথম প্রস্তাব।

বাঙ্গালী বামা-সমাজের উন্নতিকল্পে প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল ব্যাপিয়া "বামাবোধিনী পত্রিকা" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, পুরুষদিগের জন্যও বাঙ্গালা দেশে চল্লিশ বর্ষ ব্যাপিয়া কয়খানি পত্রিকা স্থায়িত্বলাভে সমর্থ হইয়াছে? সুতরাং বামাবোধিনীর এই বয়স, বামাবোধিনী পত্রিকা এবং বাঙ্গালী বামা-সমাজের পক্ষে বিশিষ্ট গৌরবের পরিচায়ক। সমগ্র বাঙ্গালী নারীসমাজের হিতকল্পে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়, ইহা সত্য ; কিন্তু বামাবোধিনীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেকের একটি ভ্রমাত্মক ধারণা আছে, তাহার অপনোদন হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালা দেশের অতি অল্পসংখ্যক মুসলমান রমণী বাঙ্গালা ভাষায় সুশিক্ষিতা, ইহাঁদের মধ্যে

অতি সামান্য সংখ্যা ভাল করিয়া বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে, পড়িতে, বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন। মুসলমান রমণী অপেক্ষা বাঙ্গালী খ্রীষ্টান বালিকা ও রমণীগণ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে শতগুণে অধিকতর শিক্ষিতা এবং সুদক্ষা; দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী মুসলমান রমণী এবং বাঙ্গালী খ্রীষ্টান রমণীদিগের অনেকের মুখে বামাবোধিনী সম্বন্ধে আমি সময়ে সময়ে অন্যায় মন্তব্য শুনিতে পাই। আমি অনেক বার স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তাঁহারা বলেন "বামাবোধিনী পত্রিকা, কেবল বাঙ্গালী হিন্দু এবং ব্রাহ্ম বামাদিগের জন্য প্রচারিত হয়; খ্রীষ্টানী বা মুসলমানীর সহিত ইহার স্বার্থ ও সম্পর্ক খুব কম।" কথাটি অতীব অসঙ্গত, কারণ "বাঙ্গালী স্ত্রীলোক" বলিলে কেবল হিন্দু ও ব্রাহ্ম পরিবারের অন্তর্ভূর্ত নারীনিচয়কে বুঝায় না, মুসলমানী হউক আর খ্রীষ্টানী হউক—প্রত্যেক বাঙ্গালা ভাষাভাষিণী স্ত্রীলোককে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং পত্রিকার উদ্দেশ্য বুঝিতে তাঁহাদের ভ্রম হইয়াছে। বাঙ্গালীর স্ত্রী হইলে এবং বাঙ্গালা ভাষা মাতৃভাষা হইলে সেই রমণী বঙ্গবামা বলিয়া গণ্যা হয়েন, তিনি দিল্লীতেই, থাকুন আর মাদ্রাজেই থাকুন, অথবা বাঙ্গালা দেশেই থাকুন্, বাঙ্গালিনী বলিয়া গণ্যা হইবেন এবং বামাবোধিনীতে তাঁহার যেমন স্বার্থ থাকে, একজন কলিকাতাবাসিনী বঙ্গবামারও সেইরূপ সম-স্বার্থ। অদ্যকার প্রবন্ধে আমি যে অতি গুরুতর এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি, তাহা পাঠ করিলেই পাঠিকা মহাশয়াগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন, বাঙ্গালী হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান এবং মুসলমান সকল শ্রেণীর রমণীর স্বার্থ বামাবোধিনীতে সমভাবে সম্পর্কীভূত কি না?

চাকুরী, বাণিজ্য, ব্যবসা অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ হউক, অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত প্রভৃতি স্থানে—অর্থাৎ বঙ্গদেশের সীমার বহির্ভূত প্রদেশপুঞ্জে—বহুসংখ্যক বাঙ্গালী পুরুষকে সস্ত্রীক বাস করিতে হয়। ইহাঁদের মধ্যে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বী এবং সকল সম্প্রদায়ের লোক আছেন। ঐ সকল দেশে অবস্থানকালে বাঙ্গালী রমণীবৃন্দ পুত্র কন্যা সকল লইয়াও অবস্থিতি করেন; এই সকল বঙ্গসমাজভুক্ত—বাঙ্গালীবংশসম্ভূত—বাঙ্গালী পিতা ও মাতার ঔরস ও গর্ভজাত—অসংখ্য পুত্র কন্যার পরিণামে কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়, বাঙ্গালী রমণীগণ তাহা কি কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? এ বিষয়ে তাঁহারা যে কতদুর অসাবধান এবং তাঁহাদের এই ঘোরতর অসাবধানতায় বঙ্গদেশ, বঙ্গসমাজ ও বাঙ্গালী জাতির যে প্রভূত পরিমাণে অনিষ্ট সম্পাদিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা কি কখনও ভাবিয়াছেন বা তৎসংশোধনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন? বঙ্গদেশের বহির্ভূত স্থানে বাঙ্গালীর পুত্র

কন্যা জন্মিলে, শত করা প্রায় ৯৮ জন বাঙ্গালা ভাষা শিখে না। বাঙ্গালা স্কুল পাঠশালার অভাবেই হউক অথবা বাঙ্গালা শিক্ষকের অভাবেই হউক কিম্বা অপর কোন কারণেই হউক, বালক বালিকারা প্রথমেই হিন্দি ও উর্দ্দূ শিখে; তাহারা তদ্দেশীয় দাস দাসী অথবা "আয়া" দ্বারা প্রতিপালিত হয়। অধিক বয়স পর্য্যন্ত ইহারা বাঙ্গালা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করে না, ইহা মাতার দোষ, আর কাহারও নহে। দীর্ঘকাল সে দেশে বাস করায় স্কুল কলেজেও ছাত্রগণকে "দ্বিতীয় ভাষা" (Second language) স্থলে উর্দ্দূ শিক্ষা করিতে হয়, কারণ তাহাতে অধিকতর সুবিধা আছে; বিশেষতঃ সে দেশের স্কুল কলেজে বাঙ্গালা পণ্ডিতের বন্দোবস্ত মোটেই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অযোধ্যা, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি স্থানের স্কুল কলেজে পড়িয়া কোনও বাঙ্গালী সন্তান বা সন্ততি "দিগ্‌গজ উর্দ্দূ পণ্ডিত" হইয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই, সুতরাং তাহাদের উর্দ্দূ জ্ঞান কেবল পরীক্ষা পাশ করিবার কারণ ভিন্ন অন্য প্রয়োজনে আইসে না। ইহাদের এই শিক্ষা বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালা দেশের কোনও উপকারে আইসে না। আর এক দিক দিয়া দেখ, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সকল পুত্র কন্যারা যাবজ্জীবন উদাসীন থাকে, বাঙ্গালা ভাষা ভাল করিয়া তাহারা আদৌ শিক্ষা করে না। বাঙ্গালা দেশের বাহিরে এইরূপ লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী বালক ও বালিকা বাঙ্গালা ভাষাকে তুচ্ছ করিয়া থাকেন। বলুন দেখি, ইহা কাহার দোষ? আমি কেবল ব্রাহ্ম বা হিন্দু রমণীকে এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে; বাঙ্গালী খ্রীষ্টান ও বাঙ্গালী মুসলমান পরিবার মধ্যে এই দোষ বরং শত গুণ অধিকতররূপে বর্ত্তমান। বাঙ্গালী মুসলমানেরা একেবারেই উত্তর পশ্চিমের মুসলমানের সহিত ঘনিষ্ঠ রূপে মিলিয়া মিশিয়া যান, তাঁহাদের ছেলে মেয়ে ভুলে একটিও বাঙ্গালা কথা বলিতে পারে না। খ্রীষ্টান পরিবার অনেক স্থলে বিলাতী ধরণের চাল চলনের বশীভূত হইয়া ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী ফ্যাশনে ডুবিয়া যান, নতুবা তদ্দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের হিন্দী বা উর্দ্দূ ভাষায় মিশিয়া পড়েন। এই জন্য, এত বৎসর গত হইল, পঞ্জাব, অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অথবা বাঙ্গালা দেশের বহির্ভূত কোনও দেশ হইতে কোনও বাঙ্গালী পুরুষ বা রমণীর মধ্যে মাইকেল বা বঙ্কিম দেখিতে পাই নাই। লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী বালক ও বালিকার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা বন্ধ থাকা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভূত অনিষ্ট হইতেছে, বিশেষতঃ ইহার প্রসার বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস হইতেছে; ভাবুন দেখি, এত লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর মধ্যে রীতিমত ভাষার চর্চ্চা থাকিলে, কত উন্নতি হইত—ভবিষ্যতের কত আশা—কত ভরসা থাকিত? মাতৃভাষা ও মাতা উভয়ের মিলনে সন্তানের শরীর ও মন

গঠনের যেমন প্রকৃষ্ট সহায়তা হয়, এমন আর অন্য কোনও প্রকারে হইতে পারে না। মাতৃস্তনদুগ্ধের ন্যায় মাতৃভাষারও পুষ্টি সাধন ও বলবর্দ্ধনের আশ্চর্য্য শক্তি আছে। বামাবোধিনী এই মিলন সাধন করিতে সর্ব্বতঃ ব্রতী। বাঙ্গালী রমণীগণ যেখানে থাকুন, বামাবোধিনীর সাহায্যে উপকৃতা হইতে পারেন। বামাবোধিনী বঙ্গবামাগণের অভাব আলোচনা করেন ও তাহা মোচন করিবার বিবিধ উপায় নির্দ্ধারণ করেন। মাতৃভাষায় অল্প-শিক্ষিতা বঙ্গবালাগণ আর কোনও গ্রন্থ পাঠ করুন, না করুন, বামাবোধিনী পত্রিকা খানি নিয়মিতরূপে পাঠ করিলে এবং এই চল্লিশ বৎসর বামাবোধিনী যে জ্ঞান আহরণ করিয়াছেন, তাহা আয়ত্ত করিতে পারিলে আপনারা মাতৃভাষায় সুশিক্ষিতা এবং সাধারণ জ্ঞানে জ্ঞানবতী হইতে পারিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। মাতৃভাষা-দক্ষা জননীগণের পক্ষে সন্তানকে মাতৃভাষায় সুশিক্ষিত করা অতি সহজ কার্য্য। বাঙ্গালী রমণী যিনি যে সম্প্রদায়ের হউন্ ও যিনি যেখানে থাকুন, বামাবোধিনীর পাঠিকা হইলে ইহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় এবং বাঙ্গালী সন্তানদিগের মাতৃভাষা শিক্ষার পক্ষে সমূহ সাহায্য হইতে পারে। ইহা না হওয়া দেশের পক্ষে কি মহাদুর্ভাগ্য নয়?

এখন সভয়ে নির্ভয়ে, বিনয়ে বিষাদে, ধীরে ধীরে, জিজ্ঞাসা করি, এই ঘোরতর অসাবধানতার জন্য, এই গুরুতর সামাজিক অমঙ্গলের জন্য, বাঙ্গালী পুরুষ কি বাঙ্গালী রমণী অধিক দায়ী? শিশুর শিক্ষা, রক্ষণ, লালন ও পালন বিষয়ে স্বামীর অপেক্ষা স্ত্রীর দায়িত্ব অধিক, ইহা সতত স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এখন বুঝিলেন কি, "বামা-বোধিনী" পত্রিকার সহিত বঙ্গদেশীয় হিন্দু বামাগণের ন্যায়—বঙ্গবহির্ভূত হিন্দু খ্রীষ্টান এবং মুসলমান রমণীরও বাধ্য-বাধকতা ও সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ! এই সম্পর্ক রক্ষা করিতে পারিলে কত মহৎ ফল লাভ হইতে পারে!

(ক্রমশঃ)।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

উদাসীনের চিন্তা।

ভবতোষিণী, রাধারাণীর সম্পর্কে ননন্দা। ভবতোষিণী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বিদুষী রমণী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি কেবল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াই তৃপ্ত হন নাই, অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি প্রবলা ছিল বলিয়া বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতৃজায়া তদ্রূপ বিদুষী নন। তিনি পাড়াগেঁয়ে মহিলা, গ্রামে অব-স্থান করিয়া যৎসামান্য লেখা পড়া

শিখিয়াছেন। গ্রামের দুই চারিটী বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে বড় অভিজ্ঞতাও নাই। ননন্দা যখনই ভ্রাতৃজায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, সেই সুযোগে তাঁহার বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁহাকে আলোকিত করিবার প্রয়াসী হইতেন। অবশ্য অর্দ্ধশিক্ষিতা গ্রাম্যবালা অনেক সময় সহজে তাঁহার ভাব পরিগ্রহ করিতে পারিতেন না, কিন্তু ননন্দা কিরূপে লোকের মনে নূতন তত্ত্ব অঙ্কিত করিয়া দিতে হয়, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ পারদর্শিনী ছিলেন, তাই তিনি ভ্রাতৃজায়াকে কোন রূপেই না বুঝাইয়া ছাড়িতেন না। এক সময়ে কোন এক শুভানুষ্ঠানোপলক্ষে ভ্রাতৃ-বধূকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন, উৎসব ব্যাপারের পরিসমাপ্তির পর এক দিবস ভ্রাতৃজায়াকে লইয়া একান্তে বসিয়াছেন। অনেক প্রসঙ্গ হইতেছে, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ননন্দা জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল ভাই! তোমার স্বামী ত বড় বেহিসিবি লোক, ছেলে পিলের পরে কি হবে তার একটা হিসাব নেই। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী! তুমি ত হাবা মেয়ে, এ বিষয়ে তাঁকে দুট কথা বল্‌তেও নারাজ। তাই না হয় নাই বল্লে, একটা কাজ কর্ত্তে ত বল্‌তে পার, তা হ'লেও ছেলে পিলের শেষ কালে একটা বন্দোবস্ত হ'তে পারে।"

রাধারাণী—ভাই, সেটা কি কাজ? আমার এঁকে কোন কথা বলতেই মন সরে না। মনে হয়, আমি মেয়ে মানুষ, আমি বুঝিইবা কি, বল্‌বইবা কি? উনি যা ভাল বুঝেন তাই করুন।

ভব—তুমি নেহাত ফুল (বোকা) পুরুষ মানুষ হইলেই কি ভুল কর্ত্তে পারে না? দেখ উনি (ভবতোষিণীর স্বামী) কত জায়গায় ভুল করেন, শেষে আমার কথায় শুধরিয়ে লন। তোমার একটা বড়ই স্বামিভক্তির বাড়াবাড়ি।

রাধারাণী—এ ত স্বামিভক্তির কোন কথা হচ্ছে না। তুমি লেখা পড়া শিখেছ; অনেক জান শুন, আমি ত আর সেরূপ নই। আমি ওঁর মত পণ্ডিত লোককে কি বুঝাতে যাব?

ভব—চাঁদেও কলঙ্ক আছে, পণ্ডিতেও অজ্ঞতা থাকতে পারে। পণ্ডিত হলেই যে সব বিষয়ে পণ্ডিত হবেন, এর ত কোন কথা নেই।

রাধারাণী—ভাই! তোমার সঙ্গে আর তর্ক করা সাজে না, আমি তোমায় বুঝাব কি সাধ্য? ভাল এখন কি কাজটা কর্ত্তে হবে, তাই একবার বলে ফেল।

ভব—তোমার স্বামী কি "জীবন বিমা" করেছেন? তা না কল্লে তাকেও কাজটা কর্ত্তে বল।

রাধারাণী—বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বদনমণ্ডল প্রসারিত করিয়া ননন্দার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি কোন্ ভাষায় কথা বলিতেছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। "জীবন বীমা" এমন একটা বাক্য তৎপূর্ব্বে তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই; সুতরাং তিনি

তাহার মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিবেন কি সাধ্য ?

ভবতোষিণী তাহার ভাব অবলোকনে বুঝিতে পারিলেন যে, ভ্রাতৃবধূ তাঁহার বাক্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন নাই। তাই তাঁহাকে বুঝাইবার প্রয়াসী হইয়া বলিলেন "তুমি বুঝি কথাটা বুঝলে না, তা বুঝবেই বা কি করে? এ কথাটা আমাদের দেশে বড় বিকায় না। সাহেবেরাই এ দেশে এ ভাষাটা এনেছেন। তা এখন তোমায় বুঝাচ্ছি, একটু মন দিয়া ধর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। এ দেশে ও বিদেশে কতকগুলি কোম্পানী আছে। তাহাদিগকে এক, তিন বা ছয় মাস অন্তর কিছু কিছু অগ্রিম টাকা দিতে হয়, ইহাকে "প্রিমিয়ম" বলে। যিনি উহা দিবেন, তাঁর শেষ জীবনে তাঁহাকে কিংবা মরণের পর উত্তরাধিকারীকে কোম্পানী যথেষ্ট টাকা দিয়ে থাকেন।

রাধারাণী—সে কত টাকা দিতে হয় এবং তা থেকে কত টাকাই বা পাওয়া যায় ?

ভব—ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে, তবে মূল কথা এই যে, হঠাৎ যদি কেহ মারা পড়েন, তা হ'লে অনেকটা লাভ আছে। মনে কর একজন ৫০০০৲ টাকার জন্য জীবন বীমা কল্লেন, অর্থাৎ যিনি জীবনের বীমা কল্লেন তাঁহার মৃত্যুর পর স্ত্রী কি পুত্রকে ৫০০০৲ টাকা দেওয়া হবে, এই করারে ত্রৈমাসিক হিসাবে ২০ কি ২৫৲ টাকা দিতে আরম্ভ কল্লেন। এইরূপ অগ্রিম দত্ত অর্থের ইংরেজি নাম প্রিমিয়াম তোমাকে বলিয়াছি। কেহ যদি এক বা দুই প্রিমিয়াম দিয়েই মারা যান, তা হ'লে দেখ ৪০ কি ৫০৲ টাকা দিয়াই স্ত্রী পুত্র পাঁচ হাজার টাকা পেলেন। এ কি কম লাভ!

রাধারাণী—যদি বেশী দিন বেঁচে থাকেন, তা হলে কি সে হিসাবে প্রত্যেক তিন মাস অন্তর অন্তর টাকা দিতে হবে ?

ভব—হাঁ তা হবে বই কি; যত দিন বেঁচে থাকেন বা দিবার করার, তত দিনই দিতে হবে।

রাধারাণী—তবে এ কাজে লাভ কি? তার চেয়ে টাকা জমিয়ে জমিয়ে কর্জ্জ দিলে বেশী সুদ আসে।

ভব—সেরূপ টাকা জমিয়ে কি ভবিষ্যতের সংস্থান কর্ত্তে পার্ব্বে ?

রাধারাণী—তা হয় কই ভাই, ডাইনে আন্‌তে বাঁয় যায়। কত খরচ! খরচ বেড়ে গিয়ে ধারও হয়, তা শুধবো, না টাকা জমাব ?

ভব—দেখ দেখি, ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য একটা বাঁধাবাঁধি না করিলে সংসারে যে হাহাকার সেই হাহাকারই থাকে। আর মানুষের জীবনের উপর ত বিশ্বাস নেই। কখন কি হয়? যাঁকে মনে করি বিশ বছর বাঁচবেন, তিনি হয়ত হঠাৎ চোক বুজুলেন, তাই ত জীবন বীমার এত প্রয়োজন।

রাধারাণী—লাখ টাকার জীবনটা যদি হঠাৎ চলে যেতে পারে, তা হ'লে পাঁচ

হাজার টাকার ভাবনা ভেবেই বা কি হবে?

ভব—রেখে দাও তোমার Sentimentalism (ভাবুকতা।) স্বামী হঠাৎ মারা গেলে ছেলে পিলে নিয়ে শুকিয়ে মরার চেয়ে এরূপ কিছু একটা করে রাখা কি ভাল নয়?

রাধা—কেন? সকলে কৃষ্ণের জীব। যিনি মুখ দিয়েচেন, তিনি আহার যোগাবেন, যিনি মার পেটে থাকতে জীবের রক্ষার ব্যবস্থা কচ্ছেন, যিনি বনের পশু, আকাশের পাখীর জীবন পালছেন, তিনি আর কি মানুষগুলিকে উপবাসে রাখ্‌বেন?

ভব—মানুষ মূর্খ হ'লেই মুস্কিল, তুমি ধান ভানতে শিবের গান পাড়ছ। জীবন বীমার কথা বুঝতে গিয়ে অত ধার্ম্মিকতা কল্লে চলবে না, এখন একটু পথে এস। দুর্ভিক্ষে যে লাখ লাখ লোক না খেয়ে মারা যায়, তা কি জান না? কই ঈশ্বর ত তাদের মুখে আহার যোগান না? তিনি যেমন মুখ দিয়েছেন, তেমনি হাত পা দিয়েছেন, খাট; বুদ্ধি দিয়েছেন, হিসাব কর; তা হ'লে আহার মিলবে। নেকা বোকা হ'য়ে ব'সে থাকলে আকাশ থেকে ধপ্‌ করে খাবার জিনিষ পড়বে না।

রাধা—তোমার সঙ্গে কথা কয়ে কেউ আঁটতে পারে না, আমি পার্ব্ব কি সাধ্যি? আচ্ছা তুমি বলছ, তোমার অনুরোধে না হয় তাঁকে একবার বলে দেখ্‌ব। কিন্তু তিনি যেরূপ ব্যয় করে থাকেন, তাতে তিন মাস অন্তর অন্তর প্রিমিয়াম দেওয়ার মত টাকা জমাতে পার্ব্বেন কি না সন্দেহ।

ভব—তুমি কোন একটা শুভ কাজ আরম্ভ কর্ব্বার পূর্ব্বেই কতকগুলি কাল্পনিক বাধা জন্মাতে চেষ্টা কর। তোমার স্বামী কি কর্ব্বেন না কর্ব্বেন তার আগে এত হিসাব কর্ব্বার দরকার কি? একবার না হয় বলে দেখবে—"যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোত্র দোষঃ" যত্নে যদি সিদ্ধ না হয়, তা হলে দোষ কি?

রাধা—তোমার উপদেশ শিরোধার্য্য। ওঁর সঙ্গে দেখা হলেই আমি এর জন্য পীড়াপীড়ি কর্ব্ব। তবে উনি আমার কথা অনেক সময় উড়িয়ে দেন, কারণ উনি সব সময় বলেন, আমি নিরক্ষর বোকা, কিছুই বুঝি না। কিন্তু ওঁর তোমার উপর খুব শ্রদ্ধা, কথায় কথায় তোমার প্রশংসা করে থাকেন। কথায় কথায় বলেন যে, তোমার মুখ দিয়ে যে কথা বের হয়, তা শুনবার যোগ্য। আমি তাই মনে করি যে, আমার চেয়ে তুমি তোমার দাদাকে বল্লে ভাল হয়।

ভব—আচ্ছা, আমিও না হয় দাদাকে এ জন্য জিদ কর্ব্ব, তবে কি না তোমার কথা না বিকাইবার কোন কারণ নাই, কারণ দাদাকে লোকে কি বলে জান?—স্ত্রৈণ—

ভবতোষিণীর শেষ কথা শুনিয়া বাক্যের যতি পড়িতে না পড়িতেই রাধারাণী লজ্জাবনতমুখে গৃহান্তরে যাইতে উদ্যতা হইলেন।

ভব—বাধা দিয়া বলিলেন, "আর নেকাম করো না। স্ত্রীকে ভালবাসা ত আর একটা মন্দ কথা নয়। তবে নিন্দা-প্রিয় লোকে একটু অতিরঞ্জিত করে থাকে মাত্র। চল আজ বেলা হয়েছে, স্নানাদি করা যাক।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারী।

কাশ্মীর-চিত্র।

(৪৪৩ সংখ্যা--২৬৬ পৃষ্ঠার পর)।

টোঙ্গারোহণ পর্ব্ব।

টোঙ্গারোহণে কিয়দ্দূর গমনের পরেই বাষ্পযানে ৩ দিন যাপন যেন স্বর্গ-সুখ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এমন বিষম গতিতে গাড়ি চলিল যে, প্রতিমুহূর্ত্তেই শরীরের অস্থিগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। স্থিরভাবে বসিয়া থাকা দুষ্কর ব্যাপার, কখন হঠাৎ গাড়ি খানা উল্টিয়া একেবারে জীবনলীলা শেষ হইয়া যায়, তাহাই প্রধান চিন্তা। সহযাত্রী দুই জন পূর্ব্বে কাশ্মীর দর্শন করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সুতরাং আমার বিষম উৎকণ্ঠা দৃষ্টে একবিন্দু সহানুভূতি প্রদর্শন দূরে থাকুক, অনবরত হাসিতে লাগিলেন। সেই হাসি আমার পক্ষে দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল। ধূলির কথা বর্ণনীয় নহে। টোঙ্গার গাত্রর সঙ্গে সঙ্গে যেন একখানা মেঘ সম্মুখভাগ অন্ধকার করিয়া চলিল। দুই খানা টোঙ্গাতে আমরা চলিয়াছি অথচ ধূলির উপদ্রবে এক টোঙ্গাতে থাকিয়া অন্য টোঙ্গা অদৃশ্য। পর্ব্বতের পাদদেশ ভেদ করিয়া দ্রুতগতিতে টোঙ্গা ক্রমশঃ তাহার শিরোদেশে উঠিতে লাগিল। এই অবসরে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী রাউলপিণ্ডি নগরের দৃশ্য ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ ত্যাগ করিলাম না।

মরি পাহাড় দৃশ্য।

রাওলপিণ্ডী ইংরাজ সৈন্যাবাসের একটী প্রধান স্থান। এই ধূলি-রঞ্জিত নগরীর বিশেষ কোনও প্রতিপত্তি আছে বলিয়া মনে হইল না। চারিদিকে গিরিমালা-বেষ্টিত বলিয়া ইহার দৃশ্য অতীব মনোহর। রাউলপিণ্ডী হইতে কয়েক মাইল অগ্রসর হইয়াই এই পার্ব্বত্য রাজ্যের অসীমত্ব ও অবর্ণনীয় শোভা অবলোকন করিয়া ধূলির উপদ্রব বিস্মৃত হইয়া গেলাম। সুদূরপ্রসারিত সুনীল-রঞ্জিত গিরিমালা নয়ন মনে অভূতপূর্ব্ব ভাব জাগাইয়া দিল। দক্ষিণ বামের মনোহারী দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গেলাম। অধিকাংশ পর্ব্বতই বৃক্ষাদি-বর্জ্জিত বলিয়া মধ্যাহ্ন রৌদ্রে কেমন এক গম্ভীর রুদ্র

ভাবপূর্ণ, তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারি না। পথের স্থানে স্থানে অনেকগুলি নির্ম্মল জলের উৎস পাষাণ ভেদ করিয়া মৃদুমন্দ ধ্বনিতে বাহির হইয়াছে। এই ধূলি ও গ্রীষ্মপূর্ণ রাজ্যে পানীয় জলের এত প্রাচুর্য্য দর্শনে মনে মনে সেই অসীম মহিমান্বিত বিশ্বপিতাকে কতই ধন্যবাদ দিলাম। মধ্যাহ্ন প্রায় দেড় ঘটিকার সময়ে পঞ্চনদের স্বাস্থ্যনিবাস মরি পাহাড়ে পঁহুছিলাম। আমরা সকলেই ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত শ্রান্ত হইয়াছিলাম, হোটেলের আশ্রয় লাভে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হইল। শীতের প্রভাব বিশেষ অনুভূত হইল। চিমনীতে ধুধু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, তবু শীতে হস্ত পদ অসাড় হইতে লাগিল। সত্বর ধূলিপূর্ণ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের পর স্নানাদি করিয়া অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি বোধ হইল। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পরেই মরি সহরটি পরিদর্শন করিতে বাহির হইলাম। অস্তাচলগামী সূর্য্যের কিরণ দূরস্থিত গিরিমালার উপর পতিত হওয়াতে চারিদিক্ হেম আভায় রঞ্জিত হইয়া যেন হাসিতে লাগিল। অপরিচিত পথ বলিয়া অধিক দূর গমন করিবার সুবিধা হইল না। মরি দার্জ্জিলিং অপেক্ষা উচ্চতর ও বৃহত্তর সহর। ইংরাজ সৈন্যাবাস বলিয়া এখানে রণবাদ্যের উচ্চরব সর্ব্বদা শ্রুত হয়। সহরটী পাইন বৃক্ষে আচ্ছাদিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গৃহগুলি পাইনের নিবিড় জঙ্গল ভেদ করিয়া পর্ব্বত-পার্শ্ব হইতে যেন উঁকি মারিতেছে। সহজ দৃষ্টিতে মরি সহরটি পাইন বৃক্ষের নিবিড় জঙ্গল ভিন্ন বহুলোকপূর্ণ নগরী বলিয়া কোন মতেই ধারণা জন্মে না। এত লোকের বাসভূমি, তথাপি দার্জ্জিলিং সহরের ন্যায় পথগুলি জনতাপূর্ণ নহে, বরং প্রথম দৃষ্টিতে ইহা জনশূন্য বলিয়াই ভ্রম জন্মে। মধ্যে মধ্যে অনেক স্থান পূর্ব্ববৎ আরণ্যিক ভাবেই রক্ষিত হইয়াছে। আমার চক্ষে সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য কত মধুর ও চিত্তহারী বোধ হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। একদিকে ইংরাজ জাতির বিলাসিতার উপকরণসজ্জিত বিপণিশ্রেণী ও লোকের জনতা, অপর অংশে মুনিঋষিগণের ধ্যান ধারণার উপযুক্ত নির্জ্জন গহন ভূমি দর্শন করিয়া হৃদয়ে যে তৃপ্তি ও স্বর্গের শান্তি উপভোগ করিয়াছি, তাহা জীবনে কোন দিন ভুলিতে পারিব না। যাত্রার আয়োজনে সকলে ব্যস্ত। পথ ঘাট আমার অজ্ঞাত, তথাপি প্রাকৃতিক মনোহর দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়া মাননীয় সহযাত্রীকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সঙ্গে লইয়া নিবিড় পাইন জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। অন্ধ অন্ধের পথপ্রদর্শক, হয় ত অজ্ঞাত গহনে পথ হারাইয়া বিপদে পড়িব, সহযাত্রী যত এই কথা বলেন, আমারও সেই নির্জ্জন বনস্থলীর অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা তত প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। ধীরে ধীরে নানা কথা বলিতে বলিতে আমরা এমন বিজন প্রদেশে উপনীত হইলাম যে, সে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া পৃথিবীর সকল

প্রকার কোলাহল ও সুখ দুঃখের চিন্তা সর্ব্বতোভাবে বিস্মৃত হইয়া গেলাম; স্বর্গের অসীম আনন্দস্রোতে শুষ্ক হৃদয়ভূমি প্লাবিত হইয়া গেল। প্রেমের প্রবল বন্যাতে উভয়ের ক্ষুদ্র হৃদয় দুটী ভাসিয়া সেই অনন্তের পথে ছুটিল। "অতি সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে" এই সঙ্গীতটি ক্ষীণকণ্ঠ ভেদ করিয়া কতবার উঠিল, তাহা বলিতে পারি না। সেই মানব-সমাগম-বিহীন পাইন বৃক্ষের নিবিড় গহনে দণ্ডায়মান হইয়া অনন্ত দেবের অসীম প্রসাদবারি উপভোগ করিয়া যেরূপ কৃতার্থ হইয়াছিলাম, জীবনে কোন দিন তেমন শুভ মুহূর্ত্ত আসিবে কি না বলিতে পারি না। "কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ না জানি কি ধ্যানে মগন, স্তিমিত লোচন কি অমৃতরস পানে ভুলিল চরাচর।" ইহার সত্যতা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, গন্তব্য পথে এখনই যাত্রা করিতে হইবে, সহযাত্রিগণ আমাদের অপেক্ষায় রহিয়াছেন, এ কথা স্মরণ হইল। কিন্তু আমাদের মন সেই গহন-বনের সৌন্দর্য্যে এমনই ডুবিয়া গিয়াছিল যে, ভাবিলাম এই স্থানে জীবন কাটাইতে পারিলেই পরম সুখী হইব। অবশেষে নানা প্রকার সুগন্ধপূর্ণ লতাগুল্ম ফুল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া চিরপরিচিত বন্ধু-গণের নিকট বিদায় লইতে প্রাণে যেমন ক্লেশ হয়; তেমনি ক্লেশ অনুভব করিয়া, অশ্রুবারি মোচন করিতে করিতে আবার টোঙ্গারোহণে দুরারোহ পার্ব্বত্য পথে যাত্রা করিলাম।

(ক্রমশঃ)।

ইলিয়ড।

প্রথম সর্গ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)।

মহা ক্রোধে দ্বিজবর এ লাঞ্ছনা হেতু
যাচিলেন সকাতরে আপোলো-সমীপে
দিতে যথোচিত দণ্ড গ্রীক যোদ্ধৃগণে।
শুনি প্রিয় আচার্য্যের প্রার্থনা-বচন
সত্বর অভীষ্ট তাঁর সাধিতে—সরোষে
টঙ্কারি ভীষণ রবে ভীম শরাসন
বর্ষিলা সঘনে দেব ঘন শরজাল
লক্ষ্য করি সমবেত গ্রীক দলে যবে;
ভীষণ মড়কে মরিল অগণ্য কোটি
সৈন্য দলে দলে; হেরিয়া এতেক হায়!
বীরের নিধন দৈবজ্ঞানে সিদ্ধ চির
দ্বিজ ক্যালকাস প্রকাশিলা—কি কারণে
এই মহামারি গ্রাসিছে করাল কাল
গ্রীক সৈন্য দলে। শুনি তাঁর বাণী আমি
কহিনু প্রথমে—ক্রিসিসা বালারে সঁপি
যাজকের করে প্রসন্ন করিতে ত্বরা

দেব আপোলোরে। ঘোর রোষে রুষিয়া
নৃপ আট্রিডিস্ কহিলা শাসায়ে মোরে
"বন্দিনীরে মোর কাড়ি লবে? অবিলম্বে
তোর এ দুঃসাহসের দিব প্রতিশোধ।"
এবে সে প্রতিজ্ঞা তার করেছে সফল,
কারণ তুষিতে দেবে দ্বিজ-সন্নিধানে
অর্পিতে ক্রিসিসে সহ নৈবেদ্য সম্ভার
করেছে প্রস্থান সেনাপতি শত শত
মিটাইতে দেব-রোষ। ভীষণ আক্রোশে
গৌরবের পুরস্কার—বন্দিনীরে মোর
কেড়ে লয়ে গেছে মূঢ় প্রেরি দূতদ্বয়।
যদি তুমি ইচ্ছ দেবী! রক্ষিতে তোমার
পুত্রের সুযশ চির, তবে গিয়া ত্বরা
যোভের সকাশে কহ কাতর বচনে—
যদি কোনকালে তব কোন উপকারে
তুষ্ট করে থাকো তাঁরে উল্লেখিয়া তাহা
দৃঢ় অনুরোধ এবে করহ তাঁহারে
উচিত প্রত্যুপকারে শোধিতে সে ঋণ—
সাধিতে কল্যাণ কিছু তনয়ের তব।
কারণ হে মাতঃ আমি শুনেছি তোমারে
জনক সকাশে মম কহিতে সতত
কেমনে ক্রনশ-পুত্র * দেবেন্দ্র যোভেরে
রক্ষেছিলে একবার ভীষণ বিদ্রোহে।
পালাস এথিনি † আর জুনো, পশিডোন‡
সহ যবে এক যোগে মিলি সুরদল
স্বর্গ-রাজ্যচ্যুত তাঁরে করিবার তরে
হয়েছিল সমুদ্যত, সে সঙ্কট হতে
মুক্ত করেছিলা যোভে তোমারি আহ্বানে
দানবকুলের শ্রেষ্ঠ শত-হস্তধারী
ব্রাইনিস * দৈত্যবর, যোভের ঔরসে
জনম যাহার, কিন্তু ধরে যেই বলী—
পিতা হতে সমধিক বীরত্ব বিক্রম।
(ব্রাইনিস বলি বীর সুরদলে খ্যাত,
ইজিয়ন নামে কিন্তু বিদিত ভূতলে)
বিদ্রোহী অমরদল যাহার শাসনে
হ'য়ে নতশির হায়! সভয় হৃদয়ে
বিদ্রোহ-বাসনা ত্বরা ত্যজেছিল সবে।
এরূপে সঙ্কটে ঘোর তোমার প্রসাদে
রক্ষা পেয়েছিল যোভ ত্রিদিবের পতি।
সেই তব তাঁর প্রতি পূর্ব্ব উপকার
স্মরণে আনিয়ে এবে কর অনুরোধ
ট্রোজানের পক্ষগণে করিতে প্রবল
সমর মাঝারে, যাহে শত্রুগণ সবে
প্রমত্ত শার্দ্দূলসম বীরমদে মাতি
সসৈন্য অচিরে বেড়ি তরণীর শ্রেণী—
বধে প্রাণে দলে দলে গ্রীক বীরদলে।
সে ঘোর বিপাকে পড়ি আট্রিডিস তবে
বুঝিবে গৌরব মোর, গ্রীকগণ আর
বুঝিবে বীরত্ব কত ধরে সে দুর্ম্মতি।

(ক্রমশঃ)।

লজ্জাবতী বসু।

* ক্রনশ—যোভের পিতা সাটারন দেবতার অর্থাৎ শনি দেবতার অপর নাম।

† পালাস এথিনি—যুদ্ধ ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী মিনার্ভা দেবীর অপর নাম।

‡ পসিডোন—নেপচুন, যোভের ভ্রাতা।

* ব্রাইনিস—একজন শতবাহুধারী ভীষণাকার দৈত্য।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতা বার্ড কোম্পানীর এজেণ্ট মেং এ এন রায় আলোয়ারে এক কয়লার খনি আবিষ্কৃত করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ফল ফলিতেছে।

২। ঢাকায় এক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনার্থ ২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। মৃত নবাব আসানুল্লার পুত্র খাজে সলিমুল্লা লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ৬০ হাজার টাকা দিবেন।

৩। কলিকাতার ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণার্থ ত্রিপুরার মহারাজা ২০০০৲ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। বিলাতের একেশ্বরবাদিগণ ইহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

৪। আমেরিকার চিকাগো কলেজে স্ত্রী পুরুষ একত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। সম্প্রতি স্ত্রীলোকদের জন্য একটী স্বতন্ত্র কলেজের উদ্যোগ হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট হার্পার তজ্জন্য ১৫ লক্ষ মুদ্রার সংস্থান করিয়াছেন।

৫। বনগ্রামের নিকট ইচ্ছামতী নদী হইতে মুক্তা তোলা হইয়া থাকে। এ বৎসর এক একটী বড় মুক্তার দাম ৫০০, ৬০০ টাকা হইয়াছে।

৬। কুচবিহারের মহারাজা অভিষেক-স্থলে ৭ম এডওয়ার্ডের এডিকং হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

৭। অমরাবতীর পি এন যোগ থিওজফী সমাজের সাহায্যার্থ মৃত্যুকালে ১৬,০০০৲ টাকা দিয়া গিয়াছেন।

৮। রুষ-সম্রাটের ভ্রাতা গ্রাণ্ডডিউক ভারত ভ্রমণে আসিয়াছেন।

৯। আসামের কমিসনর কটন সাহেব বিলাত যাত্রা করিতেছেন। কুলীদিগের জন্য তাঁহার সহৃদয়তা চিরস্মরণীয়। সিলং-নিবাসিনী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী-প্রমুখ সাত শতাধিক রমণী রৌপ্য গেলাস সহ তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন।

১০। হলণ্ডের রাজ্ঞী বিষম জ্বরে পীড়িতা।

১১। পুণ্য বৃহস্পতিবারে স্পেনের প্রতিনিধি রাজ্ঞী ১২টী গরিব স্ত্রীলোকের পদ ধৌত করিয়া দিয়াছেন।

১২। গত ২৭এ মার্চ্চ অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ খৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ দেশের ১২ জন গরিব বৃদ্ধের পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক সেবা করিয়াছেন।

১৩। মহারাণীর মুকুটের ওজন /১॥ সের মাত্র ছিল, ৭ম এডওয়ার্ডের মুকুট ওজনে /৩॥ হইবে। ভিক্টোরিয়া সিংহা-সনাধিরোহণসময়ে ১৭-বর্ষীয়া বালিকা-মাত্র ছিলেন। আমাদের রাজা বয়স্ক।

১৪। দক্ষিণ আমেরিকার আমেজন নদের ধারে এক প্রকার তাল বৃক্ষ জন্মে,

তাহার পাতা দৈর্ঘ্যে ৩০ হইতে ৫০ ফিট এবং প্রস্থে ১০।১২ ফিট হয়। একটী পাতায় একখানি বৃহৎ ঘর আচ্ছাদিত হয়।

১৫। পান্নার মহারাজা খুল্লতাত বধে সংলিপ্ত বলিয়া সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার সহচর আচ্ছাগানের ফাঁসীর হুকুম হইল।

১৬। এপ্রেলের মাঝামাঝি ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রবল ঝড় হইয়া অনেক অনিষ্ট হইয়াছে।

গ্রন্থাদি সমালোচনা।

১। অমিয় গাথা, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকর্ত্রী গদ্য ও পদ্য উভয় বিধ রচনার জন্য বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা ও নারীধর্ম্ম ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও গুণপনার পরিচয় দিয়াছে। অমিয়গাথায় তাঁহার শক্তি, গুণগ্রাম ও লিপিপটুতা অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর সুপণ্ডিত বাবু রাধানাথ রায় লিখিত গ্রন্থকর্ত্রীর এক সুন্দর জীবনী আছে। গ্রন্থখানি ২০০ পৃষ্ঠাধিক পরিমিত কাব্য। ইহা ৩ খণ্ডে বিভক্ত এবং তাহাতে প্রকৃতি সৌন্দর্য্য, প্রেম সৌন্দর্য্য এবং চিন্ময় সৌন্দর্য্য ক্রমান্বয়ে .র্ণিত হইয়াছে। আমরা যতগুলি কবিতা পাঠ করিলাম সকলগুলিই সুললিত, সুন্দর ও সুমধুর। লেখিকার ভাষার উপর যেমন, ভাবরাজ্যের উপরও তেমনি অধিকার লাভ হইয়াছে। আমরা কবিতার কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টীর উল্লেখ করিব ঠিক্ করিতে না পারিয়া বিস্তৃত সমালোচনা করিতে পারিলাম না—পরে সেরূপ করিবার অভিপ্রায় রহিল। অমিয় গাথা বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব রত্ন, সর্ব্বসাধারণে ইহার যথোচিত সমাদর করিয়া লেখিকার মর্য্যাদা রক্ষা করেন, ইহা দেখিলে আমরা সুখী হই।

২। ইন্দু—মূল্য ৵০ আনা। বরাহনগরের দেশহিতৈষী বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি কন্যারত্নে ভাগ্যবান্, কিন্তু তিনি যাহাদিগকে প্রস্তুত করিতেছেন, ভগবান্ কি নিগূঢ় অভিপ্রায়ে এক একটী করিয়া তাহাদিগেকে হরণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে লইয়া যাইতেছেন। ইন্দুবালা, বনলতা ও উষাবালা এইরূপে অল্প বয়সে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইন্দু ষোড়শবর্ষ পরিমিত ক্ষুদ্র জীবনে যেরূপ সুশীলতা, সহিষ্ণুতা, আত্মসংযম, পরসেবা, বিদ্যানুরাগ ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বালিকা মাত্রেরই শিক্ষণীয়।

৩। আভাস—কুমারী শান্তিময়ী দেবী

প্রণীত, মূল্য ।৶০ আনা। এই কবিতা পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। ২৫টী ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। রচনা সরস ও মধুর, ভাব গভীর ও ধর্ম্মময়। লেখিকার কবিত্ব শক্তি আছে, ভালরূপ অনুশীলন করিলে ইনি সুকবি মধ্যে গণ্য হইবেন।

৪। স্বামি-সোহাগিনী বা সুখের সংসার —শ্রীবিষ্ণুরাম মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। হিন্দুগৃহে কন্যা কিরূপে পালিত, শিক্ষিত ও কাজ কর্ম্মে অভ্যস্ত হইলে সংসার সুখের সংসার হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখক বর্ত্তমান হিন্দুগৃহের গুণ ও দোষ উভয়ই অপক্ষপাতে সমালোচনা করিয়াছেন এবং ধর্ম্মভিত্তির উপরে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানি বিশুদ্ধ সরল ভাষায় রচিত, ইহা পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি, পাঠিকাদিগকেও ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

৫। যক্ষ্মারোগ নিবারক ও প্রতীকারক —কলিকাতার ডাক্তার শীতলচন্দ্র পাল "থাইসিস্ ইনহেলেসন" নামক এক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ঔষধের আঘ্রাণে রোগ আরোগ্য হইতেছে বলিয়া ঔষধের প্রশংসা হইয়াছে। ইহার এক বোতলের মূল্য ৫৲ টাকা মাত্র। রোগিমাত্রেরই পরীক্ষণীয়।

বামারচনা।

প্রাণের সাধ।

কে গায় গীতি, সখি,
কে বাজায় বাঁশী,—
কোথা হ'তে আসিছে এ স্বর ?—
চাঁদের মধুর হাসে,
কার এ মাধুর্য্য ভাসে,
কার সুরভিতে পূর্ণ
কুসুম সুন্দর ?
কে হেন তরঙ্গ তুলে,
ছাপাইয়া কূলে কূলে,
আনন্দ বর্ষার স্রোতে
ভাষায় অন্তর ?

কোথা কোন্ প্রেমসিন্ধু
সুপবিত্র দেশে—
বাজাইছে কেবা এ বাঁশরী!
বজ্রনাদে মেঘমন্দ্রে
ভাঙ্গিয়া অলস তন্দ্রে
মহাপ্রাণে উচ্চ ভাবে
দিল হৃদি ভরি!
প্রীতির সজীব স্পর্শ!
কি সুখ উল্লাস হর্ষ!
যৌবনে অমর প্রাণ
সুধা পান করি!

কোথা হ'তে কে বাজায়
এ মধুর বাঁশী,—
কেমন সে ত্রিদিবের কবি!
আমার মুগধ প্রাণ
গাহিবে তাঁহারি গান,
আনন্দে করিবে দান
আপনার সবি!
পূজি শান্তি সুখ পাবে,
প্রতিদান নাহি চাবে,
আমার জগতে সেই
জ্যোতির্ম্ময় রবি!

আশায় বেঁধেছি হিয়া
কনক-অচলে,
নিরখিব সে দেব-আনন!
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তাঁর
ঝরিবে সঙ্গীত-ধার,
দূরে যাবে ক্ষুধা তৃষ্ণা
নৈরাশ্য-পীড়ন!
আদর-পীযূষে চিত
হ'য়ে যাবে বিগলিত,
সুখে ঘুমাইবে কোলে
মধুর মরণ!

শ্রীসুভাষিণী দেবী।

শুভাশীর্ব্বাদ।

"সর্ব্বমঙ্গলে মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমস্তুতে॥"

সুনীতি স্বর্গের ছবি সুধার প্রতিমা।
শরতের সরোজিনী শশীর সুষমা॥
শুভদিনে শুভক্ষণে আজ মা তোমারে।
সঁপিনু শ্রীমান্ "বিধুভূষণে"র করে॥
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা নিষ্ঠা পরার্থপরতা।
কোমল হৃদয়ে তব থাক্ চির-গাঁথা॥
ভূষিত হইয়া মাগো সদ্‌গুণ-ভূষণে।
উৎসর্গিতা হও আজ স্বামীর চরণে॥
মা তোমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।
প্রকাশিত হ'ল আজ বিভুর ইচ্ছায়॥
মা তব জীবন-গ্রন্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।
গ্রন্থকর্ত্তা সুখ-গাঁথা দিবেন গাঁথিয়ে॥
তুমিও জীবনপথ যথা সাধ্যমত।
জ্ঞানের উজ্জ্বলালোকে রেখো আলোকিত॥

গুণে মহালক্ষ্মী হও, রূপে বীণাপাণি।
কুসুম-কোমলা হও করুণার রাণী॥
তুচ্ছ করি হীরা মণি রত্ন আভরণ।
যশের মুকুট শিরে করিবে ধারণ॥
জানিবে মা এ সংসার পরীক্ষার স্থল।
সাবধানে রবে করি ঈশ্বর সম্বল॥
অলিক অদৃষ্টলিপি মিথ্যা দৈব-কথা।
চরিত্রেই সব হয় জানিবে সর্ব্বথা॥
রেখেছি সুনীতি নাম দেখি তব নীতি।
স্বনামের সার্থকতা কর মা সুনীতি॥
সবার আশীষ লয়ে সুনীতি আমার।
যাবে কন্যা পতি-গৃহে খুলি স্বর্গদ্বার॥
নম্রতা শুদ্ধতা ল'য়ে যাইবে যেথানে।
অলকা অমরাপুরী শোভিবে সেখানে॥

সদ্ভাব কুসুম ফুটি কোমল হৃদয়ে।
সুগন্ধে এ মহা বিশ্ব তুলুক মাতায়ে॥
অপার আনন্দ-রাশি আদর মমতা।
প্রাণভরে লয়ে যাও প্রীতি পবিত্রতা॥
জনক জননী সম শ্বশুর শাশুড়ী।
ভক্তিভাবে সেবা কর প্রাণপণ করি॥
অবহেলা করিও না দাস দাসীগণে।
তুষিবে সবারে তুমি মধুর বচনে॥
সাধ্যমত করিবে মা অতিথি-সৎকার।
দীনে দান কর শান্তি পাইবে অপার॥
রোগীর শুশ্রূষা করা নারীর ধরম।
সাধ্যমতে এই ধর্ম্ম করিবে পালন॥
শুভদিনে শুভক্ষণে আজ মা সুনীতি।
প্রণাম করহ আসি দেবোপম পতি॥
স্মরণ রাখিবে সীতা সাবিত্রীর কথা।
স্বামীরে করিবে ভক্তি হবে পতিব্রতা॥
আপনি পরমেশ্বর মনুষ্য-আকারে।
স্বামিরূপে বিরাজিত নারীর সংসারে॥
যে স্বামী সঙ্গের সঙ্গী জীবনে মরণে।
প্রীতি প্রেমাঞ্জলি দাও তাঁহার চরণে॥
আপনার সুখ শান্তি হয়ে বিস্মরণ।
পতির কুশল চিন্তা কর অনুক্ষণ॥
স্বামি-সোহাগিনী হও তুমি মা আমার।
সাবিত্রী সমান হয়ে করহ সংসার॥
কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি কোটিবার।
স্বামিসঙ্গে চির সুখে থাক মা আমার॥
করুন এ ইচ্ছা পূর্ণ প্রভু ইচ্ছাময়।
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু হউক অক্ষয়॥
"হাতে লোহা ক্ষয় যাক্" হও চিরজীবী।
তোমার যশেতে ধন্য হউক পৃথিবী॥
শুভদিনে শুভক্ষণে প্রফুল্ল অন্তরে।
অন্তরযামীর নাম স্মরিয়া অন্তরে॥
জনক জননী পূজি নমি গুরুজন।
স্বর্গস্থ ভ্রাতার পদ করিয়া বন্দন॥
স্বামি-সঙ্গে স্বামি-গৃহে যাবে মা আমার।
সনাতন হইবেন সহায় তোমার॥

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মা।

শোক-গাথা।

অন্নপূর্ণা ছেড়ে কাশী, হয়েছ মা স্বর্গবাসী।
আত্ম-বন্ধু প্রতিবাসী করে হায় হায়!
সোণার প্রতিমা কেন শ্মশানে লুটায়?
গগনের পূর্ণ শশী, ভূতলে পড়িল খসি,
যত সব দাস দাসী, কাঁদিয়া বেড়ায়।
সোণার প্রতিমা কেন শ্মশানে লুটায়?
ঘরে মা যাইলে হাসি, পীড়াতে ঘিরিল আসি,
যম ছিল সেথা বসি হরিতে তোমায়।
সোণার প্রতিমা কেন শ্মশানে লুটায়?
যাইতে ছিল না মন, জোরেতে নিলে শমন,
আছে কে এমন বল তাহারে তাড়ায়?
সোণার প্রতিমা কেন শ্মশানে লুটায়?
অন্নদার অন্নদান, কে করিল সমাধান,
জগদীশ তব খেলা বোঝা নাহি যায়।
সোণার প্রতিমা কেন শ্মশানে লুটায়?
তোর ভাই ভগ্নীগণ, ম্রিয়মাণ সর্ব্বক্ষণ,
দিদি দিদি বলে তারা করিছে রোদন।
অকালে প্রতিমা আজ হ'ল বিসর্জ্জন!

তোর পিতা মাতা শোকে, করাঘাত হানে বুকে,
কোথা যাও বলে তারা হ'ল অচেতন।
অকালে প্রতিমা কেন হ'ল বিসর্জ্জন?
বিদ্যাবতী গুণবতী, পতিব্রতা তুমি সতী,
মৃত্যুকালে স্বামি-মুখ করি দরশন
অকালে প্রতিমা আজ হ'ল বিসর্জ্জন॥
পুত্র-শোকে জরা আমি কত যে বোঝাতে তুমি
দিবানিশি করিতে মা সান্ত্বনা বর্ষণ,
অকালে প্রতিমা আজ হ'ল বিসর্জ্জন॥
পূরিল না কোন সাধ, হরিষে হ'ল বিষাদ
জগদীশ সাধে বাদ সাধিলা এখন।
অকালে প্রতিমা আজ হ'ল বিসর্জ্জন॥
আমারে বলিলে মাগো দেও ভাল করি,
আর যে যাতনা আমি সহিতে না পারি॥
কোথা মা মধুসূদন কোথা মাগো হরি।
প্রাণ যায় প্রাণ যায় দমফেটে মরি॥
তুমি যে বলিলে মাগো আজ হবে ভাল।
কই ভাল হ'ল মাগো বুক ফেটে গেল॥
কোথা আছ দীননাথ দেখা দাও হরি।
আর যে সময় নাই এই বার মরি॥
বলিতে বলিতে হল মুদিত নয়ন।
মা মা বলে ডাকিলাম নাহিক বচন॥
সেই কথা মনে হলে পুড়ে উঠে মন।
কতক্ষণ যাতনাতে থাকিবে জীবন?
অপ্রকাশ কাঁদিতেছে, তোমার প্রকাশ
ধৈর্য্যগুণে সহ্য করে, না করে প্রকাশ॥
পশুপক্ষী কাঁদিতেছে কোকিল কোকিলা।
স্বর্গেতে বীণার ধ্বনি তুলে দেব-বালা॥
চন্দনের ছড়া পড়ে কুসুমের বাস।
অন্নপূর্ণা গিয়াছ মা শিবের কৈলাস॥
শান্তি কুঠি অগ্নি কাঠ দেখিবারে পাই।
সন্তান সন্ততি তোর কিছু মাত্র নাই॥
কে লইবে অট্টালিকা বসন ভূষণ।
হায়! হায়! কার হবে ভাবি সর্ব্বক্ষণ॥
শান্তিময়ী শান্তিধামে করিছ ভ্রমণ।
এত দিনে ভাই বোনে হইল মিলন॥
উভয়ে দারুণ রোগে ছিলে জ্বালাতন।
এত দিনে স্বর্গে বসি কর আলাপন॥
জগদীশ তব লীলা বুঝে উঠা ভার।
জীবন রাখিয়া নিলে জীবনের সার॥
মনে করি ভাবিব না, কেন ভাবে মন?
নয়ন মুদিয়া দেখি দুখানি বদন॥
পাশাপাশি হয়ে আছে দেখিতে সুন্দর।
কত কথা কহি, তারা না দেয় উত্তর॥
চক্ষু মেলি দেখি আমি সব অন্ধকার।
সব মিথ্যা—এ সংসার কেবলি অসার॥

শ্রীউদাসিনী দেবী।

Registered No. C. 134

No. 466-67. June & July, 1902.

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ। ৪৬৬-৬৭ সংখ্যা। { জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—১৩০৯। } ৭ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৹, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 466-67. June, July, 1902.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ। ৪৬৬-৬৭ সংখ্যা। — জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—১৩০৯। — ৭ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ্যাভিষেক—ইংলণ্ডের ৭ম এড-ওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে লণ্ডনের ১০ লক্ষ গরিবকে ভোজ দেওয়া হইবে।

মহর্ষির শুভ জন্মদিন—গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীমৎ মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় ৮৫ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ৮৬ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে মহাসমারোহ হয়। সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে অভিবন্দন করেন এবং তিনি ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে পরলোক যাত্রার্থ সকলের নিকট বিদায় লন।

অতি হর্ষে মৃত্যু—ফ্রান্সের এক দরিদ্র বৃদ্ধা সুরতী খেলায় ১ টাকা দিয়াছিল, সে তৎপরিবর্ত্তে ৭৫ হাজার টাকা পাইয়াছে, খবরের কাগজে এই সংবাদ পড়িতে পড়িতে গতাসু হইল। ডাক্তারের পরীক্ষায় প্রকাশ—হঠাৎ অতি-আনন্দই তাহার মৃত্যুর কারণ।

কটন-অভ্যর্থনা—আসামের চিফ কমিসনর কটনের বিদায়ের পূর্ব্বে কলিকাতার প্রধান প্রধান লোক টাউন-হলে এক সভা করিয়া সমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছেন। মহারাজা সার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর এই সভার সভাপতি হন। মহারাজা বহুব্যয়ে এক ভোজও দিয়াছেন।

আসামের নূতন শাসনকর্ত্তা—কটন সাহেবের স্থলে ফুলার সাহেব আসামের প্রতিনিধি চিফ কমিসনর হইয়াছেন।

পারস্য ও রুষিয়া—রুষিয়া ১৯০০ সালে পারস্যকে অনেক টাকা ঋণ দেন, আবার সম্প্রতি দেড় কোটি টাকা ঋণ

দিয়াছেন। রুষিয়া নানা উপায়ে পারস্তকে হস্তগত করিয়া রাখিতেছেন।

জাপানের রাজস্ব—আয় প্রায় ৪০ কোটি টাকা, ব্যয় কিছু কম।

বাঙ্গালীর ব্যবসা—জাপানের ইয়োকোহামা নগরে এক বাঙ্গালি কারবার খুলিয়াছেন। তিনি জাপানি দ্রব্য সকল ভারতে রপ্তানি করিতেছেন এবং এদেশীয় দ্রব্য জাপানে আমদানী করিতেছেন। বাঙ্গালীর এরূপ উদ্যম নিতান্ত প্রশংসার্হ।

বৃদ্ধ ক্রুগার—চিকাগো নগরবাসিগণ ক্রুগারকে আমেরিকায় বাস করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। তথায় তিনি নগরবাসীর সমুদায় অধিকার পাইবেন।

জাপানের সৎসাহস - ইংলণ্ডের সহিত জাপান সন্ধিবদ্ধ হইলেও ইংলণ্ড চিনরাজ্যে অহিফেন প্রেরণ করেন, জাপান ইহার ঘোর বিরোধী।

কলিকাতার লর্ড বিসপ—কলম্বোর প্রাচীন ধর্ম্মাধ্যক্ষ কোপলেষ্টন বিসপ ওয়েলডনের স্থানে কলিকাতার লর্ড বিসপ হইয়াছেন।

নূতন সেন্সস গণনার ফল—গত সেন্সস গণনানুসারে ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের লোকসংখ্যা এইরূপ হইয়াছে :—

বঙ্গদেশ।

	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
হিন্দু	৪,৬৭,৪০,৬৬১	২,৩২,৯০,৭৮৭	২,৩৪,৪৯,৮৭৪
ব্রাহ্ম	৩,১১৮	১,৮১৬	১,৩০২
শিখ	৩২৮	২৩৪	৯৪
জৈন	৭,৪৫৭	৫,০৭৬	২,৩৮১
বৌদ্ধ	২,১০,৬২৮	১,০৬,৩৩৫	১,০৪,২৯৩
পারসী	৩৮৮	২৪০	১৪৮
মুসল্মান	২,৫২,৬৫,৩৪২	১,২৭,৩২,৯৭০	১,২৫,৩২,৩৭২
খ্রীষ্টান	২,৭৫,১২৫	১,৪১,৩৮২	১,৩৩,৭৪৩
ইহুদী	১,৯৩৯	৯৪৪	৯৯৫
অনাখ্রীষ্ট	২২,৪২,৭৭০	১০,৯৮,৬৩৩	১১,৪৪,১৩৭
ক্ষুদ্র২ সম্প্রদায়	২২৮	১৮১	৪৭
	৭,৪৭,৪৪,৮৬৬	৩,৭৩,৭৬,৭৭২	৩,৭৩,৬৮,০৪৮

কলিকাতা।

	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
হিন্দু	৬,১৫,৪৯১	৪,০১,০৭০	২,১৪,৪২১
ব্রাহ্ম	১,৮১২	১,১১৯	৬৯৩
শিখ	১৬২	১৩৮	২৪
জৈন	১,২৪১	৮৬৩	৩৭৮
বৌদ্ধ	২,৯৩৮	২,৪৭২	৪৯৬
পারসী	২৯৫	১৭৭	১৪৪
মুসলমান	২,৮৬,৫৭৬	১,৯৬,০৬০	৯০,৫১৬
খ্রীষ্টান	৩৮,৫১৫	২১,৮৭৫	১৬,৬৪০
ইহুদী	১,৮৮৯	৯১৭	৯৭২
কংফুসী	১৭৮	১৫৩	২৫
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়	১৭	১১	৬
	৯,৪৯,১৪৪	৬,২৪,৮৫৫	৩,২৪,২৮৯

প্রীতিই নারীর প্রকৃত বল।

বাহিরের কোন কোন বিষয়ে নারীজাতির অধিকার অল্প দৃষ্ট হয় বলিয়া সকল বিষয়েই যে তাঁহাদের অধিকার অল্প এ কথা কথনও বলা যাইতে পারে না। নারী-

জাতির একটী স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, সেই রাজ্যের নাম গৃহ। ঈশ্বর সেই রাজ্যের শাসনের সম্পূর্ণ ভার নারীর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। গৃহরাজ্যে নারীর ক্ষমতা ও প্রভাব যে সর্ব্বোপরি, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। নারী যদি প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর-প্রদত্ত এই অধিকার রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তবে গৃহধাম স্বর্গে পরিণত হয়, এবং তাঁহার স্বর্গীয় প্রভাব জনসমাজে প্রবল হইয়া মনুষ্যকে অশেষ প্রকার দুর্নীতি ও পাপ তাপ হইতে রক্ষা করে। এই রাজ্য রক্ষণ ও শাসন করিবার জন্য শারীরিক বলের প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর নারীর হৃদয়ে প্রীতিরূপ যে বল দান করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। নারী প্রীতির বলে গৃহস্থ সকলকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হউন, শারীরিক বলের প্রয়োজন ভুলিয়া যাইবেন, এবং বুঝিতে পারিবেন প্রীতিই নারীর অদ্ভুত বল। এই বল দ্বারা যাহাকে একবার বশীভূত করিবেন, সে কোনও দিন আর শত্রু হইতে পারিবে না। প্রীতির অকাট্য বন্ধন ছিন্ন হইবার নহে। গৃহের সকলকে বশীভূত করিবার উপায় বিনয়, সহিষ্ণুতা, প্রীতি ও ভালবাসা। প্রীতিরূপ পবিত্র সৌন্দর্য্যে হৃদয়কে অনুরঞ্জিত করিতে নারী সচেষ্ট হউন। তাঁহার আকৃতি, কথা, দৃষ্টি ও কার্য্যে যেন প্রীতির প্রভাব প্রকাশ পায়। এই প্রীতির ভাব যত বিকাশ পাইবে, গৃহধাম ততই সুখের আলয়রূপে পরিণত হইবে। নারীর বাহ্য সৌন্দর্য্য অতি তুচ্ছ, হৃদয়ই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের স্থান। প্রত্যেক নারী এই সৌন্দর্য্য লাভ করিতে ব্যাকুল হউন। বাহিরের সৌন্দর্য্য কোন কার্য্যকর নহে, আন্তরিক সৌন্দর্য্য চির-মনোহর। যে নারীর হৃদয় প্রীতির পবিত্র জ্যোতিতে উজ্জ্বল, তিনি গৃহরাজ্যের সকলকে শাসন করিতে সমর্থ। অগ্নিস্পর্শে তৃণ যেরূপ ভস্মীভূত হয়, প্রীতির জ্যোতিতে সেইরূপ কুটিলতা, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি আবিল ভাব নারীর হৃদয় হইতে দূরীকৃত হয়।

নারীজাতির রাজ্য ও কার্য্যক্ষেত্র গৃহ। এইস্থলে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তারের উপায় রহিয়াছে। যদি সমুচিত ক্ষমতাসহকারে এ রাজ্য শাসন করিতে পারেন, তবে নারীজীবন সার্থক হইবে, এবং নারী বুঝিতে পারিবেন করুণাময় পিতা কত বড় রাজ্যের ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। গৃহরাজ্যের প্রকৃত রাণী যে তিনি নিজ ক্ষমতা দ্বারা তাহার পরিচয় দিন। প্রত্যেক নারী স্মরণ রাখিবেন একটী বিস্তৃত রাজ্যের ভার তাঁহার হস্তে। ঈশ্বর-প্রীতি মূলে রাখিয়া, সেই প্রীতির প্রভাব প্রদর্শন করিয়া সকল কর্ত্তব্য পালন করিবেন। গৃহ প্রীতি ও পবিত্রতার আলয় না হইলে জনসমাজ উন্নত হইবে না; লোকে ধর্ম্মের সমাদর করিতে শিখিবে না। যত দিন পর্য্যন্ত গৃহ ঈশ্বরের আলয় না হয়, প্রত্যেক নারী আপনার হৃদয়কে প্রীতির আধার

করিতে যত্নবতী হইবেন, ঈশ্বর-প্রীতি আদর্শ করিয়া প্রীতির ভাব শিক্ষা করিবেন। মানুষের কত দোষ ও পাপ সত্ত্বেও করুণার আধার ঈশ্বর তাহাকে প্রীতি করেন, পাপ হইতে উদ্ধার লাভের পথ প্রদর্শন করিয়া জগতে কল্যাণ বিস্তার করেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা কি অসীম! প্রীতিবলে মনুষ্যের কোটি কোটি অপরাধ ক্ষমা করিতেছেন। নারী ঠিক্ এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া গৃহকে সুখ শান্তির আলয় করিতে সচেষ্ট হউন, তবেই প্রেমের জয় হইবে এবং পাপ তাপ ও দুঃখপূর্ণ পৃথিবী স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে ভূষিত শান্তিরাজ্যে পরিণত হইবে।

রাজপুত্র।

কুনাল। *

১

'বীর, ধীর, রূপবান্ সাধুশীল, বুদ্ধিমান্,
অশোকের প্রিয়তম সুত,
রাজকার্য্যবিশারদ, জিতেন্দ্রিয় প্রিয়ংবদ,
কুনাল অশেষ গুণ-যুত।
পিতৃআজ্ঞা শিরে ধরি, সেনাবৃন্দ সঙ্গে করি,
তক্ষশীলা উত্তরিলা বীর,
দুরন্ত বিদ্রোহী দলে, আনিলেন করতলে,
শীতরশ্মি প্রতাপে মিহির!
বিপক্ষের প্রতি তাঁর, কিবা প্রিয় ব্যবহার,
সে কথা ভাবিতে আঁখি ঝরে,
প্রেমের আগুন জ্বালি, করুণার ঘৃত ঢালি,
গলা'লেন অরাতি-নিকরে।
বিদ্রোহীর দলপতি, কুঞ্জর কুনাল প্রতি,
অনুরক্ত হইল তখন;
শুনিয়া মগধ-নাথ, অশোক স্বগণ সাথ,
আনন্দ সাগরে নিমগন!

২

কুঞ্জরেরে উচ্চপায়, সংস্থাপিয়া যুবরায়,
করিতে লাগিলা রাজকাজ,
প্রজাকুল তাঁর প্রতি, হইল সন্তুষ্ট অতি,
সানন্দ অশোক মহারাজ।
সহসা কুঞ্জর তায়, রাজ-আজ্ঞা-পত্র পায়,
কুনালের আঁখি উৎপাটিতে;
কিসে কি পাইয়া দোষ, রাজার এতেক রোষ,
ভাবিল কুঞ্জর ক্ষুণ্ণচিতে,—
কি লাগিয়া মহারাজ, নিক্ষেপ করিলা বাজ,
এ অকাজ কেমনে করিব!
কুঞ্জরের গণ্ড দিয়া, পড়ে অশ্রু গড়াইয়া,
ভাবে—ইথে কেমনে তরিব!
শুনিয়া কুনাল কহে, "এ তব উচিত নহে,
কি কারণ বিষাদিত-মন?
আমার বচন ধর, রাজাজ্ঞা পালন কর,
আঁখি মোর কর উৎপাটন।"

---

* কুনাল অশোকরাজার অশেষগুণাকর পুত্র। ইঁহার চরিত্র আদর্শ চরিত্র এবং জীবন বিচিত্র অদ্ভুত ঘটনাতে পরিপূর্ণ। ভগিনী সঙ্ঘমিত্রার ইনি উপযুক্ত ভ্রাতা।

কুঞ্জর দাঁড়ায়ে পাশে, নয়ন-সলিলে ভাসে,
বদনে না সরি'ছে বচন।
"থসাও নয়নমণি, তাহে না বিপদ গণি,"—
কহিলেন কুনাল তথন,—
"পিতৃ-আজ্ঞা যে না পালে, কে তারে তনয় বলে,
কুপুত্র কুলের কালি সেই ;
নাহি কাজ রাজ্যধনে, নাহি কাজ এ নয়নে
সংসারের সুখে স্পৃহা নেই।
কুঞ্জর, সেধ না বাদ, করোনা ইথে বিষাদ.
পিতৃপদে আশীর্ব্বাদ যাচি,
গেল আঁখি যাক্ টুটে, জ্ঞাননেত্র যেন ফুটে,
বিভুনামে ম'রে যেন বাঁচি!
বিলম্ব কর না আর, সংবর নয়ন-ধার,
আঁখি দুটি ফেল উপাড়িয়া।"
কাঁদিয়া কুঞ্জর কয়, "আমার সে কর্ম্ম নয়,
ক্ষম প্রভু, অক্ষম জানিয়া।"
ভাবিতে বিদরে বুক, কহিতে শুকায় মুখ,
লিখিতে এ লেখনী কাঁপিল!—
নির্ম্মম চণ্ডাল আসি, কোমল নয়ন নাশি,
অন্ধ হায়! কুনালে করিল।
পার্থিব সকল সুখে দিয়া বিসর্জ্জন,
যতিধর্ম্ম রাজপুত্র করিলা গ্রহণ।
তক্ষশীলা ত্যজি, অন্ধ হইলা বাহির,
প্রশান্ত গম্ভীর ভাব, গমন সুধীর।
জনকের প্রতি তাঁর নাহি মাত্র রোষ,
অথবা অন্তরে কিছু নাহি অসন্তোষ।
দিবানিশি করে সাধু বিভুর ভজন,
মনের আনন্দে কভু বাঁশরী বাদন।
এইরূপে কিছুদিন করিয়া অতীত,
কুমার পাটলিপুত্রে হৈলা উপনীত।
গভীরা যামিনীযোগে একদা কুমার
বংশীরবে করিলেন অমৃত সঞ্চার!
ভাবিলেন রাজা তাহা করিয়া শ্রবণ,
কে বাজায় বাঁশী আহা, মধুর এমন!
কুনাল সে পটু হেন বাঁশীর বাদনে,
সে'ত এবে তক্ষশীলা-রাজ-সিংহাসনে।
কে তবে বাজায় বাঁশী জানিবার তরে,
উপজিল কৌতূহল রাজার অন্তরে।
রজনী-প্রভাতে ভূপ অনুচর প্রতি
আনিবারে বাদকেরে দিলা অনুমতি।
অবিলম্বে কাছে তাঁর আসিল কুনাল,
অন্ধ হেরি পুত্রে হৈলা আকুল ভূপাল!

৪

ধরিয়া কুমারে হৃদয় মাঝারে
ভুজপাশে আবরিয়া,
কাঁদে নরপতি শোকাকুল অতি
সুতে অন্ধ নিরখিয়া।
ঝটিকার প্রায় উঠিল সেথায়
শুধু হায় হায় রব,
শিরে করাঘাত করে নরনাথ,
শোকে নিমগন সব।
"কহ যাদুমণি" সুধায় নৃমণি,
আসন্ন মরণ কার?
কে করিল তোর এ দুর্দ্দশা ঘোর,
অব্যাহতি নাহি তার।"
জ্বলে নররায় হুতাশন প্রায়
নিদারুণ রোষভরে,—
প্রিয়তম তাঁর কুনাল কুমার,
কে তাহারে অন্ধ করে?
পিতার সকাশে বাক্য নাহি ভাষে
কুনাল বিনম্রমুখ।—

রাজার অন্তর শোকে জর জর,
অপার অসহ দুখ!

৫

অশোকের ছিল রাণী কলুষ-আধার,
কুনালের বিমাতা সে, প্রেয়সী রাজার।
তাহার কুচক্র নাহি বুঝে কোন জনা,
ষড়যন্ত্রে পাপীয়সী চির-বিচক্ষণা।
কুনাল কুমারে অন্ধ করিতে সত্বর
সেই লিখেছিল!—জাল রাজার স্বাক্ষর!
সেই করিয়াছে এই মহাসর্ব্বনাশ,
জ্বলিয়া উঠিল রাজা অনল-সঙ্কাশ!
"করিয়াছি পাপিষ্ঠারে ক্ষমা বহুবার,
অদ্যই নিশ্চিত তারে করিব সংহার।"
এত বলি মহীপাল উঠিল গর্জ্জিয়া,
কহিলেন পদতলে কুনাল পড়িয়া,—

৬

"করিও না বৃথা রোষ, বিমাতার নাহি দোষ,
তিনি মোর মঙ্গল-কারণ;
সংসারের মোহঘোরে বিষয় বাসনা-ডোরে
কি আমার করিবে এখন!
জগতের যত পাশ করেছি সমূলে নাশ,
ঘুচিয়াছে সব অহঙ্কার।"
দ্বিগুণ দুঃখের বেগে ভূপতি উঠিল রেগে
শুনিয়া সে বচন তাঁহার।
পুনশ্চ কুনাল কয় পিতার চরণ-দ্বয়
ভাসাইয়া নয়নের জলে,
"না জানি এ দুরাচার নাশিয়াছি নেত্র কার,
এ দশা আপন কর্ম্মফলে।
বিমাতার নাহি দোষ বৃথা প্রভু কর রোষ
বুঝি পরে ক'রেছি পীড়ন,
পরে পীড়া দেয় যারা, চিরদুঃখী হয় তারা,
কেন র'বে আমার নয়ন?"
শুনি এ বাক্য অদ্ভুত আরও শোকে অভিভূত
হইলেক ভূপতির মন।
শোকে দুঃখে রাগে তাঁর সংকল্প রহিল সার,
পাপীয়সী মহিষী-নিধন!
পিতার চরণ ধরি বহু অনুনয় করি'
কহিলেন কুনাল আবার,
"হইয়াছে যা হ'বার, নাহি তার প্রতীকার,
অপরাধ ক্ষম বিমাতার।
তাঁরে যদি দাও তাপ, আমারি হইবে পাপ,
মোর তরে মাতৃদণ্ড হ'বে,
আমি পুত্র কুলাঙ্গার, বাঁচিব না তবে আর
ভূমণ্ডলে পরীবাদ রবে।
তুমি প্রভু সদাশয়, তব উপযুক্ত নয়
অল্পবুদ্ধি নারীর নিধন;
বিমাতার দণ্ড হলে, পশিব অনলে জলে,
হলাহল করিব অশন।"
এইরূপ সবিনয় করি বহু অনুনয়
রাখে সাধু বিমাতার প্রাণ;
ঈশ্বরে যে প্রেমময় তাঁহার বিচারে নয়
শত্রুমিত্র কভু অসমান।

সুভাষিণী দেবী।

তড়িৎ শক্তি।

বিদ্যুৎ ও বজ্র।

ঘর্ষণ, পেষণ, রাসায়নিক সংযোগ, তাপ ও চুম্বকাকর্ষণ প্রভাবে পদার্থ সকল এক অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ শক্তিকে তড়িৎ শক্তি বলা যায়। তড়িৎ-সম্পন্ন হইলে পদার্থ সকল কখন আকৃষ্ট কখন বা প্রত্যাকৃষ্ট হয়; কখন দীপ্তি-মান হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করে, কখন বা তাপসংযুক্ত হইয়া অগ্নিশিখা বিক্ষেপ করিয়া থাকে; কখন রাসায়নিক সংযোগ-যুক্ত এবং কখন বা রাসায়নিক সংযোগ-বিমুক্ত হইয়া পড়ে। দিঙ্‌মণ্ডল বিভাসিত করিয়া নভোমণ্ডলে যে ক্ষণ-প্রভা প্রকাশিত হয়, তাহা এই তড়িৎ শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কোন দ্রব্য তড়িৎসম্পন্ন কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তড়িৎ-পরিদোলক (Electric pendulum) নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কাচ-নির্ম্মিত আধার দণ্ডের অগ্রভাগে বক্রাকার এক খণ্ড পিত্তলের শলাকা সংলগ্ন করতঃ একটী শোলার বর্ত্তুল রেশমী সূত্র দ্বারা উহাতে ঝুলাইয়া দিলে উক্ত যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তড়িৎ সংলগ্ন কোন বস্তু উক্ত বর্ত্তুলের সন্নিহিত করিলে উহা তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। রেশমী বস্ত্র দ্বারা সংঘর্ষিত কাচ-দণ্ড তড়িৎ পরিদোলকের বর্ত্তুলের সন্নিহিত করিলে দেখা যায় ঐ বর্ত্তুলটী প্রথমতঃ কাচদণ্ড দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উহাতে সংলগ্ন হয়, কিন্তু পরক্ষণে উহা হইতে বিচ্যুত ও দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। শোলার বর্ত্তুল তড়িৎসম্পন্ন কাচদণ্ডের সংস্পর্শে তড়িৎ সম্পন্ন হয়, এবং যতক্ষণ ঐ উভয় পদার্থে তড়িৎ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ উহারা মিলিত না হইয়া পরস্পর দূরবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করে। ফ্লানেল দ্বারা লাক্ষাদণ্ড (গালার বাতী) সংঘর্ষণ করিয়া তড়িৎসম্পন্ন করতঃ যদি অন্য একটী তড়িৎপরিদোলকের বর্ত্তুলের সন্নিহিত করা যায়, তাহা হইলে উক্ত বর্ত্তুলকেও লাক্ষাদণ্ডের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ উহার সহিত মিলিত ও পশ্চাৎ উহা হইতে বিচ্যুত ও দূরবর্ত্তী হইতে দেখা যায়। যে দুই বস্তু একবিধ তড়িৎসম্পন্ন, তাহারা পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট, আর যাহারা বিপরীত তড়িৎসম্পন্ন তাহারা পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত কাচ ও লাক্ষাদণ্ড উভয়েই তড়িৎসম্পন্ন বটে, কিন্তু এতদুভয়ের তড়িৎ একবিধ নহে। তড়িৎ-সংযুক্ত কাচদণ্ডের সংস্পর্শে তড়িৎ-সম্পন্ন হইয়া যে তড়িৎ পরিদোলকের বর্ত্তুল দূরবর্ত্তী হইয়াছে, তড়িৎ-সংযুক্ত লাক্ষা দণ্ডের দ্বারা তাহা আকৃষ্ট হয় আর তড়িৎ-সংযুক্ত লাক্ষা দণ্ডের সংস্পর্শে তড়িৎসম্পন্ন ও দূরবর্ত্তী তড়িৎ পরিদোলকের বর্ত্তুল তড়িৎ-সংযুক্ত

কাচদণ্ডের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কাচদণ্ড রেশমী বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষিত হইয়া যে তড়িৎসম্পন্ন হয়, তাহাকে (Vitreous or Positive) পুং, অথবা সমতাড়িৎ আর ফ্লানেলের দ্বারা ঘর্ষিত হইয়া লাক্ষাদণ্ডে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহাকে (Resinous or Negative) স্ত্রী অথবা বিষম তড়িৎ আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে। যে সকল পদার্থ দ্বারা তড়িৎ অবাধে পরিচালিত হয়,তাহাদিগকে তড়িৎ পরিচালক এবং যে সকল পদার্থ তড়িৎ পরিচালনে অক্ষম, তাহাদিগকে অপরিচালক বলা যায়।

তড়িৎশক্তি প্রভাবে দৈনন্দিন কত শত অত্যাশ্চর্য্য ও অত্যাবশ্যক কার্য্য-পরম্পরা সংসাধিত হইতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহার নির্ব্বাঢ় কারণ অবধারিত হয় নাই। সিমার (Symmer) নামক এক জন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত অনুমান করেন, পদার্থ-মাত্রেই একপ্রকার ভার-বিহীন তরল পদার্থ বিদ্যমান আছে, উহাকে (Electrical fluid) তরল তড়িৎ বলা যায়। ঐ তরল তড়িৎ সম (Positive) এবং বিষম (Negative) নামক তরল পদার্থদ্বয়ের সমবায়ে সমুৎপন্ন। যখন কোন দ্রব্যে উক্ত পদার্থদ্বয় সমঞ্জস-ভাবে মিলিত হইয়া অবস্থিতি করে, তৎকালে উক্ত পদার্থ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। ঘর্ষণ, রাসায়নিক সংযোগ প্রভৃতি উপায়ে এই সমঞ্জসভাবাপন্ন তরল তড়িৎ বিশ্লিষ্ট হয় অর্থাৎ উহার উপাদানী-ভূত তরল পদার্থদ্বয় পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়ে। কোন দ্রব্য এই তরল পদার্থ দ্বয়ের মধ্যে একের আধিক্যে সমতড়িৎ-সম্পন্ন এবং অন্যটীর আধিক্যে বিষম-তড়িৎসম্পন্ন বলা যায়।

ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে শুদ্ধ ঝড় বৃষ্টির সময়ে নয়, কিন্তু সর্ব্বদাই বায়ুমণ্ডলে সম বা বিষম তড়িৎ বিদ্যমান আছে। আকাশমণ্ডল মেঘযুক্ত থাকিলে বায়ুমণ্ডল সমতড়িৎসম্পন্ন হয়। অত্যুচ্চ পৃথগবস্থিত স্থান সকলে ইহার আধিক্য উপলব্ধি হয়। গৃহাভ্যন্তরে, পথে কিম্বা বৃক্ষতলে ইহার বিদ্যমানতার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠের ৫ ফুট উচ্চ স্থান হইতে সমতড়িৎ পরিলক্ষিত হয় এবং উচ্চতার আধিক্যের সহিত ইহার আধিক্য হইয়া থাকে। নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে বায়ুমণ্ডল কখন সম কখন বা বিষম-তড়িৎ সম্পন্ন হয়।

বায়ুমণ্ডলস্থ তড়িৎ উৎপত্তির কারণ কি, তাহা এপর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। কোন কোন পণ্ডিত ভূপৃষ্ঠের সহিত বায়ুর সংঘর্ষণই ঐ তড়িৎ উৎপত্তির কারণ বলিয়া অনুমান করেন; কেহ উদ্ভিদাদির উৎপত্তির জন্য কেহ বা জল হইতে বাষ্প হইবার জন্য তাড়িৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া অনুমান করেন। কোন কোন পণ্ডিত অন্যরূপ কারণও অবধারণ করেন।

মেঘ হইতে যে ক্ষণস্থায়ী জ্যোতিঃ

উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিদ্যুৎ, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। বিদ্যুৎ যে তড়িৎ শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন তড়িৎসম্পন্ন দুই খণ্ড মেঘ পরস্পর মিলিত হইয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া শব্দ উত্থিত হয়, তাহাকেই বজ্র বলে। বায়ুমণ্ডলের নিম্নভাগে বিদ্যুদালোকের বর্ণ শ্বেত, কিন্তু উহার উপরিভাগে উহার বর্ণ বায়লেট। বিদ্যুদাভা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে ;-(১) সর্পগতি আলোক রেখা, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রুতগামী। (২)আলোক রাশি। ইহা রেখাকৃতি নহে। ইহাতে সমস্ত নভোমণ্ডল আলোকিত হয়, কিন্তু ইহার বিশেষ কোন আকৃতি নাই। (৩) গ্রীষ্মকালের রাত্রে এক প্রকার বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে, এই বিদ্যুৎ প্রকাশের সহিত বজ্রনিনাদ শ্রুত হয় না। সাধারণ বিদ্যুতের ন্যায় ইহার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু অধিক দূরে উক্ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় বলিয়া উহার শব্দ আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতে পারে না। কোন কোন সময় নভোমণ্ডলে মণ্ডলাকার আলোক রাশি দৃষ্ট হয়, উহাকে অগ্নিগোলক (Fire-balls) বলে। এই গোলক দশ সেকেণ্ড সময় পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় এবং মেঘ হইতে ভূপৃষ্ঠের দিকে এত মৃদুভাবে অবতরণ করে যে উহার গতি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রায়ই ঐ গোলক ভূপৃষ্ঠে উপনীত হইবা মাত্রই পুনর্ব্বার লাফাইয়া উঠে। কোন কোন সময়ে উহা এত অধিক শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায় যে মনে হয় যেন এক কালে বহুসংখ্যক কামান দাগা হইয়াছে। প্রথমোক্ত ত্রিবিধ বিদ্যুৎ জ্যোতিঃ এক সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের অধিক ক্ষণ থাকে না।

বিদ্যুৎ ও বজ্র অর্থাৎ আলোক ও শব্দ এক সময়ে হইয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যুৎ প্রকাশের কিছুক্ষণ পরে বজ্রের শব্দ অনুভূত হয়। শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,১০০ ফুট মাত্র, কিন্তু আলোক প্রকাশ মাত্রেই দৃষ্ট হয়। যদি কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎসম্পন্ন মেঘ হইতে ৬,৬০০ ফুট দূরে থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বিদ্যুৎ অবলোকন করিবার ৬ সেকেণ্ড পরে বজ্রধ্বনি শুনিতে পাইবে। বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইলে বায়ুমণ্ডল আন্দোলিত ও স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচলিত হয়, ইহাতে বজ্রের শব্দ উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ সাধারণতঃ ঊর্দ্ধ হইতে অধোদিকে পরিচালিত হয়, কিন্তু আবার কোন কোন সময়ে বিদ্যুৎকে বায়ুমণ্ডলের নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ দিকে উঠিতে দেখা যায়। যখন মেঘ বিষম তড়িৎসংযুক্ত এবং ভূপৃষ্ঠ সমতড়িৎ সম্পন্ন হয়, অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন, সেই সময়ে এইরূপ ঊর্দ্ধগামী বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তড়িৎ আকর্ষণ-নিয়মানুসারে উন্নত ও তড়িৎ-পরিচালক পদার্থের উপর সর্ব্বপ্রথম

বজ্রপাত হইয়া থাকে। * বৃক্ষ, উন্নত অট্টালিকা ও ধাতু দ্রব্য প্রভৃতিতে বজ্র পতনের বিশেষ সম্ভাবনা। বৃক্ষ সকলের অভ্যন্তরে যে জলীয় পদার্থ আছে, তাহা তড়িৎ পরিচালক। এই কারণে ঝড় বৃষ্টির সময়ে বৃক্ষতলে আশ্রয় লওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

বজ্রপ্রভাবে কত জীব জন্তু মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, দহনশীল পদার্থ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, ধাতুসকল দ্রব হইয়া যায় এবং অপরিচালক দ্রব্যসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া থাকে। লৌহ-শলাকার উপর বজ্রপাত হইলে উক্ত শলাকা চুম্বকধর্ম্ম সম্পন্ন হয়।

কোন গৃহে তড়িৎ যন্ত্র পরিচালিত করিলে যেরূপ গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে, বজ্রপাতের পর ঠিক্ সেইরূপই গন্ধ অনুভূত হয়। ঐ গন্ধ অম্লজানের রূপান্তর ওজন নামক বাষ্পের গন্ধ। অম্লজানের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চালিত করিলে ওজন বাষ্প উৎপন্ন হয়।

শ্রীমন্মথ নাথ সিংহ।

* তড়িৎসম্পন্ন মেঘ ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইলে মেঘস্থিত তড়িতের বিপরীত তড়িৎ ভূপৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়। এই উভয় তড়িৎ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া ও ভীষণ শব্দ করিয়া মিলিত হয়। ইহাই বজ্রপাত। মেঘ হইতে 'বজ্র' বলিয়া কোন ধাতব পদার্থ পতিত হয় এই যে এদেশের সাধারণ সংস্কার, তাহা মিথ্যা।

ত্রয়যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(৪৪৪-৪৫ সংখ্যা ৩০৫ পৃষ্ঠার পর)।

তৃতীয় সর্গ।

প্রথমতঃ হেলেনাকে প্রত্যর্পণ এবং কৃত-অপরাধের জন্য যথোচিত ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য ত্রয়াধিপতিকে অনুরোধ করা হয়; কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না; বরঞ্চ গ্রীকদিগের অনুচিত স্পর্দ্ধার জন্য যথেষ্ট প্রতি-ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। এবম্প্রকারে অযথা অপমানিত হইয়া সমস্ত গ্রীকজাতি একত্র সম্মিলিত হইল এবং অসংখ্য রণতরী সজ্জীকৃত করিয়া ত্রয় নগর আক্রমণ করিল। রণতরীতে সমুদ্রদেশ আচ্ছন্ন হইল এবং গ্রীশ ও আসিয়া-মাইনর এক হইয়া গেল। নৌসেতু দ্বারা সমস্ত গ্রীক-সৈন্য সমুদ্র পার হইয়া ত্রয়ের প্রাকার সম্মুখে সমবেত হইলে, ত্রজনেরাও রণবেশে সুসজ্জিত হইয়া নগরের বহির্ভাগে আগমন পূর্ব্বক শত্রুসেনার পথাবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। যুদ্ধার্থ সমস্ত প্রস্তুত। অশ্বারোহীর বিপরীতভাগে অশ্বারোহী, পদাতির প্রতিকূলে পদাতি, ব্যূহের সম্মুখে ব্যূহ এবং দূরস্থ তীরন্দাজদিগের সমবস্থানে তীরন্দাজ সকল সংস্থাপিত হইল। সেনাপতিগণ অশ্বারোহণে শ্রেণীবদ্ধ

সৈন্যের পুরোভাগে ও পশ্চাদ্ভাগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সৈন্যগণ শরাসনে শরসন্ধান ও অসিচর্ম্ম, ভল্ল, টাঙ্গী প্রভৃতি অস্ত্র সকল যথাবিধানে আকর্ষণপূর্ব্বক প্রধান সেনাপতির আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময় ত্রয় সেনাপতি মহাবীর হেক্তর উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রীক সেনাপতি আগামেমননকে সম্বোধনপূর্ব্বক উভয় পক্ষের হিতকর প্রস্তাব করিলেন, যে পারিশ ও মিন-ই-লেয়স উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, যিনি পরাস্ত হইবেন, তিনিই হেলেনা ও তদানীত রত্ন-সম্ভার প্রাপ্ত হইবেন। এই অপূর্ব্ব প্রস্তাব শ্রবণে গ্রীকবীরগণ পরস্পরের অভিমত জানিবার জন্য সোৎসুকচিত্তে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। আগামেমনন স্বীয় অনুজের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। মিন-ই-লেয়স তৎক্ষণাৎ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। পারিশও প্রস্তুত ছিলেন। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পারিশ পরাভূত হইলেন! কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাক প্রযুক্ত পণ রক্ষা হইল না। ভূভার হরণার্থ বাল্মীকি ও ব্যাস যেরূপ দেবতাদিগকে সমুদ্যুক্ত করিয়া মর্ত্তালোকে আনয়ন করিয়াছিলেন, হোমরও সেইরূপ উভয় শত্রুপক্ষকে উপলক্ষ করিয়া দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইয়াছেন।

মিন-ই-লেয়স দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে জয়ী হইয়া পারিশের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ভূপাতিত করিয়া বধার্থ উদ্যত হইলে সুরসুন্দরী বেনাস (রতিদেবী) তাহার রক্ষার্থ অগ্রসর হইলেন। অলক্ষ্যে বন্ধনমুক্ত করিয়া তাঁহাকে লইয়া অন্তরীক্ষে ধাবমান হইলেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার শয়ন মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শয্যায় শয়ান রাখিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

রিক্ত শিরোভূষণ হস্তে সংলগ্ন ও পারিশের অন্তর্দ্ধান দেখিয়া মিন-ই-লেয়স হতবুদ্ধি হইয়া নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পাণ্ডরস নামে জনৈক ত্রয়বীর মিনার্ভা দেবী * কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া অলক্ষিতভাবে নিশিত শর দ্বারা তাঁহার হৃদয়দেশ বিদীর্ণ করিলেন। পণ অবদলিত হইল, সন্ধি ভঙ্গ হইল এবং তদবধি উভয় পক্ষের

* মিনার্ভার অন্য নাম এথিনা—গ্রীকেরা ইঁহার নামেই রাজধানী এথেন্সের নামকরণ করিয়াছিল। ইঁহার আর একটী নাম পালাশ। ইনি দেবরাজ যূ-পিতারের কন্যা। ইঁহার জন্মসম্বন্ধে উক্ত আছে যে যূ-পিতার জলাধিপতির (আসিয়ানসের) কন্যা মেতিসকে বিবাহ করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে তাঁহার গর্ভে জন্মদাতার অপেক্ষা বলবান্ সন্তান জন্মিবে, তখন তিনি ভীত হইয়া সসত্ত্বাকালের প্রথম মাসেই পত্নীকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এক মাস পরেই তাঁহার শিরোদেশ হইতে মিনার্ভা উৎপন্ন হন। বিশ্বকর্ম্মা (বলকান) যূ-পিতারের কর্পর খুলিয়া তাঁহাকে বাহির করেন। তিনি সশস্ত্র রূপযৌবনসম্পন্না পূর্ণবয়স্কারূপে অবতীর্ণ হন। ইনি ইন্দ্রের দম্ভোলী হইতে রক্ষা করিতে এবং অল্পায়ুকে আয়ুষ্মান্ করিতে সমর্থা।

তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। এইরূপে গ্রীক ও ত্র-জনের মধ্যে অবিশ্রান্ত নয় বৎসর কাল ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। ক্রমে গ্রীক-বীরেরা প্রাকারের বহির্ভাগের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া নগরের বহিস্তোরণের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল। নগর প্রকৃতরূপে অবরুদ্ধ হইল। ত্রজনেরা দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রাকারের শিখর হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু তদ্দ্বারা গ্রীকদিগের জয়োল্লাস সংহৃত না হইয়া বরং সম্বর্দ্ধিতই হইয়াছিল।

দৈবনির্ম্মিত ও সূর্য্যদেবের রক্ষিত বলিয়া গ্রীকেরা প্রাকারোল্লঙ্ঘনে সাহসী হয় নাই।

এই সময়ের এক পক্ষের যুদ্ধ ঘটনা বর্ণনা করিয়া হোমর ইলিয়দ রচনা করিয়াছেন। গ্রীকেরা ত্রয়ের বহির্ভাগস্থ সমস্ত দেশ জয় করিয়া প্রভূত ধন অপহরণ ও তৎসঙ্গে ক্রুসিসা ও বৃসিসা নাম্নী দুইটী পরমা সুন্দরী কন্যাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল। একটী কন্যা গ্রীশাধিপতি আগমেমননকে ও অপরটী অখিলেশকে উপহার প্রদত্ত হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই গ্রীক-শিবিরে বিষম দৈবোৎপাত আরম্ভ হয়। দৈবজ্ঞেরা গণিয়া নির্ণয় করেন যে সূর্য্যদেবের দেবলকন্যা অপহরণ জন্য এরূপ দুর্গ্রহ উপস্থিত; যতদিন না তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হয়, ততদিন এইরূপ অমঙ্গল ও অনিষ্টাপাত হইবে। ক্রুসিসা কন্যাটী আগামেমননকে দেওয়া হইয়াছিল, অগত্যা তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তিনি গ্রীকদিগের অধিরাজ সেনাপতি ও অগ্রণী, সুতরাং সহজে নিবৃত্ত হইলেন না, অখিলেশকে যে বৃসিসা কন্যারত্ন প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা গ্রহণ-লালসায় সদর্পে অনুচর প্রেরণ করিলেন।

অখিলেশ অত্যন্ত অভিমানী। তিনি কন্যারত্ন ফিরাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু ক্রোধে অস্থির হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আগামেমনন্ ও তাহার ভ্রাতার সাহায্যার্থ আর অস্ত্রধারণ করিবেন না। গ্রীকেরা পৃথিবীর মধ্যে অমিততেজা ও মহা ধনুর্দ্ধর হইলেও কেহই অখিলেশের সমতুল্য ছিলেন না। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ক্ষিপ্রকারিতায়, অস্ত্রসঞ্চালনে ও রণনৈপুণ্যে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। বিশেষতঃ অপ্সরা-গর্ভজাত বলিয়া দৈববল সম্পন্নও ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার জননী অপ্সরা থেটিস তাঁহাকে শৈশবাবস্থায় প্রেতনদী বৈতরণীতে নিমজ্জন করেন, তজ্জন্য তাঁহার সমস্ত শরীর পাষাণবৎ অভেদ্য হয়, কেবল গুল্‌ফদেশ হস্তে ধৃত ছিল বলিয়া তাহা জলস্পর্শ করিতে পারে নাই, সুতরাং তাহা অভেদ্য হয় নাই। একদা থেটিস পুত্রের প্রশ্নানুসারে ভবিতব্যতা প্রকাশ করিয়া বলেন যে যদি তিনি বীর পুরুষের ন্যায় ভূমণ্ডলে বিচরণ করেন, তাহা হইলে অসীম খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ

করিবেন কিন্তু অল্পায়ু হইবেন, আর যদি শান্ত সমাহিত চিত্তে নিভৃতে কালযাপন করেন, তাহা হইলে দীর্ঘজীবী হইতে পারিবেন। অখিলেশ বীরজীবন মনোনীত করিয়া লইলেন। ত্রয়ের উচ্ছেদনার্থ তাঁহার জন্মবিধান। এ সম্বন্ধে এক অশ্চের্য্য উপাখ্যান আছে। যখন তাঁহার পিতার বিবাহ হয়, মানবের সহিত অপ্সরার বিবাহ—এই অপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনার্থ কুতূহলী হইয়া দেব, দৈত্য, নর, অপ্সর প্রভৃতি সভাস্থলে অনেকেরই শুভাগমন হইয়াছিল। সমস্ত দেব ও দেবীকে আহ্বান করা হইয়াছিল, শুভকর্ম্ম বলিয়া কেবল বিঘ্নবিধায়িনী অশান্তি দেবীকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। অশান্তি দেবী এই অকারণ অবমাননায় সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন এবং বিদ্বেষ পরতন্ত্র হইয়া বিবাহসভায় একটী স্বর্ণ-আপলফল ফেলিয়া দিলেন। ফলের উপরিভাগে লেখা ছিল যে "যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপবতী, তিনিই কেবল ইহা গ্রহণে অধিকারিণী।" অনুপমা সুরসুন্দরী জুনো, বেনাস (রতি) ও মিনর্ভা তিন জনেই তথায় উপস্থিত ছিলেন; ফললাভে সমুৎসুক হইয়া তিন জনেই যুগপৎ হস্ত বিস্তার করিলেন। প্রত্যেকেই ফলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ধারণ করিয়া আপনাকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ও ফলাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। বিবাহ সভায় মহা কোলাহল হইল। দেবগণ, দৈত্যগণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। দৈব-ঘটনানিবন্ধন ত্রয়রাজপুত্র পারিশও তথায় উপস্থিত ছিলেন। মর্ত্ত্যলোকে তিনি অদ্বিতীয় রূপবান বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুর-সুন্দরীত্রয় একমত হইয়া স্বীয় স্বীয় সৌন্দর্য্যের বিচারভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিলেন। পারিশ বেনাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপবতী বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক, স্বর্ণ আপল তাঁহারই প্রাপ্য বলিয়া মীমাংসা করিলেন।* কোলাহল নিবৃত্ত হইল এবং বিবাদও মিটিল, কিন্তু পারিশ চিরদিনের জন্য জুনো ও মিনর্ভার বিষ-নয়নে পতিত হইলেন। তাঁহাদের কোপেই পারিশের পতন ও ত্রয়ের উচ্ছেদ সাধন হয়।

(ক্রমশঃ)

* এ সম্বন্ধে অন্য আখ্যায়িকা আছে। রাজপুত্র পারিস আইডা পর্ব্বতে মেষ চরাইতেছিলেন, সেইখানে উপরি উক্ত তিন দেবী তাঁহার বিচার-প্রার্থী হন এবং তিনি রতিদেবীর পক্ষপাতী হন।

নীতি-সার।

ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমং।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্য মনিত্যতাং॥

কাশ্মীর চিত্র।

(৪৬৫ সংখ্যা—২৯ পৃষ্ঠার পর)

সহর পরিত্যাগ করিয়া যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, প্রকৃতির দৃশ্য ততই বিচিত্র ভাব ধারণ করিয়া চক্ষু বিমোহিত করিল। পর্ব্বতের পাষাণ দেহ নানা ফল ফুল ও সুগন্ধি গুল্ম লতাপূর্ণ। তাহাদের অনেকগুলি উৎকট রোগের ঔষধি বলিয়া বিখ্যাত। ১০।১২ মাইল পরে টোঙ্গার অশ্ব পরিবর্ত্তিত হয়, এ সুযোগে টোঙ্গা হইতে অবতরণপূর্ব্বক কত পরম সুন্দর কুসুম ও লতা গুল্ম সংগ্রহ করিলাম, তাহাদের মনোহর সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া প্রাণ মোহিত হইয়া গেল। পর্ব্বতের পার্শ্ব দেশে অসংখ্য ডালিম গাছে পরিপক্ক ডালিম ঝুলিতেছে দেখিয়া পাড়িয়া লইতে বড়ই সাধ হইল, অনেক কষ্টে পাহাড়ের উপর উঠিয়া ২।৪টী সংগ্রহ করিলাম। নিবিড় জঙ্গল ভেদ করিয়া বিচিত্র বর্ণ-চিত্রিত বিহগকুল উড়িতেছিল, তাহাদের পালক ঠিক্ চাকচিক্যশালী ময়ূরের ন্যায়। সঙ্কীর্ণ পথে পাশাপাশি প্রায় দুইখানি গাড়ী চলিবার স্থান হয় না। টোঙ্গা দ্রুতগতিতে চলিতে চলিতে পথিমধ্যে গো-শকটের ভিড় দেখিয়া থামিয়া দাঁড়ায়। শত শত গো-শকট নানা জাতীয় সুস্বাদু ফলপূর্ণ। প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক শকট বিদেশে চালান দেওয়া এ দেশে অতি বিস্তীর্ণ লাভজনক ব্যবসায়। এ দেশে আপেল, নাসপাতি, আঙ্গুর প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের মূল্য নাই বলিলেই হয়। দরিদ্র লোকেরা মুড়ি চিড়ার ন্যায় সর্ব্বদা এই সকল ফল চর্ব্বণ করিতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এ দুই দিন কেবল পর্ব্বতের পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে করিতে চলিয়াছি, আজ পর্ব্বত-বাহিনী প্রবলস্রোতা ঝিলাম বা বিতস্তার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যে প্রকার আহ্লাদিত হইলাম বর্ণনীয় নহে। বিতস্তা গিরি-মূল বিধৌত করিয়া ঘোর গর্জ্জনে বন-স্থলী কাঁপাইয়া যে প্রকার রণরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে পঞ্চনদ অভিমুখে ছুটিয়াছে, স্বচক্ষে না দেখিলে তাহার এবং এই পর্ব্বত ও তটিনী-বিরাজিত বনপ্রদেশের অসীম সুষমা পাঠকের হৃদয়ে প্রতিভাত করিবার চেষ্টা করা বৃথা। আমরা এমন মনোহর স্থানের অস্তিত্বও কল্পনা করি নাই। পর্ব্বত ও নদীর সৌন্দর্য্য একত্রে উপভোগ করিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম। সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অতি কষ্টে টোঙ্গা ক্রমশঃ উপরে উঠিতেছে, একটু সরিলেই ৫০০০ হাজার ফিট উচ্চ হইতে টোঙ্গা খানা বিতস্তার প্রবল স্রোতে গড়াইয়া পড়িতে পারে, ভাবিয়া সময়ে সময়ে বিশেষ ভয় হইতে লাগিল। কখন

কখন টোঙ্গা ছাড়িয়া হাঁটিয়া চলিয়া নানা প্রকার ফুল ও সুন্দর পাতা সংগ্রহ করিলাম। সঙ্গে যে সকল আহারীয় ছিল, তদ্দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা কথঞ্চিৎ শান্তি করিয়া ইংরেজ অধিকারে লালিত পালিত হইয়াছি, এখন সেই রাজ্য অতিক্রম করিয়া স্বাধীন হিন্দু রাজার অধীনস্থ কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবেশ করিতেছি চিন্তা করিতে করিতে হৃদয় এমন এক অনির্ব্বচনীয় নূতন ভাবে পূর্ণ হইল যে তাহা কোনও কথায় প্রকাশ করিতে পারি না।

কোহালা একটা ক্ষুদ্র গ্রাম, তথায় পথিকদের আহারাদি দ্রব্যপূর্ণ ২।৪ খানা দোকান ঘর দেখিয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ক্রয় করিলাম। বিতস্তার উপর কাষ্ঠনির্ম্মিত নূতন প্রণালীর সুদৃঢ় সেতু, ইহা কাশ্মীর-রাজের ব্যয়ে প্রস্তুত। প্রতিদিন বাণিজ্যদ্রব্যপূর্ণ শত শত শকট যাতায়াত করিতেছে। আমরা ইংরেজ রাজ্যের সীমাতে অবতরণপূর্ব্বক বিতস্তার অপর তীরস্থিত উচ্চ গিরিমালার অবর্ণনীয় শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে পদব্রজে সেতু পার হইয়া কাশ্মীর মহারাজার রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। বিদেশীয় রাজ্য হইতে কি উদ্দেশ্যে কাশ্মীর রাজ্যে গমন করিতেছি, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া মহারাজার একজন কর্ম্মচারী আমাদের নিকট টোল গ্রহণ পূর্ব্বক পাস লিখিয়া দিলেন। আমরা প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য অনিমেষ-নয়নে দেখিতে দেখিতে চলিলাম। স্থানে স্থানে পর্ব্বতগুলি যেন পথের উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে। বোধ হয় হঠাৎ আমরা চাপা পড়িব। এক একটী পাষাণ খণ্ডের আয়তন দেখিয়া অবাক্ হইলাম। মৃত্তিকাশূন্য পাষাণের উপর নানা বর্ণের কুসুমদাম প্রস্ফুটিত হইয়া কি অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিতেছে, তাহা দেখিয়া শুষ্ক প্রাণ স্রষ্টার অসীম শিল্পকৌশলে ডুবিয়া গেল। এখন হইতে প্রবল-স্রোতা বিতস্তা (ঝিলাম) সঙ্গীর ন্যায় আমাদিগকে পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক ঘোর গর্জ্জনধ্বনিতে ছুটিতেছে। বিতস্তার অপর তীরস্থ পর্ব্বতমালা নানাজাতীয় বিশাল অটবী পরিপূর্ণ। হরিৎ বর্ণের শস্যক্ষেত্র গুলি চিত্রপটের ন্যায় দৃষ্ট হইল। এই সকল পর্ব্বত ভল্লুক, গাড়োল (পার্ব্বতীয় মেষ), মৃগ ও নানাপ্রকার বন্য কুক্কুটে পূর্ণ। দুরারোহ পর্ব্বতশিখরে হরিণ ও মেষযূথ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া তপোবনের দৃশ্য মনে হইল। এই সকল স্থানের অপূর্ব্ব শান্তিপূর্ণ দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্বদেশের কথা ভুলিয়া গেলাম। প্রকাণ্ড পর্ব্বতের দেহ ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গের ন্যায় সঙ্কীর্ণ পথ। আমাদের টোঙ্গা যখন এই পথে প্রথম প্রবেশ করিল, তখন বাস্তবিক বিস্মিত হইয়া গেলাম। দূর হইতে দেখিতেছিলাম পাষাণময় ভীমদর্শন পর্ব্বত দণ্ডায়মান, তাহার মধ্যে যে প্রবেশ-উপযোগী ছিদ্র রহিয়াছে, কোন ক্রমে তাহা অনুমান করা যায় না। ক্রমে ক্রমে আমরা এই প্রকার ৩টী পার্ব্বত্য সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করিয়া

একান্ত ক্লান্ত দেহে ডোমেল নামক স্থানে মহারাজার ডাক বাঙ্গলায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। স্থানটীর রমণীয়তা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। ঠিক্ বিতস্তার উপরেই ডাক বাঙ্গলাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। পার্ব্বতীয়া নির্ঝরিণী বিতস্তা কি ভীষণ বেগে, ভীম গর্জ্জনে চারিদিক্ কম্পিত করিয়া রণরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে নিম্ন-দিকে ছুটিতেছে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বুঝা যায় না। শত শত প্রকাণ্ড উপল খণ্ড নদীগর্ভে বিস্তৃত, তাহাতে বাধা পাইয়া স্থানে স্থানে জলস্রোত ২।৩ ভাগে বিভক্ত হইয়া দ্বিগুণ পরাক্রমের সহিত নিম্ন ভূমির উদ্দেশে বহিয়া চলিয়াছে। দার্জিলিঙে রঞ্জিতের বিশাল স্রোত দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলাম, বিতস্তার ভীম গর্জ্জন ধ্বনি শ্রবণ ও ভীষণ বেগ লক্ষ্য করিয়া সেই পার্ব্বতীয় স্রোতের ভীম মূর্ত্তি স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল। বিতস্তা প্রবাহ লক্ষ্য করিতে করিতে স্নানাদির কথা একবারে ভুলিয়া গেলাম। চারি দিকে উচ্চ গিরিমালা বিরাজিত বাঙ্গলাটী তাহার গর্ভে লুক্কায়িত বলিয়া বোধ হয়। বিতস্তার মহাকল্লোলে শ্রবণ যেন বধির হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও আহারাদিতে অতি-বাহিত করিয়া অপরাহ্ণ সময়ে ভ্রমণে বাহির হইলাম।

কৃষ্ণগঙ্গা নাম্নী অন্য একটী ক্ষুদ্র তটিনী এই স্থলে বিতস্তার স্রোতে মিশিয়াছে। আমরা একটী পরম সুন্দর দোলায়মান সেতু অতিক্রম করিয়া চলিলাম। আমাদের ভারে সেতু বিলক্ষণ দুলিতে লাগিল, বোধ হইল ছিঁড়িয়া যাইবে! যাহাহউক সেতু অতিক্রমপূর্ব্বক আমরা বিতস্তা ও কৃষ্ণ গঙ্গার সম্মিলন স্থানে উপনীত হইলাম। এস্থানের মনোহর শোভা কি বলিয়া বর্ণনা করিব? কৃষ্ণগঙ্গার ঘোর নীল জলস্রোত বিতস্তা প্রবাহের সহিত মিশিয়া কি রমণীয় শোভা বিস্তার করিয়াছে তাহা বুঝাইতে পারি না। আমরা অতি সন্ত-র্পণে অবতরণপূর্ব্বক দুই তটিনীর মিলন স্থলে বৃহৎ উপল খণ্ডের উপর উপবেশন পূর্ব্বক প্রকৃতির ভুবনমোহিনী সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। সায়াহ্নে রবির হেমময় কিরণমালা উন্নত পর্ব্বত-শিরে নিপতিত হওয়াতে এ নির্জ্জন পার্ব্বত্য দেশ যেন বিমল হাসিতে পূর্ণ হইতেছিল। পর্ব্বতের পাদমূল ধৌত করিয়া নদীস্রোত অবিরাম গতিতে চলিতেছে। মনুষ্য-সমাগমশূন্য বনস্থলীতে মধুর কণ্ঠ বিহগকুল হৃদয় খুলিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। এস্থলে সংসারের কোলাহল প্রাণে প্রবেশ করিতে অবসর পায় না। প্রকৃতির ক্রীড়াভূমিতে বসিয়া স্বভাবের মাধুরীপূর্ণ মুখচ্ছবি খানি প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে করিতে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এমন শান্তিপূর্ণ স্থানে আসিয়া অনন্ত দেবের গুণগানে স্বভাবতঃই হৃদয় আপনা হইতেই ডুবিয়া গেল। প্রাতঃস্মরণীয় মুনি ঋষিগণ এই হিমাচলের শৃঙ্গে বসিয়া প্রকৃতির এই অবর্ণনীয় সুষমা দর্শন করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া সাম-

গানে পশুপক্ষীকে পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তুলিতেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। স্থানের মাহাত্ম্য যে শরীর মনের উপর বিশেষভাবে কার্য্য করে, এ স্থলে বসিয়া তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম। অস্তাচলগামী সূর্য্য-কিরণ-বিভাসিত প্রকৃতি-সতীর রমণীয় সৌন্দর্য্য যেন শত গুণে লাবণ্য বিকাশ করিতে লাগিল। প্রদোষের বিরল অন্ধকার চারিদিক্ আচ্ছাদিত করিতেছে দেখিয়া এ স্থানটী ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। শুক্ল পক্ষের প্রথম ভাগ বলিয়া চন্দ্রমা মৃদু শীতল কিরণে জল স্থল পর্ব্বত উজ্জ্বল করিয়া আকাশপটে কি সুন্দর শোভা বিস্তার করিল! আমরাও আর বিলম্ব না করিয়া স্বভাবের অতুলনীয় দৃশ্য হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতগতিতে আমাদের আশ্রয় স্থল ডাক বাঙ্গলাতে আসিয়া পঁহুছিলাম। আসিবার সময়ে যত পারিলাম, সুন্দর সুন্দর উপলখণ্ড ও ফুল পাতা সংগ্রহ করিতে বিস্মৃত হইলাম না। টোঙ্গার ভয়ঙ্কর গতিতে এত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে শরীরের অস্থিগুলি একবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে বোধ হইল। এক একবার অবতরণ করিবার সুযোগ পাইলে যেন প্রাণে বাঁচিয়া যাই। হাঁটিয়া যাওয়া শতগুণে প্রার্থনীয় বোধ হইতে লাগিল। শরীরে এমন বিষম ব্যথা বোধ হইল, যে রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। রাত্রি শেষ না হইতে হইতেই আবার যে টোঙ্গার যাত্রী হইতে হইবে, এই চিন্তায় নিদ্রা যেন দূরে পলায়ন করিল। আমরা সমস্ত বাঙ্গলাটী অধিকার করিয়া ছিলাম, ভ্রমণের পর আসিয়া দেখি ২।৩ জন ইংরেজ ভ্রমণকারী বাঙ্গলায় আশ্রয় লইয়াছেন। পূর্ব্ব-অধিকৃত ঘরগুলির দুই একটী তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইল। সুখের বিষয় যে তাঁহাদের আগমন জন্য কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

সঙ্ঘামিত্রা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাণী অগ্নিমিত্রা ও পরিচারিকাদ্বয়।

রাণী। দেখ্ দেখি পোড়ার মুখী,
কেমন কাজের ছিরি তোর,
আছে সোণার সিন্ধুকেতে
হীরা মতির গয়না মোর;—
আজ আমি সেই গয়না গুলি
আন্‌তে তোরে দিলুম বলে;
তুই কিনা লো ছোট্ট আমার
হাতীর দাঁতের বাক্স খুলে,
নিয়ে এলি কবেকার ছাই
মরচে ধরা অলঙ্কার!
ভেবে চিন্তে পাইনে আমি
তোর নিয়ে কি কর্‌ব আর!

১ম পরিচারিকা। ওমা! তাইত বটে
দেখ্‌ছি রাণী,

আমার কিছু নাইক' দোষ,
বল্‌ছি ভেঙ্গে আসল কথা,
করোনা মোর' পরে রোষ।
এই যে তোমার দাঁড়য়ে পাশে
কালামুখী ময়না দাসী,
আমায় কিনা বল্লে এসে,
ওগো, আমার লক্ষী মাসী,
রাণী বলেছেন গাঁথ্‌তে মোরে
মনের মতন মালা তাঁর ;
তুমি জান গাঁথ্‌তে ভাল
মোহন মালা—চিকণ হার ;
দেওনা গেঁথে ফুলের মালা
আমি করি তোমার কাজ ;
তাইত আমি ময়নার হাতে
চাবির তাড়া দিয়ে আজ,
তুলি কত রকম ফুল
ফুলবাগানে ছুটে গিয়ে
কষ্ট করে মালা গাছি
গেঁথে এখন এলেম নিয়ে।
আমায় কেন বকৃচ রাণী ?
ময়না তোমার দাঁড়য়ে পাশে,
গালাগালি দাওনা তারে
যা তোমার মা মুখে আসে।
২য়া। ওমা কি মিথ্যে কথা !
এসব তুই শিখ্‌লি কোথা ?
বল্‌ দেখি এই ভুঁয়ে নুঁয়ে,
রাণী মা'র চরণ ছুঁয়ে,
কে এনেছে অলঙ্কার ?
কে গেঁথেছে চিকণ হার ?
১মা। কেন ? আমার গরজ কি ?
আমি ত দোষ করিনি।

মল্লে হবে তোরে মর্ত্তে,
আমি যাব শপথ কর্ত্তে ?
২য়া। বটে ! মর্ত্তে হবে মোর ?
বল্‌চি তবে গুণের কথা তোর।
পাড়ায় বেড়াস কোঁদল করে,
আমি দিন রাত্তির ধরে
কত রকম করি কাজ,
পোড়ার মুখি নাইক' লাজ ?
করিস্‌ কেবল কথার ছল,
আজ্‌কে কোথায় ছিলি বল ?
কোথায় বসে গল্প করে,
এখন এসে রাণীর ঘরে,
হাতের কাছে পেলি তাঁর,
পুরাণো সব অলঙ্কার,
চট্‌ করে তাই নিয়ে এলি,
মালা আবার তুই কোথায় পেলি ?
রাণী। আচ্ছা আমি দেখছি এখন,
মালা গেঁথেছিস্‌ তুই বা কেমন ?
(মালা হাতে লইয়া)
আমার মতন রাজবালা
পরে কি এই ছা'য়ের মালা ?
কেবল রাঙা ফুলে গাঁথা,
তোর মুণ্ড আর তোর মাথা।
এক একটি ফুলের পরে
মণি এক একটি করে,
থাকৃত যদি মালায় তোর,
তবে হ'ত যোগ্য মোর।
এমন গাঁথা মালা যার,
জাঁক কেন আর মুখে তার ?
ময়নাত ঠিক্‌ বল্‌ছে খাঁটি,
সব কাজ তুই করিস মাটি,

তবু তোর মুখের কাছে,
দাঁড়ায় কার সাধ্য আছে ?
কাজত দেখি দিনে রাতে,
ঝগড়া শুধু লোকের সাথে ?

১মা। ওমা ! আমি কোথায় যাব ?
আমায় কেন মন্দ ভাব ?
শত্তুর আমার ময়না দাসী,
তোমার কাছে লাগায় আসি
মিথ্যা করে কথা খালি,
তাই শুনে দেও গালাগালি !

রাণী। রাগাস্ না আর মিছে বকে,
দেখ্‌তে পাই সব আপন চোখে।
বৈঠকখানায় মন্ত্রী আছে,
যা দেখি তুই তাঁহার কাছে,
বল্‌গে আমার মুক্তার হার,
পা'ব কদিন পরে আর ?

(প্রথমা পরিচারিকার প্রস্থান)

রাণী। কাল্‌কের সেই শাড়ীখানা
ময়না তুই নিয়ে আয় না।

(ময়নার প্রস্থান ও শাড়ী লইয়া আগমন।)

রাণী। (শাড়ী হাতে লইয়া)—
হাজার টাকা শাড়ীর দাম,
ছি! ছি! একি রাম! রাম!
খালি রেসম খালি সূতা,
নাইক' মণি, নাই মুকুতা।
রাজার মেয়ে আমি রাণী,
এই শাড়ীটা আমায় আনি,
কোন আক্কেলে দিল তাঁতি,
কত বড় বুকের ছাতি ?
কোতয়ালকে বল গিয়ে,
তাঁতিটাকে বেঁধে নিয়ে
কয়েদ খানায় রাখুক, পরে
দেখ্‌বে যা হয় বিচার ক'রে।

(ময়নার প্রস্থান।)

(প্রথমা পরিচারিকার প্রবেশ)।

১মা। মন্ত্রী মশাই তোমার কথা
শুনে পেলেন মনে ব্যথা।
বল্লেন তিনি দুঃখ করে,
দুর্ভিক্ষ এই রাজ্য ভরে;
লোকের ঘরে নাইক অন্ন,
প্রজারা তাই মতিচ্ছন্ন।
দিতে কেহ চায় না কর,
ছেড়ে যাচ্ছে বাড়ী ঘর।
রাজকোষে নাই অর্থ আর,
লক্ষ টাকার মুক্তাহার,
কিন্‌তে এখন গেলে হায়,
রাজ্যের হবে কি উপায় ?

রাণী। মন্ত্রীটা মোর বুড় হয়ে
একেবারে গেছে বয়ে।
লোকেরা সব পায় না খেতে,
আমি যাব কি অন্ন দিতে ?
না দিলে কেউ রাজার দেনা,
আমার যত সেপাই সেনা,
শূলে চড়াবে বেঁধে আনি,
বুঝবে কেমন আমি রাণী।
না খেয়ে লোক মরুক সবে,
মুক্তাহার মোর কিন্‌তে হবে।

(প্রথমা পরিচারিকার প্রস্থান)।

(দ্বিতীয়া পরিচারিকার প্রবেশ)।

দ্বিতীয়া। দেবীমা'র পুরুত এসে,
অনেকক্ষণ বাইরে বসে।

রাণী। তুই যা তারে নিয়ে আয়,
শুন্‌ব সে কি বল্‌তে চায়।
(দ্বিতীয়া পরিচারিকার প্রস্থান ও
পুরোহিতের আগমন)।
পু। (রাণীর হাতে ফুল দিয়া)—
লও দেবী মা'র আশীর্ব্বাদ,
পুরুক তোমার মনসাধ।
দেবীর পায়ে মতি রাখ,
লক্ষ বছর বেঁচে থাক;
বাড়ুক ধন বাড়ুক যশ,
রাজ্য তোমার হ'ক বশ।
জয় রাণী মায়ের জয়,
এমন কি আর রাণী হয়?
লক্ষ্মী যেন মূর্ত্তিমতী
কিম্বা স্বয়ং সরস্বতী।
কিম্বা হবে দেবীর মায়া
দক্ষযজ্ঞে ত্যজি কায়া
ধন ধান্যে পূর্ণ দেশে,
এলেন সতী ছদ্মবেশে।
নইলে কি আর এমন ধারা
মেয়ের কাজ রাজত্ব করা?
এমন শাসন রাজ্যে রাণীর
গরিব দুঃখী ধনী মানীর
কা'রু নাইক শক্তি আর,
মাথা তুল্‌তে একটি বার।
রাজারা সব করে ভয়,
এমন কি আর রাণী হয়?
রাণী। কেন ঠাকুর অমন করে,
বকে বকে যাচ্ছ মরে?
অন্য কথা রাখ তুলে,
তোমার কথা বল খুলে।
পু। আর কি মাথা মুণ্ড বলি,
এসে পড়েছে ঘোর কলি।
চুলোয় যাবে ধর্ম্মকার্য্য,
ম্লেচ্ছ নেবে হিন্দুর রাজ্য।
দেখনা তার চিহ্ন চেয়ে
অশোক রাজার সেয়ানা মেয়ে
আপন বাপের রাজ্য ছেড়ে
সন্ন্যাসিনীর পোষাক পরে,
কেমন যে কি কচ্ছে গুণ
লোক গুলোত হ'ল খুন!
রাণী। মরুক গিয়ে যত লোক,
হঠাৎ তোমার কেন শোক?
পু। শোক না করে রাণী মা আর
হাসি কেমন করে?
দুদিন পরে রাজ্য তোমার
ম্লেচ্ছে যাবে ভরে।
শুনেছে কে এমন আর!
কোটি কোটি দেবতা, তার
একটিও নয় সত্য নাকি সবি মিথ্যে ফাঁকি,
কেমন করে শুনে বল চুপ করে আর থাকি?
সত্য ত্রেতা দ্বাপর ধরে
আসছে লোকে যজ্ঞ করে,
দেবীর কাছে মানুষ ছাগল দিচ্ছে কত বলি,
আজ কিনা সব বন্ধ হবে এম্নি ঘোর কলি!
বামুন—যাহার রাগটি হ'লে
মুখে উঠ্‌ত আগুন জ্বলে,
বৈশ্য কায়েত শূদ্র গুলো পুড়ে হ'ত ছাই,
গাঁয়ের যত মানুষ ডেকে
নাস্তিকেরা বল্‌ছে হেঁকে
সেই বামুনে অন্য জেতে তফাৎ কিছু নাই!
(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

মিঃ সদানন্দ ভট্টাচার্য্য কলিকাতার এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের ছেলে। তাঁহার পিতা ব্যবসা দ্বারা বহুতর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন। সদানন্দের বয়স যখন অল্প, তখনই পিতা তাঁহার তীক্ষ্ণ মনীষা এবং বুদ্ধিমত্তা নিরীক্ষণে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি তখনই সংকল্প করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে সন্তানের শিক্ষা শেষ হইলে তাঁহাকে সুশিক্ষিত করিয়া রাজকীয় উচ্চপদের উপযোগী করিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবেন। তাই সদানন্দের বয়স যখন ১৭ বৎসর, তখন তাহাকে বিলাত প্রেরণের আয়োজন করা হইতেছে। পুত্রও মনের আনন্দে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রস্তুত, তথাপি পিতা মাতা এবং আত্মীয় প্রিয়জনদিগের সহিত বহু দিনের তরে বিচ্ছেদ ঘটিবে ভাবিয়া একটু একটু দুঃখিত হইতেছে। একদিন শুভক্ষণ দেখিয়া সদানন্দ বিলাত যাত্রা করিল। তথায় পঁহুছিয়া অধ্যবসায় এবং যত্নসহকারে অধ্যয়নের পর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। বাড়ীতে পিতৃদেব পুত্রের ভাবী উন্নতির পথ প্রশস্ত হইতেছে দেখিয়া কতই আনন্দিত হইলেন! সদানন্দের ত্রয়োদশবর্ষীয়া গৃহিণীর কথাই ত নাই। তাঁহার স্বামী দেশে প্রত্যাগত হইয়া একটা ভাল হাকিমী পদ পাইবে, সে তাঁহার গৃহিণী হইবে, দাসদাসী সকলে তাহাকে মেম সাহেব বলিয়া সম্বোধন করিবে, এইরূপ আশার কুহকে পড়িয়া কত কল্পনাই করিতেছিল। যথোপযুক্ত সময়ে সদানন্দ দেশে প্রত্যাগত হইয়া দূরবর্ত্তী এক নগরে এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ পাইল; স্ত্রী বালিকা বলিয়া কিছুদিন তাঁহার সঙ্গিনী হইল না। পরে প্রাপ্তবয়স্কা হইলে শাশুড়ী পুত্রবধূকে লইয়া পুত্রের নিকট গমন করিলেন। সদানন্দ ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করিবার সময় ইংরেজ সমাজের দোষগুণ অনেকটা অধিকার করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়, গৃহিণীকে কিরূপ আদরে রক্ষা করিতে হয়, সদানন্দ তাহা বিলক্ষণরূপ অবগত হইয়াছেন। সুতরাং দেশে ফিরিয়া সাহেবদিগের অনুকরণে স্ত্রীকে ষোল আনা মেম সাজাইলেন। তাঁহার স্ত্রীও অভীপ্সিত অবস্থা লাভ করিয়া অহঙ্কারে ও দম্ভে স্ফীত হইতে লাগিলেন। যে কোন লোক তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেই বুঝিতে পারিত যে পদগৌরবের মাদকতায় তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইয়াছে। সামান্য একটু দোষ এবং ত্রুটি পাইলেই দাস-দাসী গুলিকে "ড্যাম শুয়র" বলিয়া গালাগালি করিতেন। তাঁহার অপরিসীম দাম্ভিকতার নিকট বর্ষীয়সী শাশুড়ী ঠাকুরাণীরও নিস্তার ছিল না। যদিও শাশুড়ী ভরণ

পোষণ জন্য তাঁহার স্বামীর মুখাপেক্ষী ছিলেন না, প্রত্যুত পুত্রের অতিরিক্ত ব্যয়ের আংশিক পরিমাণ শ্বশুর মহাশয় প্রেরণ করিতেন, তথাপি পুত্রবধূর ধারণা ছিল যে শাশুড়ী যেন পেটের দায়ে তাঁহার স্বামীর গলগ্রহ হইয়াছেন, তাই মাঝে মাঝে আত্মহারা হইয়া শাশুড়ীর প্রতি কটূক্তি বর্ষণে ত্রুটি করিতেন না। স্বামী স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, সুতরাং পত্নীর তাদৃশ তেজ ও দাম্ভিকতা অম্লানচিত্তে সহ্য করিতেন, একটি বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিতেন না। "চির দিন কখন সমান না যায়" অহঙ্কার পতনের পূর্ব্ব লক্ষণ। গৃহিণীর তাদৃশ দুর্ব্ব্যবহার অধীনস্থ দাস-দাসীর সহ্য হইতে পারে, কিন্তু বিধাতা তাহা সহ্য করিবেন কেন? অলক্ষিত-ভাবে তাঁহার স্বামীর অধঃপতনের একটু সূত্রপাত হইল। বিধাতার লীলাচক্র কিরূপে ঘূর্ণিত হইতেছে, নির্ব্বোধ স্থূলদর্শী মানুষ তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে না। তাই যখন কোন প্রতিকূল অবস্থার তরঙ্গ আসিয়া মানবকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, তখন সে "হা হতোস্মি" করিতে থাকে। সদানন্দের ভাগ্যে প্রায় তাহাই ঘটিল। সদানন্দের দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কোন একটা মোকর্দ্দমার রায়ে পূর্ব্বের তারিখ লিখিয়া দিয়াছিল। বিধির বিপাকবশতঃ তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হইল। কর্ত্তৃ-পক্ষ ছাড়িবার পাত্র নহেন, ঘটনা সত্য কি না তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য তিন জন পদস্থ কর্ম্মচারীর এক কমিটি বসিল। তাঁহারা সকলে একবাক্যে সদা-নন্দকে দোষী স্থিরীকৃত করিয়া উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট প্রদান করেন। কর্ত্তৃপক্ষ অনেক বিবেচনার পর সদানন্দকে অপসৃত করাই স্থির করিলেন। সংবাদ সদানন্দের নিকট পঁহুছিল। তাঁহার সুখচন্দ্র দুর্দ্দৈব রাহু আসিয়া গ্রাস করিল। তাঁহার স্ত্রী যাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই, কালচক্রের বিঘূর্ণনে তাহাই ঘটিল। স্বামী কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইলেন। উৎপীড়িত দাসদাসীগণ গৃহ-কর্ত্রীকে তাদৃশ অপমানিত এবং লাঞ্ছিত দেখিয়া যারপর-নাই প্রফুল্লচিত্ত হইল। বধূমাতা শত অপরাধে অপরাধিনী হইলেও শাশুড়ী প্রতিশোধ লইবার সুযোগ মনে করিলেন না। পুত্রের অবমাননাতে মায়ের অব-মাননা, সন্তানের ক্লেশ মায়ের বক্ষে শেল সম বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে না পারিয়া বধূর সহিত সমবেদনা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দিন যায়, থাকে না। সুখের দিন শীঘ্র শীঘ্র যায়, দুঃখের দিন ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। এইরূপে দুঃখ ও সন্তপ্ত হৃদয় লইয়া সকলে মহানগরীতে প্রত্যাগত হইলেন। সদানন্দ এখন করেন কি? এক দিবস একাকী বসিয়া জীবিকার পন্থা আবিষ্করণে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় এক খ্রীষ্টান পাদরী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সদানন্দ ইউরোপে শিক্ষালাভ করিয়া দেশীয় সাধু সজ্জনের উপর বীতরাগ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অৰ্দ্ধ-সভ্য লোকদিগের ন্যায় তাঁহাদের বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি নাই। ভিক্ষার দ্বারা তাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, অনেকেই নিরক্ষর, বিশেষতঃ দর্শন বিজ্ঞানের কোন ধার ধারেন না, তাই তাঁহারা বিলাত-প্রত্যাগত একজন নব্য যুবকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে অসমর্থ। কিন্তু পাশ্চাত্য ধর্ম্মযাজক যে কারণেই হউক, তদ্বিধ লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন বিচিত্র কি? পাদরি সাহেবকে সমাগত দেখিয়া সদানন্দ যথোচিত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহাকে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। পাদরি সাহেব সদানন্দের কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "আমি আপনার অবসরের কথা শুনেছি। বোধ হয় আপনার প্রতি একটু অবিচার (injustice) করা হইয়াছে।" একজন শ্বেতকায় পুরুষের নিকট হইতে তাদৃশ সহানুভূতি-ব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া সদানন্দের বিমর্ষাকুল প্রাণে একটু উৎসাহের সঞ্চার হইল এবং প্রত্যুত্তরে বলিলেন "হাঁ মহাশয়, তাইত, একজন সাহেব হ'লে হয়ত এতদূর গড়াইত না। এখন কি করি তাই ভাবছি।"

পাদরী। কেন, ইংরেজিতে একটা কথা আছে disappointment, এই কথাটার d বর্ণটার পরিবর্ত্তে h বর্ণটা বসিয়ে দিয়ে পাঠ করুন, দেখিবেন disappointment কথাটা His appointment কথাদ্বয়ে পরিণত হয়। তাইত ঠিক্, যা ঘটিতেছে সে সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রসূত, তখন ইহা হতে অশুভ হ'তে পারে না। কিছুকাল ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করুন, দেখবেন ঈশ্বর যা করেছেন ভালর জন্যই করেছেন।

সদানন্দ।—আপনারা পাদরী মানুষ, আপনারা সব ঘটনাই ভাল ভাবে দেখতে পারেন। আমাদের আর ত সেরূপ বিশ্বাস নেই, তাই বিপদ দেখে তাকে সম্পদ ভাবতে পাচ্ছিনে।

পাদরী।—বিপদ কখন সম্পদ হয় না। বিপদ ভাবাটাই ভুল। একটা ছেলেকে পড়ার জন্য তাড়না করুন, দেখবেন সে ভাব্‌বে বাবাটা বড়ই নিষ্ঠুর, তাই কষ্ট দিয়ে তাঁকে বিপদে ফেলছেন। কিন্তু জ্ঞানী ছেলে আর কি তা ভাববে? সে বলবে তার মত দুষ্ট ছেলের অপরাধের ঐ প্রায়শ্চিত্ত।

সদানন্দ।—এ কথাটা বেশ বুঝলুম, কিন্তু যদি কোন দোষ করে থাকতুম, তা হলে না হয় প্রায়শ্চিত্ত করে খালাস হতুম। তার পর দণ্ডেরও একটা সীমা ত আছে। লঘু পাপে গুরু দণ্ড হলেইত বিচারকর্ত্তার উপর মন চটে যায়, আমার কি তা হয় নাই? আপনিই বলছিলেন আমার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে, তবে আমি ঈশ্বরের ন্যায়পরতার উপর বিশ্বাস রাখি কি করে? হয়ত ঈশ্বর নেই, থাকলেও তিনি উদাসীন, জগতের কোন কাজে হাত দেন না। সদানন্দের শেষের এই উক্তি বিশ্বাসী পাদরীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি সজোরে

টেবিলের উপর চাপড় মারিয়া বলিলেন "ঈশ্বর এখানে আছেন। আপনার উক্তি ঈশ্বর-নিন্দা (blasphemy) মনে করি। আপনি ভবিষ্যতে কোনও বিশ্বাসীর নিকট এরূপ কথা বল্‌বেন না, তার মনে বড় ক্লেশ হবে।

সদানন্দ।—আপনার মনে যে এত কষ্ট হবে তা ভাবি নাই। সরল ভাবে কথাটা বলে ফেলেছি, আমায় মাপ করুন।

পাদরী সাহেব এ বিষয়ে আর অধিক বাক্যব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন। তিনি যে প্রয়োজনে আসিয়াছিলেন, তাহারই অবতারণা করিলেন। পাদরী-দিগের দ্বারা একটী উচ্চশ্রেণীর কলেজ পরিচালিত হইতেছিল। তাঁহারা অপস্থত সদানন্দকে একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার জন্য সাহেবকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধি পাদরীর সহিত বেতনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া সদানন্দ অধ্যাপকতা গ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে তাদৃশ পদ লাভ এবং পাদরীর সহিত কথোপকথন তাঁহার চিত্তে ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা চিন্তা তুলিয়া দিয়াছিল। তিনি মনে মনে প্রশ্ন করিলেন, "ঈশ্বর কি তবে তাঁহারই কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যস্ত ?" অন্তর হইতে যেন একটী দৈববাণী হইল "অপেক্ষা কর, বুঝিতে পারিবে।" কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। সদানন্দ ধৈর্য্যের সহিত ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত রহিয়াছে, তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। উপর্য্যুপরি ঘটনারাজি সদানন্দের হৃদয়ে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী শক্তির তত্ত্ব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার পদচ্যুতি না ঘটিলে তিনি জনহিতকর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিতেন না। দাসত্বের নিগড় তাঁহাকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে দিত না। তিনি ক্রমে ক্রমে দেশের সদনুষ্ঠানের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেশশুদ্ধ লোক তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষণা এবং গুণগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়া দেবতাভ্রমে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি এতাদৃশ কীর্ত্তিস্তম্ভে সমাসীন হইয়া আত্মালোচনা করিতেছেন, এমন সময় তৎপত্নী সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, "বেশত তোমার শাপে বর হয়েছে, ঈশ্বর যা করেন ভালই করেন। এক সময়ে ভাবতুম এটা কথার কথা, এখন দেখছি তা নয়, উহা সত্যি।"

সদানন্দ—আমারও এটা বেশ ধারণা হয়েছে, কিন্তু আজ তোমায় একটা কথা না বলে থাক্‌তে পাচ্ছিনা, আমার যত না কল্যাণ হয়েছে তোমার তার চেয়ে বেশী।

পত্নী—তা কি ক'রে ? কই আমার ত পাঁচ পদ গয়না বাড়েনি, কি দুটা সভা সমিতেতে বড় মেম সাহেব বলে নিমন্ত্রণও হয় নি ?

স্বামী—তোমার চোথ কেবলই বাহিরের

দিকে। একবার ভিতরে চেয়ে দেখছ কি? তোমার এমনি অহঙ্কার বেড়ে গেছিল যে, লোকে তোমার নিকট এগুতেই ভয় পেত, দাস দাসীর ত কথাই নাই। মা বেচারির পার পা'বার যো ছিল না।

পত্নী—হাঁ সে বিষয়ে অনেকটা শুধ-রিয়েছে। এখন অহঙ্কার মনে আসলেই ভয় হয়, না জানি কোন্ বিপদ ঘট্‌বে।

পতি—আমার যা হয়েছে, তাতে আমি যত না সুখী হয়েছি, তোমার যে এতটা পরিবর্ত্তন হয়েছে তাতে তার চেয়ে ঢের বেশী সুখী হয়েছি। ঈশ্বর করুন্ তোমার এ ভাব চিরস্থায়ী হউক। আমার প্রাণেও যেন অহঙ্কার স্থান না পায়, ইহাই নিত্য প্রার্থনা।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারি।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের অসাবধানতা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)।

আমি স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী নহি, প্রত্যুত ইহার পৃষ্ঠপোষক। অনেক বৎসরকাল ব্যাপিয়া ভারতবর্ষের স্ত্রীজাতির সুশিক্ষার ব্যবস্থা জন্য নানা সময়ে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলাম এবং কোন কোন স্থানে বালিকা ও গৃহিণীদিগের জন্য বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিতে যত্নের ত্রুটি করি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমি স্ত্রীশিক্ষার অযথা গোঁড়াও নহি। পুরুষের শিক্ষার সহিত স্ত্রীজাতির শিক্ষার পদ্ধতির স্বতন্ত্রতা আছে এবং সতত এই স্বতন্ত্রতা থাকা আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করি। অনেক সময়ে যাহা পুরুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা নহে। কিন্তু এ দেশে অধুনাতন একপ্রকার "হাল ফ্যাশনের" শিক্ষা দেখা যাইতেছে, যাহার আমরা সম্পূর্ণ বিপক্ষ। এই শিক্ষায় ভারতবর্ষীয় রমণীকুলকে সৌখীন, অলস, পরিশ্রমকাতর এবং ইউরোপীয়-ভাব-সমন্বিত করিয়া নিতান্ত "বিদেশীয় ফ্যাশনের গৃহিণী" করিয়া তুলিতেছে। ব্রাহ্ম, হিন্দু ও মুসলমান নারীসমাজে ইহা অনেকটা কম ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সমাজের বামাদিগের মধ্যে এই দোষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, অন্য সমাজেও ক্রমে প্রবেশ করিবার অসম্ভাবনা কি? এখন অনেকেই বিলাতী অনুকরণ-প্রিয়— "টি কে দে, পি সি ভট্ট, সি সি বানর্জ্জী" নামে প্রসিদ্ধ। পিতা মাতার কত সাধের তারাকিশোর, প্রসন্নকুমার, চারুচন্দ্র প্রভৃতি নামের কি অপব্যবহার! যাঁহারা এইরূপ নাম ধারণ করিতেছেন, তাঁহারা সন্তানদিগের নাম কি আর আস্ত বাঙ্গালা রাখিবেন? ক্রমে পুত্র কন্যাদের নামকরণ সময়েই বিলাতী নামকরণ প্রথা আরব্ধ হইতে পারে। আমি জানি, অনেক বাঙ্গালী খ্রীষ্টানের কন্যা খুব ভাল লেখা পড়া শিখিয়া, যুবতী অবস্থায়,

ফিরিঙ্গি (Eurasian), মেটে ফিরিঙ্গি (East Indian) এবং কেহ কেহ ইউরোপীয়ান বা আমেরিকান পুরুষকে বিবাহ করিয়াছেন। আমেরিকান ও ইউরোপীয়ান বিবাহের সংখ্যা খুব কম। বলুন দেখি, এই বিবাহে কত না ঘোরতর অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে? প্রথমতঃ বাঙ্গালীর সঙ্গে ফিরিঙ্গি, মেটে ফিরিঙ্গির, ইউরোপীয়ান বা আমেরিকানের নানা কারণে সততই অমিল হয়; রূপজ মোহের প্রভাবে প্রথমে মিল থাকিলেও সকল সময়ে মিল থাকা অসম্ভব। দম্পতীর পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ও সহানুভূতি বর্ত্তমান থাকিলেও ভবিষ্যৎ বংশ আর বাঙ্গালী থাকে না; ভবিষ্যৎ বংশে বাঙ্গালীর গন্ধটুকুও পাওয়া যায় না। কন্যা ও পুত্রেরা ইংরাজী খানা খায়, ইংরাজী ভাষা তাহাদের মাতৃভাষা হয় এবং বাঙ্গালী পিতা মাতার বংশে উৎপন্ন হইলেও বাঙ্গালীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখে না। এইরূপ বিবাহে বাঙ্গালী বংশের লোপ হয়, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অধঃপতন ঘটে, বাঙ্গালী সমাজ ঘৃণিত ও হীনবর্ণ হয় এবং বাঙ্গালী জাতির অনেক আশা ভরসা কমিয়া যায়। আমি বলি, একজন শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র এবং সৎকুলজাত বাঙ্গালী খ্রীষ্টান পুরুষকে বিবাহ করিলে কি ক্ষতি ছিল? তাহাতে ধর্ম্মেরও হানি হইত না, সমাজেরও নিয়ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করা হইত না অথচ বাঙ্গালী সমাজের সহিত চিরকাল ঘনিষ্ঠতা থাকিত। এইরূপ বিবাহে এ কুল ও কুল দুই কুলই নষ্ট হয়। বাঙ্গালী সমাজে অকারণে কতকগুলা ফিরিঙ্গি পুত্র ও কন্যার জন্ম দিয়া, না-বাঙ্গালী না-বিলাতী এইরূপ কিম্ভূত কিমাকার জীবের আবির্ভাবের কোনও আবশ্যকতা আছে কি? বাঙ্গালী খ্রীষ্টান রমণীবৃন্দ অনুগ্রহ করিয়া এই কথাটা একবার ভাবিয়া দেখেন, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা ও প্রার্থনা। আমি এরূপ ঘটনা অসংখ্য স্থলে দেখিয়াছি এবং এইরূপ বিবাহে দেশের অনিষ্ট ভিন্ন কথনও ইষ্ট দেখি নাই। ইষ্ট হইবার কথনই সম্ভাবনা নাই বলিয়াই আমার দৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাস। আমি কেবল খ্রীষ্টান রমণীগণকে বলিতেছি তাহা নহে; ব্রাহ্ম, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সমাজে এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা আছে এবং পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা যুবাকালে অসাবধান হইয়া এইরূপ বিবাহে উৎসাহিনী হয়েন, কিন্তু অনেক পরে তাঁহাদিগকে অনুতপ্তা হইতে হয়, ইহা নিশ্চিত সত্য কথা। বলুন দেখি, এইরূপ অসাবধানতা প্রশংসনীয় কি নিন্দনীয়?

কতকগুলি বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের অসাবধানতা এমন নির্ব্বুদ্ধিতা অথবা বালিকাত্বের পরিচায়ক যে, অনেক সময়ে তাহা দেখিয়া দুঃখ হয়, আবার উচ্চ হাস্যও সম্বরণ করা যায় না। বাঙ্গালী খ্রীষ্টান রমণীগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাদের পুত্র কন্যার নাম করণে নিতান্তই অসাবধানতা প্রকাশ

করেন। পুত্রদের নাম রাখেন—মিষ্টর কেকৃশ্‌টন, হেনীংটন, হেজ্‌লার, ডাভেন পোর্ট ইত্যাদি। বাঙ্গালী বংশের বংশধর ও বংশধরী হইয়াও বাঙ্গালা নামগুলি পর্য্যন্ত ইহাঁদের নিকটে হেয় বলিয়া পরিগণিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দু সমাজের মেয়ে পুরুষের মত সুন্দর অর্থযুক্ত এবং সুশ্রাব্য নাম বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনও সমাজে বা দেশে নাই। মনোরঞ্জন, সত্যেন্দ্রনাথ, দেবীপ্রসাদ, দেবদাস, ব্রহ্ম-প্রসাদ, সচ্চিদানন্দ, গৌরহরি, হরিমতি, সুশীলা, হিরণ্ময়ী, দেবদাসী প্রভৃতি নাম-গুলি কেমন বল দেখি!! কেহ কেহ বলিতে পারেন, নামে কিছু আসে যায় কি ? গোলাপ ফুলকে গোলাপ ফুল না বলিলেও তাহার সৌগন্ধ্য যায় না।” এরূপ যুক্তি নিতান্ত অর্ব্বাচীন বালিকার উক্তি। এইরূপ নামকরণের প্রথম ও প্রধান দোষ এই যে, বিলাতী ধবণের নামে এ দেশীয় লোকের সর্ব্বাগ্রেই একটা অশ্রদ্ধার উদয় হয়; প্রাচ্য দেশের লোকের প্রকৃতিই তাহা। বাঙ্গালা কাপড় পরিয়া, বাঙ্গালা খাদ্য খাইয়া, বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা রাখিয়া যদি কেহ আপনাকে সালিশ্‌বরী বা উইলশন্ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা হইলে সমাজের নিকট সে হাস্যাস্পদ হয় কি না ? পূর্ব্ব-দেশীয় লোকের (Oriental people) প্রকৃতি এই যে, তাহারা প্রথমেই নাম ও উপাধি দ্বারা নবাগন্তুক ব্যক্তির প্রবৃত্তি ও সহানুভূতি বুঝিয়া লয়। একজন মুসলমান যদি কৈলাসপতি নাম রাখে, তাহা হইলে মুসলমানেরা তাহাকে কেমন কেমন ভাবে! একজন হিন্দু যদি সম-শুদ্দীন নাম রাখে, হিন্দু তাহা হইলে তাহাকে কেমন কেমন ভাবে!! একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইলেও যদি উইলশন বা থিয়োপিলশ নাম রাখে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে প্রথমতঃ আপন সমাজের বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হই। রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনরেবল কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভরেণ্ড জগন্মোহন ভট্টাচার্য্য, বাবু রাম চন্দ্র বসু প্রভৃতি এ বিষয়ে খ্রীষ্ট সমাজের আদর্শ। অনেক খ্রীষ্টান রমণী বলিতে পারেন, “আমরা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র (বাইবেল) হইতে ছেলে ও মেয়ের নাম রাখি, এ গুলি আমাদের সন্তান সন্ততির শাস্ত্র সঙ্গত (Scriptural names) নাম।” আমি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিতে পারি, Mr. Savage, Mr. Cox, Mr. Fox, Mr. Bull, অথবা মিশ্ হগ্, হেলি, নেলি, এন্‌কিলা, শিরা প্রভৃতি বাইবেলের কোন্ অংশ হইতে গৃহীত হইতেছে বল দেখি ? হে খ্রীষ্টীয় রমণীগণ! তোমরা বাঙ্গালীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা দেশের ভাষা, সাহিত্য, আহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি যদি পরিত্যাগ কর, যদি বাঙ্গালা নামগুলি পর্য্যন্ত ঘৃণা কর, তাহা হইলে তোমাদের উপর আমরা কিছু আশা বা ভরসা করিতে পারি কি? তোমাদের দেশহিতৈষিতা, মুখের কথা

মাত্র, হৃদয়ের জিনিষ নহে। তোমরা ধর্ম্মে স্বতন্ত্র হইয়াছ বটে, কিন্তু দেশ হইতে স্বতন্ত্র ত হও নাই! তবে এ বিদেশীয় ভাব কেন? বাল্যকাল হইতেই ছেলে মেয়েকে এমন বিদেশীয় করিয়া তুলিতেছ কেন? সমস্ত দেশের ও জাতির সহিত স্বতন্ত্র হইতেছ কেন? তোমাদের এই অসাবধানতা নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয়?

তাহার পরে আর এক কথা। যাহারা দেশী নাম রাখেন, তাঁহাদের আবার দেশী নামগুলি বিলাতী রংএ গিল্‌টি না করিয়া ছাড়েন না। ঘোষ বাবু হইলেন Mr. Gheuse, সেন বাবু হইলেন Mr. Shanne, রায় বাবু হইলেন মিষ্টর রে, হরকালী বাবু হইলেন Mr. Kelly ইত্যাদি। কি আশ্চর্য্য!! কি আশ্চর্য্য!! এতদূর অসাবধানতা কি ভাল?

স্ত্রীলোকের ছেলে মেয়ের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চরিত্র প্রভৃতির শ্রীবৃদ্ধি বা অধোগতির অনেকটা মৌলিক কারণ তাহার মাতা। অতএব সকল বিষয়েই বাঙ্গালী রমণীকে সাবধানা হইতে হইবে এবং হওয়া কর্ত্তব্য। আমার কথাগুলি পাঠিকা মহাশয়াগণ মনোযোগ সহকারে আলোচনা করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বউ কথা কও।

"Ye ask not and ye receive not; ask ye and it shall be given unto you."

New Testament.

জ্যৈষ্ঠ মাসের একদিন মেদিনীপুরের গোপগিরিতে একাকী উপবেশন করিয়া কোনও প্রয়োজনীয় বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলাম। সেই নিভৃত স্থলে আমার সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে অথবা অল্প দূরে কোনও মনুষ্যের সমাগম ছিল না। গোপগিরির নির্জ্জন স্থান গম্ভীরতা ও নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ ছিল; অকস্মাৎ সেই সুন্দর গম্ভীরতা ও নিস্তব্ধতার ব্যতিক্রম ঘটিল। আমি অন্তর্জগৎ হইতে আবার বহির্জগতে দৃষ্টিপাত করিলাম। শুনিলাম, অকস্মাৎ কে যেন শূন্য হইতে 'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও' বলিয়া চিৎকার করিতেছে। শূন্যের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, অনন্ত নীল আকাশের কোলে উড়িয়া উড়িয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, খেলিয়া খেলিয়া সুমধুর স্বরে একটী পাখী ডাকিতেছে 'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও।' পাখীর সুমধুর তানলয়-সমন্বিত ঝঙ্কারে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া গেল, শ্রোতার হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল, সেই নীল আকাশের কোলে স্বর্গের সুমধুর সংগীত-লহরী ছুটিল, এবং সেই বিমানবিহারী বিচিত্র বিহঙ্গ ক্লান্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ

ডাকিতে লাগিল 'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও।' হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "বল দেখি এই ক্ষুদ্র পাখী বউ কথা কও, বউ কথা কও বলিয়া কেন পুনঃ পুনঃ চিৎকার করে?" হৃদয় উত্তর দিল "এই বিমানবিহারী বিহঙ্গ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও চরিত্রে মহান্। এই ক্ষুদ্র পাখী ভারতের বামাজাতির অন্যতম প্রধান শিক্ষক।" হৃদয়কে কহিলাম "তবে কি ভারতরমণী-বৃন্দকে বউ নামে সম্বোধন করিয়া এই বিচিত্র বিহঙ্গবর 'কথা কও' 'কথা কও' বলিয়া মধুর ঝঙ্কার দিতেছে?" প্রশ্ন শুনিয়া হৃদয় যেন ঝটিতি উত্তর দিল 'হাঁ, তুমি ঠিক্ বুঝিয়াছ।' তখন এই নূতন বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলাম, পাখীর ঐই সুস্বর-সমন্বিত ঝঙ্কার আমাদের স্ত্রীলোকদিগের কল্যাণের জন্য তাহার স্বর্গীয় কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হয়; কিন্তু কয়জন ভারতরমণী বা বঙ্গবামা তাহা বুঝিতে পারে? পাখী এই কূজন দ্বারা রমণীকুলকে একটী মহা অধঃপতন হইতে অনবরত সাবধান করিয়া দিতেছে, কিন্তু কয়জন স্ত্রীলোক এই সাবধানতা-ব্যঞ্জক সুস্বরের অর্থ বুঝিয়াছে? ভগিনি! আইস, আমরা ঐ পাখীর 'বউ কথা কও' বুলীর অর্থ আজি বুঝিতে চেষ্টা করি। ভারতের নারীজাতির পক্ষে বউ কথা কও পাখীর ন্যায় আর কোনও উপকারী পাখী আছে কি না জানি না।

নিস্তব্ধতা অথবা মৌনী হইয়া থাকা কিম্বা মূক ভাব অবলম্বন করা অনেক সময়ে প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় বটে, বিশেষতঃ ভারতের স্ত্রীজাতির স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতা তাহাদের অধিকতর নিস্তব্ধতার অন্যতম কারণ; কিন্তু নিস্তব্ধতা অনেক সময়ে প্রয়োজন ও প্রশংসার বিষয় হইলেও ইহা সকল সময়ে প্রশংসার বিষয় বলিয়া গণ্য হয় না এবং হইতে পারে না। মৌনব্রতাবলম্বিনী ব্রহ্মচারিণী-দিগকে আর্য্য ঋষিগণ অধিক বাক্যব্যয় করিতে নিষেধ করিয়া সামান্য মাত্র কথা বলিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মহর্ষিগণ কর্তৃক ইহাও লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, "সাধু সংকল্পের সিদ্ধির জন্য অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হইলে, মৌনব্রতাবলম্বিনী ব্রহ্মচারিণী বা সন্ন্যাসিনী-গণও অধিক বাক্যব্যয় করিতে পারেন।" মহাত্মা পল খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোক-দিগকে গির্জ্জায় ধর্ম্মাধিকরণের অধিকার হইতে বঞ্চিতা করিয়া বলিয়াছেন "গির্জ্জার মধ্যে পুরোহিতের কার্য্য করা পুরুষেরই কর্ত্তব্য, স্ত্রীলোকের নহে। স্ত্রীলোকেরা যেন পাদ্রী বা প্রচারকের কার্য্য না করে।" কিন্তু উপসংহারে সাধু পল ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, "সদ্বাক্য প্রয়োগ জন্য তাঁহাদের (স্ত্রীলোকদিগের) মুখ সতত যেন প্রস্তুত থাকে, কারণ সদ্বাক্য দ্বারাই মুখ পবিত্র হয়। অতএব সতত সৎ কথা কও।" বাঙ্গালা প্রবাদে অধিক বাক্যব্যয়িনী স্ত্রীলোকদিগের নিন্দা আছে,—

"খড়ম পেয়ে, চিরণদাঁতি, ট্যাঁস ট্যাঁসানে কথা।
গৃহলক্ষ্মী ছেড়ে যায়, হেন নারী যথা॥"

কিন্তু শ্রীমন্মনু মহারাজ বলিয়াছেন, "হিংস্রা চাপ্রিয়বাদিনী" অর্থাৎ যে স্ত্রীলোক হিংস্রকা এবং সতত অপ্রিয় কথা বলে, সেই স্ত্রীলোকই অলক্ষ্মী। তাহা হইলে বেশ বুঝা যাইতেছে, স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা হইলেও সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য—পবিত্র উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য—অধিক বাক্যব্যয় করা অথবা 'কথা কহা' তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। ঈশ্বর জিহ্বা দিয়াছেন কথা কহিবার জন্য, কথা না কহিলে সংসার চলিতে পারে কি? আজি কালি অনেক সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্ম-প্রচারক, লেখক এবং পণ্ডিতেরা স্ত্রীজাতিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আসন, স্বতন্ত্র পদবী, স্বতন্ত্র কার্য্য এবং স্বতন্ত্র স্থান দান করিয়া ভারতরমণীগণকে সম্পূর্ণরূপে "পর্দানশিনী" অথবা "নিস্তব্ধা" থাকিতে পরামর্শ দিতেছেন। এই দলের লোকের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অধিক এবং হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রচারকের সংখ্যা অল্প নহে। আমি নিজে হিন্দু; এখনকার কালের যুবক হিন্দু নহি, কিন্তু প্রাচীন কালের লোক বলিয়া স্ত্রীজাতির ধর্ম্মসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত, শাস্ত্রসঙ্গত ও সময়সঙ্গত অধিকার হইতে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিতা করা আমি ঘোর অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করি। এই অধিকার প্রাপ্তির জন্য স্ত্রীজাতি যদি "কথা কয়" তাহা হইলে সে কথা আমরা শুনিতে বাধ্য। দেশের সমাজ এবং রাজাও তাহা শ্রবণ করিতে বাধ্য। আমার বোধ হয়, ভারত-বধূদিগের কথা কহিবার সময় আসিয়াছে, তাহাতেই ঐ পাখী উড়িয়া উড়িয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সুষুপ্ত ভারত-রমণীকুলকে জাগাইয়া জাগাইয়া, চিৎকার স্বরে বলিতেছে, "বউ কথা কও" "বউ কথা কও।" দ্বারে আঘাত না করিলে দ্বার কেহ খুলে কি? কথা না কহিলে কেহ উত্তর দেয় কি? "বোবার শত্রু নাই" বটে, কিন্তু বোবার যত অসুবিধা ও অনিষ্ট হয়, একজন জিহ্বাযুক্ত ব্যক্তির তত হয় না, সুতরাং "Knock, it shall be opened unto you; Ask, ye shall receive" এই কথা সতত স্মরণ রাখা উচিত। ভারতরমণী! তুমি কথা কহিতে শিখ নাই, তাহাতেই তোমার এই অবনতি। তাহাতেই ঐ আকাশের পাখী ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তোমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক তোমাকে শিখাইয়া দিতেছে "বউ কথা কও" "বউ কথা কও।"

এমন একদিন ছিল, যে দিনে ভারত-রমণী কার্য্যেও যেমন পটু, জিহ্বাতেও তেমনি পটু ছিলেন। তরবারী দ্বারা কার্য্যোদ্ধার এবং জিহ্বা দ্বারা কার্য্যোদ্ধার এই বিষয়ে তাঁহারা সুদক্ষা ছিলেন। তাঁহারা কেমন করিয়া কথা কহিতে হয়, তাহা জানিতেন। এখনকার কালে স্ত্রীলোকেরা কথা কন না এবং কথা কহিতেও জানেন

না, তাহাতেই এই দুর্দ্দশা। মনে কর, স্ত্রীলোকের শিক্ষা (Female education) লইয়া বঙ্গদেশে—সমগ্র ভারতবর্ষে—কতই না প্রবল আন্দোলন হইয়া গেল, কিন্তু ফল কি হইল? সমগ্র জগতের—বিশেষতঃ ভারতের পুরুষ জাতি এমনই ঘোর স্বার্থপর যে, যে স্থানে পুরুষের সামান্য স্বার্থের ও ব্যাঘাত দেখিতে পাইয়াছে, সেই স্থানেই স্ত্রীলোকের অধিকার হইতে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিতা করিতে ত্রুটি করে নাই। বঙ্গ দেশে অনেকে অযথা যুক্তি এবং অন্যায় শাস্ত্রার্থ দ্বারা স্ত্রীজাতিকে সুশিক্ষা হইতে স্বতন্ত্রা রাখিতে যত্ন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, স্ত্রীলোকেরা যাহাতে কিছু বলিতে সমর্থা না হয় অথবা তাহাদের পক্ষের লোকেরা কথাটী পর্য্যন্ত কহিতে না পারে, তজ্জন্য নানা অযথা উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। পুরুষের এইরূপ ব্যবহারে স্ত্রীজাতি নিস্তব্ধা; পুরুষের ভয়প্রদর্শক বচনে স্ত্রীজাতি ভীতা এবং দেশের এই আন্দোলনে তাহারা কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়া। স্ত্রীজাতির এই অবস্থা দেখিয়া স্বর্গের পাখী উর্দ্ধমুখ হইয়া চিৎকার স্বরে বলিতেছে "ভারতবধূ! কথা কও, কথা কও; পুরুষের ভ্রূকুটিতে ভীতা হইও না; গৃহস্থের—দেশের—সমাজের—সমগ্র পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধির ভার তোমার উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহা হইলে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না।" পাখী উড়িয়া উড়িয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেছে "বউ কথা কও, বউ কথা কও।"

ভাষা, সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য অথবা গৃহস্থালীর কার্য্য যাহা লইয়াই বিবেচনা করা যাউক, পুরুষেরা যদি স্ত্রীলোকগণকে সকল প্রকার ন্যায়-সঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে, তবে স্ত্রীলোকেরা তাহাদের যথোপযুক্ত অধিকার প্রাপ্তির জন্য কথা কহিবে না কেন? আমি স্বীকার করি, অনেক কাজ কেবল পুরুষের পক্ষেই শোভা পায়, আর অনেকগুলি কার্য্য কেবল স্ত্রী-সমাজেরই পক্ষে উপযুক্ত; কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র ভারত—স্ত্রীসমাজকে অশিক্ষিত রাখিয়া সমগ্র দেশটাকে "গরুর গোয়াল" রূপে পরিণত করা কি শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও যুক্তির অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়? যতটুকু পুরুষের প্রাপ্য, ততটুকু পুরুষ পাইবে; যতটুকু নারীর প্রাপ্য, ততটুকু সে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে; তাহাকে বঞ্চিতা করা কাহার সাধ্য? কাহারও সাধ্য নাই বলিয়া আকাশের পাখী বলিতেছে "বউ কথা কও" "বউ কথা কও।" মহামতি যিশু বলিয়াছিলেন, "আমার শিষ্যেরা যদি কথা কহিতে না পায়, তাহা হইলে সম্মুখস্থ ঐ প্রস্তরখণ্ড ভেদ করিয়া কথা বাহির হইবে।" আমারও বিশ্বাস এই যে, হে স্বার্থপর পুরুষ-পুঙ্গবগণ! যদি তোমরা বঙ্গের বামা-কুলের মুখ বন্ধ কর—যদি তোমরা স্বার্থান্ধ হইয়া তাহাদের অধিকার হইতে তাহা-দিগকে বঞ্চিতা রাখিয়া দাও—তাহা হইলে বাঙ্গালার গৃহের দেওয়ালে, গঙ্গার

তরঙ্গে, দার্জিলিং পাহাড়ের পাথরে এবং বৃক্ষের পল্লবের শন্ শন্ সমীরণে রমণীর কথা শুনিতে পাইবে। রমণীর এক বিন্দু চক্ষুর জলে যে মহাতরঙ্গায়িত মহাসাগরের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে সমগ্র পুরুষ সমাজ সারমেয়-তাড়িত মেষশাবকের ন্যায় দলে দলে ডুবিয়া মরিবে। আর হে রমণীবৃন্দ! তোমরা যদি (যেখানে কথার প্রয়োজন, সেখানে) কথা না কও, তাহা হইলে তোমরাও ঈশ্বরের আজ্ঞার লঙ্ঘনকারিণী হইবে। তোমরা চাও না, তাই পাও না; কেহ কেহ চায়, কিন্তু তাহারা কেমন করিয়া চাহিতে হয়, তাহা জানে না। তোমরা কথা কহিতে শিক্ষা কর, চাহিতে শিক্ষা কর। তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই পাখী বলিতেছে "বউ কথা কও, বউ কথা কও।"

তাহার পরে শেষ কথা, বউ কথা কও পাখীর শেষ কথা। চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং চিন্তা বুদ্ধি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি আমাদের প্রধান সহায় স্বরূপ হইলেও, বিশ্বস্রষ্টা দয়াময় ভগবান্ আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায় এবং সমুদয় সাধুসংকল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক। সেই প্রেমের আকর, গুণের সাগর, কল্যাণময় পিতার নিকটে মনের কথা, সভক্তি প্রার্থনা দ্বারা কথা কহিতে পারা বড়ই সৌভাগ্যের। যে ব্যক্তি হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ খুলিয়া সেই নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ভগবানের সহিত কথা কহিতে পারেন, তাঁহার মানব-জন্ম সার্থক; আমি (অধম) তাঁহার পবিত্র পাদপদ্মে সভক্তি প্রণাম করি। প্রাচীনা ভারতের স্ত্রীজাতি ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত কথা কহিতে জানিতেন। এখনকার স্ত্রীলোকেরা আবার তেমন প্রার্থনাপরায়ণা, তেমন ব্রহ্মবাদিনী হইবেন কি? হে রমণীগণ! তোমরা ভগবানের সহিত মনঃপ্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে শিখ, সেই চিন্তাহারী দুঃখ-বারী ভক্তবৎসল ভগবানের উপর ভরসা কর, তাঁহাতে তন্ময়া হও, তোমাদের দুঃখের দিন অবসান হইবে। আবার এই তামসী রজনীতে আশার আনন্দময় আলোক আসিয়া ইহ জীবনকে সুখকর ও পবিত্র এবং পরজীবনকে "সত্যং শিবং সুন্দরং"—রাজ্যের অন্তর্ভূত করিয়া দিবে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

তীর্থ যাত্রা।*

প্রথম পরিচ্ছেদ—সৌন্দর্য্য শিক্ষা।

মণিমালা ব্রাহ্মণকন্যা পরম রূপসী, অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম, সন্তানাদি হয় নাই। প্রতিবেশিনী প্রবীণা গৃহিণীরা বলেন, মণিমালা বুঝি বন্ধ্যা, আর ত বয়স নাই।

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

আজকাল চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যে যদি কেহ জননীপদে অধিষ্ঠিতা না হইতে পারে, তাহা হইলে বিধাতা তাহাকে সন্তানের মুখ দর্শন করিতে দেন না।

মণিমালার স্বামী রঘুনাথ ভট্ট জাতিতে ব্রাহ্মণ, সামান্য বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন। শৈশবেই পিতৃহীন হওয়াতে বিধবা মাতা নাবালক পুত্রটিকে কষ্টে সৃষ্টে, স্বামীর বিষয় সম্পত্তি যৎসামান্য যাহা ছিল, বিক্রয় করিয়া মানুষ করিয়াছেন ও জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী লেখা পড়া শিখাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। তিনি পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়া থাকেন। রঘুনাথ পূর্ণবয়স্ক পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবক, শাহারণপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামে বাস করেন। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে কয়েক ঘর হিন্দু প্রজা ছাড়া অধিকাংশ মুসলমান। গ্রামের জমীদারও জাতিতে মুসলমান। বৃদ্ধ জমীদার সম্প্রতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র যুবকপুত্র মীর মহম্মদ এখন সর্ব্বে সর্ব্বা। প্রথম যৌবনে বিষয়ের অধিকারী হইয়াছেন। মীর মহম্মদ অতি যথেচ্ছাচারী, উদ্ধত ও দুশ্চরিত্র হইয়া পড়িয়াছেন। গ্রামের বসতবাটীতে বাস করা তাঁহার পক্ষে সুখসাধ্য নহে। মাসের মধ্যে অধিকাংশ দিন রাত্রি প্রমোদ-ভবনে বাস করেন। ইঁহার উদ্যানের সন্নিকটেই ব্রাহ্মণ রঘুনাথের বাসস্থান। দরিদ্রের পৈতৃক বাটীখানি ছাড়া আর কিছুই সম্পত্তি নাই। কেবল কতকগুলি জীর্ণ শীর্ণ সংস্কৃত পুঁথি আর শালগ্রাম শিলা কয়টি সম্বল। এতদ্ব্যতীত সামান্য তৈজস-পত্র দ্বারা ক্ষুদ্র গৃহখানি সজ্জিত ছিল। বহু মূল্যের ধনের মধ্যে শ্রীমতী মণিমালার অতুল রূপবিভা সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহ সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সৌন্দর্য্যরশ্মি মেঘ-অন্তরিত সূর্য্যের ন্যায় সকল পল্লীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দরিদ্রের গৃহে রূপসী স্ত্রী যেন মহা শঙ্কাময়ী, বিশেষতঃ যবনাধিকৃত স্থানে বাস আরও ভীতিজনক। মণিমালার রূপ লইয়া তাহার স্বামী ও শ্বশ্রূ বিব্রত। সে অপ্রার্থিত রূপরাশি লইয়া যে কোথায় ঢাকিয়া রাখিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। সেই অযত্ন-সম্ভূত লাবণ্য আবার আপনা আপনি বিকশিত হইতে লাগিল। মণিমালা কখনও কেশ বিন্যাস বা অঙ্গরাগে যত্নবতী নহে। ভুলিয়াও কখন নিজ পুরাতন ভগ্ন মুকুরখানি লইয়া সেই প্রফুল্লকমলবৎ মুখখানি দেখিতে পায় না। স্বামী রঘুনাথের এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা ছিল। ব্রাহ্মণ-কুমার সর্ব্বদাই ভীত, শঙ্কিত ও উদ্বেলিত-চিত্ত—বিধাতাকে এই অবিধির জন্য বার বার মনে মনে তিরস্কার করিত। তাহার রূপবতী ভার্য্যাই যেন উন্নতির পথে কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে। স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখিয়া এক পা বাহিরে যজমানী করিতে গেলে তাহার অন্তঃকরণটি পিছনে পড়িয়া থাকিত। ভয়াকুল মন, উদ্বেগপূর্ণ নয়ন যেন ঘরেই রহিয়া যাইত। যাহা হউক,

বৃদ্ধ মাতাকে আশ্রয় করিয়া কোন মতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

মণিমালা গৃহস্থালীর সকল কার্য্যই করিয়া থাকে, কেবল বাটীর বাহির হইয়া জল আনা অগত্যা বৃদ্ধা শাশুড়ীর দ্বারা করাইতে হয়। এইরূপে সুখে দুঃখে দিন কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু দিনের পর দিন ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অগ্রসর হইল।

রঘুনাথের মাতা একদিন জল আনিতে গিয়া ধামাল খালের ধারে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন। বৃদ্ধ বয়সে সহজেই বল শক্তির অভাব, তাহার উপরে গুরু পরিশ্রমে, পুষ্টিকর আহারের অনাটনে রঘুনাথের মাতার শরীর অধিকতর দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, উঠিবার শক্তি নাই। এ দিকে মণিমালা শ্বশ্রূর আগমন-কাল উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে পথ পানে তাকাইয়া আছেন, কেন এত বিলম্ব হইল—তিনি ত তাহাকে একা ফেলিয়া কোন খানেই তিলার্দ্ধ বিলম্ব করেন না। পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় দরজা জানালা দিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিয়া নিরস্ত হইতেছেন। দৈবের ঘটনা রঘুনাথও আজ এ সময় বাড়ী নাই। তিনি আজ গ্রামস্থ জনৈক বণিক্‌কন্যার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইতে গিয়াছেন। বিবাহটা গোধূলি লগ্নে হইবে। পুরোহিতের ইচ্ছা কোন মতে দুই হাত এক করিয়াই বিদায় লন। এইরূপে তিনিও সেখানে ব্যস্ত অন্তঃকরণে কাটাইতেছেন।

বৃদ্ধা অনেক চেষ্টায় কষ্টে স্থষ্টে উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু বামপদে এমন আঘাত লাগিয়াছে যে, উঠিয়া স্বয়ং বাড়ী যাইবার ক্ষমতা নাই। বেদনায় কাতর-চিত্ত হইয়াও বৃদ্ধার হৃদয়ে পুত্রবধূর গৃহে একাকী থাকার চিন্তা তিরোহিত হয় নাই।

ক্রমে সন্ধ্যার মলিন ছায়ায় আকাশ ধূসরবর্ণ হইল। সমস্ত দিবসের পরে পৃথিবী একবার বিশ্রামার্থ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ধামাল খালের দিকে যেখানে রঘুনাথের মাতা জল আনিতে গিয়াছিলেন। সেখানে বড় একটা লোক জনের সমাগম হয় না, কেবল মাঝে মাঝে দু এক খানি শটকারোহী সন্ধ্যা-সমীরণ সেবন করিতে যাইতেছে। ক্রমান্বয়ে দুই তিন খানি ফেটিং বায়ুবেগে চলিয়া গেল। আর কাহারও সাড়া শব্দ নাই। বৃদ্ধা প্রতিক্ষণেই জন মানবের সাহায্যের আশায় প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু সংসারের নিয়ম—ইচ্ছামত ও প্রয়োজনমত সকল বস্তু লাভ করা দুর্লভ। সন্ধ্যার ধূসর আলোক আঁধারে পরিণত হইয়া আসিল, এমন সময়ে ঐ খালের ধার দিয়া একটি বালক ছুটিয়া যাইতেছিল। বৃদ্ধা তাহাকে কাতর-বাক্যে অনুনয় করিয়া নিজ অবস্থা জানাইল। বালকের কোমল হৃদয় বৃদ্ধার ক্রন্দনে দ্রবীভূত হইল। সে বাটী গিয়া নিজ পিতা ও ভ্রাতাকে সকল সমাচার জানাইল। বালকের পিতা রঘুনাথের মাতার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া চারিজন

বাহক লইয়া উহাকে বহন করিয়া বাটীতে উপনীত হইল।

মণিমালা শ্বশ্রূকে এরূপ ভাবে আনিতে দেখিয়া অতি ভয়ব্যাকুলমনে বহির্ব্বাটীর দ্বারে আসিয়া পড়িলেন; কিন্তু সম্মুখে দুইজন অপরিচিত নবাগত ব্যক্তিকে দেখিয়া সরিয়া গেলেন। আগন্তুকেরা এই ক্ষুদ্র বাটীখানিতে এইরূপ মণিময় ঐশ্বর্য্যের প্রভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশে পূর্ণ-চন্দ্রের রশ্মি বিকীর্ণ হইতে দেখিয়া তাহাদের প্রাণে বড়ই খট্‌কা লাগিল। সৌন্দর্য্যের কি মোহিনী শক্তি! যতই বিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ চক্ষু হউক না কেন, আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। জগতে আর কোনও বস্তু কি এরূপ আছে যাহা একবার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে অমনি মানব-মন জয় করিয়া ফেলে? সেই বালক ও তাহার পিতা বৃদ্ধাকে যথাস্থানে রাখিয়া মণিমালার মুগ্ধকারী সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—অনুরাগ।

খালের অপর পার্শ্বে বৃহৎ উদ্যান। তন্মধ্যে প্রকাণ্ড সুসজ্জিত অট্টালিকার একটি প্রকোষ্ঠে সুন্দর মেহগিনী কাষ্ঠের পালঙ্কে যুবক মীর মহম্মদ অর্দ্ধ-শায়িত—স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত দীর্ঘ আলবোলায় ধূম-পানে নিযুক্ত। লোহিত বর্ণের পায়জামা ও আঙ্গারাখা এবং উষ্ণীষধারী বালক ভৃত্য পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

নূতন বিষয়ভোগ-বাসনায় জমীদার-পুত্রের চিত্ত অতীব প্রমত্ত। মস্তিষ্ক নিত্য নব নব সুখ কল্পনায় ব্যাপৃত। চারু নেত্র-যুগল ঢুলু ঢুলু, কখন মুদ্রিত কখন বা উন্মীলিত। এইরূপে সুখের রজনী অল্পে অল্পে সমাগত হইতেছে। উত্তেজিত-প্রাণ মীর মহম্মদের হৃদয়ে অনন্ত তৃষ্ণা, সর্ব্বদা শুষ্ক মুখ, শুষ্ক বুক। জগতে ভোগের এই মহিমা—উহার আর সীমা নাই, তৃপ্তি নাই। বালক ভৃত্যকে শীতল পানীয় আনিতে বলিলে সে তখনি যথাবৎ আজ্ঞা পালন করিল, পরে প্রভুর আদেশ মত পদসেবায় নিযুক্ত হইল। মীর মহম্মদ কহিলেন "আজ তোর বাটী হইতে আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?" বালক কহিল "হুজুর আজ বড় বিপদ ঘটিয়াছিল। একটি বৃদ্ধা এই খালের ধারে পড়িয়াছিল, তাহাকে অতি কষ্টে তাহার বাসায় পৌঁছাইয়া দিতে হইল। সে বোধ হয় রঘুনাথ ভট্টের মাতা। তাহার গৃহে একটি যে বিবি দেখিলাম তা আর কি বলিব! হুজুর আপনার অন্দরেও তেমন একটি তসবীর নাই" বলিয়া বালক চুপ করিল। মীর মহম্মদের সুপ্ত হৃদয় জাগিয়া উঠিল, ক্ষণেকের জন্য মদিরার মোহ অপনোদিত হইলে তিনি সেই অনিন্দিত কল্পিত রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। যদিও তখন বাহিরে কিছু প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু হৃদয়ে দুরাশা বর্ত্তিকা জ্বলিয়া উঠিল। বারংবার বালকের নিকট সেই আখ্যায়িকা নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন। এইরূপে

কয়েক দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। সময়ের বিবর্ত্তনে যুবার হৃদয়ে সে রূপ-লালসা নিবৃত্ত না হইয়া প্রবল হইতে লাগিল। হৃদয়-নিহিত সেই রূপ-বীজ আসক্তি বারির সেচনে অঙ্কুর প্রসব করিল। দিবা নিশি মনের সহিত সংগ্রাম চলিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার প্রিয় বয়স্য নফর দাসকে নিজ চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ অবগত করাইলেন। নফর কহিল "সে যে হিঁদুর মেয়ে সেই যা একটা কথা, নইলে কতক্ষণ লাগে; তবু আমার চেষ্টার কসুর করিব না। এক কথায় বদ্যির হাত-যশ, আর রোগীর কপাল।" এই বলিয়া বন্ধুকে সান্ত্বনা দিল ও সেই দিন হইতে নানা ফন্দি ফিকির খাটাইতে লাগিল, কিরূপে হরিণীকে জালে ফেলিবে।

নফর প্রত্যহ রঘুনাথের বাটীর নিকট দিয়া যাতায়াত করে, অবসরমত এক দিন স্বয়ং রঘুনাথের নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহার বৃদ্ধ মাতার কুশল জিজ্ঞাসা করিল ও অতি সুহৃদ্-ভাবে তাঁহার তত্ত্বাবধানের জন্য ঔৎসুক্য দেখাইতে লাগিল। কখন কখন স্বীয় সহধর্ম্মিণী মঙ্গলা ঠাকুরাণীকেও পাঠাইয়া দিত। মণিমালা প্রথম প্রথম মঙ্গলা ঠাকুরাণীকে দেখিয়া ঘোমটা দিতেন ও কথা কহিতেন না, কিন্তু সদা সর্ব্বদা যাতায়াতে অগত্যা সে লজ্জাটুকু সরাইয়া রাখিতে হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিন মাস গত হইয়া গেল, বৃদ্ধার অবস্থা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িল। বর্ষার প্রারম্ভেই উঁহার জীবন-রবি কালমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। প্রাণের প্রাণ পুত্রবধূ ও পুত্রটির মায়া ছিন্ন করিয়া জননী অন্তর্হিতা হইলেন। রঘুনাথ মাতৃ-হীন হইয়া বিষম বিপদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আজি রঘুনাথ জগতে অসহায়, নিঃস্ব ও দুঃস্থ। পৃথিবী একেবারে ঘোর অন্ধকারে মগ্ন। সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, পাতাল, পর্ব্বত, গুহা, নদ, নদী, সকল বিশ্ব চরাচর আজি নির্জ্জীব ও নিস্তব্ধ—সকলি অসার, কেবল শোকের ঘন কুয়াসা চক্ষুর সমক্ষে ও পরোক্ষে, অন্তরে ও বাহিরে কেবল সেই চির-স্নেহ-দায়িনী জননীর অভাব জাগ্রত। এমন দুর্দ্দিনে তাহাদের সম্বল একমাত্র অশ্রুজল; কিন্তু পার্থিব জগতের জীব কখনই ক্রিয়াবিহীন হইতে পারে না। কর্ম্মময় প্রাণীর জীবনে মরণে কর্ম্ম জড়িত; অকর্ম্মই কর আর সুকর্ম্মই কর। রঘুনাথ কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিলেন, এখন আর এ বিপদে কাহার শরণ লইব, সকল আরাম ও শান্তির স্থল আজ ভাঙ্গিয়া গেল, এখন কাহাকে ডাকিব, কাহার আশ্রয় লইব? এই বলিয়া আবার অধীরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। মণিমালা স্বামীর বিষম দশা দেখিয়া অতি মধুর ভাবে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন "কেন আর বৃথা কাল বিলম্ব করিতেছ, সেই অনাথ-শরণ বিপদভঞ্জনকে স্মরণ কর, তিনিই আমাদের জননীর জননী, তাঁহারই ইচ্ছায় জগতে সকল

সুখ দুঃখের ঘটনা, তিনি যাহা বিধান করিবেন তাহাই হইবে। এ সময় যে কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন তাহা নির্ব্বাহ কর।" শোকার্ত্ত রঘুনাথ উঠিয়া অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার উদ্যোগে বাহির হইবেন, এমন সময়ে নফরচন্দ্র সস্ত্রীক আসিয়া উপনীত। মঙ্গলা ঠাকুরাণী বাড়ী ঢুকিবামাত্র দীর্ঘ কোলাহলে ক্রন্দনে প্রতিবেশিগণকে এই শোক সমাচর দিলেন। অনেকেই আসিয়া সহানুভূতি ও বৃদ্ধার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে তৎকালোপযোগী অর্থের অনাটন ঘটিল। তখন নফর কহিল "চল, তোমাকে জমীদারের নিকট লইয়া যাই। তিনি অতি দয়ালু, অবশ্য কোন সাহায্য পাইবে।" শোকবিমূঢ় রঘুনাথ অগত্যা নিরুপায় হইয়া জমীদার মীর মহম্মদের নিকটে উপস্থিত হইয়া কাতরে স্বীয় বিপত্তি জানাইলেন। জমীদার রঘুনাথকে নফরের সঙ্গে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু বাহিরে অতি গম্ভীরভাবে নফরকে আজ্ঞা দিলেন "নগদ ৫০৲ টাকা ও আবশ্যক মত লোক জন এই ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে দাও।" এই বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। নফরও রঘুনাথকে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে বলিয়া প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে টাকাগুলি আনিয়া রঘুনাথের হস্তে দিল। রঘুনাথ ঘোর বিপত্তিকালে এইরূপ উপকার পাইয়া মনে মনে যার পর নাই কৃতজ্ঞ হইলেন।

বাটী আসিয়া মাতার শবদেহ লইয়া হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে যাইবার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু গৃহে একাকিনী মণিমালাকে রাখিয়া যাইতে পারিলেন না, সুতরাং তিনিও সঙ্গিনী হইলেন। কিয়দ্দূর যাইবার পরেই নফরচন্দ্র দ্রুতবেগে আসিয়া উপস্থিত। হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলেন "তোমরা এর মধ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছ, আমি বাড়ী গিয়ে কেবল মাত্র কাপড়খানি লইতে যাহা বিলম্ব হয়েছে। আহা! তোমরা ছেলেমানুষ, এমন করে কি বেরুতে আছে? তোমার স্ত্রীকে কেন লইয়া যাইতেছ, এই সময়ে বালিকা এমন করে কি হাঁটিয়া যাইতে পারে? আহা! পূর্ব্বে আমাকে জানাইলে আমি ডুলি পাল্‌কি একটা শওয়ারি আনিতাম।" রঘুনাথ নীরবে মণিমালাকে পার্শ্বে লইয়া জননীর আজীবনের স্নেহ মমতা ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলেন। এই পঞ্চবিংশতি বর্ষের প্রত্যেক দিবস ও রজনীতে তিনি কোন্ সময় কিরূপে কোন্ কথাটি কহিয়াছেন, কোন্ সময়ে কি করিয়াছেন—প্রত্যেক মুহূর্ত্তের বিভিন্ন চিত্রগুলি তাঁহার হৃদয়-পটে প্রতিভাসিত হইতে লাগিল ও জল-বিম্বের মত আপনা আপনি একের পর আর একটি ঘটনার ছায়াগুলি শোক-সাগরে মিশিয়া গেল। পর দিবস বেলা দুই প্রহরের সময় গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—জলে মগ্ন।

বেলা অবসানপ্রায়, সূর্য্যদেব অস্ত-গমনোন্মুখ, শোকে দুঃখে ক্লিষ্ট রঘুনাথ

গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া অশ্রুসিক্ত-নয়নে, কাতরহৃদয়ে তৎকালোচিত কার্য্য সকল সমাধা করিলেন। মণিমালা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া কেবল রোদন করিতেছেন। ক্রমেই সন্ধ্যার আঁধারে গঙ্গাতীর ছাইয়া ফেলিল, একে একে তটস্থ লোকজন নিজ নিজ গন্তব্যপথে গমন করিল। কলনাদিনী জাহ্নবীর তরঙ্গগুলি গায়ে গায়ে জড়াইয়া সন্ধ্যার ধূসর আলোকে মুগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল। মণিমালা চিরদিন অন্তঃপুর-অবরুদ্ধা, কখন ঘরের বাহিরে যান নাই, আজি বিপদাক্রান্তা হইয়া এই প্রকাশ্য স্থানে অবগাহন করিতে আসিয়াছেন। ভয়ে দুঃখে লজ্জায় ভারাক্রান্তা হইয়া জলে নামিলেন। প্রথম দু একটি সোপান অবতরণ করিতেই পায়ে কি ঠেকিল, অমনি যেই উঠিতে যাইবেন, তাহাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। এই নিস্তরঙ্গ অগভীর জলের ভিতর মণিমালা হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল!!

* * * * *

বিপদ যখন আক্রমণ করে, তখন নিজ সহচরকে সঙ্গী করে। মণিমালা জলে মগ্ন হইয়া কেবল এতটা বুঝিলেন যেন কোন বস্তু দ্বারা তিনি আকর্ষিত হইয়া যাইতেছেন, নিরুপায় হইয়া একবার মাত্র সেই সুন্দর চম্পকদাম সদৃশ অঙ্গুলি জল হইতে উত্তোলন করিয়া স্বামীর নিকট অন্তিম সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু তখন সকল বিফল!! রঘুনাথ এই ব্যাপার অবলোকনে অনন্যোপায় হইয়া জলে ঝম্প দিয়া পড়িলেন ও সাধ্যমত বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন হতাশ হইয়া জাহ্নবীর পদতলে উঠিয়া বসিয়া হৃদয়বিদারক করুণ ক্রন্দনে সেই তমসাময় সন্ধ্যা-গগন কাঁপাইয়া তুলিলেন। উপরে নীলাকাশে চন্দ্র, তারা নীরবে তাঁহার দশা দেখিল, নীচে ধরিত্রী বক্ষ পাতিয়া ধীর গম্ভীর প্রাণে অধোবদনে রহিলেন। কেবল সমীরণ সেই জ্বলন্ত বক্ষঃস্থলের বিলাপধ্বনি বহন করিয়া প্রতি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করাইল, সেই শোচনীয় সমাচারে মানবিক হৃদয় মাত্র কাঁদিয়া উঠিল। মানুষ যতই নিষ্ঠুর হউক না কেন, অন্তিম ব্যাপার অবলোকনে বিগলিত হয়। জগতে শোকের অপেক্ষা তীব্র বেদনাকারী আর কি আছে? জাগতিক প্রেম মানুষের হৃদয়ে এত মধুর, তাহার বিচ্ছেদই যেন চরম বিচ্ছেদ জ্ঞান হয়। অন্নময় শরীর লইয়াই সকল সুখ দুঃখের ভোগাভোগই সার। তাই এত আকুলতা, তাই এত নৈরাশ্য, তাই এত ভুল! কি মোহ!

রঘুনাথের এই বিপদবার্ত্তা শ্রবণে নিকটস্থ পল্লীর গৃহস্থেরা সমাগত হইলেন ও সকলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। কেবল একটি যুবক আর উঁহাকে তদবস্থায় একাকী ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। নানা প্রকারে রঘুনাথকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তখন হঠাৎ নফর দাস আবির্ভূত হইয়া নানা উপায় আবিষ্কার করিতে লাগিল; কিন্তু সে সকল কেবল

বাহ্যিক সৌহৃদ্যমাত্র। অবশেষে গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার যুক্তি স্থির হইল। নফর কহিল, "রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন বাটী চল, প্রাতঃকালে পুনরায় অনুসন্ধান করা যাইবে।" আগন্তুক যুবক নফরের বাহ্যিক ব্যস্ততা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় কি ইহাঁর নিকট সম্পর্কীয় ?" নফর দাস তদুত্তরে কহিল "না ভাই, আমি জমীদারের কর্ম্মচারী, রঘুনাথের সাহায্যের নিমিত্ত জমীদার কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি।" যুবক কহিলেন "উত্তম, তবে আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসিতেছি।" এই বলিয়া ডুবুরি আনিতে পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নফর দাস এই সকল দেখিয়া "রঘুনাথ, আমি একবার জমীদারকে এই সকল সম্বাদ দিয়া আসি" বলিয়া সভয়ে প্রস্থান করিলেন।

মাতৃহীন, পত্নীবিয়োগবিধুর রঘুনাথ একাকী কুশাবর্ত্তভীরে বসিয়া সর্ব্ব দুঃখের আশ্রয়স্থল ক্রন্দনকে আশ্রয় করিয়া একান্তচিত্তে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দরদর-ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার পক্ষে সুখ-শান্তিময় গৃহ মহাবিভীষিকাময় শ্মশান সমতুল্য! বাহিরের অন্ধকারে জগৎ পরিব্যাপ্ত, আর শোকের তিমিরে রঘুনাথের অন্তর মগ্ন। তিনি অধীর ভাবে জাহ্নবীকে অভিশাপ প্রদান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত যুবকটি কয়েকটি মশাল ও ডুবুরী লইয়া আসিয়া উপনীত হইলেন; কিন্তু নফর দাস কই এখনও আসিল না। ডুবুরীরা বিস্তর অনুসন্ধানেও মণিমালার বিচেতন দেহখানিও পাইল না। কে জানে তাহা কোন্ সর্ব্বগ্রাসী রাহুর কবলে পতিত হইল! ডুবুরি কহিল "মহাশয়, রাত্রিকাল, কিছু ঠিক্ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু যতদূর বুঝিলাম ইহার মধ্যে নাই, কি হইল এত অল্প সময়ের মধ্যে স্থির করিতে পারিলাম না। অগত্যা সকলেই নিরাশ হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শোকার্ত্ত রঘুনাথ আর ফিরিলেন না— বলিলেন "আর কোথায় যাইব ? সংসার ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল। যে জাহ্নবীর পায়ে সকল সমর্পণ করিয়াছি, সেই খানেই এই দুঃসহ জীবনের ভার রাখিব। আগন্তুক যুবক বন্ধু অনেক অনুনয় বিনয়েও উঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না— গঙ্গাপুলিনে সৈকত ভূমিতে পড়িয়া অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া ঘোর নিশীথে সেই পরিত্যক্ত প্রেমময়ী মধুরমূর্ত্তিগুলির ধ্যান করিতে করিতে রজনী অবসান হইল। পরদিন সেই বন্ধুটি আসিয়া বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্যে বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই আর সে স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। রঘুনাথের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিল। গঙ্গাতীরে বাস ও গঙ্গাজল পান করিয়া দিবসত্রয় কাটাইলেন, পরে তাঁহার বন্ধু প্রত্যহ অল্প স্বল্প আহার আনিয়া সেইখানেই দিতে লাগিলেন। এই প্রকারে দুঃখের দীর্ঘ দিন অলস জীবনের মত গড়াইয়া গড়াইয়া কাটিতে লাগিল। রঘু-

নাথের শোকার্ত্ত জীবনও দুঃখের পীড়নে অলক্ষ্যে ক্ষয় হইতে লাগিল। তাঁহার বন্ধুটি আসিয়া রঘুনাথের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

একদিন রঘুনাথ বসিয়া মণিমালার সম্বন্ধে বন্ধুটির সহিত কথোপকথন করিতেছেন ও মাতার অবর্ত্তমানেই তাঁহার এই দুর্দ্দশা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গ হইতে জমীদার ও তদীয় কর্ম্মচারী সম্বন্ধে কথা উঠিল। তখন বন্ধুটির যেন মনে হইল "সেই যে নফর দাস গেল আর ত তাহার কোন সংবাদ নাই।"

রঘুনাথ সরল চিত্তের লোক, তিনি কহিলেন "বড়লোকেরা আর কি দুঃখ কষ্টের কথা স্মরণ করেন, তাঁহাদের নানা কাজ।" বন্ধুবর এই উত্তর শুনিয়া যেন অতৃপ্ত রহিলেন, যেন কোন প্রকার সন্দেহ-বায়ু তাঁহাকে ফিরিয়া ফিরিয়া কি বলিতে উদ্যত। তিনি কহিলেন "তুমি নিরাশ হইয়া উদ্যম হারাইও না। আমি এখনও তোমার মঙ্গল কামনায় ঘুরিতেছি।" রঘুনাথ কহিল "আমি অতি হতভাগ্য, অমঙ্গলের পর অমঙ্গল, আর কি এ জীবনে মঙ্গলের আশা আছে? এখন এই স্থির করিয়াছি, এখানে থাকিয়া তোমার বেদনা বৃদ্ধি করিব না—তীর্থ যাত্রা করিয়া অবশিষ্ট পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। মিথ্যা বন্ধনে জড়াইবার কি প্রয়োজন?" বন্ধু কহিলেন "না ভাই, আমার অনুরোধ কেবল আর একমাস এই খানে থাক, পরে যাইও। আমার মনের সন্দেহ অপনোদন হইয়া যাউক, আমি যেন এখনও কোন মতে নিরাশ হইতে পারিতেছি না। জানি না তোমার অদৃষ্টচক্রে কি লিখিত আছে।" (ক্রমশঃ)

আমরা।

আমরা কে, কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, ইহা কি আমাদিগের চিন্তার বিষয় নহে? এই বিশাল অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে আমি কি! আমি যে সামান্য জলবুদ্বুদের মতও নই, তবে অনন্তকে ধরিবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে কে দিল? মানব অন্তরে ধীরে ধীরে আত্মজ্ঞান প্রাকৃতিক জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত করে! যিনিই করুন, এমন একজন সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতা আছেন যাঁহার অলঙ্ঘনীয় নিয়মে নভোমণ্ডলস্থ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীস্থ পর্ব্বত নদী কীট পতঙ্গ তুমি আমি সকলেই নিয়মিত। সেই সৃজনকর্ত্তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য জ্ঞাত হওয়া কাহার সাধ্য? তবে কি না পরিবর্ত্তনশীল জগতের অবস্থা দেখিয়া, জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-পূর্ণ এই হর্ষবিষাদময় সংসারের অবস্থা দেখিয়া প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে এই প্রশ্ন উত্থিত হয়, আমি কে যে দুদিনের নিমিত্ত আসিয়া এই অনিত্য সংসারের

অনিত্যতার সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিতেছি ; আবার কোথায়ই বা যাইব ? অমনি আত্মজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। দেখি—এ কি আমি যে অনন্তের কন্যা, আমার আত্মা যে সংসারের অনিত্যতার সহিত মিশিয়া যাইবার নহে। তখনই এই চিন্তা আসে, যে এই অমর আত্মরূপী আমি তো ঐ অনন্ত হইতেই আসিয়াছি—ঐ অনন্তেই যাইব, তবে দুদিনের নিমিত্ত এ ধূলা খেলা কি ? ইহার উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য অতি গুরুতর। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম বিষয় চিন্তনে প্রথমে দেখি সংসারে সুখভোগ করাই উদ্দেশ্য। আত্মার মধ্যম অবস্থায় কি দেখি ? না, তা নয়, সংসারের কর্ত্তব্যগুলি পালন করিলেই মনুষ্যনামের যোগ্য হওয়া যায়। কিন্তু আত্মার উচ্চতম অবস্থায় অর্থাৎ দেবত্বের আভাস পাইলে কি উদ্দেশ্য দেখা যায় ? দেখা যায়, স্বীয় জীবন তো উন্নত হইবেই, তদ্ভিন্ন পরের দুঃখ দূর করা, জগতের কল্যাণ সাধন করা ও মানবাত্মাকে নিত্য অক্ষয় রাজ্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক আত্মতৃপ্তি বা পরমার্থ-তৃপ্তি সাধন করাই মানব জন্মের উদ্দেশ্য। ঈশা, চৈতন্য, রাজা রামমোহন প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই শেষোক্ত দলের মহাপুরুষ। সেই জন্যই ত তাঁহারা অমিত তেজ, সাহস ও ধর্ম্ম-পরাক্রমে সমুদয় দেশ কম্পিত করিয়াছিলেন ; যাহা সত্যরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই প্রাণপণে পালন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাই জ্ঞানিগণ বলেন, "মহাপুরুষেরা ত অমর কীর্ত্তিতে জীবিত রহিয়াছেন।"

এ সংসার আমাদিগের শিক্ষার স্থল। জীবনের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করিলে নিম্ন দিকে দৃষ্টি করিতে হইবে না। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা অধিক বা প্রশংসার্হ হইয়াছে বা অমুক ব্যক্তির তুলনায় আমি খুব বড় হইয়াছি ইত্যাদি বিষয়ের চিন্তা দ্বারা অবনতি নয়। সুতরাং জীবনের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করিলে কেবল ঊর্দ্ধ-দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 'অমুক বিজ্ঞ ব্যক্তি, ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি করিতেছেন, অমুক শিক্ষিতা মহিলা কি প্রকার সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, কি প্রকারে জীবনের উন্নতি ও দেশের উন্নতির নিমিত্ত কার্য্য করিতেছেন, আমি সেরূপ করিলাম কোথায় ? এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া তবে আমার জীবনের কি গতি হইবে ? সময় থাকিতে এখন প্রভু পরমেশ্বরের চরণাশ্রয় গ্রহণ করি। তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া অহংকার ও প্রশংসা লাভের বাসনা ত্যাগ করিয়া সরল অন্তরে স্বীয় জীবনের উন্নতি এবং পৃথিবীর কোন মহত্তর কার্য্যের কোন ক্ষুদ্রতর অংশও সম্পাদন করিয়া এ সংসারে জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সফল করিতে সচেষ্ট হই ; তাঁহার কৃপায় নির্ম্মল-অন্তর হই ; মনুষ্যজন্মের মহান্ ভাব, মহৎ লক্ষ্য ধারণা করিতে সমর্থ হই।' ভগ্নি, আমাদিগের কি নাই ? হস্ত নাই, না পদ নাই, না চিন্তা করিবার শক্তি নাই ? জড়পিণ্ডের ন্যায় কালক্ষয় করিবার জন্য কি এ সংসারে আসিয়াছি ? হস্ত থাকিতে

কেন হস্তের উৎকৃষ্ট ব্যবহার না করি? সকল অকর্ত্তব্য বর্জ্জন করিয়া, কুকর্ম্ম হইতে হস্তকে সঙ্কুচিত করিয়া, কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম, উৎকৃষ্ট কর্ম্ম, মনুষ্যোচিত ও মহত্তর কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া হস্তকে কেন পবিত্র না রাখি? আর বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ আমার ত কিছুই নাই, তজ্জন্য কি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব? বিধাতা যাহা দিয়াছেন, তাহার কি সদ্ব্যবহার করিতে হইবে না? সুঁচগুলি কিছুকাল ঘরে রাখিয়া দিলে কেমন মরিচা ধরিয়া যায়। ব্যবহার না করিলে, মার্জ্জিত না হইলে বাসন কি কখনও চক্ চক্, ঝক্ ঝক্ করে? বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার না হইলে তাহার বিকাশ কি প্রকারে সম্ভবে? শক্তির ব্যবহারে শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ব্যবহার না করিলে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকল পালন না করিলে আমরা কিরূপে মনুষ্যত্ব লাভের আশা করিতে পারি? সকলেই যদি আহার নিদ্রায় ইন্দ্রিয়-সুখ-পরতন্ত্র হইয়া কাল কর্ত্তন করিবে, তাহা হইলে জগতে অসাধারণ কার্য্যসমূহ কোথা হইতে সম্পন্ন হইবে? মনুষ্যসমাজ দিন দিন কিরূপে উন্নত হইতে উন্নততর, সভ্য হইতে সভ্যতর অবস্থায় আরোহণ করিতেছে? বুদ্ধিবৃত্তির চালনা না হইলে তাহা কি সম্ভবে? শক্তি সকলেরই আছে, কাহারও না হয় অল্প, কাহারও অধিক, কাহারও এক বিষয়ে তীক্ষ্ণতা অধিক, অপর বিষয়ে অল্প, কাহারও হয় ত অপর বিষয়ে স্বাভাবিক ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অধিক। কিন্তু চালনা দ্বারা মানুষ সকল বিষয়েই কিছু না কিছু উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। জগতে যে কোন বিষয়েই মনুষ্য উৎকর্ষ লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহাতেই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালন আবশ্যক। জ্ঞান শিক্ষা ব্যতীত—জ্ঞান লাভ ব্যতীত মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লাভ করা অসম্ভব। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, অজ্ঞ কৃষক হউক না, যদ্যপি ভক্তিরসে হৃদয়, মন আপ্লুত ও ভক্তিভাবে প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়, তবে তাহার জ্ঞানের প্রয়োজন কি? সে তো জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করিলে ভক্তি কখনই জ্ঞান হইতে পৃথক্ বোধ হয় না। কোন বিষয়ে ভক্তির উদ্রেক হইলেই তৎপূর্ব্বে উহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই জ্ঞানেতেই মনুষ্যের বিশেষত্ব। এতদ্দ্বারাই জগৎপিতা পরমেশ্বর মনুষ্যকে এ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ অধিকার দান করিয়াছেন, এবং তিনি স্বয়ং জ্ঞানময় হইয়া চতুর্দ্দিকে কেবল জ্ঞান বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। জ্ঞাননয়নে দৃষ্টিপাত করিলে চতুর্দ্দিকে জ্ঞানের অনন্ত বিভূতি দেখিয়া কাহার না মন স্তম্ভিত হয়? মহা মহা জ্ঞানিগণ এই জ্ঞানসমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়া কূল কিনারা না পাইয়া হাবু ডুবু খান। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নিউটন বলিয়াছিলেন "আমি জ্ঞান পাই নাই, জ্ঞানসমুদ্রের তীরস্থ উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতেছি।" সমুদ্রে

অবগাহন তো দূরের কথা। তবে তুমি আমি কি করিতেছি? কোন্ সন্তান পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইতে বাসনা না করে? জ্ঞানময় পিতা জ্ঞানরূপ অতুল ঐশ্বর্য্য জগতে অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ পদার্থে—অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ ঘটনায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, জ্ঞান নয়ন খুলিয়া আমরা কয়জন সে ঐশ্বর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষু সার্থক করিতে পারিতেছি?—স্বয়ং সে মহান্ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবার বাসনা করিতেছি? চক্ষু থাকিতেও আমরা অন্ধ। চক্ষুহীন অন্ধের চক্ষু প্রাপ্তির বাসনার ন্যায় কি আমরা জ্ঞান লাভের বাসনাটুকুও হৃদয়ে সজাগ রাখিব না? আমি দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া থাকিলে কি হইবে? মানব-প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চাপিয়া বিনষ্ট করা যায় না। আত্মার অনন্ত জ্ঞানতৃষ্ণা পৃথিবীর সম্পদে কি কখনও মিটে? অসার সুখের লালসায় মানব দিবারাত্র ধাবিত হয়, কিন্তু এই স্বপ্নবৎ ক্ষণিক সুখে কি মানব-প্রাণের অনন্ত পিপাসা মিটে?

তাই ভাবিতেছিলাম আমরা আমাদিগকে এখনও চিনিতে পারি নাই, জীবনের মূল্য বুঝিতে পারি নাই। এখনও সময় থাকিতে জীবনের লক্ষ্য পথ কেন না চিনিয়া লই? জীবন পথে এক পাও অগ্রসর হইবার চেষ্টা কেন না করি?

তড়িৎ সম্বন্ধে নানা কথা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বিশ্বসংসারস্থ সমুদয় বস্তুতেই তড়িৎ বিদ্যমান আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাও স্থির করিয়াছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় কি চেতন কি অচেতন সকল পদার্থই একপ্রকার সূক্ষ্ম তড়িৎ জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া থাকে। মনুষ্যের মস্তিষ্ক একটী তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রমাত্র, ইহা হইতে সর্ব্বদা তড়িৎ উৎপন্ন ও বিনির্গত হইতেছে।

কোন ব্যক্তি একাগ্রমনে অন্য এক ব্যক্তিকে চিন্তা করিলে, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির আয়ত্ত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রথম ব্যক্তির দৈহিক তড়িৎশক্তি প্রবল হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অভিভূত করে।

আজিকালি ক্লোরোফরম নামক আরক সাহায্যে রোগীর নিদ্রা আনাইয়া অস্ত্র-চিকিৎসা করা হইয়া থাকে, পূর্ব্বে এরূপ হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মেস্মর নামক একজন অষ্ট্রীয়াদেশীয় চিকিৎসক দৈহিক তড়িৎশক্তি-প্রভাবে রোগীকে নিদ্রিত করিয়া অস্ত্র-চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। এই জন্য দৈহিক তড়িৎশক্তি-প্রভাবে কোন ব্যক্তিকে নিদ্রাভিভূত করাকে মেস্মেরিজম (Mesmerism) কহে। এই মেস্মেরিজম্

পরে হিপ্‌নটিজম (Hypnotism) নামে অভিহিত হইয়াছে।

দৈহিক তড়িৎশক্তি-প্রভাবে নিদ্রাভিভূত হইলে মনুষ্যের এক অত্যদ্ভুত ক্ষমতা জন্মে। এই ক্ষমতাপ্রভাবে, অভিভূত ব্যক্তি, যে বিষয় কখন শুনে নাই অথবা যে দৃশ্য কখন দেখে নাই, তাহার কথা যথাযথ ভাবে বলিতে পারে। আমাদিগের দেশের পূর্ব্বতন মুনি ঋষি ও সাধু মহাপুরুষেরা যোগস্থ বা উন্নত দশা প্রাপ্ত হইয়া ভূতভবিষ্যৎ করতল-গত আমলকের ন্যায় দর্শন করিতেন। ইহা বলিলে অনেকে হাস্য পরিহাস করিবেন; কিন্তু তাঁহারা যদি (Hypnotism) হিপ্‌নটিজম্ বিষয়টী ভাল করিয়া পাঠ করেন, তাহা হইলে কখনই ঐরূপ করিতে পারেন না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কোন ব্যক্তিকে দৈহিক তড়িৎ শক্তি-প্রভাবে নিদ্রাভিভূত করতঃ তাহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি আনাইয়া চোর ধরিবার প্রথা আবিষ্কার করিয়াছেন। অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে এবংবিধ প্রথা ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রচলিত আছে। আমাদিগের দেশে যে বাটীচালা, হাতচালা প্রভৃতি প্রচলিত আছে, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এই আবিষ্কার নূতন নহে। যে ব্যক্তি আদৌ লেখা পড়া জানে না, হাত-চালার সময় তাহার হাত দিয়া অক্ষর বাহির হয়, ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়? কত লোক হাত চালার সময় যাহাতে হাত না চলে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই হাত-চলা বন্ধ করিতে পারে নাই। শুনা যায় ওঝা বা গুণী মন্ত্র পড়িয়া ফুঁ দিলে হাত অবশ হইয়া যায়, সুতরাং তখন যতই কেন চেষ্টা কর না, কোন মতেই হাত আপন আয়ত্ত মধ্যে থাকিবে না। বোধ হয় গুণীর দৈহিক তড়িৎ-শক্তি-প্রভাবে হাত অভিভূত হয়, তাহাতেই ঐরূপ হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক বহুকাল একত্র সহবাস করিলে তাহাদিগের প্রকৃতিগত পার্থক্য বেশী থাকে না। পরস্পরের তড়িতের আদান প্রদান বশতঃ এইরূপ হয় বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্ম ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াসক্ত নীচ-প্রকৃতি ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ও শেষোক্ত ব্যক্তি লাভবান হন, অর্থাৎ উভয়ের তড়িৎ-শক্তি পরস্পর সমভাবাপন্ন হইতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে উন্নত ব্যক্তির অধঃপতন হয় আর নীচ ব্যক্তি উন্নত হয়। বোধ হয়, এই কারণেই আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন :—

> "হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
> সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাং॥"

—

গীতাসার ব্যাখ্যা।

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥"

যিনি বিধেয়াত্মা অর্থাৎ যাঁহার আত্মা যথাবিহিত ধর্ম্মবিধি দ্বারা সুনিয়মিত, তিনি আসক্তি এবং ঘৃণাবিহীন আত্ম-বশীভূত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয় ভোগপূর্ব্বক আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

অসংযত আত্মার দুই বিপরীত লক্ষণ দেখা যায়, ১ম বিষয়ে অর্থাৎ রূপরস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ে তাহার ঐকান্তিক অনুরাগ। ইহার ফল মোহ এবং তজ্জনিত আত্মগ্লানি। আর এক লক্ষণ বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষ অর্থাৎ মর্কট-বৈরাগ্য বশতঃ ভোগ্য বিষয় সকলের প্রতি অযথা ঘৃণা। এইরূপ বিকৃত বৈরাগিগণ সংসারকে পাপময় স্থান বলিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক হয় বনে গমন করেন, নয় আপনার চক্ষু শ্রোত্র প্রভৃতি নিরোধ করিয়া ইন্দ্রিয় রাজ্য হইতে সকল যোগ বিচ্ছিন্ন করিতে চান। কিন্তু অসংযতাত্মা বনে গিয়াও বিষয় চিন্তা করেন এবং নূতনবিধ সংসার পাতিয়া বসেন। বাহ্যেন্দ্রিয় বিনষ্ট করিলেও অবিবেকী ধ্যানে জ্ঞানে জাগ্রৎ স্বপনে বিষয়েরই অনুধ্যান করেন, বিষয়ের অতীত কোনও বস্তুতে চিত্ত নিবেশ করিতে পারেন না। সুতরাং বিষয়ানুরাগে যেমন—বিষয় বিদ্বেষেও সেইরূপ বিষয়ের মলিন কামনা পরিহার করা যায় না এবং আত্মগ্লানি নরকানলে দগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু যে আত্মা সংযত ও স্ববশ, তাহার ভাব অন্যরূপ। তাহার বিষয়ের প্রতি আসক্তিও নাই, ঘৃণাও নাই। স্বচ্ছ স্ফটিকে সুন্দর গোলাপেরও ছায়া পড়ে এবং গোময়েরও ছায়া পড়ে, কিন্তু এ উভয়ের কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিয়া সুগন্ধ বা দুর্গন্ধযুক্ত করিতে পারে না। সংযতচিত্ত ব্যক্তির প্রকৃতি সেইরূপ নির্ম্মল ও নির্বিকার। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন। তিনি সকলই দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, অনুভব করিতেছেন, অথচ আপনার বিবেক বুদ্ধি অনুসারে কোথাও ইন্দ্রিয়কে সুখাস্বাদনে নিয়োগ করিতেছেন, কোথাও তাহাকে বিনিবৃত্ত করিতেছেন। তিনি ভগবৎ-প্রীতি উদ্দেশে বা আত্ম-শ্রেয়োভিলাষে সুদৃশ্য দর্শন, সুশ্রাব্য শ্রবণ ও সুরস আস্বাদন করেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যের আকর পরমেশ্বরে তাঁহার চিত্ত নিমগ্ন করে, সুমধুর শব্দ তাঁহার নিকট ইষ্টদেবতার নামের প্রতিধ্বনি করে এবং সুমিষ্ট রস তাঁহার হৃদয়কে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ করিয়া 'রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু' পরমেশ্বরের প্রেমে বিগলিত করে। তিনি সকল অবস্থাতেই প্রশান্তচিত্ত এবং তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও লক্ষ্য পূর্ণানন্দ পরমেশ্বর, সুতরাং

ইন্দ্রিয়যোগে বিষয় রাজ্যে ভ্রমণ করিয়াও তিনি ক্লিষ্ট ও গ্লানিযুক্ত হন না, কিন্তু আত্ম-প্রসাদই লাভ করিয়া থাকেন। আত্মসুখের জন্য—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য যে ব্যক্তি বিষয় ভোগ করে, সে কামী; বিষয় সংযোগে তাহার চিত্ত কলুষিত হয়। কিন্তু যিনি পরমাত্মার সুখোদ্দেশে সুখসকল গ্রহণ করেন, তিনি প্রেমিক এবং তাঁহার চিত্ত নির্ম্মলই থাকে। মনুষ্যের জন্য ঈশ্বর অশেষ প্রকার সুখের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক এক ইন্দ্রিয় শত শত সুখের দ্বার—তাহা হইতে যে সুখ লাভ হয়, তাহা ইন্দ্রিয়জনিত সুখ। তদুপরি জ্ঞান-জনিত সুখ, স্নেহমমতা ভালবাসার সুখ, কর্ত্তব্য পালনের সুখ। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ সুখ আত্মপ্রসাদ। ইহাই ঈশ্বরের মহাপ্রসাদ এবং পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ। সুখময় পরমেশ্বর সকলই দেখিতেছেন, সকলি শুনিতেছেন, সকলই জানিতেছেন। তিনি তাঁহার জগৎসংসারকে প্রীতি করিয়া তাহাতেই সুখী। ঈশ্বর-প্রেমিক ধার্ম্মিক ব্যক্তি, তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া তাঁহার ইচ্ছাতে আপনার ইচ্ছা মিলাইয়া দিয়া অথচ সংসারের সহিত নির্লিপ্ত হইয়া কার্য্য করেন। তিনি ঈশ্বরের সহিত কামনার সকল বিষয় উপভোগ করিয়া থাকেন। এই পরমানন্দ ব্রহ্মানন্দ আত্মপ্রসাদ—ঈশ্বরের মহাপ্রসাদ। সকল জীব জন্তু আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রদত্ত কণামাত্র আনন্দ ভোগ করে, কিন্তু বিধেয়াত্মা তাঁহার সহিত একত্র পরমানন্দ ভোগ করেন, তাঁহার কি পরম সৌভাগ্য!!

কর্ম্মসাধন।

নমি তব পদে প্রাণময় প্রাণনাথ,
কর্ম্ম সাধনের ক্ষেত্রে থাক সাথে সাথ।
এ যে মহা কুরুক্ষেত্র সমর-অঙ্গন,
কত বিঘ্ন কত বাধা বিপদ ভীষণ—
বৈরী দল চারিদিক্ বেড়িয়া প্রবল,
কেমনে যুঝিব একা নিতান্ত দুর্ব্বল?
ভয়বারী বিঘ্নহারী ভকত-বৎসল,
একমাত্র তুমি দেব সহায় সম্বল।
দেহ বল দেহে, মনে তেজ দিব্যজ্ঞান,
আত্মারথ চালাও সারথি ভগবান্।
তব 'প্রিয় কার্য্য' বিনা কি আছে ধরায়?
তনু মন ধন সব সেবিতে তোমায়।
তব কার্য্যে করি যেন আত্ম-সমর্পণ,
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

জয়পুরের মহারাজ মাধো সিংহের বিলাত যাত্রা।

আগামী ২৬শে জুন সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক মহা সমারোহে সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে ভারতীয় অনেক রাজা, মহারাজা, নবাব বাহাদুর প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়া ইতিপূর্ব্বে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তন্মধ্যে জয়পুরের মহারাজা মাধো-সিংহের সমুদ্র-যাত্রা বিশেষ কৌতুকাবহ। প্রথমতঃ ইনি যে জাহাজে আরোহণ করিয়াছেন, তাহা নাকি হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সংশোধিত করা হইয়াছে। কিরূপ হোম বা যাগ হইয়াছে আমাদের সংবাদদাতা তাহা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন নাই। পোতাধিকারীর সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে যে, 'জাহাজস্থ নাবিক, মালিম, কাপ্তেন, লস্কর প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মচারী নিষিদ্ধ খাদ্য আহার করিতে পারিবে না, করিলে বিশেষ দণ্ডার্হ হইবে। জাহাজ মধ্যেও কোনও অখাদ্য দ্রব্য (হিন্দুধর্ম্ম-নিষিদ্ধ) রাখিতে পারিবে না অর্থাৎ জাহাজ যতদিন মহারাজের অধীন থাকিবে, য়ুরোপীয় ও মুসলমান কর্ম্মচারিগণ গোমাংস, শূকরমাংস, পলাণ্ডু, লশুন প্রভৃতি আহার করিতে পারিবে না। মহারাজা যে জাহাজে যাত্রা করিয়াছেন, তাহার নাম 'অলিম্পিয়া,' এখানি এস্কার লাইনের একখানি ষ্টিমার; ইহা কুক এণ্ড সনের সম্পত্তি। কাপ্তেন সি, জে, অস্‌বর্ণ ইহার প্রধান অধ্যক্ষ। মহারাজের সমভিব্যাহারে ১২৫ জন কর্ম্মচারী ও ভৃত্য আছে। মহারাজের সুযোগ্য কর্ম্মচারী বাবু সংসারচন্দ্র সেন ও তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনও তৎসঙ্গে যাত্রা করিয়াছেন। এই সকল লোকের ছয় মাসের উপযোগী খাদ্য ও এক প্রকাণ্ড (ট্রঙ্কে) জলাধারে গঙ্গাজল জাহাজের ডেকের উপর সংগৃহীত হইয়াছে। একজন উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাইজ নাথ চৌবে এই জলাধারের তত্ত্বাবধায়ক। জাহাজের উপর ছয়টী পৃথক্ পাকশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। যাত্রীর মধ্যে মহারাজের বাস্তুদেব ও পূজারী বিহারী দাস। দেবের ভোগের জন্য একটী পৃথক্ পবিত্র পাকশালা। মহারাজের নিজের জন্য, তাজিনের সর্দ্দারের জন্য, পণ্ডিত মধুসূদন দাসের জন্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের জন্য আরও চারিটী পৃথক্ পৃথক্ পাকশালা নির্দ্দিষ্ট আছে; অন্যান্য সহচরদিগের জন্যও আর একটী সাধারণ পাকশালা আছে। স্নানের জন্যও বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। জাহাজের নির্দ্দিষ্ট স্থান মধ্যে ম্লেচ্ছ বা মুসলমান কর্ম্মচারীরা আসিতে না পারে, এই জন্য সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতি কয়েকজন শ্রমজীবীও লওয়া হইয়াছে। ধোপা নাপিত ইত্যাদি আরও কয়েকজন সহযাত্রী আছে। আবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য স্তূপাকার

মৃত্তিকারাশিও সংগৃহীত হইয়াছে। মহারাজা মাধো সিংহ এই সমুদ্রযাত্রা সনাতন ধর্ম্মানুমোদিত করিবার জন্য যত অর্থ আবশ্যক, তাহা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ষ্টিমারের ভাড়া (১০,০০০ পাউণ্ড) দেড় লক্ষ টাকা। সমভিব্যাহারী স্বর্ণ ও রত্নরাজী এবং ভূষণাদির মূল্যও ত্রিশ লক্ষ টাকা (৪৫ হাজার টাকা দিয়া ইনসুয়র করা হইয়াছে।) এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্যয়ের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা পোতাধ্যক্ষ কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত রাখা হইয়াছে। অহিন্দু অথবা অনার্য্য দেশে অনার্য্যদিগের প্রস্তুত কোন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় না করা এবং তাহাদিগকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত না করা মহারাজের বিশেষ আদেশ। ষ্টিমারে আরোহণ করিবার অগ্রে বোম্বের আপলো বন্দরে পণ্ডিত ও শাস্ত্রীমণ্ডলী পবিত্র বেশে স্বস্তিবাচন মাঙ্গলিক ক্রিয়া ও সমুদ্রের পূজা করিয়াছিলেন। সমুদ্রযাত্রা সনাতন হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত। এই বিষয়ে মহারাজা সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন। তাহার শত শত খণ্ড এই সময়ে বিতরিত হইয়াছিল। তাহাতে নাকি লেখা আছে যে, হিন্দু হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া যে কোন দেশে, যে কোন যানে, যে কোন অবস্থায় গমনাগমন করিতে পারেন। তবে এত অর্থশ্রাদ্ধ ও আঁটাআঁটি কেন? গোয়ালিয়র, নাবা, কোলাপুর প্রভৃতির মহারাজগণ মেইল ষ্টিমারে যাইতে সঙ্কুচিত হন নাই। কোলাপুরের রাজা মহারাষ্ট্রাধিপতি মহান্ শিবজীর বংশসম্ভূত।

মহারাজ মাধো সিংহ লণ্ডন নগরে পৌঁছিলে কেম্পডিন হিলে মোরে লজে অবস্থিতি করিবেন। অন্যান্য রাজাদিগের জন্যও পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান নিরূপিত হইয়াছে।

পরমহংস ভাস্করানন্দ সরস্বতী।

পরপৃষ্ঠায় যে মহাত্মার চিত্র প্রকটিত হইল, তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন। প্রগাঢ় বিদ্যা ও তপোবলে একজন সামান্য গৃহস্থসন্তান; আত্মোৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাঁর জীবনী অমানুষী ঘটনাপূর্ণ অথবা বিশেষ চমৎকারজনক না হইলেও অনেক বিষয়ে আদর্শ ও শিক্ষোপযোগী। শিশুকাল হইতে ইহাঁর দয়াগুণ অতীব প্রবল ছিল। সংসারের ও পরিবারের ক্ষতি করিয়াও পশু পক্ষীদিগকে আহার প্রদান করিতেন, তজ্জন্য সময়ে সময়ে পিতা মাতার অসন্তোষভাজন হইতেন।

ইহাঁর পিতার নাম পণ্ডিত মিশ্রলাল মিশ্র। তিনি একজন সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। বেদ ও পুরাণে তাঁহার বিশেষ

স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী।

ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তদনুশাসনে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। তিনি শাণ্ডিল্য-গোত্রোদ্ভূত উচ্চশ্রেণীর কনোজ ব্রাহ্মণ। ভাস্করানন্দ তাঁহার ঔরসে সম্বৎ ১৮৯০ (সঃ অঃ১৮৩৯) শুক্ল আশ্বিন সপ্তম দিবসে কানজুর জেলাস্থ মৈথিলালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম মতিলাল মিশ্র। ইনি অষ্টম বর্ষ বয়সে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইলে প্রচলিত রীত্যনুসারে গুরুগৃহে শাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত হন। যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন, এবং সপ্তদশ বর্ষ বয়সে একজন প্রগাঢ় সংস্কৃত পণ্ডিত বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইলেন। ইহার পর তিনি বেদান্ত দর্শন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। এই উদ্দেশে তিনি মহামহা দর্শনবিৎ পণ্ডিতদিগের সাহায্য-প্রার্থী হইয়াছিলেন। পাটনার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অনন্তরাম এই সময়ে হরিদ্বারে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহার নিকটও তিনি দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন।

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্মে; কিন্তু সন্তানটী কিছুদিন পরে গতাসু হয়। পণ্ডিত মতিরাম এই ঘটনার অব্যবহিত পরে সহসা বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিয়া উদাসীনের ন্যায় পদব্রজে উজ্জয়িনী নগরে প্রস্থান করেন। এখানে তিনি উপযুক্ত গুরুর নিকটে পাতঞ্জল দর্শন অধ্যয়ন করেন ও যোগাভ্যাসে রত হন। সপ্তবিংশতি বর্ষ বয়সে উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ পরমহংস শ্রীপূর্ণানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক তিনি সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হন এবং তদবধি শ্রীস্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী নামে অভিহিত হন। ইহার পর তিনি প্রায় ভারতীয় সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করেন এবং একাধিক বার পুণ্যনদী গঙ্গা প্রদক্ষিণ করেন। এই সময় তিনি বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র বহির্বাস বা কৌপীন পরিধান করেন। শেষে তাহাও

পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ দিগম্বর হন। অনন্তর তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীধামে আগমন করিয়া তত্রত্য আমেঠির মহারাজার উদ্যানে অবস্থিতি করেন। এই উদ্যানটীর নাম আনন্দবাগ, ইহা দুর্গাকুণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্ব দিকে স্থাপিত। ইহা ভূতপূর্ব্ব মহারাষ্ট্রাধিপতি অমৃতলাল রাও পেসোয়ার উদ্যান বাটী। সিপাহিবিদ্রোহের পর ইহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া নিলামে বিক্রীত হইলে আমেঠির মহারাজ ক্রয় করেন। তিনি এখন এই উদ্যান ভাস্করানন্দের বাসের জন্য নিরূপিত করিলেন। স্বামীজী ধীর ও শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি আড়ম্বর ভাল বাসিতেন না অথচ তাঁহার যোগ ও তপশ্চর্য্যার খ্যাতি দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তীর্থযাত্রীর ন্যায় অজস্র জনমণ্ডলী তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বদা আগমন করিত। কেবল যে ভারতের চতুঃসীমা হইতে ভারতবাসীরা আগমন করিত, এমন নহে। য়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ সমূহ হইতেও বিদেশীয় অনেক দর্শক প্রতিনিয়ত আগমন করিতেন। এমন কি গবর্ণর, সেনাপতি ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করিয়া আপ্যায়িত ও উপকৃত হইয়াছেন।

এইরূপে সাধু জীবন যাপন করিয়া ষষ্টি বর্ষ বয়সে ১৮৯৯ সালের ৯ই আগষ্ট রাত্রি দুই প্রহরের সময় সমাধি অবস্থাতে দেহ ত্যাগ করেন। আনন্দবাগের মধ্যস্থ মণ্ডপে মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি সৎকার হয়। সমাধিস্থানে সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত ছিল।

বারাণসী আগমনাবধি স্বামীজী প্রায় নির্জন বাস করিতেন, তথাপি তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য ও ভক্তের সংখ্যার ইয়ত্তা ছিল না। ধনী দীন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, শ্রমজীবী, বণিক্, জমিদার, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি অনেক লোক তাঁহার শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহার তপঃ প্রভাব ও যোগ সিদ্ধির কথা প্রচারিত হইয়াছিল। কানপুরের গয়াপ্রসাদ নামক একজন ভক্ত বণিক্ স্বামীজীর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণার্থ এক লক্ষ টকা দান করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীস্বামী স্বয়ং প্রকাশানন্দ মৈথিল, যিনি এক্ষণে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত আছেন, তিনি তাঁহার স্মরণার্থ "ভাস্করানন্দ সংস্কৃত পাঠশালা" স্থাপন করিয়াছেন। এখানে বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ শিক্ষা দান করা হয়। শিক্ষাকার্য্যে ছয় জন উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন এবং মৈথিলস্বামী স্বয়ং সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। ছাত্রসংখ্যা প্রায় দুই শত হইবেক, প্রত্যেক ছাত্র মাসিক দুই টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকে। স্বামীজী বলেন যে এই পাঠশালার ব্যয় প্রায় মাসিক ছয় শত টাকা। এই পাঠশালা স্থায়ী হইলে পরমহংস ভাস্করানন্দ স্বামীর নামও স্থায়ী হইবে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য তাঁহার দিগ্বিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ

স্বরূপ স্থানে স্থানে যে মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপিও বর্ত্তমান থাকিয়া জনসমাজের মহোপকার সাধন করিতেছে। পরমহংস ভাস্করানন্দের শিষ্য ও ভক্তেরা মনোযোগী হইলে এই স্মৃতি পাঠশালাটীও স্থায়ী হইতে পারিবে।

গৃহচিকিৎসা।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(প্লীহা) জ্বরাধিকার—

১। কেতকী পত্রের ক্ষার দুই মাষা, গুড়মিশ্রিত করিয়া খাইলে প্লীহা ভাল হয়।

২। কুলের পাতার কুঁড়ি ও লবণ একত্রে মটরের ন্যায় বড়ি করিয়া বাসি জল দিয়া খাইলে কয়েক দিবসে প্লীহা আরোগ্য হয়।

৩। এরণ্ডমূল ও যব গোমূত্রে বাটিয়া কিম্বা চিতার মূল পাকা কদলীর ভিতরে দিয়া অথবা নিসিন্দার চূর্ণ গোমূত্রের সহিত খাইলে প্লীহা আরোগ্য হয়।

৪। উষ্ট্রের মূত্র এক ছটাক প্রাতে ৭ দিবস ও আকন্দ গাছের দুগ্ধ ২০ ফোঁটা, জল এক ছটাক সহ মিশ্রিত করিয়া সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ আরোগ্য হয়। বড় মাছ, দুধ, শাক, অম্ল খাইতে নিষেধ।

৫। হাতিশুঁড়ো পাতার রস একখানি নেকড়ায় ভিজাইয়া ছিবড়া গুড়ি সেই নেকড়ার ভিতর রাখিয়া পুঁটুলি করিয়া ইহার ঘ্রাণ লইবে। মধ্যে মধ্যে ঘ্রাণ লইয়া পুঁটুলি শুষ্ক হইলে পর ফেলিয়া দিয়া আবার বদলাইয়া লইবে। ২।৩ দিবস এইরূপ ঘ্রাণ লইলে, ২।৩ তিন দিবস অন্তর প্রবল পালাজ্বর আরোগ্য হয়।

৬। চিরতা ১ তোলা, বাকস মূল ১ তোলা, ধনে ও মিছরী ১ তোলা একটী কাঁচ বা প্রস্তর পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিবস প্রাতে উক্ত পাত্রস্থিত জল অপর পাত্রে ঢালিয়া তাহাতে অর্দ্ধ তোলা ক্ষেত পাপড়ার রস ও সিকি তোলা সেফালিকা পাতার রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাঁপজ্বর আরোগ্য হয়।

৭। নাটার বিচীর শাঁস ১ তোলা, হিরাকস সিকি তোলা, পেঁপের আটা এক ধান পরিমাণ এই সমস্ত একত্রিত করিয়া সাতটী পূরিয়া বাঁধিবে। প্রত্যহ তিন বার, বাসী জলের সহিত ঐ এক একটী পূরিয়া সেবন করিলে পুরাতন প্লীহাজ্বর আরোগ্য হয়।

৮। মানকচুর শিকড় সামান্য পরিমাণে লইয়া আড়াইটী গোলমরিচ সহিত জলে বাটিয়া খাইলে প্লীহা জ্বর আরোগ্য হয়।

৯। গোঁড়া লেবুকে চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া একটী মাটীর পাত্রে /২॥০

সের জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধেক জল মরিলে উহাতে কিছু চিনি দিয়া এক পোয়া জল থাকিতে নামাইয়া উক্ত লেবুগুলি নিংড়াইয়া ছাঁকিয়া অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হয়।

১০। রক্তপলাশের মূল কোমরে কিম্বা বাম হাতে ধারণ করিলে পালাজ্বর নিবারণ হয়।

১১। আদা ও বাসকের রস সম পরিমাণে লইয়া মধুর সহিত তিন দিবস সেবন করিলে ঐকাহিক জ্বর আরোগ্য হয়।

১২। নাটাবিচীর শাঁস, নিমছাল, গুলঞ্চ, মিছরী, শুঁট, হরীতকী, রেউচিনি, কলম্বা, জেলাফা, কালাদানা, সালসা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক ১॥০ রতি পরিমাণে লইয়া দুইটী পুরিয়া করিবে। প্রত্যহ সকালে উক্ত পুরিয়া ১ রতি ও বৈকালে অর্দ্ধ রতি লবণ মিশাইয়া সেবন করিলে কুইনাইনের আটকান জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি সত্বর আরোগ্য হয়। কিন্তু উদরাময় থাকিলে খাইবে না।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ‘বান্ধা সালসা—

অনন্তমূল ৪ তোলা, গোলাপ কুঁড়ি ॥০ আনা, গোক্ষুরবীজ ॥০ আনা, চিরেতা ২ তোলা, কালাদানা ৬ রতি, কোয়াত বীজ ।০ আনা, জাঙ্গি হরীতকী ॥০ আনা, কাসনি ॥০ আনা, ধনে ॥০ আনা, শিরখাস্তা ॥০ আনা, মৌরী ॥০ আনা, তোপচিনি ।০ আনা, বার্লি ।০ আনা, রক্তচন্দন ॥০ আনা, লবঙ্গ ॥০ আনা, ছোট এলাচ ।০ আনা, সিয়ামসিলি ।০ আনা, বন জোয়ান ।০ আনা, তোকমারী ।০ আনা, দারুচিনি ॥০ আনা, সালসারুট ৪ তোলা, রেউচিনি ৵০ আনা, যষ্টিমধু ২ তোলা, সা-চা-ফরাস ॥০ আনা, সিনকোনা বার্ক ১ ভরি, তেজপাত ॥০ আনা, বেদিয়ান ॥০ আনা, বড় এলাচ ॥০ আনা, বড় হরীতকী ।০ আনা, মিজিরিয়ম ৵০ আনা, পদ্মকাষ্ঠ ॥০ আনা, বীচবঁদ ॥০ আনা, খর্শাঞ্জন ॥০ আনা, মিছরী ॥০ আনা, গোয়েকম ৵০ আনা, ইসবগুল ।০ আনা, তোপবালাম ।০ আনা, বিহিদানা ।০ আনা, যোয়ান ।০ আনা, তাল মাখনা ।০ আনা, জৈত্রী ।০ আনা, সোনাপাতা ৵০ আনা, ত্রিক্ষুর ।০ আনা।

উক্ত ৪৩ প্রকার দ্রব্যের লিখিত পরিমাণ মত লইবে। তন্মধ্যে কঠিন বস্তুকে চূর্ণ করিয়া সমস্ত দ্রব্যকে ৪২৪ তোলা জলে মাটীর পাত্রে কাঠের মৃদু জ্বালে আচ্ছাদন পূর্ব্বক পাকারম্ভ করিবে। ৬০ কি ৬৪ তোলা আন্দাজ জল থাকিতে নামাইয়া চটকাইবে। পরে পরিষ্কার বস্ত্রে ছাঁকিয়া পটাস আইওডাইড ১৬ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ৫ তোলা পরিমাণ দিবসে ৩ কি ৬ বার সেবন করিতে হয়। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার দুষিত রক্ত ও গায়ের কদাকার চিহ্ন পরিষ্কার হয়। দুই মাস পর্য্যন্ত এইরূপে নিত্য পাক করিয়া সেবন করিবে। নিত্য পাক করিয়া সেবনে অসুবিধা হইলে রেকটিফাইড স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া বোতলে রাখিবে।

পথ্য—ঘৃতপাক রুট, অড়হর, মুগ কি মুসুর ডাল; ডালনা, শুকতানি, আলু, পটোল, ইচড়, কলম্বীশাক, মানকচু, মোচা, ডুমুর, ওল। একসন্ধ্যা পুরাতন চাউলের অন্ন; বৈকালে মাংসের ঝোল, লুচি বা রুটি, বল্কা দুগ্ধ, মোহনভোগ, গজা ইত্যাদি বলকর ঘৃতপক্ক জিনিষ ব্যবহার্য্য।

অপথ্য—শাক, অম্ল, কলাইয়ের ডাল, দিবানিদ্রা, চিন্তা, বাসিজিনিষ, ইত্যাদি। সালসা ব্যবহারকারী এই সকল বিধি-নিষেধ বিষয় বিবেচনার সহিত পালন করিবে; সর্ব্বদা গরম কাপড় গায়ে রাখিবে; সর্ব্বদা গরম জল ব্যবহার করিবে।

স্বর্গগতা দেবী স্বর্ণময়ী।

আজ যে স্বর্গস্থ রমণীরত্নের জীবন-কাহিনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তিনি যথার্থই এক ক্ষণজন্মা নারীরত্ন ছিলেন। তিনি অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া যেরূপ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহার বুদ্ধি যেরূপ পরিমার্জ্জিত, স্বভাব যেরূপ বিমল ও কর্ত্তব্যজ্ঞান যেরূপ উজ্জ্বল ছিল, তাহা দেখিয়া মনে হইত না যে তিনি "সেকেলে মেয়ে" ছিলেন। এক-দিকে যেমন তাঁহার তেজ ছিল, অন্য-দিকে তেমনি তাঁহার ন্যায় স্নেহশীলা মাতা অতি কমই দেখা যায়। তিনি যেমন পরকে আপনার করিতে পারিতেন, সেরূপ অল্পই দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজে কত রমণী আছেন যাঁহারা স্বর্ণময়ীর মধুর স্বভাবে এবং স্নেহ বাৎসল্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার সন্তানদের ন্যায় তাঁহারাও আজ মাতৃহারা হইয়াছেন। অন্যায় ব্যবহার, অন্যায় কথা, মিথ্যা কথা, মিথ্যা ব্যবহার স্বর্ণময়ী একেবারে সহ্য করিতে পারিতেন না। কাহারও অন্যায় ব্যবহার দেখিলে মুখের উপর বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। তিনি পরোক্ষে কাহারও নিন্দা করা দূষণীয় মনে করিতেন। সন্তানেরা যদি কখনও কাহারও নিন্দা করিত, তাহা হইলে বলিতেন "তোমরা আগে নিজে ভাল হও।"

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে গোয়ালন্দ সবডিভিসনের অধীন বাঙ্গালা গ্রামে মাতুলালয়ে স্বর্ণময়ীর জন্ম হয়। ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ সবডিবি-সনের অধীন মালুচি গ্রামের প্রসিদ্ধ বসু রায় বংশের ৺ রামদয়াল রায় মহাশয়ের দুহিতা। রামদয়াল রায় মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের একজন সুদক্ষ মোক্তার; তিনি সুবিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের

নিযুক্ত মোক্তার ও অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মই করিতেন না। রামদয়াল রায় মহাশয় অতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অতি উন্নত ও উদার ছিল। স্বর্ণময়ীই তাঁহার একমাত্র সন্তান। সঙ্গতিশালী পরিবারের একমাত্র কন্যা হইয়া তিনি আদর পাইয়া নষ্ট হইয়া যান নাই। আশৈশব পারিবারিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতরে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। অতি অল্প বয়স হইতেই তাঁহাকে গৃহিণীপনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। স্বর্ণময়ীর খুল্লতাত বাবু কৃষ্ণ দয়াল রায় মহাশয় এখনও বর্ত্তমান আছেন, তিনিই ইহাঁকে অতি যত্ন সহকারে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। স্বর্ণময়ীকে প্রায়ই বলিতে শুনা গিয়াছে "যা কিছু এখন একটু লিখিতে পড়িতে পারি, তা কাকার জন্যে।" যখন ইহাঁর ৮ বৎসর বয়স, তখন বিবাহ হইল। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই বিধবা হইলেন। নয় বৎসরের বিধবা বালিকা লইয়া রায়-পরিবার শোকসাগরে মগ্ন হইল। রামদয়াল রায় মহাশয় পাগলের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। শুনিয়াছি তিনি কত দিন কেঁদুয়া পুষ্করিণীর পাড়ে শুইয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন। এখন হইতে কৃষ্ণ-দয়াল রায় স্বর্ণময়ীকে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন। রামদয়াল রায় মহাশয় তাহাতে উৎসাহ দিতেন। সেকেলে লোক হইলেও তাঁহার বুদ্ধি ও মত অতি মার্জ্জিত ছিল। তাঁহার ভ্রাতা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগ দিতেন, ব্রাহ্মদের সহিত মিলিতেন মিশিতেন, তাহাতে তিনি কখনও বাধা দেন নাই। সেই প্রাচীন ব্রাহ্মদের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় একজন। তিনি কৃষ্ণদয়াল রায়ের বন্ধু বলিয়া রামদয়াল রায় মহাশয়েরও অতি প্রিয় ছিলেন। বালিকা স্বর্ণময়ীকে বিধবার ন্যায় পরিচ্ছদ ধারণ করিতে দেওয়া হয় নাই, কিন্তু পাছে তাহাতে জ্ঞাতিগণ রামদয়াল রায়কে সমাজচ্যুত করে, এই ভয়ে তিনি দেশে যাওয়া একরূপ বন্ধ করিলেন এবং কলিকাতা নগরে বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। খুল্লতাত মহাশয়ের অশেষ যত্নে ও নিজের অদম্য উৎসাহে স্বর্ণময়ী অতি শীঘ্রই অতি সুন্দর লেখাপড়া শিখিলেন। স্বর্ণময়ীর হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজিও কতক পড়িয়াছিলেন, ইংরাজী কথা এত জানিতেন যে, তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। কত সময় সামান্য দ্রব্যের ইংরাজী নাম ভুলিয়া গেলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিয়াছেন। স্বর্ণময়ী সন্তানদিগকে প্রায়ই বলিতেন "তোদের লেখাপড়ার জন্য যেরূপ টাকা খরচ হয়েছে, আমার জন্য যদি তার এক আনিও হোতো, তা'হলে তোদের চেয়ে ঢের বেশী শিখতে পারতাম।" সত্যই

স্বর্ণময়ীর বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল। রামদয়াল রায় মহাশয় সাংসারিক হিসাবপত্র লেখা দেখা ইত্যাদি সমস্ত ভার কন্যার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এখন হইতে স্বর্ণময়ী রীতিমত গৃহিণীপনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া কালে একজন সুদক্ষ গৃহিণী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেখিয়াছি অনেক বিজ্ঞ ব্যবসায়ী স্বর্ণময়ীর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিয়াছেন। কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয় একদিকে যেরূপ ভ্রাতৃপুত্রীকে লেখাপড়া শিখাইতেন, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকাদিও পাঠ করিতে দিতেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন। অতএব স্বর্ণময়ীর সেই সময় হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর আস্থা জন্মিয়াছিল।

এই সময় ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ লইয়া ভারতবর্ষে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও রায় মহাশয় সমাজের ভয়ে কন্যাকে বিবাহ দিতে পারিলেন না। স্বর্ণময়ীর যখন ১৪ বৎসর বয়স, তখন পিতা পরলোক গমন করিলেন। পিতা মৃত্যুসময় কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া ভ্রাতা কৃষ্ণদয়াল রায়ের হস্তে দিয়া বলিয়াছিলেন "ইহার একটা গতি করিও।" ভ্রাতাও অনুরোধ রক্ষা করিলেন। ১৭ বৎসর বয়সের সময় ময়মনসিংহ জেলার অধীন ঈশ্বরগঞ্জ সবডিভিসনস্থ মামদীপুর গ্রামের কাশীনাথ দেবের পুত্র কালীনাথ দেব মহাশয়ের সহিত স্বর্ণময়ীর বিবাহ হইল।

কালীনাথের জীবনও আশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ। পিতা কাশীনাথ দেব অতি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন কালীনাথ মাতৃগর্ভে ছিলেন। কাশীনাথ দেব ওকালতি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং এখনকার দিনের সরকারী উকিলের পদ প্রাপ্ত হন; কিন্তু অমিতব্যয়িতা দোষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। কালীনাথের মাতার বয়স তখন ১৫ বৎসর মাত্র। কালীনাথ যখন রাজসাহী গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তখন তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে হইয়াছিল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের বৎসরেক পরে ইনি ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কুমিল্লাতে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইলেন। কালীনাথ বাবু যখন ঢাকা কলেজে বি, এ পড়িতেন, তখন ঢাকার সুবিখ্যাত ব্রজসুন্দর বসু মহাশয়ের নিকট তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ব্রজসুন্দর বাবু কালীনাথ বাবুকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তিনিও ব্রজসুন্দর বাবুকে পিতার ন্যায় ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করিতেন। কালীনাথ বাবু ঢাকা কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ব্রেনান সাহেবের ছাত্র ছিলেন। অঙ্ক শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া ব্রেনান সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ত্রিপুরার বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্রী উমাকান্ত দাস রায় বাহাদুর, ৺ পার্ব্বতী চরণ

রায়, রামপ্রসাদ সেন, কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী, দীননাথ সেন, ভুবনমোহন শাহা রায় বাহাদুর ইত্যাদি মহোদয়গণ কালী নাথ বাবুর সমপাঠী ছিলেন এবং ইহাঁরা ঢাকায় এক ছাত্রাবাসে থাকিতেন। ঢাকানিবাসী গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয় কালীনাথ বাবুর বাল্যবন্ধু।

স্বর্ণময়ী শৈশবকাল হইতে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া মিলিত হইলেন। শৈশবে খুল্লতাত মহাশয়ের নিকট হইতে এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে শিখিয়াছিলেন, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাই করিয়াছিলেন। দৈনিক উপাসনা একদিনের জন্যও বাদ যায় নাই। ভীষণ ব্যাধির তাড়নায় শয্যাশায়ী হইয়াও দৈনিক উপাসনা ছাড়েন নাই। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও সমাহিতচিত্তে দৈনিক উপাসনা করিয়াছেন। স্বর্ণময়ী ধনবান্ পিতার একমাত্র কন্যা ছিলেন, সঙ্গতিপন্ন ঘরে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু অহঙ্কার বা বাবুগিরি কাহাকে বলে জানিতেন না। পাচক সত্ত্বেও প্রত্যহ স্বয়ং রন্ধন করিতেন এবং নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। স্বর্ণময়ীর ন্যায় সুনিপুণা গৃহিণী অতি অল্পই দেখা যায়। কালীনাথ বাবু বন্ধু বান্ধবদের নিকট প্রায়ই বলিতেন "উনি যদি আমার ঘরে না আসিতেন, তবে আমি মানুষ থাকিতাম না।" কুমিল্লায় অবস্থানকালে কালীনাথ বাবুর ভীষণ বহুমূত্র পীড়া দেখা দিল। এই পীড়াগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে অতি সাবধানে থাকিতে হইত। ভাত একেবারে খাইতেন না, ননীতোলা দুধ, মাংস এবং রুটী এই তাঁহার আহার ছিল। স্বর্ণময়ী প্রাণপণে স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। কালীনাথ বাবু অত্যন্ত বলবান্ লোক ছিলেন। রসগোল্লা সন্দেশ অতিশয় ভালবাসিতেন এবং একেবারে অনেক খাইতে পারিতেন। তাঁহার খাওয়ার কথা এখনও তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা বলিয়া থাকেন। একটা ছাগলের মাংস একলা একেবারে খাইতে পারিতেন। আম্রফলও তাঁহার একেবারে নিষিদ্ধ হইল। স্বর্ণময়ীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল আহার ছাড়িলেন এবং যতদিন বাঁচিয়াছিলেন উহা স্পর্শ করেন নাই। স্বর্ণময়ী একটী ব্রাহ্মণ-পুত্রকে অতি শৈশবকাল হইতে সন্তানবৎ লালনপালন করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। তিনি এখন মধ্যভারতে বিষয় কার্য্য করিতেছেন। স্বর্ণময়ী তাঁহাকে এরূপ স্নেহ ও যত্ন করিতেন যে তাঁহার সন্তানেরা তাঁহাকে কখনও পর ভাবিতে পারেন নাই। কালীনাথ বাবুর গৃহ কখনও অতিথি ছাড়া থাকিত না; সর্ব্বদাই দুই একটী অতিথি অভ্যাগত বাস করিতেন। স্বর্ণময়ী তাঁহাদিগকে অত্যন্ত আদর যত্ন পূর্ব্বক সেবা করিতেন। বন্ধুদের মুখে এখনও তাঁহার অতিথিসৎকারের ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাই।

স্বর্ণময়ীর বিবাহের প্রায় দুই বৎসর পরে ইহাঁদের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার নামকরণোপলক্ষে ব্রাহ্মোপসনা হয় এবং পূজ্যপাদ বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় ইহার বিদ্যারম্ভসূচক ব্রহ্মোপসনা করেন। ক্রমান্বয়ে তিন পুত্র ও চারি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। প্রথমা কন্যা (দ্বিতীয় সন্তান) ভূমিষ্ঠ হইবার প্রায় ৮মাস পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ কন্যা এবং পঞ্চম পুত্রের নামকরণোপলক্ষে কালীকচ্ছ নিবাসী ৺আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ষষ্ঠ কন্যার নামকরণোপলক্ষে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় গমন করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। সপ্তম সন্তানের নামকরণোপলক্ষে বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় কাঁথি গমন করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করেন। কালীনাথ বাবুই ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। কি করিয়া শিক্ষা দিলে পুত্র কন্যারা সকল বিষয়ে সুশিক্ষিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। পুত্রকন্যারা তখন অতি ছোট ছিল, কিন্তু তবুও কালীনাথ বাবু এবং স্বর্ণময়ী তাহাদিগকে লইয়া প্রতি রবিবার নিয়মিত ব্রাহ্মোপসনা করিতে বসিতেন। পাপ, কুসংস্কার, মিথ্যার প্রতি ঘৃণা করিতে তাহাদিগকে শৈশব কালেই শিখাইয়াছিলেন। অন্য ছেলেদের সহিত ছোটকালে মিশিলে পাছে সন্তানদের মনে কুসংস্কার জন্মে, এই ভয়ে তাহাদিগকে প্রায় কাহারও সহিত মিশিতে দিতেন না। কালীনাথ বাবু অত্যন্ত কুসংস্কার-বর্জ্জিত লোক ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন "আমার মেয়ের সঙ্গে বামনের ছেলের বিয়ে দেবো।" কন্যাগণকে বেশী ভালবাসিতেন। বঙ্গরমণীগণের দুর্দ্দশার প্রতি সহানুভূতিই ইহার কারণ। স্বর্ণময়ী কখনও কখনও বলিতেন "মেয়েদের অত বাবুগিরি শিখান কেন হইতেছে?" তাহাতে কালীনাথ বাবু বলিতেন "আমার এখানেও ইহারা কষ্ট করিবে?" বঙ্গরমণীগণের দুর্দ্দশার কথা শুনিলে প্রাণে এত আঘাত পাইতেন যে, বক্ষে হাত বুলাইয়া "আহা আহা" করিতেন। যখন কলেজে পড়িতেন, তখনই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "বিধবা বিবাহ করিব।" এইরূপ স্বামীর হস্তে পড়িয়া স্বর্ণময়ীর জীবন আরও উন্নত হইল। কুসংস্কার সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

কালী নাথ বাবু জেষ্ঠা কন্যাকে বেথুন স্কুলের বোর্ডিংয়ে পাশ দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। তখন মেয়ের বয়স আট বৎসর মাত্র ছিল। কিন্তু কন্যার অত্যন্ত অনিচ্ছা দেখিয়া কাঁথিতেই একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কন্যাদিগকে তথায় ভর্ত্তী করিয়া দিলেন। পুত্রের জন্য যেরূপ মাষ্টার নিযুক্ত করিলেন, কন্যাদিগের জন্যও তাহাই হইল। এইরূপে স্বর্ণময়ী স্বামীর নিকট পুরুষের ন্যায় স্ত্রী-শিক্ষারও গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন। উদারচেতা মহানুভব পতির নিকট

অনেক শিক্ষা করিলেন। যোগফল গুণ প্রভৃতি অনুশীলনের অভাবে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, তাহা এখন পূর্ণতা লাভ করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। নারীগণ পুরুষের অধীন এবং তাঁহাদের সেবাদাসী হইয়া সৃষ্ট হইয়াছেন ; এই কুসংস্কার উদারহৃদয় পতির সহবাসে থাকিয়া সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। শিক্ষার অভাবেই যে বঙ্গনারীগণের এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অতএব কন্যাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে এই তাঁহাদের মূল মন্ত্র হইল। বঙ্গরমণীগণের অস্বাভাবিক লজ্জা কালীনাথ বাবু একেবারে পছন্দ করিতেন না। স্বর্ণময়ী জন্মাবধি সম্মানিত হিন্দু পরিবারে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তিনি এই লজ্জা কি করিয়া ত্যাগ করিবেন ? অনেক চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না। কালীনাথ বাবু ভয় পাইলেন পাছে কন্যারা মাতার দেখাদেখি এই অস্বাভাবিক লজ্জা শিক্ষা করে। কন্যাদিগকে লইয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের সহিত একত্রে আহার করিতেন। বৈঠকখানায় কন্যাদিগকে সঙ্গে করিয়া বসিতেন ও তাহাদিগকে সকলের নিকট সঙ্গীত করিতে বলিতেন। এইরূপে সকল বিষয়ে সংস্কারপ্রয়াসী গৃহকর্ত্তার নিকট স্বর্ণময়ীর কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া উদারতা শিক্ষা হইল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই আষাঢ় কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটস্থ ভাড়াটীয়া বাটীতে প্রায় ৪১ বৎসর বয়সে দারুণ বহুমূত্র রোগে কালীনাথবাবু মানবলীলা সংবরণ করিলেন। স্বর্ণময়ী ছয়টী শিশু সন্তান লইয়া অকূল সাগরে ভাসিলেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পতিকে অকালে হারাইয়া শোকে মুহ্যমানা হইলেন। দেখিয়াছি ছয়মাস পর্য্যন্ত তিনি শয্যা ত্যাগ করেন নাই। অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছিলেন। দিবারাত্রি ক্রন্দন, শরীরের প্রতি উপেক্ষা ইত্যাদি কারণে তাঁহার শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া পড়িল। একত্রিশ বৎসরের বিধবা রমণী এতগুলি শিশু সন্তান লইয়া কোথায় দাঁড়াইবেন, কে অভিভাবকের কার্য্য করিবে, এই সকল ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। কালীনাথ বাবু কেবল মাত্র কয়েক সহস্র টাকার কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। নিরাশ্রয় অবস্থায় একাকিনী এতগুলি সন্তানকে কি করিয়া মানুষ করিবেন ভাবিয়া তাঁহার শোকাগ্নি দ্বিগুণিত হইল। যে সকল সন্তান আজন্ম সম্পদে বর্দ্ধিত হইতেছিল, হঠাৎ সংসারের ঘোরতর পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহারাও আতঙ্কিত হইল। যখন সকলের এইরূপ অবস্থা, তখন কালীনাথ বাবুর ধর্ম্মবন্ধু ৺বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় স্বর্ণময়ীর প্রাণে আশ্চর্য্য রূপে শান্তিবারি বর্ষণ করিয়াছিলেন। জগদীশ্বর স্বয়ং গোস্বামী মহাশয়ের মধ্য দিয়া স্বর্ণময়ীকে সান্ত্বনা দিলেন। পরম পিতা স্বয়ং অসহায় পরিবারের গৃহস্বামী হইয়া তিনিই সকল ভার নিজ হস্তে লইলেন। স্বর্গীয় গোস্বামী মহাশয় সন্তান

সন্তুতি সহ স্বর্ণময়ীকে নিজের বাটীতে আনয়ন করিলেন ও প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া স্বর্ণময়ীর শোকাগ্নি প্রশমিত করিতে প্রয়াসী হইলেন। গোস্বামী মহাশয়ের ইঙ্গিত অনুসারে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও শ্বশ্রূঠাকুরাণী প্রতি রবিবারে স্বর্ণময়ীকে ব্রহ্মমন্দিরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপে স্বর্ণময়ীর অশান্ত দগ্ধ প্রাণ শান্ত ও শীতল ভাব ধারণ করিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)।

নূতন সংবাদ।

১। বোয়ার যুদ্ধের ন্যায় বোয়ারদিগের সহিত ইংলণ্ডের সন্ধিস্থাপন বর্ত্তমান যুগের প্রধান ঘটনা। উভয় পক্ষের স্বার্থ ও সম্মান রক্ষা করিয়া এই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া শান্তিদাতা ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ করিতেছি।

২। ২৬এ জুন ইংলণ্ডেশ্বর ভারতসম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের বিপুল আয়োজন হইয়া হঠাৎ তাহা স্থগিত হওয়াতে পৃথিবী শুদ্ধ লোক আতঙ্কিত, স্তম্ভিত ও বিষাদিত। সম্রাটের উদর মধ্যে স্ফোটক হওয়াতে ক্লোরোফরম করিয়া কাটিতে হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। জগদীশ্বর আমাদের সম্রাট্‌কে রক্ষা করুন্।

৩। সম্রাট্ বিপন্ন অবস্থাতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, গরিবদিগের ভোজ দেওয়ার বন্দোবস্ত স্থগিত না হয়।

৪। এ বৎসর বড় দুর্ব্বৎসর! মার্টিনিক অগ্ন্যুৎপাতে ৪০ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ১৮ই এপ্রেল হইতে ৩ দিন ধরিয়া আমেরিকার গোয়াটিমালায় যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ১০ হাজারের অধিক লোক মারা গিয়াছে। স্পেন, ফ্রান্স, গ্রীশ প্রভৃতি দেশে ভূমিকম্প হইয়াছে।

৫। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর বৃদ্ধতম লোকটীর নাম ক্রুনো কোট্রিম। তিনি রাইও জেনিরো নিবাসী, তাঁহার বয়স ১৫০ হইয়াছে।

৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার এডওয়ার্ড সাহেব ৩ মাসের ছুটী লওয়াতে সুবিদ্বান্ বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ বি এল তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন, এ সংবাদে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

৭। নেপাল গবর্ণমেণ্ট ৮ জন নেপালী যুবককে দেশালাই নির্ম্মাণ, খনির কাজ প্রভৃতি শিক্ষার জন্য জাপানে পাঠাইয়াছেন। পঞ্জাবের আর্য্যসমাজও কয়েকটী পঞ্জাবীকে পাঠাইয়াছেন। বাঙ্গালীরা উদ্যোগী হউন্।

৮। হাইকোর্টের উকীল সিরাজ-উল-ইসলাম খাঁ বাহাদুর চট্টগ্রাম বিভাগের

ডিষ্টিক্ট বোর্ডের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

৯। মান্দ্রাজের ভূপুরু নামক স্থানে সামাজিক সমিতি নামে এক সভা স্থাপিত হইয়া বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সেক্সপিয়ার ৪র্থ ভাগ বা শেষ—খ্যাতনামা ভক্ত, ভাবুক, সুকবি ও সুলেখক শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাকবি সেক্সপিয়ারের সমগ্র নাটকাবলীর মর্ম্মানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকারা যাহাতে সেক্সপিয়ারের নাটকাবলী আখ্যায়িকার আকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। জগদীশ্বর সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি কাটাইয়া ভক্তের কামনা পূর্ণ করেন, তাই হারাণের মনোরথ পূর্ণ হইল। যাঁহারা মূল সেক্সপিয়র পড়েন নাই, তাঁহারা এতৎপাঠে সেই স্বর্গীয় প্রতিভারাশির বিচিত্র চরিত্রসৃষ্টি ও তদীয় কাব্যের কল্যাণময় নীতিতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া উপকৃত, পুলকিত ও মুগ্ধ হইবেন। হারাণবাবুর ভাষা এত সরল, নির্ম্মল, ওজস্বী ও মর্ম্মস্পর্শী যে, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া থাকা যায় না। বোধ হয় যেন, তাঁহার লেখনীর মুখ দিয়া তাঁহার মনপ্রাণ গলিয়া বাহির হইয়াছে। ইংরাজির অনুকরণে সচরাচর যেরূপ ভাষাবিকার ঘটিয়া থাকে, হারাণবাবুর লেখায় তাহা নাই। সাধারণ বঙ্গবাসীর নিকট, যাহা এতদিন বিদেশীয়, বিজাতীয়, অপরিচিত সামগ্রী ছিল, আজি হারাণের কল্যাণে তাহা স্বদেশীয়, স্বজাতীয় একটী অপূর্ব্ব ভোগ্যরূপে বঙ্গবাসীর ব্যবহার্য্য হইল। এ বাঙ্গালা সেক্সপিয়ার বঙ্গভাষার চিরগৌরব হইয়া হারাণ বাবুর নাম অনশ্বর রাখিবে। বঙ্গভাষার এ সমৃদ্ধি অচিন্তনীয়। বাল্যকালে বঙ্গভাষাকে যে আকারে দেখিয়াছিলাম, আর আজি যাহা দেখিতেছি, তাহাতে জ্ঞান হয় যেন আমাদের মাতৃভাষার যুগান্তর উপস্থিত। মাতৃভাষার এ অভিনব কান্তি ও পুষ্টি দর্শন করিয়া কোন্ বঙ্গসন্তানের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত না হয়? যে স্থানে স্বদেশের ও স্বজাতির জন্য আত্ম-বিসর্জ্জনের কথা, যে স্থানে পতিপ্রাণা সতীর ও দৃঢ়ব্রত ধর্ম্মবীরের অগ্নিপরীক্ষার কথা, যে স্থানে সত্য, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের সহিত অসত্য, অধর্ম্ম ও অবিচারের সঙ্ঘর্ষ, সেই সকল স্থানে সেক্সপিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে হারাণের লেখনীও অগ্নি উদ্গিরণ করিয়াছে।

সেক্সপিয়ারের অবিকল অনুবাদ করিতে না গিয়া হারাণ বাবু ভালই করিয়াছেন। ইহাতে মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, অথচ হাস্যকর অকৃতার্থতা দোষ ঘটে নাই। বস্তুতঃ মহাকবির কাব্যের প্রকৃত অনুবাদ হয় না। তাহাকে ভাষান্তরিত করিতে গেলে বিকৃত হইয়া পড়ে। অথচ, সেই মূল গ্রন্থে যে অমূল্য উপদেশ আছে, তাহাও অন্যজাতির উপেক্ষণীয় নহে। তাই বলিতেছি, সেক্সপিয়ারের জগৎপ্রাণ মহান্ উপদেশ স্বদেশবাসীকে সরল আখ্যায়িকার আকারে প্রদান করিয়া হারাণ সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। হারাণের প্রসাদে সেক্সপিয়ারের পরমার্থ-প্রদ উপদেশগুলি আমাদের স্বাভাবিক ভাবে লাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। মূল সেক্সপিয়ার পড়িলে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়, বিচিত্র ঘটনাজালের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে যেমন কবির চরম লক্ষ্য সেই অনন্ত মঙ্গলময় জ্ঞানের ক্রোড়ে নীত হয়, এ বাঙ্গালা সেক্সপিয়ার পড়িলেও বঙ্গবাসীর হৃদয় সেই দিব্য বস্তুর নিকট উপস্থিত হইয়া এবং তাহার "শান্তপাবনমচিন্ত্যবৈভবম্"—জ্যোতিঃ লাভ করিয়া পূত ও ধূতপাপ হয়।

মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার নব নব মহোপকারের জন্য মা সর্ব্বমঙ্গলা আমাদের হারাণকে চিরজীবী ও চিরনিরাময় করিয়া রাখুন।

২। অমৃতসাগর—শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামিকৃত, শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী চৌধুরাণীর আনুকূল্যে প্রকাশিত, মূল্য ১।৹ মাত্র। স্বামী শিবনারায়ণ বর্ত্তমান সময়ের একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগুরু এবং তাঁহার উপদেশে অনেক শিষ্য আকৃষ্ট হইয়াছেন। ইহঁার ধর্ম্মমত, সামাজিক বিধি ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সাধনার প্রণালী যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা এই পুস্তক খানি মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিবেন। ইহাতে অনেক গভীর পরমার্থ তত্ত্ব, হিতকর উপদেশ, এবং দূষিত দেশাচার ও কুসংস্কারের প্রতিবাদ আছে। কিন্তু ইহাতে নূতনবিধ কোন কোন কুসংস্কার সূক্ষ্মভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে সাবধান হওয়া আবশ্যক। সূর্য্যদেবের উপাসনা, অদ্বৈতবাদ, নিরাকারের সহিত আত্মার যোগের অসম্ভাবনা এবং হোমক্রিয়া ইত্যাদির অতিরিক্ত পক্ষপাতিতা হেতু স্বামীজীর মত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইবে কি না সন্দেহস্থল।

৩। যুগান্তর—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম এ প্রণীত, ২য় সংস্করণ, মূল্য ১৲ টাকা। এই বৃহৎ পুস্তকের ইতিমধ্যে ২য় সংস্করণ হইয়াছে, ইহাদ্বারা গ্রন্থের গুণবত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে অনেক গুলি প্রাচীন ও নবীন চরিত্রের সুন্দর চিত্র আছে। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে অনেক অনুকূল যুক্তি ও দৃষ্টান্ত আছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের বাঙ্গলা যে সরস, বিশুদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী, তাহার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য।

বামারচনা।

নববর্ষের প্রতি।

(বন্ধুর অন্তিম অবস্থা দর্শনে)

হে বর্ষ!
বহুবার ঘুরিয়াছ মাথার উপর,
বহু বজ্রাঘাতে প্রাণ করেছ কাতর।
অতি ত্রাসে হে নবীন! তাই তোমা হেরি।
আহ্বান করিতে ভয়, তাই যাই সরি॥
পুরাতন কি পুরায়েছে? বলা যে দুষ্কর,
আঘাতে আঘাতে তার, বিচূর্ণ অন্তর।
নবীন! তোমাকে কত আদর উল্লাসে
অভ্যর্থনা করিয়াছি, কোথা গেল ভেসে
সে শ্যামল ভাব হায়! প্রাণ যে আঁধার।
তাই হে নবীন সখা, ডরি গো তোমার
পরশ। যদি বা দাও প্রেম-আলিঙ্গন,
নবাঘাতে বৃদ্ধি কর প্রাণের বেদন॥
মিত্র ভাবে শত্রু তুমি, তাই তোমা ডরি;
আহ্বান করিতে ভয়, তাই যাই সরি॥

শ্রীমতী—

"বিহঙ্গ বিচিত্র।"

(লালমোহন)

১

নয়নের তৃপ্তিকর
সুন্দর বিহগবর!
বল্ দেখি মোরে,—
এসেছিস কোন্ কাজে?
সাজিয়ে মোহন সাজে
দুঃখিনীর ঘরে।—

২

হিয়া মো॰ বিষাদিত,
করেছিস্ পুলকিত
সুমধুর গানে,
হেরিয়া রূপের ছটা,
বিচিত্র বরণ-ঘটা,
হরষ উথলে প্রাণে।

৩

বড় এই সাধ মনে,
প্রতিদিন সযতনে
সেবিব পাখীরে;
নানাবিধ পাকা ফল,
দিব দুধ, ভাত জল
পিঞ্জর ভিতরে।

৪

সুন্দর বিস্তার পাখা
রাঙ্গা পীত বর্ণে আঁকা
রচনা যাঁহার,
বিচিত্র সুন্দরতম
জ্যোতির্ম্ময় মনোরম
তিনি মূলাধার।

৫

যথা ফনোগ্রাফ যন্ত্রে
অপূর্ব্ব মোহিনী মন্ত্রে

গায়কের গীত—
সুরে তানে—অবিকল
কাব্য-গীতি অনর্গল
হয় উচ্চারিত—

৬

তেমনি বিহগ-গানে
ধ্বনিত ললিত তানে,
বিশ্ব-গীতি রবে;
অমিয়া জড়িত ভাষা—
পায় তাঁর ভালবাসা—
সকল মানবে।

৭

কাননের পাখী তুই
ছাড়িয়া স্বদেশ ভূঁই
আছ বন্দী হ'য়ে;
দিবানিশি এই মনে,
কবে পাখী সঙ্গি-সনে
বেড়াবে খেলিয়ে।

৮

দেহের পিঞ্জর ছাড়ি,
মন পাখী চল বাড়ী
নাহি সুখ হেথা;
মিছে কেন এই ভবে
কাল যাপ বন্দী ভাবে,
চল, সুখ যেথা।

স্নেহলতা দত্ত।

ঊষাবালা।*

তোমাতে আমাতে আজ কত ব্যবধান!
কত দেশ, কত শৈল মাঝে কত নদী,
তথাপি তোমার তরে কেন কাঁদে প্রাণ?
মোহিনী মূরতি তব ভাবি নিরবধি!
কে তুমি আমার!—কোন্ অলক্ষ্য বন্ধনে
বাঁধিয়া পরাণ মম কর আকর্ষণ?
নিয়ত ভাবিয়া মরি একা মনে মনে,
তথাপি ভাবিতে সাধ হয় অনুক্ষণ!
এসহে বিয়াক্ত চিন্তা.—অনন্ত মধুর,
যত ভাবি তত প্রাণ হয় মধুময়;
গ্রাম জনপদ ভেদি কাছে আছে "দূর"
মলয় পবনে হয় শীতল হৃদয়!
অয়স্কান্ত মণি যেন না বলিয়ে দিতে
আপনা আপনি লৌহ করে আকর্ষণ,
তেমনি পরাণ মম আপনা হইতে
তোমার মধুর ছবি করিছে স্মরণ!
বুঝিতে পেরেছি সখি, নিজে ভগবান,
গড়েছেন আমাদের করিয়া এমনি,
একের কারণে কাঁদে অপরের প্রাণ
একসুরে সাধা যেন দুইটী রাগিণী!
তুমি আমি যেন দুটী আকাশের তারা,
দুজনে দোঁহার পানে চেয়ে অনিমেষে,
তুমি আমি যেন দুটী পাখী পথহারা,
দুজনেই চলিয়াছি ছুটি দুই দেশে!
তুমি আমি যেন দুটী কাননের ফুল,
দোঁহার সৌরভে দোঁহে হয়েছি বিভোর,

---

* বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্গগতা তৃতীয়া কন্যা। ইনি বোম্বাই প্রদেশে বিবাহিতা হন।

এক তটিনীর যেন মোরা দুটী কূল,
নয়নে নয়নে মাখা চির ঘুমঘোর !
আবেশে অবশ হ'য়ে যেন দুইজনে
স্নেহ পারাবার মাঝে দিতেছি সাঁতার,
কভু ঢেউয়ে দূরে নেয়, কভু কাছে আনে,
তরঙ্গে তরঙ্গে প্রাণ নাচে দুজনার !

এস আজ দুইজনে করি যোড়কর
কাতর অন্তরে যাচি বিধাতার পায়,
এ স্নেহলহরী যেন রহে নিরন্তর
আমি ভুলিব না, তুমি ভুলোনা আমায় !

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ,
মরেল গঞ্জ।

বিনয়ভূষণ।*

খোকারে প্রাণের খোকা বিনয়ভূষণ !
তোমাকে কালের কোপে দিয়ে বিসর্জন
হইয়া জীবন্মৃত বেঁচে আছি আমি,
অন্তরের দুঃখ মম জানে অন্তর্যামী।
ফিরিয়া আসিল খোকা সেই জ্যৈষ্ঠমাস,
যে মাসে হয়েছে মম ঘোর সর্ব্বনাশ।
মধুর বসন্তকাল আসিল আবার,
আমার মানস ফুলে মধু নাই আর।
আসিল বরষা পুনঃ যে বরষা কালে
ভাসিয়াছি অভাগিনী নয়নের জলে।
আবার পাকিল ওরে খেজুর কাঁঠাল,
তুমি না আসিলে ফিরে সোণার গোপাল !
আবার ফলিল ডাব নারিকেল গাছে,
আমার প্রাণের খোকা কোন্ খানে
আছে ?
আবার পাকিল আম যে আমের তরে
কাঁদিয়াছ খোকা তুমি আর্ত্তনাদ ক'রে।
খোকা, আমি এখনও সেই বরিশালে
বাস করিতেছি, ছেড়ে যাই নাই চলে।

সেই যে রিজার্ভ ট্যাঙ্ক খোকারে আমার,
যে ট্যাঙ্কের জল ছিল পানীয় তোমার,
এখনও সে ট্যাঙ্ক মম বাসার পারশে
জ্বালিতেছে শোক-অগ্নি আমার মানসে।
সেই বাসা সেই বাড়ী সেই বরিশাল,
সেই আছি নন্দরাণী—নাই সে গোপাল।
সেই বৃন্দাবন সেই শ্রীদাম সুদাম,
প্রাণ নিয়ে মথুরায় চলে গেছে শ্যাম।
ননী নিয়ে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াই,
আয়রে রাখালরাজা আয়রে কানাই।
কেন তুমি গেলে খোকা এত দূরদেশে,
প্রেমের পৃথিবী ত্যজি উদাসীন বেশে ?
সেই আমি যার দুঃখ করিলে দর্শন
কতই দুঃখিত হ'য়ে করিতে ক্রন্দন।
কাঁদিতেছে দিবানিশি সেই মা তোমার,
আয়রে আয়রে আয় সুধার আধার !
হৃদয় মাঝারে আয় হৃদয়রতন—
বাবা বাবা খোকা খোকা বিনয়ভূষণ।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

* স্বর্গগত বিনয়ভূষণ দাস গুপ্তের মৃত্যু উপলক্ষে এই শোক-কবিতা লিখিত।

Registered No. C. 134

No. 468. August, 1902.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ। ৪৬৮ সংখ্যা। | শ্রাবণ—১৩০৯। আগষ্ট—১৯০২। | ৭ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 468. August, 1902.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪০ বর্ষ। ৪৬৮ সংখ্যা। | শ্রাবণ—১৩০৯। আগষ্ট—১৯০২। | ৭ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজসংবাদ—রাজা ৭ম এডওয়ার্ড ভগবানের কৃপায় আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এখন সস্ত্রীক বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়াছেন। আগষ্ট মাসে পুনরায় রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা হইতেছে। জগদীশ্বর ভারত-সম্রাট্‌কে শীঘ্র সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল করিয়া শুভানুষ্ঠান সম্পাদনের সহায় হউন্।

বুয়র-ইংরেজ-সন্ধি—রাজা এডওয়ার্ডকে সকল সাধুলোক ধন্য ধন্য করিতেছেন যে তিনি এই সন্ধি স্থাপন দ্বারা অনেক ধন প্রাণ রক্ষা করিয়া জগতের মহাকল্যাণ সাধন করিলেন। সন্ধিবন্ধন হইবামাত্র ট্রান্সভাল গবর্ণমেণ্ট ৫০ জন বডীগার্ডের সহিত লর্ড কিচনারের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন। এখন প্রতিদিন সহস্র সহস্র বুয়র ইংলণ্ডরাজের অধীনতা স্বীকার করিতেছে।

মন্ত্রিপরিবর্ত্তন—লর্ড সালিসবরি অনেক দিন ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রিপদ পরিত্যাগের জন্য ব্যগ্র ছিলেন, অসুস্থতা নিবন্ধন সম্প্রতি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পদে ব্যালফোর সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

বুয়র-জিতের অভ্যর্থনা—দক্ষিণ আফ্রিকার সেনাপতি লর্ড কিচেনার বলে যত হউক না হউক, সদ্ভাবে বুয়রদিগকে পরাজিত করিয়া আপনার অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। ইংলণ্ড-বাসীরা মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছেন। এ সংবাদে আমরা সুখী হইলাম।

অগ্ন্যুৎপাত—ফরাসী অধিকার মার্টি-নিকেরত সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আবার ডোমিনিকা ও সেণ্ট ভিনসেণ্টের আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গিরণ আরম্ভ হইয়াছে। স্পেন, ফ্রান্স ও সিসিলিতে ভূমিকম্প

হইতেছে, এটনা পর্ব্বত আবার বহ্নিমান্ হইবে এইটী আশঙ্কা।

আশ্চর্য্য স্ত্রী-অধ্যবসায়—আমেরিকায় এক রমণী ৬৮ বৎসর বয়সে পাঠারম্ভ করিয়া ৭৬ বৎসর বয়সে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। "বিদ্যা বুড়া হয় না," সত্য কথা। এ দেশের বয়স্কা রমণীরা কি এ সত্যের প্রমাণ দিবেন না?

দাতা কার্ণাজী—যে কার্ণাজী ধনকুবের হইয়া ইংরাজ-সমাজে দাতাকর্ণের স্থান পাইয়াছেন, তিনি প্রথমে রাস্তা ঝাঁট দেওয়ায় কাজ করিতেন। তখন তাঁহার সঙ্গী মেতুয়া আর কয়েক জন ছিল। তাহাদের মধ্যে মাককার্গো আলিঘানি ভ্যালি রেলরোডের এবং রবার্ট পিকটের্ণ পেনসিলভিনিয়ার রেলরোডের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তৃতীয় সঙ্গী মোরলাণ্ড একজন প্রসিদ্ধ আটর্ণি। ঈশ্বর প্রসাদে পুরুষকারে কি না হয়?

বদান্যতা—ঢাকার বর্ত্তমান নবাব সলিমুল্লা আলিপুর পশুশালায় ভল্লুকাবাসের জন্য ১৫,০০০ টাকা দিয়াছেন! ময়ুরভঞ্জের মহারাজা কুমারী ঘোষালের প্রস্তাবিত বালিকা বিদ্যালয়ে ১০ হাজার, ব্রাহ্মবালিকাবিদ্যালয়ে ১ হাজার, সিটী কলেজে ১ হাজার, এবং বাঁকীপুর রামমোহন রায় সেমিনারীতে ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন।

শোচনীয় মৃত্যু—সুগায়ক ধর্ম্মনিষ্ঠ যুবক বাবু মনোমত ধন দেব গত ১৮ই জুন চৌরঙ্গীর বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ী চড়িতে গিয়া হঠাৎ পড়িয়া গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে বহুলোক হাহাকার করিতেছেন। মঙ্গলময় ঈশ্বর তাঁহার অমর আত্মার কল্যাণ করুন এবং শোকার্ত্ত পরিজন ও আত্মীয় বন্ধুদিগকে সান্ত্বনা দান করুন। মনোমত ধন আলাপিনী সম্পাদন করিতেছিলেন, তাহা কি আর চলিবে?

শিবজী উৎসব—গত ৫ই আষাঢ় মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবজীর জন্মমহোৎসব কলিকাতায় মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে যে সভা হয়, তাহাতে বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির কার্য্য এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বিপিন চন্দ্র পাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

বিক্টোরিয়া স্মৃতিফণ্ড—দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর বিক্টোরিয়া স্মৃতিফণ্ডে ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আর ৪।৫ লক্ষ হইলে ৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান হয়।

জাপানে স্ত্রী-শিক্ষা—জাপানে স্ত্রীলোকদের যে উপাধি বিতরণ সভা হয়, তাহাতে শত শত উপাধিধারিণী রমণী উপস্থিত ছিলেন। স্ত্রীজাতির সুশিক্ষা ও উন্নতি না হইলে জাপান কি এত বড় হইতে পারিত?

নূতন সাধারণতন্ত্র—আমেরিকার কিউবা একটী নূতন সাধারণতন্ত্র হইয়াছে। মুসর পামা ইহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট বা সর্ব্বাধ্যক্ষ।

মাতৃশ্রাদ্ধে সৎকীর্ত্তি—সুপ্রসিদ্ধ

ডাক্তার রসিকলাল দত্ত (Dr. R. L. Datta) তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে ৫০,০০০ টাকা দিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার বাসভূমি হাবড়ায় গরিবদিগের জন্য সুন্দর স্বাস্থ্যকর বস্তী নির্ম্মিত হইবে।

আর্য্য সমাজের উন্নতি—১০ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যসমাজের সভ্যসংখ্যা ৪০ হাজার ছিল, এ বৎসর ৬৭, ১০৫ হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজেরও লোকসংখ্যা বাড়িতেছে বটে, কিন্তু এ পরিমাণে নয়।

তীর্থযাত্রা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—শঠে শঠে।

গভীরা রজনী। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, জমীদার মীর মহম্মদ নিদ্রা যান নাই। নিকটে বয়স্য নফর দাস বসিয়া মৃদুস্বরে কি কথোপকথন করিতেছে। সেখানে একটী বালক ভৃত্য ছাড়া আর কেহই নাই। ভৃত্যটী পরম বিশ্বস্ত। "হুজুরের সুখের জন্য নফর প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে, "এখন একদিন নূতন বিবীকে আমাদের এই প্রমোদ-ভবনে আনিয়া জলসা করিতে হইবে" নফর অতিশয় আহ্লাদভরে কহিল। কিন্তু মীর-সাহেব এখনও সম্পূর্ণ নির্ভীক নহেন, তাই তাঁহার প্রাণে এখনও আনন্দ ফোয়ারা খুলিতেছে না। তিনি গম্ভীরভাবে অতি মৃদুস্বরে কহিলেন "সেই যে গঙ্গাতীর হইতে আনিয়া ফেলিয়াছি, এখনও তাহার চেতনা হয় নাই এবং জলবিন্দু রমণীর মুখে কেহ দিতে পারে নাই। বোধ করি তাহার উদরে বিস্তর জল প্রবেশ করিয়াছে। হাকিম সাহেবকে ৫ হাজার টাকা পুরস্কারের লোভ দেখান হইয়াছে, তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য করিবেন বলিয়াছেন; একবার চোখ মেলতে পারলে হয়। মেয়ে মানুষকে ভুলাতে কতক্ষণ লাগে? তবে শুনতে পাই হিঁদুর ঘরের মেয়েরা বড়' একগুঁয়ে।" নফর তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিল "আর মহাশয়, আপনি যখন সেই জহর বিবির মুক্তামালাগাছি লইয়া দাঁড়াইবেন, তখন আর সে অটল প্রতিজ্ঞা থাকিবে না, দেখবেন তখন মতিতে মতি মিলিবে।" মীরসাহেব কহিলেন "ভাই হে, তোমার জন্য এ অতুল সুখের অধি-কারী হইব। কিন্তু সাবধান! সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ছোঁড়া আবার না আগুন লাগায়।" "না না, সেটা একে বোকা, তাতে দুঃখে কষ্টে হতবুদ্ধি হইয়াছে। না আছে সহায় না আছে সম্পত্তি, সে আপনারই অনু-গ্রহের ভিখারী। শুনছি নাকি ছোকরা সন্ন্যাসী হয়ে দেশে দেশে ভিক্ষা করে খাবে।" এই বলিয়া নফর কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উদ্বিগ্নভাবে কহিল "আর এক ছোঁড়া পুলিশের চাকরী

করে, গিরিবর দত্ত তাহার নাম, জাতিতে ক্ষত্রিয়। সে তাহার বড় বন্ধু ও মুরব্বী হইয়াছে। তা আপনি এত বড় জমীদার, আপনার অন্দরে পিপীলিকা প্রবেশের সাধ্য নাই। যে তয়খানায় তাহাকে রাখা হইয়াছে, সেখানে বায়ু পর্য্যন্ত যাইতে সঙ্কোচ করে। যে সময় জল হইতে তুলিয়া ক্লোরোফম শিশি নাকে ধরিলাম আর অমনি তিনি মহা ঘুমে অচৈতন্য, তাঁহারত কোন সংজ্ঞাই ছিল না। মশাই, এ নফরের ফাঁপরে যে পড়ে, তার কি আর রক্ষা আছে? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" কিন্তু এ সান্ত্বনায় মীরসাহেব সুস্থির হইতে পারিলেন না। দোষীর চিত্ত সর্ব্বদা ভয়াকুল। তিনি এই নির্জ্জন প্রকোষ্ঠের মধ্যে বসিয়াও যেন চতুর্দ্দিকে শত শত্রুর আশঙ্কা করিতেছেন। অতএব ব্যস্ত হইয়া কহিলেন "আচ্ছা এখন ত রাত্রি অধিক হইয়াছে, নিদ্রা যাই, কল্য যাহা ভাল হয় করা যাইবে।" এই পরামর্শেরপর উভয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে মীরসাহেব শয্যা-ত্যাগ করিয়াই নফরকে ডাকাইয়া হাকিম-জীর নিকট পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন আর বলিলেন যে, রাত্রি ১০ টার পর তাহাকে সঙ্গে লইয়া অন্দরে উপস্থিত হইবেন। নফর প্রস্থান করিলে পর মীর সাহেব বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—একবার গিয়া তাহার ভাব ভক্তি দেখি। হৃদয় শত শত আশা নিরাশায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। অবশেষে আসক্তির কুহকে পড়িয়া তখনি বালকভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন। সে আস্তাবলে গিয়া অশ্বপালকে হুকুম দিবা মাত্র গাড়ি প্রস্তুত করিয়া আনিল। মির মহম্মদ সুন্দর বেশভূষা করিয়া নানা-বিধ সুগন্ধে চর্চ্চিত হইয়া নিজ আবাস ভবনে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—স্বামী স্ত্রী।

বেলা দশটা বাজিয়াছে, জমিদার ভবনে আহারের আয়োজন হইয়াছে। মীর সাহেব প্রত্যহ এই সময় বাড়ী আসিয়া পরিণীতা স্ত্রী বানু বেগমের সহিত আহারাদি করেন। বানুবিবির হৃদয়া-কাশে প্রত্যহ দশঘটিকায় একবার মাত্র প্রভাকর উদিত হইয়া তখনি অস্ত গমন করেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার-গৃহে বেগম সাহেব উপনীতা। তাহার নবীন অঙ্গ সুচারু ওড়নায় আচ্ছাদিত, কারুকার্য্য-খচিত কঞ্চুলিকা ভিতরে শোভমানা, পরিধানে হরিদ্বর্ণের সাটিনের বৃহৎ পায়-জামা। বানুবেগম রূপসী বটে, কিন্তু দ্বিতীয়ার শশীর ন্যায় তাহার মুখচন্দ্র মলিন। ধনাঢ্য যবনী রমণীর ন্যায় বহুমূল্য আভরণে তাহার অভিরুচি নাই, কেবল দুই হাতে দুইগাছি বেলওয়ারি কাঁচের চুড়ি ও অঙ্গুলিতে একটি হীরক অঙ্গুরী এবং একটি চুনিযুক্ত নাকছাপী মুখ-সরসীতে পদ্ম পুষ্পের আভা দিতেছে। বেগম সাহেব অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। বামগণ্ডে হাত চাপিয়া রমণী কি ভাবিতেছেন। অতিরিক্ত মানসিক উদ্বেগে আয়ত

লোচনের তলদেশে কালিমা লক্ষিত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস যেন তদীয় অন্তরের ঘন মেঘ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই মানসিক সংগ্রামের মধ্যে হঠাৎ তিনি গাড়ীর শব্দে চমকিয়া উঠিলেন, এককালে তাহার সকল ভাবনা সরিয়া গেল। মস্তক উত্তোলন করিবামাত্র চাহিয়া দেখেন সম্মুখে তাঁহার অন্তরের আলোড়নকারী উপস্থিত। মীরসাহেবকে আজ আবার নূতন ভাবে সজ্জিত দেখিয়া বেগমের মনে বিষাদের ছায়া গাঢ়তর হইয়া আসিল। কিন্তু রমণীর মত হৃদয়-ব্যথা চাপিতে কি আর কোনও জীব জগতে আছে? বানু মুখে একটু মলিন হাসি হাসিয়া বলিলেন "আজ মীরসাহেব আরও সুন্দর দেখাইতেছেন, আপনার নবীন বেশ বহুদিনের পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে। যে দিন আমি বিবাহের পর প্রথম এই মহলে আসিয়াছিলাম, আপনাকে এইরূপ সুচারু সজ্জায় সজ্জিত দেখিয়াছিলাম। আজ সেই "প্রথম মিলন" আবার উপস্থিত * * * এই বলিয়া রমণী নীরব হইয়া প্রাণের আবেগ সম্বরণ করিলেন। স্বামী মীর মহম্মদের হৃদয় এখন উন্মত্ত। তাঁহার অদম্য ঔৎসক্য প্রবল বন্যার স্রোতের মত চলিয়াছে, কিছুতেই বাধা মানিতেছে না। মানব-হৃদয়ের দুরাকাঙ্ক্ষা এতই বলবতী যে তাহার প্রকোপে বিবেক একেবারে অন্ধ হইয়া পড়ে। মীর মহম্মদ পত্নীর সম্ভাষণের উত্তরে একটু কাষ্ঠ হাস্য হাসিয়া তাহার নিকটে বসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে আহার করিতে লাগিলেন। কেবল জিজ্ঞাসিলেন নফর দাসের কোনও লোক এখানে আসিয়াছিল কি না? যথারীতি আহারাদির পর নিজ বৃদ্ধা ধাত্রী সলন্তীকে ডাকিয়া তলঘরের চাবি আনিতে কহিলেন। বৃদ্ধার নিকটেই চাবি ছিল, সে তখনি মীর মহম্মদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া কয়েকটি সোপান অবতরণপূর্ব্বক একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল। গৃহটি চতুষ্কোণ, সূর্য্য চন্দ্র ও বায়ু সহসা প্রবেশে অসমর্থ। সেই কারাগারের মধ্যস্থলে একখানি সুকোমল শয্যোপরি একটি অতি কৃশাঙ্গী রমণী অচৈতন্য অবস্থায় শায়িত। রমণী যেন শৈবাল-সমন্বিত সরোবরে শ্বেত কমলিনীবৎ ফুটিয়া আছেন। রমণীর মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ, নয়নের নিম্নদেশে ঘোর কালিমা পড়িয়াছে। মীর মহম্মদ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া অনিমেষনেত্রে কেবল সৌন্দর্য্য সুধা পান করিতেছেন। তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে নড়িতে পারিতেছেন না। হৃদয়ে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াছে। নারী-সতীত্বের তেজঃপ্রভাবে তাহাকে অগ্রসর হইতে দিতেছে না। কিন্তু রূপের মোহিনী বাগুরা মদোন্মত্ত লোলুপ প্রাণকে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। হৃদয়ের বৃত্তিগুলির আকর্ষণেই জীব পরিচালিত হয়। মীর মহম্মদ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীর পদবিক্ষেপে ক্রমে রমণীর শয্যার সন্নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন। ধাত্রীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া

দাঁড়াইল ও প্রভুর আদেশমত রমণীর মুখে কিঞ্চিৎ গোলাপজলের ছিটা দিতে দিতে সে চক্ষু উন্মীলন করিল ও সম্মুখে জমীদার মহম্মদকে দেখিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিল—মৃদুস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আবার হতচৈতন্য হইল। জমীদার ধাত্রীকে কহিলেন পাখা লইয়া একটু বাতাস কর ও নিজের বক্ষঃস্থিত পুষ্পস্তবক তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন যে, উহার আঘ্রাণ দেও। কিন্তু আর রমণী চক্ষু মেলিলেন না। মীর মহম্মদ নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে ধাত্রীকে তদবস্থায় সেই-খানে রাখিয়া নিজে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া আসিলেন ও বানু বেগমের গৃহে প্রবেশ করিয়া চিন্তাযুক্তভাবে একখানি চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার আশাপূর্ণ বদন এখন বিমর্ষতা-ভারে অবনত দেখিয়া, স্ত্রীর অন্তঃকরণ বিচলিত হইল। অবশ্য মুখে সহসা কিছু ব্যক্ত করিতে না পারিয়া স্বামীকে অন্যমনস্ক করিবার ছলে কতকগুলি ছবি আনিয়া দেখাইলেন। কহিলেন "দেখ, আজি আমি এক পটুয়াপত্নীর নিকট কয়েকখানি নূতন চিত্র কিনিয়াছি। একখানি হিমালয় পর্ব্বত ও দ্বিতীয় খানি গোমুখী—যে স্থান হইতে গঙ্গা বহির্গত, তৃতীয় খানি হরিদ্বারের ছবি। যদিচ ইহা হিন্দুদিগের পরম গৌরবের জিনিস, তথাপি ইহার স্বাভাবিক দৃশ্য দেখিবার জন্য কিনিতে বাধ্য হইলাম। তাহার নিকট আরও অনেক প্রকার চিত্র ছিল, আবার লইয়া আসিবে।" মীর মহম্মদ হরিদ্বারের ঘাটের চিত্রখানি দেখিয়া যেন আরও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। পত্নীকে বলিলেন কে এ সকল আনিয়াছিল? যে সে লোকের বস্তু ক্রয় করা উচিত নহে। আজকাল প্লেগনামক রোগের সংক্রামকতা এইরূপে ব্যাপ্ত হয়। এই কথোপকথনের মধ্যে একখানি শকটের শব্দ হইল। মীর মহম্মদ সোৎসুকচিত্তে সেই শব্দের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে জনৈক দাসী আসিয়া সংবাদ দিল বাহিরে নফরদাস ও হাকিমজি অপেক্ষা করিতেছেন। শুনিবা-মাত্র সেখানে গেলেন। নফরের সহিত কাণে কাণে দুই একটি কথা কহিয়া হাকিমজিকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে আসিলেন। দাসী অগ্রে অগ্রে অন্তঃপুর-বাসিনীগণকে সতর্ক করিয়া দিল, হাকিমজি একেবারে সোজা তল-ঘরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। জমীদার স্বয়ং চাবি খুলিয়া হাকিমকে ভিতরে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধা ধাত্রী মোমবাতি জ্বালাইয়া একখানি পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। চৌদিকে বায়ুবদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিয়া হাকিমজী নিজেই শ্বাসরুদ্ধের অবস্থায় পড়িলেন, কিন্তু পঞ্চ সহস্র মুদ্রার লোভ তাঁহার সকল ক্লেশ দূর করিয়া দিল। রোগিণীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কহিলেন "অতি সঙ্কট অবস্থা। প্রথমতঃ ইহাকে স্থানান্তর করা আবশ্যক, নতুবা শীঘ্রই ইহার পরিণাম শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে।" তাঁহার সঙ্গে যে ঔষধ ছিল, তাহা রমণীর

বাহুযুগলে সূচিদ্বারা বিদ্ধ করিয়া সিঞ্চিত করিলেন ও মস্তকে অতি সুগন্ধ তরল প্রলেপ লেপন করিয়া দিলেন এবং কহিলেন "ইহাঁকে সুপরিস্কৃত বায়ুপূর্ণ স্থানে লইয়া গিয়া অতি শান্তভাবে শয়ন করাইয়া দিউন—স্ত্রীলোক ব্যতীত সেখানে যেন কেহ না থাকে।" হাকিম চলিয়া গেলে পর কয়েকটি দাসীর সাহায্যে রমণীকে উপরে আনা হইল ও একখানি সুন্দর সজ্জীভূত গৃহের মধ্যে তাহার শয্যা স্থাপিত করিয়া দাসীরা ক্রমান্বয়ে বাতাস করিতে লাগিল। মীর মহম্মদ বৃদ্ধা ধাত্রীকে বিশ্বস্তভাবে তথায় রাখিয়া তাহার হস্তে উহার শুশ্রূষার ভার দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাহার স্ত্রী পাছে সপত্নী-বিদ্বেষিতা প্রকাশ করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় জমিদার বাবু বেগমের গৃহেই বাস করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। মুসলমানগণের যথেচ্ছাচারিতা এত প্রবল যে তাহাদের স্ত্রীগণ উহার জন্য প্রস্তুত থাকেন। তাহারা সপত্নীদিগকে তাহাদের প্রণয়ের অংশ দিতে বাধ্য ও তাঁহাদিগের সহিত একত্র বাসে কুণ্ঠিত নহে।

(ক্রমশঃ)।

সঙ্ঘামিত্রা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)।

রাণী। বহুভাবি নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ! সাবধান!
　বৃথা বাক্য বলিবার নহে এই স্থান!
পুরো। বৃথা বাক্য? বৃথা নহে এক কথা
　　　　　　　　　　মোর;
　সঙ্ঘা—অশোকের মেয়ে প্রতি ঘরে ঘরে
　যেয়ে প্রচারে নাস্তিক ধর্ম্ম বৈরাগ্য
　কঠোর। কুহকে পড়িয়া তার শত
　নারী তেয়াগিয়া নিত্যকর্ম্ম তেয়াগি
　আপন ধর্ম্ম চলিয়াছে তপস্যায় পুত্র
　　　　　　　　　　কন্যা ছাড়ি!
রাণী। তাই বটে! সত্য ক'রে বল হে
　　　　　　　　　　ব্রাহ্মণ,
　নাস্তিক বেধর্ম্মী বৌদ্ধ অশোক দুর্জ্জন,
　ঘোর অহঙ্কারে মাতি　মানে না দেবতা
　　　　　　　　　　জাতি
　ত্যজিতে সংসার-সুখ করি উপদেশ,
　পরাইতে চায় সবে সন্ন্যাসীর বেশ,
　অহিংসা পরম ধর্ম্ম মিথ্যা বলে যজ্ঞ, কর্ম্ম,
　সত্যই কি তার কন্যা এসে অকস্মাৎ,
　করিছে আমার রাজ্যে এ হেন
　　　　　　　　　　উৎপাত?
পুরো। আমি বিপ্র, পুরোহিত রাণী,
　মিথ্যা কভু নহে মোর বাণী।
রাণী। কি আস্পর্দ্ধা তবে সেই নিলর্জ্জা
　　　　　　　　　　নারীর!
　দেখ কোথা সৈন্যাধ্যক্ষ আছে রণবীর,
বল তারে গিয়া ত্বরা, রাণীর হুকুম কড়া—
　যেমন করিয়া হোক্ এখনি বাঁধিয়া
　দিতে হবে অশোকের কন্যারে
　　　　　　　　　　আনিয়া।

বুঝিবে সে আমি কেবা, করিবে চরণ
সেবা,
রহিবে এ রাজ্যে মোর দাসীর মতন;
যে হবে বে-ধর্ম্মী তারে করিব নিধন।

রাণী ও সন্ধ্যা।

রাণী। আমি রাণী, দেখিলেত আমার
প্রতাপ!
রাজকন্যা, তবু তুমি দাসী গৃহে
মোর।
যদি চাহ সুকল্যাণ, তবে ত্বরা করি
কর ত্যাগ নবধর্ম্ম সন্ন্যাসিনী-বেশ;
আসিবে না বল এই রাজ্যের সীমায়,
তাহলে করুণা করি পাঠাব তোমায়
তোমার পিতার রাজ্যে। নহিলে
নিশ্চয়
স্বর্ণলতা সম অই সুকুমার দেহ
জ্বলন্ত অনলে পুড়ি হবে ভস্মরাশি।
সন্ধ্যা। হায়! রাণি, জাননাত কত ক্ষুদ্র
নর;
তাই বৃথা অহঙ্কার, তাই ভাব আপনার
কিছুই অসাধ্য নাই ধরণীভিতর!
তুমিত দুর্ব্বলা নারী, ভেবে দেখ মনে—
কত রাজা ধরণীর, কত শত মহাবীর
অতি দর্পে বসেছিল রত্নসিংহাসনে,
আজ কি তাদের চিহ্ন আছে এ
ভুবনে?
তোমার কি শক্তি রাণি? পার কি
করিতে?
কতদিন এই গর্ব্ব রহিবে মহীতে?
এ ধরায় আর তুমি কতদিন রাজ্য ভূমি,
কতদিন আপনারে পারিবে রাখিতে?
এই যে তোমার কান্তি লাবণ্য মধুর,
যে লাবণ্য বাড়াইতে কত যত্ন দিনে রাতে,
সুকোমল দেহে শোভে স্বর্ণ সুপ্রচুর;
এই রম্য লাবণ্য কি তুমি চিরদিন
পারিবে রাখিতে স্থির? জরা এসে
অবনীর
করিবে না এ কনক দেহলতা ক্ষীণ?
তবে রাণি, রাখ গর্ব্ব, ছাড় অভিমান;
দাসী আমি, দুঃখ নাই, মনে বড় দুঃখ
পাই,
হেরি যবে প্রাণহীন রমণীর প্রাণ।
জাননা কি রমণীরা বিশ্বের জননী,
নারী প্রাণে তাই উঠে স্নেহের কুসুম
ফুটে,
নারী প্রাণে তাই বহে সুধা-তরঙ্গিণী।
তবে কেন তুমি নারী, নিদয়া এমন,
কত দীন অন্ন বিনে কত দুঃখী উৎপীড়নে
করিতেছে হাহাকার অশ্রু বিসর্জ্জন,
তোমার টলে না কেন রাজ-সিংহাসন?
রাণী। (স্বগত)
আজি এই সন্ন্যাসিনী নারীর কথায়
মন কেন হইল চঞ্চল? থেকে থেকে
কেঁপে উঠে প্রাণ! ছি ছি, দুর্ব্বলতা
মোর
বুঝিতে পারে না যেন এই সন্ন্যাসিনী।
(প্রকাশ্যে)
শত্রু তুমি, তবু মিষ্ট লাগে বাণী তব।
বুঝিলাম এ দেহ রবে না চিরদিন;
রাজা প্রজা মৃত্যুর অধীন। তা বলিয়া
যত দিন আছে দেহ, দেহে আছে প্রাণ,

তত দিন কেন, চাহিব না নিজ-সুখ ?
আমি রাণী, আছি উচ্চ সম্পদ-শিখরে,
আমি কেন নেমে যাব দরিদ্রের
কাছে ?
আমি কেন মুছাইব অশ্রু শোকার্ত্তের ?

সন্ধ্যা। হায় ! রাণি, বাসনার ছলনায় শুধু
আত্মসুখ শ্রেষ্ঠ মনে হয়। সম্পদের
স্বপ্নে সদা চিত্ত মগ্ন রয়। কিন্তু জেন
এ স্বপ্নের সুখ ক্ষণস্থায়ী। স্থায়ী শুধু
সুখ অন্তে দুঃখ অবসাদ ! তাই বলি
কর ছিন্ন বাসনার পাশ। সুখস্পৃহা
দেও বিসর্জ্জন ; ভুলে যাও আত্মপর-
জ্ঞান। সংসারেতে কেবা আত্ম ?
কেবা পর ?
চিন্তা যদি কর সকলেই পর ; ভেবে
যদি দেখ সবাই আপন। এক মহা
জীবনের সিন্ধু শুধু আছে ; তুমি আমি
তাহারি বুদ্বুদ !

রাণী। অল্প বুদ্ধি তব ; আত্মসুখ তুচ্ছ ভাব
তাই। ভেবে দেখ, আত্মসুখ লভিবার
তরে, জড়জীব উন্মত্ত ধরায় !

সন্ধ্যা। কভু সত্য নয়। প্রতিদিন সূর্য্য
তার
স্বর্ণরশ্মি-জালে, অচেতন বিশ্বে করে
চেতনা সঞ্চার ; মধুর পরশে বায়ু
উত্তপ্ত ধরণীবক্ষ করে সুশীতল ;
স্রোতস্বিনী মেদিনীরে দেয় প্রীতি রস,
প্রস্ফুটিত পুষ্পভার বিতরে সৌরভ ;
মিষ্ট ফল বিটপী বিলায়। ইহারা কি
আত্মসুখ চায় ?

রাণী। রাখ জড় উদ্ভিদের কথা।

সন্ধ্যা। তবে কি শুনিতে চাও মানুষের
কথা ?
সত্য বটে মোহে মুগ্ধ অসংখ্য মানব,
আত্মসুখ চাহে নিরন্তর। তবু দেখ
এমনি রহস্য জীবনের ! মানবের
মনস্কাম পূর্ণ নাহি হয়। পশ্চাতে যে
কে আছে কে জানে ? শুধু জানি,
চাই সুখ—
দুঃখ এসে ঘেরে। চাই স্বার্থ, অনিচ্ছায়
মোরে, কে যেন নিষ্কাম ব্রতে করে
নিয়োজিত !

রাণী। তুমি আত্ম-প্রতারিত !

সন্ধ্যা। শুধু আমি নহি রাণী ; আছে লক্ষ
নর নারী,
চেয়েছিল আত্মসুখ ; কিন্তু কে বলিবে,
কাহার কুহকে, অসংখ্য প্রাণীর তরে
করে প্রাণপণ !

রাণী। মূর্খ তারা !

সন্ধ্যা। মূর্খ নহে রাণি ! তারা যদি প্রাণপণ
না করিত মানবের তরে ; মোরা
বাঁচিতাম কাহার কৃপায় ? ভাবনাত
তত্ত্ব জগতের। ভাবিলে বুঝিতে, এই
বিশ্বে অপরের সাহায্যবিহনে, কেহ
দাঁড়াইতে নাহি পারে ক্ষণকাল। চক্ষু
খোল, চেয়ে দেখ, মাতা বসুন্ধরা
স্নেহকোলে
রেখেছেন তাঁর। জনক জননী
দিতেছেন রক্ত হৃদয়ের, ভাই ভগ্নী
প্রেম সুমধুর ; তাই তুমি সুখে আছ
নিত্য নিরন্তর। চেয়ে দেখ কত গুরু
করে বিদ্যাদান, তাই মোরা পাই দিব্য

জ্ঞান। কৃষকেরা ক্ষেত্রে করে চাষ,
তাই
মুখে উঠে অন্নগ্রাস। তন্তুবায় বস্ত্র
করে নিয়ত বয়ন, তাই হয় লজ্জা-
নিবারণ। কে আছে এমন? অপরের
মুখাপেক্ষী না হয়ে জগতে, একদণ্ড
আপনারে পারে বাঁচাইতে?

রাণী। কেহই পারে না।

সন্ধ্যা। তবে কেন বৃথা অহঙ্কার? তবে
আর
কিসের গৌরব? কেন তুমি বসি উচ্চ
স্বর্ণ সিংহাসনে, দীন দরিদ্রের দুঃখে
আছ উদাসীন? চেয়ে দেখ, কত উচ্চে
আছে মেঘ, কত নিম্নে ক্ষুদ্র তরুলতা,
তবুও জলদ, বৃক্ষলতিকার দুঃখে
আর্দ্র হয়ে—অই, নামিতেছে বৃষ্টিরূপে,
ঢালিতেছে স্নেহবারি তরুলতা শিরে।
মেঘের মতন, তোমার গলুক প্রাণ
আর্ত্তের ক্রন্দনে; তুমিও নামিয়া এস
উচ্চ গর্ব্ব হতে; তুমিও হইয়া আজি
মাতৃ-স্বরূপিণী, বিতর করুণা দুঃখী
কাতর মানবে।

দেবী স্বর্ণময়ী।

(৪৬৬-৬৭ সংখ্যা—৯৫ পৃষ্ঠার পর)।

স্বর্ণময়ী এখন সাংসারিক কর্ত্তব্য কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া সন্তান সন্ততির লালন পালন ও শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। একমাত্র পরমেশ্বর ও স্বর্গস্থ স্বামীর মুখ ধ্যান করিয়া তিনি অচল পর্ব্বতের ন্যায় কিরূপ ঘোরতর পরীক্ষার সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে মন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের বঙ্গ হিন্দু বিধবারা যেরূপ ভাবে থাকেন, স্বর্ণময়ী মৃত্যু পর্য্যন্ত সেইরূপ প্রণালীতে সমস্ত দিন উপবাস পূর্ব্বক অপরাহ্ণ ২।৩ ঘটিকার সময় উপাসনা করিয়া সামান্য একমুষ্টি আতপ চালের ভাত নিরামিষ এক তরকারি দিয়া আহার করিতেন। বৈকালে জলখাবার খাইবার জন্য তাঁহার সন্তান ও আত্মীয়েরা কত অনুরোধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা শুনিতেন না। কচিৎ কখনও রজনীতে তাঁহাকে সামান্য জলযোগ করিতে দেখা গিয়াছে। কাশীনাথ বাবুর বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন স্বর্ণময়ী সারাদিন উপবাস করিয়া সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মোপসনার পর কেবল এক গ্লাস সরবত পান করিতেন। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী কিম্বা সন্তানদের রন্ধন ব্যতীত অপর কাহারও হস্তের রন্ধন খাইতেন না। কোন নিমন্ত্রণ স্থলে আহার করিতেন না। নিজের খাওয়াপরার জন্য কখনও এক পয়সা বেশী ব্যয় করেন নাই। যদি কেহ বলিতেন "বেশী না খান্, একপয়সার

কিছু কিনিয়া খান্।" তাহাতে স্বর্ণময়ী বলিতেন "না, এ পয়সাটী থাকিলে ছেলে-পিলেরা খাবে।"

নিজের শরীরকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কেবল সন্তানদের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতেই দেহপাত করিলেন। এই অত্যাচারের ফলে নানারূপ পীড়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কালীনাথ বাবুর মৃত্যুর চারিবৎসর পর স্বর্ণময়ীর দ্বিতীয় পুত্র পঞ্চম সন্তানটী আটবৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করিল। এটী অতি প্রিয়দর্শন ও বুদ্ধিমান্ ছিল এবং বিদ্যালয়ে শ্রেণীর উচ্চ স্থানে থাকিত। এই দ্বিতীয় আঘাতে তাঁহার হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। পক্ষিণী যেরূপ পক্ষি-শাবক গুলিকে পক্ষ দিয়া ঢাকিয়া রাখে, স্বর্ণময়ী সেইরূপ তাঁহার সন্তানগুলিকে আরও সতর্কভাবে ঢাকিতে যত্নবতী হইলেন। কালীনাথ বাবুর মৃত্যু সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী কেবল মাত্র ১২ বৎসর বয়স্ক ছিলেন। ইনি সিটি কলেজিয়েট স্কুলের একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। ইনি তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া ডবল প্রোমোসনের প্রার্থী হইলে প্রিন্সিপ্যাল উমেশ বাবু অসাধারণ গুণবত্তার পুরস্কার দানার্থ ইহাঁকে প্রথম শ্রেণীতে তুলিয়া দিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া অত্যন্ত খাটুনী পড়াতে তাঁহার চক্ষের পীড়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার পড়াশুনা বন্ধ করিতে বলিলেন। সে বার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া হইল না। নিরাশা ও মনঃকষ্টে অভিমানী পুত্র একেবারে দমিয়া পড়িল। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া স্বর্ণময়ী প্রাণে দারুণ যাতনা পাইলেন। পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য স্বর্ণময়ী কখনও কার্পণ্য ভাব অবলম্বন করেন নাই—অজস্র খরচ করিয়াছেন। কেহ যদি সে বিষয়ে কিছু অনুযোগ করিতেন, তবে বলিতেন "উনি এত কষ্ট করিয়া যে টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ছেলেদের বাবু-গিরির জন্য নয়, তাহাদের শিক্ষার জন্য।" মুখে যে কথা বলিয়াছেন, কাজেও তাহা করিয়াছেন। টাকার অভাব হইলে নিজের সমুদায় অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া সন্তানদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলেন। ভাড়াটিয়া বাটীতে প্রতিমাসে বাড়ীওয়ালা আসিয়া ভাড়ার তাগাদা করে, হয় ত অনেক সময় মাসে ভাড়া দেওয়া মুস্কিল হয়, ইহা দেখিয়া স্বর্ণময়ী অদম্য সাহসের সহিত ১৪ বৎসরের পুত্রকে সহায় করিয়া কলিকাতা সহরে বাটী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। অনেক বাধা বিঘ্নের পর বাটী প্রস্তুত হইল। সন্তান সন্ততি লইয়া নিজবাটীতে মাথা রাখিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। সংসার কি করিয়া চলিতেছে, কোথা হইতে টাকা আসিতেছে, কিরূপ বন্দোবস্ত করিলে কিরূপ সুবিধা হইবে এই সকল সাংসারিক ভাবনা তিনি কখনও সন্তানদিগকে ভাবিতে দেন নাই। আশৈশব সন্তানেরা সুখে ও নিশ্চিন্ত ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কালীনাথ বাবুর মৃত্যুর

পর তাহাদের অবস্থা অন্যরূপ দেখিয়া তাঁহার প্রাণে এরূপ আঘাত লাগিয়াছে যে তিনি নিজে কখনও সাংসারিক কষ্টের কথা সন্তানদের নিকট মুখ ফুটিয়া বলিতেন না এবং সাধ্যমত সন্তানদিগকে তাহা জানিতে দিতেন না। নিজে সন্তানদিগকে কখনও এক গ্লাস জল আনিয়া দিতে বলেন নাই বরং তাহারা কোন কাজ করিতে গেলে তাহাদিগকে সরাইয়া নিজে তাহা করিয়াছেন। অত্যধিক সন্তানবাৎসল্যই ইহার কারণ। কতদিন এরূপ হইয়াছে যে আজ হাতে একটা পয়সা নাই, কাল রাত্রি প্রভাত হইলে সন্তানদের আহারের কি হইবে? স্বর্ণময়ীর প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। মনের চাঞ্চল্য ঢাকিয়া মুখ প্রফুল্ল করিয়া বেড়াইয়াছেন, পাছে সন্তানেরা তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন দেখিয়া অসুখী হয়। আত্মসম্মান বোধ অতি প্রখর ছিল, ইহার বলেই তিনি সংসারে টিঁকিয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন। বংশমর্য্যাদা যাহাতে অটুট থাকে, সে বিষয়ে অতি সতর্ক ছিলেন। সন্তানদিগকে প্রায়ই বলিতেন "দেখিও বাপ পিতামহের নাম হাসাইও না, তোমরা ব্রাহ্মের সন্তান যেন মনে থাকে।" ব্রাহ্মসমাজে অনেক পুজনীয় ব্রাহ্ম আছেন, যাঁহাদের কুসংস্কার একেবারে যায় নাই। মুখে তাঁহারা জাতি মানেন না বটে, কিন্তু কাজে সত্য রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। স্বর্ণময়ী রমণী হইয়াও যেরূপ তেজস্বিনী ছিলেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রায়ই বলিতে শুনিয়াছি "আমার একটী মেয়েকে ব্রাহ্মণে ও একটীকে শিক্ষিত মুসলমানের সহিত বিয়ে দেবো।" কন্যাদের বিবাহই যে চরম উদ্দেশ্য, তাহা তিনি ভাবিতেন না। বলিতেন "মেয়েদের শিক্ষা প্রথম চিন্তা, আগে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখুক তারপর বিয়ে হয় হবে, না হয় না হবে, বিদ্যা শিখিলে নিজেরা চাকুরী করিয়া জীবন কাটাইবে।" সাংসারিক কাজ কর্ম্ম অপর ব্যক্তি দ্বারা করাইতে হইত বলিয়া তাঁহাকে যে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা লেখা অসাধ্য। বন্ধুবান্ধবেরা সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বর্ণময়ীর যে প্রতিমুহূর্ত্তেই পরের উপর নির্ভর করিতে হইত, ইহা নিতান্ত ক্লেশকর বোধ হইত। জ্যেষ্ঠ পুত্রটী নিতান্ত ছেলে মানুষ, বিশেষতঃ তখন তিনি কলিকাতার কিছুই জানিতেন না। এই জন্যে প্রত্যেক খুটীনাটী কাজ হইতে বড় কাজ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে পরের মুখাপেক্ষী থাকিয়া জ্বালাতন হইয়া তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন "যদি মৃত্যুর পর আবার জন্ম থাকে, তবে যেন আর এ পোড়া দেশে জন্ম না হয়। এখানে এক পয়সার ছুঁচ কিনিতেও পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়।"

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণময়ীর জ্যেষ্ঠ কন্যার সহিত বিক্রমপুরস্থ পঞ্চসার গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায় বংশের স্বর্গীয় ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় বি, এর বিবাহ স্থিরীকৃত হয়। স্বর্গীয় প্রভাত বাবু কালীনাথ বাবুর একজন বাল্যবন্ধু ছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ণানন্দ বাবু শিক্ষালাভার্থ বিলাত যাত্রা করেন। এই সময় কন্যার বয়স ১৫ বৎসর থাকাতে বিবাহ হয় নাই। ১৮ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মেয়েদের বিবাহ হওয়া উচিত নয়, স্বর্ণময়ীর এই মত ছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ণানন্দ গৌরবের সহিত উপাধি লাভ করিয়া বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইলে বংশমর্য্যাদানুসারে ঘটা করিয়া কন্যার বিবাহ দিলেন। জামাতাকে তিনি আপন পুত্র জ্ঞানে স্নেহ করিতেন। জামাতা বলেন "আমি তাঁহাকে পাইয়া মাতার অভাব ভুলিয়াছিলাম।"

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণময়ী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। পুত্রের বিলাত গমন সময় বন্ধুবান্ধবেরা নানারূপ আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি কি কাজ করিতেছ? কোথা হইতে বিলাতের খরচ চালাইবে? শেষে সকলকে মজাবে? তোমার নিকট এমন কি জমিদারী আছে যে তুমি মেয়ে মানুষ হইয়া বিলাতের ও এখানকার খরচ চালাইবে!" কিন্তু স্বর্ণময়ী অন্যের কথা শুনিয়া টলিবার মেয়ে ছিলেন না। নিজে মনে যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, তাহা কাজে করিয়া ছাড়িতেন, অন্যের কথায় কর্ণপাত করিতেন না। তিনি খুল্লতাতকে তেজের সহিত বলিলেন "আপনি ভয় পাইবেন না। যিনি ইহা-দিগকে এতকাল এত বিপদ ও পরীক্ষার ভিতরে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই ইহাদের শিক্ষার ভারও নিজ হস্তে লইয়াছেন। আমার কি সাধ্য যে আমি ইহাদের ভার লইতে পারি? যাঁহার ভার, তিনি নিজেই লইয়াছেন।" অসংখ্য বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া পুত্রকে বিলাত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কষ্টের একশেষ হইল। পুত্রের বিলাত যাত্রা সময়ে বন্ধু-বান্ধবেরা বাধা দিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন অর্থের অভাবের কথা ইহাঁদের নিকট বলিবেন না। শেষ পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। কি করিয়া ৭ বৎসর পুত্রের বিলাতের খরচ চালাইলেন ভাবিলে অলৌ-কিক কাণ্ড (miracle) বলিয়া মনে হয়। স্বর্ণময়ী পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া ঘোরতর মানসিক উদ্বেগে জীবন কাটাইতে লাগিলেন। প্রতিমাসে টাকা পাঠাইবার সময় অত্যন্ত উদ্বেগে দিন কাটাইতেন। হাতে একটি কপর্দ্দক নাই, বিলাতের খরচ পাঠাইতে হইবে নতুবা পুত্র বিদেশে না খাইয়া মারা পড়িবে এই ভাবিয়া অস্থির হইয়া প্রার্থনা করিতেন। রাত্রিতে উঠিয়া প্রার্থনা করিতেন। প্রাতঃকালে কোথা হইতে টাকা আসিয়া উপস্থিত হইত। এ সকল স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কল্পনা নহে। স্বর্ণময়ী সন্তানদের নিকট বলিতেন "প্রিয়কে বিলাতে পাঠাইয়া আমার দশ বৎসরের আয়ু কমিয়া গেল। পরমেশ্বর তাঁহার কাজ চালাইবার জন্য আমাকে বলিয়াছেন, যে দিন আমার কাজ শেষ হইবে, সেইদিন

আমি চলিয়া যাইব। তোমাদের জন্য আমি শেষ রক্ত-বিন্দুও দিব। এই সময় হইতে তাঁহার কঠিন পীড়া হইতে আরম্ভ হইল। নানা ভাবনা চিন্তায় তাঁহার দেহ ভগ্ন হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু মন তেমনি দৃঢ় রহিল। জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে সেরূপ তেজ দেখিয়া অবাক্ হইতাম। কঠিন পীড়া হইলে সন্তানেরা ভীত হইয়া বলিত "মা! তুমি এখন মারা গেলে আমাদের দশা কি হইবে? আমরা কোথায় দাঁড়াব?" মাতা উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠে বলিতেন "ভয় নাই, আমি এখন মরিব না, আমার কাজ শেষ হয় নাই।" সাত বৎসর পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার হইয়া বিলাত হইতে ফিরিলেন। তখনও সংসারের ভার পুত্রের উপর দেন নাই, পাছে পুত্রের কষ্ট হয়। কোথা হইতে টাকা আসে, কিরূপে তাহা খরচ হয়, পুত্র তখনও কিছু জানিতেন না। পূর্ণিয়ার উকিল পার্ব্বতীনাথ দাসের দ্বিতীয় কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন, কিন্তু উপার্জ্জনক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত পুত্রের বিবাহ দেওয়া উচিত মনে করিলেন না। এই ঘটনার প্র.প্র ১০ বৎসর পরে পুত্র সিভিল মেডিকেল অফিসার হইয়া আজমীর যাত্রা করিলেন। কাজ পাইবার ৬।৭ মাস পরে পুত্রের বিবাহ দিয়া সকলকে লইয়া আজমীর গেলেন। বধূকে নিজের কন্যার ন্যায় ভাল বাসিতেন এবং অতি যত্ন ও আদরের সহিত ঘরকন্নার কাজ শিখাইতেন। আজমীর যাওয়াই স্বর্ণময়ীর কাল হইল। কি কুক্ষণেই কলিকাতা ছাড়িয়া আজমীর যাত্রা করিলেন। আজমীর পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং রাজপুতানার ভয়ঙ্কর মরুভূমির সন্নিকট স্থান। গ্রীষ্মের সময় আজমীরে প্রচণ্ড গরম পড়ে। ভাদ্র মাসের শেষে আজমীরে গেলেন। দুরন্ত শীত সহ্য করিলেন বটে, কিন্তু যেমন ভীষণ গরম পড়িতে লাগিল, স্বর্ণময়ীর দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। এই ভয়ানক গরমের মধ্যে স্বর্ণময়ী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইতেন। তাহাতে গরম অসহ্য বোধ করিয়া স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই শুইয়া থাকিতেন। কয়েক দিন এরূপ করিয়া সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া তাঁহার ভীষণ জ্বর হইল। এই জ্বর ছাড়িল বটে, কিন্তু পেটে এক অসহ্য বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)।

ভক্তি-উপহার।

(কবিবর স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঊনত্রিংশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তদীয় চরণে)

১

দেব! কিবা দিব আর?—
মায়ের অমূল্য রত্ন,
জগতে করেনি' যত্ন,
বুঝেও বোঝেনি তুমি কি যে ধন তার!
তাই আঁখি-জলে ভেসে

চলে গেলে পর-দেশে,
কি দিয়ে কি নিয়ে গেলে, নহে কহিবার!
আজ কিবা দিব আর?

২

দেব! কিবা দিব আর?—
তুমি যে শিবের মত,
গরল গিলিয়া কত,
ভূতলে খুলিয়া দিলে সুধা পারাবার;
ধন্য প্রাণ, ধন্য আশা,
কাঙালিনী বঙ্গভাষা,
তারে দিলে রাজাসন, হীরকের হার!
দেব! কিবা দিব আর?

৩

দেব! কিবা দিব আর?—
আজি সেই "ভবিষ্যৎ"
পূর্ণ তব মনোরথ,
জয় সে সত্যের, জয় দিব্য প্রতিভার!
তুমি উদাসীন ছেলে,
কবে এলে, কবে গেলে,
দিয়ে গেলে অফুরন্ত কুবের ভাণ্ডার!
দেব! কিবা দিব আর?

৪

দেব! কিবা দিব আর?—
শুনিয়াছি হিমগিরি,
বজ্র বিধে বক্ষ চিরি,
তবু বহে অকাতরে ধরণীর ভার—
ভূলোক প্রাচীর সম,
(বিশাল বিশালতম),
তাহাঁরে ব্যথিত করে সে শকতি কার?
দেব! কিবা দিব আর?

৫

দেব! কিবা দিব আর?—
তুমিও হিমাদ্রি মত,
বজ্রাঘাত সহি কত,
করিয়াছ কত কাজ বিশ্ব-বিধাতার!
আমরাই ভাগ্যহীন,
অকৃতজ্ঞ চিরদিন,
আমরা অধম পাপী, অতি দুরাচার!
দেব! কিবা দিব আর?

৬

দেব! কিবা দিব আর?—
সোণার মূরতি গড়ি,
যদি আজি পূজা করি,
ওই স্মৃতি, ওই কীর্ত্তি, ওই প্রতিভার;
তবু সে কলঙ্ক-কালি,
দেবতার গালাগালি,
তবু এই হৃদয়ের মৌন হাহাকার!
এ জনমে মুছিবে না, ঘুচিবে না আর!

৭

দেব! কিবা দিব আর?—
দূর হোক্ ভস্ম ছাই,
একদিন ভুলে যাই,
একদিন শান্তি হোক সব যাতনার!
কহিব পরাণ খুলে,
তোমারই চরণ-মূলে,
মরতের যত কিছু সুখ-সমাচার।
দেব! কিবা দিব আর?

৮

দেব! কিবা দিব আর?—
সেই রবি শশী আসে,
সেই সব ফুল হাসে,

সেই সব আছে আজো বুকে বসুধার,
শুধু আর জন্মিল না
মেঘনাদ, বীরাঙ্গনা,
"শ্রীমধুসূদন কবি" ফিরিল না আর!

৯

দেব! কিবা দিব আর?—
প্রিয় কপোতাক্ষী তব,
গাহিয়া সঙ্গীত নব,
প্রতিদিন সিন্ধুপানে হয় আগুসার
অমর অমৃত ধাম,
তোমারি মধুর নাম,
বিরাজিত মরমের স্তরে স্তরে তার!
দেব! কিবা দিব আর?

১০

দেব! কিবা দিব আর?—
বঙ্গ-রাজধানী মাঝে,
তব স্মৃতিস্তম্ভ রাজে,
কত হৃদি দিতেছে যে পুষ্প অর্ঘ্যভার;
যে লোকে যেখানে রও,
তৃপ্ত হও, তৃপ্ত হও,
শত হস্ত প্রদানিছে ভক্তি উপহার।

প্রণতা সেবিকা
শ্রীমঃ—সাগর দাঁড়ী।

সন্দেহে বিভ্রাট।

১

সুধীরচন্দ্র দত্ত পূজার ছুটীতে সস্ত্রীক মুঙ্গের বেড়াইতে আসিয়াছেন। তিনি শৈশবে পিতার বিষম শাসনে, ও সমাজের কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়াও এখন হাল আইনের নব্য শিক্ষিত যুবা। তাঁহার পিতা ঘোরতর হিন্দু ছিলেন, অথচ পুত্রের শিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলের একজন প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার। তাঁহার ন্যায় তাঁহার পুত্রের জমীদারিতে অনুরাগ নাই। সুধীর চন্দ্রের শৈশব অতীত হইবার পরেই রাধাকান্ত বাবু তাঁহাকে সদর স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিয়াছিলেন। সুধীর চন্দ্রের লেখাপড়ার বিষয়ে অনুরাগ অন্য জমীদার পুত্রদিগের মত নহে। তিনি সদরে লেখাপড়া শিখিয়া, এণ্ট্রান্স পাস করিয়া, পিতার সহিত অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাসা করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হন। সেই স্থানে থাকিয়া বি এ পাস করিয়া ডিগ্রি ধারণ করেন।

তাঁহার পিতা সেই পল্লীগ্রামের নিকটেই কোন এক দরিদ্র গৃহস্থের সুন্দরী সুলক্ষণা কন্যা দেখিয়া, ঠিকুর্জি-কুষ্ঠি মিলাইয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের অল্প দিন পরেই পিতার মৃত্যু হইল। তখন সুধীর চন্দ্র জমীদারির কার্য্যভার তাঁহার পিতার বিশ্বস্ত পুরাতন নায়েবের হস্তে দিয়া, বালিকা স্ত্রীকে সঙ্গে

লইয়া, কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। তাঁহার স্ত্রী চারুশীলা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, বিবিয়ানা চাল চলন কিছুই জানিত না। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়াই, সেখানকার জল বাতাস পাইয়া অল্প অল্প করিয়া সব শিখিয়া লইল। প্রথমে সেমিজ দেখিয়া সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, ক্রমে সেমিজত দূরের কথা, জ্যাকেট বডিস নহিলে বারমাস চলে না!! তাহা ব্যতীত কোথাও যাইতে আসিতে হইলে চরণের আবরণ জুতা মোজা টুকুও চাই, নহিলে যে সুধীর চন্দ্রের সে হ্যাট কোটের মান থাকে না। সুধীর চন্দ্র বাড়ীতে মেম রাখাইয়া স্ত্রীকে চলনসই ইংরাজী শিখাইয়াছিলেন, বাঙ্গালা নিজেই পড়াইতেন। কিন্তু চারু খুব সেয়ানা মেয়ে, সে যখন শ্বশুর-বাড়ী যাইত, তখন আধ হাত ঘোমটা ছাড়া থাকিত না। সূক্ষ্ম বস্ত্রের ভিতর সেমিজ পরা তখন পল্লীগ্রামের মেয়েদের মন্দ লাগিত না। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সময়, অনেক আত্মীয় ননদ ও যায়ে মিলিয়া তাহাকে সেমিজ জ্যাকেটের ফরমাস করিয়াছিল! চারু লক্ষ্মী মেয়ে, পাঠাইতে ভুলে নাই। সুধীর চন্দ্র দেশে পূজার সময় ব্যতীত যাইতেন না, কারণ শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় আর স্বদেশে স্নেহবন্ধন ছিল না। যদিও তাঁহার পিতৃগৃহ আত্মীয় রমণীতে পরিপূর্ণ ছিল এবং সকলেই তাঁহার পিতার দ্বারা প্রতিপালিত, কিন্তু তাঁহার মাতৃস্থান কে পূরণ করিবে?

মুঙ্গেরে সুধীর চন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু মহিমা চরণ বসু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কতকটা তাঁহার অনুরোধে, কতকটা স্ত্রীর দেশভ্রমণের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সুধীর চন্দ্র পূজার সময় দেশে না গিয়া মুঙ্গেরে বেড়াইতে আসিলেন। তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বেই মহিমা বাবু কেল্লার ভিতরে গঙ্গার উপরেই নিজের বাটীর পার্শ্বে একটি সুন্দর সুসজ্জিত বাঙ্গালা ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রী কলিকাতা হইতে একটি পুরাতন ভৃত্য ও দাসী মাত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যে দিন আসিয়া মুঙ্গেরে পঁহুছিলেন, সেদিন মহিমা বাবুর বাড়ীতেই আহারাদির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মহিমা বাবুর স্ত্রী নলিনীর সহিত চারুশীলার পূর্ব্বেই পত্রে আলাপ চলিতেছিল, সাক্ষাতে উভয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বাঙ্গালীর মেয়ে ঝগড়া করিতেও যেমন মজবুত, প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে ও বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইতেও তেমনি।

চারুশীলার বয়স প্রায় বিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, এ পর্য্যন্ত কোনও সন্তান হয় নাই। তাহার সুখের আকাশে এই দুঃখ মেঘান্ধকারের মত আসিয়া, যখন তখন ছায়াবৃত করিত। সে আসিয়া দেখিল নলিনী দুইটি সন্তানের জননী। মাধুরী দুই বৎসরের বালিকা, কোলে একটী ছয় মাসের সন্তান, তাহার ডাকনাম এখন খোকা। শীঘ্রই খোকার অন্নপ্রাশন হইবে, সারা জগতের নাম

দেখিয়া এখনো নলিনী তাহার নাম স্থির করিতে পারে নাই। চারুশীলা আসিয়া দেখিল তাহার অপেক্ষা নলিনীরা অধিক সুখী। সুধীর চন্দ্র সে ছেলে মেয়ে দুটিকে লইয়া এত খেলা করিতে লাগিলেন যে, দেখিয়া পত্নীর অন্তর আকুল বেদনায় সন্তানের কামনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। আহা! কোন্ পাপে ভগবান্ তাহাকে এই মনস্তাপ দিয়াছেন? কেন সে জগতের এত সুখৈশ্বর্য্যশালিনী হইয়াও অপত্যস্নেহের ভিখারিণী হইয়া জন্মিল? তাহার স্বামীর অতুল সম্পত্তি, সন্তান না হইলে বংশে কেহ থাকিবে না, এরি মধ্যে খুড়শাশুড়ীরা অন্য বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। যদিও চারুশীলা স্থির জানিত যে সুধীরচন্দ্র অন্য বিবাহ করিবেন না, তবু "পুরুষের মন কাঁচের বাসন, একবার ভাঙিলে আর যোড়া যায় না" এই কথাটি সর্ব্বদা তাহার মনে জাগিত। যদিও সে শিক্ষিত স্বামীর হস্তে পড়িয়াছিল, তবু তাহার কুসংস্কার কিছুতেই ঘুচে নাই, লুকাইয়া অনেক ঔষধ সেবন করিয়াছে এবং কোনও দেবতার আরাধনা করিতে বাঁকি রাখে নাই।

আহারাদির পর সুধীরচন্দ্র চারুশীলাকে লইয়া নিজের বাটীতে আসিলেন। চারুশীলা গৃহে আসিয়া সকল দ্রব্যাদি গুছাইতে লাগিল। বাটীটি সাহেবি ফ্যাশানে সজ্জিত। দুইটি শয়নকক্ষ, মধ্যে হল, তাহাতে পার্টিসন দেওয়া—অর্দ্ধেক ডাইনিং ও অর্দ্ধেক ড্রইং রুম। দুইটা পাশেও দুইটা ঘর ছিল। চারুশীলাদের আর ডাইনিং রুমের প্রয়োজন ছিল না, তবে সুধীর বাবুর বন্ধুবান্ধব আসিলে চা পান করিবার বা কখনও সাধ করিয়া টেবিলে আহার করিবার প্রয়োজন হইত। দুইটি শয়নকক্ষের মধ্যে একটিতে সুধীর বাবুর বসিবার গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইল। চারুশীলার এই নূতন গৃহ ও গৃহকর্ম্মে খুব মন লাগিল। তাহার সে কলিকাতার বদ্ধ গৃহ হইতে এই মুক্ত বাতাস ও বাঙ্গালাখানি খুব ভাল লাগিতেছিল।

চারুশীলা অতিশয় সুগৃহিণী। সন্তান হয় নাই বলিয়া যদি স্বামী ভাল না বাসেন, সে জন্য সে স্বামীর সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করিতে ও মন যোগাইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। তাহার স্বামীর সামান্য কর্ম্মটুকুও দাসী চাকরের হস্তে করিতে দিত না। স্বামীর আহারাদির প্রতি, পরিচ্ছদের প্রতি, সুখ ও আরামের প্রতি চারুর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। স্বামীর সুখই তাহার একমাত্র সুখ ছিল, স্বামীর ভালবাসাই তাহার একমাত্র বাঞ্ছনীয় দ্রব্য ছিল। কিন্তু স্বামীর অতুল ঐশ্বর্য্য, তাহার ভবিষ্যতের ব্যবস্থা কি হইবে? সেজন্য চারুর মন মাঝে মাঝে বড় চঞ্চল হইত। অত ভালবাসায় কখনও কখনও সন্দেহের ছায়া আসিয়া দেখা দিত। সত্যভামার মত

"পরশি প্রাণেশ অঙ্গ বহে যদি সমীরণ,
ঈর্ষানলে দহে এ হৃদয়।"

২

তাহাদের সে দিনগুলি কি সুখেই কাটিত! অতি প্রত্যূষে চারু দাসীকে লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইত। তাহাতে প্রায়ই রাগ করিয়া সুধীর বাবু কিছু বলিলে বলিত ঃ—

"আহা! অমন গঙ্গার জল ছেড়ে আমরা পাড়াগাঁর মেয়ে কি লোভ সামলাতে পারি?" সুধীর বাবু বলিতেন ঃ—

"এতদিন ধরিয়া সব শেখান বৃথা হইল!" তাহার পর চারু স্বহস্তে স্বামীর প্রাতর্ভোজনের দ্রব্যাদি দিয়া গৃহকর্ম্ম করিত। দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর দুই বাটীর লোক এক বাটীতে একত্র হইয়া মজলিস্ বসিত। সুধীর বাবু ও মহিমা বাবু অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাঁহাদের একান্ত অনুরোধে নলিনী ও চারুশীলা সম্মুখে বাহির হইয়াছিল, ক্রমে কথাবার্ত্তা কহিতে আর কুণ্ঠিত হইত না। বৈকালে প্রত্যহ দুই বন্ধুতে একত্র ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন, পরে সন্ধ্যার সময় পুনরায় সস্ত্রীক গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যাইতেন। গঙ্গার তীরে ভৃত্য সতরঞ্জ বিছাইয়া আসিত, তাঁহারা সেই স্থানে গিয়া বসিতেন। শুভ্র জ্যোৎস্না-বিভূষিতা রজনীতে গঙ্গার কল কল ধ্বনি বা তরঙ্গ প্রবাহ যে একবার স্থির হইয়া শ্রবণ করিয়াছে বা দেখিয়াছে, সে কি জীবনে কখনও তাহা ভুলিতে পারে?

একদিন তাঁহারা গাড়ী করিয়া সীতাকুণ্ড দেখিয়া পীর পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলেন। চারুর ত আর সীতাকুণ্ড দেখিয়া সাধ মেটে না। সহস্র প্রশ্নে সুধীর বাবুকে অস্থির করিয়া তুলিল। সেই বিষম উষ্ণ জল দেখিয়া সে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেছিল। বিম্ব প্রতিবিম্ব যতই ফুটিয়া উঠিতেছিল, ততই বিস্ময়-ব্যাকুলতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইতেছিল। বাহিরে আসিয়া সেই ক্ষীণ জলস্রোতের ধারা কেমন বহিতেছিল, তাহাই পুলকিত হইয়া দেখিতে লাগিল। পীর পাহাড়ে আসিয়া তাহার আর সে প্রাসাদ তুল্য গৃহ ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। তাহার পর তাঁহারা সেই পীরের সমাধি দেখিয়া প্রতিধ্বনির গৃহে আসিলেন। মহিমা বাবু প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আপন নাম প্রাচীরে লিখিয়া সকলকে লিখিতে বলিলেন, এবং ইহাতে কে কোথায় লিখিয়াছিল, তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা সেই সোপানযুক্ত কূপের নিকট আসিলেন। তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছিল, কাজেই আর নামিবার অবসর হইল না। যখন তাঁহারা ভ্রমণের পর নামিয়া আসিতেছিলেন, তখন দেখিলেন অন্য এক দল পুরুষ ও রমণী সেই পথে উঠিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা অতি নিকটে আসিলে চারু দেখিল তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ হিন্দু সমাজের মত। চারু দেখিল তাহার স্বামীর আনন সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল— তিনি অনিমেষনয়নে সম্মুখে একজন শুভ্রবেশধারিণীর প্রতি চাহিয়া আছেন। রমণী অতুললাবণ্যময়ী, কিন্তু শিশিরসিক্ত গোলাপের মত আননে দুঃখের ম্লান ছায়া

প্রতিভাত হইতেছিল। সহসা রমণীর দৃষ্টি সুধীর চন্দ্রের উপর পড়িল, মুহূর্ত্তে উভয়ের দৃষ্টির সহিত উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইল, রমণী শিহরিত হইয়া, মুখে আবরণ টানিয়া, দ্রুতপদে অন্য দিকে চলিয়া গেল। সুধীরচন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের মত শূন্য দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। মহিমা ও নলিনী এই ভাবান্তর দেখিল। মহিমা বাবু তখন সুধীর চন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন "কি দেখিতেছ! পীরপাহাড়ে ভূত প্রেত দেখিলে না কি, না কোনও পরী দেখিলে? বা পীর স্বয়ং তোমায় দেখা দিল?" স্বপ্নোথিতের মত চাহিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুধীর চন্দ্র বলিলেন :—"বোধ হয় তাই"।

তাহারা পুনরায় অগ্রসর হইয়া চলিলে, চারুশীলা মৃদুস্বরে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—"ও কে? তুমি উহাকে জান না কি?"

সুধীরচন্দ্র শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "কে? তাই ভাবিতেছি, যেন চিনি চিনি —চিনি না।"

কুসুমে কীট প্রবেশ করিল। চারুশীলার প্রণয়ের সুধা-পাত্রে কে একবিন্দু সন্দেহের হলাহল ঢালিয়া দিল। যাহাহউক সে বিষয়ে চারুশীলা আর কোনও প্রশ্ন করিলেন না।

সেই দিন হইতে চারুশীলা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিল সুধীরচন্দ্র যখন তখন শূন্যদৃষ্টিতে অন্যমনস্ক হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। সর্ব্বদা হাসি ও কথার মধ্যে যেন তাঁহার মুখে কেমন বিষাদের ছায়া ঘেরিয়া থাকিত। রাত্রে অনেক সময় অনিদ্রভাবে, নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। দু এক দিন চারু তাঁহার চক্ষে জলও দেখিয়াছিল। চারু কিছু জিজ্ঞাসা করিলে 'কই কিছু না' বলিয়া সে কথা চাপা দিতেন। চারুশীলার হৃদয়ের ভিতর যেন ক্রমশঃ আঁধার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, জীবন যেন শূন্য মরুময় বোধ হইতে লাগিল। তখন নলিনীর সেই সন্তান দুটিকে দেখিয়া, মহিমা বাবুর সন্তান-স্নেহ দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় সন্তানের কামনায় আকুল হইয়া উঠিত। সে শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া, আকুল হইয়া কাঁদিত, আর একটি অমূল্য সন্তান রত্নের কামনা করিত। সে ভাবিত 'আমি সুন্দর নই, একটি ননীর পুত্তলী সোণার ছেলে যদি কোলে দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার প্রতি এ বিরাগ থাকিত না। হায়! ভগবান্ কোন্ পাপে এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়াও আমাকে এই সন্তান ধনে বঞ্চিতা করিয়া পাঠাইলেন?'

তাহার কয়েক দিন পরে এক দিন সন্ধ্যার সময় সুধীরচন্দ্র ও মহিমারঞ্জন সস্ত্রীক পদব্রজে কষ্টহারিণীর ঘাটের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই সন্ধ্যার গোধূলি আলোকে ভ্রমণ বড় ভাল লাগিত। পথও নির্জ্জন ছিল। কষ্টহারিণীর ঘাটে গিয়া তাঁহারা সকলে উপবেশন করিলেন। জ্যোৎস্না-বিকশিত রজনীতে জাহ্নবীর রূপরাশি উছলিয়া

পড়িতেছিল। সেই পবিত্র তীর্থস্থানে দাঁড়াইলে স্বভাবতঃই সকলকার হৃদয়ে কেমন এক গম্ভীর পবিত্র ভাব জাগিয়া উঠে। দূরে মন্দিরে সন্ধ্যারতি হইতেছিল, মধুর শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল। গঙ্গার তরঙ্গ চন্দ্রালোকে উচ্ছলিত হইয়া তটভূমি চুম্বন করিতে করিতে সেই বাঁধান ঘাটের সোপানে আছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই সন্ধ্যার শীতল সমীরণ সেই তরঙ্গ-রাশি রঙ্গে দোলাইতেছিল।

তাঁহারা যখন বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন সহসা পথের পার্শ্বে একটি দীপালোক-প্রভাসিত বাটীর সম্মুখে সেই শুভ্রবেশধারিণী রমণীকে দেখিলেন। রমণী আলোর দিকে ফিরিয়াছিলেন, সেই দীপালোকে মলিন শুষ্ক আননে অতুল লাবণ্যপ্রভা খেলিতেছিল। সে মুখের এত শ্রী যে, একবার দেখিলে মানসে চিরাঙ্কিত হইয়া যায়। চারুশীলার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। নলিনী অতি মৃদু স্বরে চারুর হাত ধরিয়া বলিল, "চারু এ ভাই সেই পীরপাহাড়ের, কেমন না?"

চারু উত্তর না দিয়া ফিরিয়া স্বামীর প্রতি চাহিল, দেখিল তাহার স্বামী তাহাদিগের হইতে কয়েক পদ দূরে দাঁড়াইয়া অনিমেষলোচনে সেই রমণীর প্রতি চাহিয়া আছেন। তাঁহার আননে বিষাদ ও করুণার আভাস সুস্পষ্ট প্রভাসিত হইয়া আছে। সে রমণীও যেন স্থিরনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। চারু কিছু না বলিয়া একবার সে বাটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া নলিনীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। তাঁহারা কিয়দ্দূরে গিয়া ফিরিয়া দেখিলেন সুধীরচন্দ্র বিশেষ মনোযোগের সহিত একদৃষ্টে সেই বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিল, তাঁহাদের ফিরিতে দেখিয়া দ্রুতপদে আসিয়া সকলের সহিত মিলিত হইলেন। পথে আর বিশেষ কোনও কথাবার্ত্তা হইল না।

(ক্রমশঃ।)

প্রার্থনাষ্টক।

"যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ
শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন
স তে রাজন্ প্রসীদতু।"

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি জীবন-সুহৃৎ,
হংসে শুক্ল, শুকে যেই করিলা হরিৎ,
বিচিত্র বর্ণেতে যাঁর শিখী শোভমান,
হে রাজন্! তিনি তব সাধুন কল্যাণ।

সব ঈশ্বরের যিনি মহা-মহেশ্বর,
সকল দেবতা যাঁর চরণ-কিঙ্কর,
সকল পতির পতি পুরুষপ্রধান
হে রাজন্! তিনি তব সাধুন কল্যাণ

৩

যে দেবতা জলে স্থলে অনিলে অনলে,
বিশ্বসার বিশ্বাধার বিভু যাঁরে বলে,
বনস্পতি ওষধিতে যিনি বিদ্যমান,
হে রাজন্! তিনি তব সাধুন কল্যাণ।

৪

কোটি চন্দ্র, কোটি সূর্য্য, কোটি গ্রহ তারা
অন্ত না পাইয়া যাঁর ঘুরে দিশাহারা,
অনন্ত আকাশ কাল যাঁর লীলা-স্থান,
হে রাজন্! তিনি তব সাধুন কল্যাণ।

৫

যাঁর বলে বলী, তেজে তেজস্বী মানব,
যাঁহার কৃপায় সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য গৌরব,
প্রেম পুণ্য সত্য যাঁর করুণার দান,
হে রাজন্! তিনি তব সাধুন কল্যাণ।

৬

যোগী ঋষি মুনি গুণী ভক্ত জ্ঞানবান্,
বেদ বাইবেল তন্ত্র পুরাণ কোরাণ,
তত্ত্বাতীত ব'লে যাঁর করয় বাখান,
হে রাজন্! তিনি তব সাধুন্ কল্যাণ।

৭

অমর-বন্দিত-পদ, অমৃতস্বরূপ,
অরূপ পরম জ্যোতি যিনি বিশ্বরূপ,
মৃত্যুময় ভবে যিনি অমৃত-সোপান,
হে রাজন্! তিনি তব সাধুন্ কল্যাণ।

৮

যাঁহার গচ্ছিত ভার এ রাজ্য তোমার,
ঐশ্বর্য্য সম্পদ বীর্য্য প্রসাদ যাঁহার,
পিতা, মাতা, গুরু, প্রভু যিনি ভগবান্,
হে রাজন্! তিনি তব সাধুন কল্যাণ।

কাশ্মীর-চিত্র।

(৪৬৬-৬৭ সংখ্যা- ৫৩ পৃষ্ঠার পর)।

ডোমেলে রাত্রি থাকিতে উঠিয়া কিঞ্চিৎ আহারীয় সংগ্রহপূর্ব্বক আবার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। এ স্থানে আসিতে আসিতে খাদ্যাদির অভাব বোধ দূরে থাকুক, দুগ্ধ ও নানাজাতীয় সুস্বাদু ফল এত প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইতেছি যে, রাস্তায় চলিতে চলিতে প্রতিদিন রাজ-ভোগে ভোজন চলিতেছে। শত শত গো-শকটে সঙ্কীর্ণ পথ অনেক সময়ে রুদ্ধ থাকাতে আমাদের টোঙ্গা অনেক কষ্টে পর্ব্বতের পার্শ্ব ঘেঁসিয়া চলিল। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, বিচিত্র বর্ণের ফুল পাতায় সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতের শ্যামল দৃশ্যে নয়ন মুগ্ধ হইয়া গেল। উদ্ভিদ্-জগতের সৌন্দর্য্য বিধাতা এখানে পূর্ণ-মাত্রায় কি কৌশলেই সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মন বিস্মিত হইল। দাড়িম্ব দ্রাক্ষা প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের বৃক্ষে ও সুদৃশ্য তৃণলতাতে পর্ব্বতগুলি পরিপূর্ণ। কবি কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া (Happy Valley) "সুখময় উপত্যকা" নাম দিয়াছেন। পথের মাধুর্য্যপূর্ণ দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভূতলেই স্বর্গের মনোহর শোভা দর্শন

করিয়া কৃতার্থ হইব, সেই আশায় প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সূর্য্যোদয়ের বিচিত্র শোভা দর্শন করিবার জন্য অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আবার যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইলাম। দুরন্ত শীতে টোঙ্গায় বসিয়া থাকা বিষম কষ্টকর ব্যাপার। গরম শীতবস্ত্র ও মোটা কম্বলে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া রহিলাম। শ্বাসগ্রহণ জন্য নাসিকার অগ্রভাগ মাত্র বাহিরে রহিল। দক্ষিণের ও বামের হস্তের অঙ্গুলিগুলি দেখিতে লালবর্ণ হইয়া গেল, নিশ্বাস প্রতিনিশ্বাস বায়ুর সহিত তুষারকণা রক্তের মধ্যেও যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। ভয় হইল পাছে রক্তচালনা অবরুদ্ধ হইয়া যায়। তথাপি শীতল বায়ুহিল্লোল তীক্ষ্ণবাণের ন্যায় শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিল। সম্মুখের পর্ব্বতাচ্ছাদিত উপত্যকাভূমি হইতে সূর্য্যোদয়ের যে অপূর্ব্ব শোভা দেখিলাম তাহা বর্ণনীয় নহে। দক্ষিণে সুবিস্তৃত গিরিমালা, বামে খরস্রোতা ঝিলাম গম্ভীর গর্জ্জন ধ্বনিতে চারিদিক্ পূর্ণ করিয়া বিদ্যুৎগতিতে পঞ্চনদ অভিমুখে ছুটিতেছে। বিচিত্রবর্ণ-ভূষিত নানাজাতীয় বিহগ মধুর কাকলিতে বনস্থলী মাতাইয়া তুলিয়াছে! প্রকৃতির এই ক্রীড়াকাননের বিচিত্র শোভা দর্শনে আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়গুলি যে আপনা ভুলিয়া অনন্তের অসীম সত্তাতে নিমগ্ন হইয়া পড়িবে, তাহারআশ্চর্য্য কি? পর্ব্বতের পাষাণ-দেহ বেষ্টন করিয়া এমনই ঘোরাল পথ যে, আমরা তির্য্যগ্ গতিতে চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া চলিলাম। প্রকাণ্ড ঝরণা গুলি বাষ্প উদ্গিরণ পূর্ব্বক পর্ব্বত কলেবর হইতে বাহির হইয়া বিতস্তা-স্রোতে মিশিতেছে দেখিয়া পরম পুলকিত হইলাম। এক একটী ঝরণার মুখগুলি শীতদেশীয় পরম সুন্দর দুর্লভ নানা জাতীয় "ফারন" ও কুসুমে ভূষিত হইয়া এমন অপূর্ব্ব মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছিল,যাহার বর্ণনায় এ ক্ষুদ্র লেখনী পরাভব মানিতেছে। আমি শীতের তাড়নায় টোঙ্গা হইতে অবতরণপূর্ব্বক দ্রুতগতিতে অনেক পথ হাঁটিয়া রাশি রাশি দুষ্প্রাপ্য কুসুম, শোভনীয় পত্রগুচ্ছ, নানাজাতীয় অপূর্ব্ব সুগন্ধিপূর্ণ ওষধি সংগ্রহ করিলাম। নানা প্রকার সুগন্ধি ঔষধের গাছ গাছড়ায় পর্ব্বতের দেহ জঙ্গলময়। তাহা আহরণ করিতে যাইয়া সুগন্ধে মোহিত হইয়া গেলাম। রুগ্ন শরীরে টোঙ্গারোহণের অবর্ণনীয় কষ্ট সকলই একবারে বিস্মৃত হইয়া গেলাম। গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে মর্কটবংশ-অবতংস বিশল্যকরণী আহরণ করিয়া যে সুমিত্রা-নন্দনের মৃত দেহে সঞ্জীবনী শক্তি চালনা করিয়াছিলেন, তাহা আর উপন্যাসের কথা বলিয়া মনে হইল না। আশঙ্কা এই যে যাঁহারা স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, তাঁহারা বা এ সামান্য বর্ণনা অতিরিক্ত বলিয়া উপহাস করেন। বিতস্তার অপর তীরস্থ উচ্চ পর্ব্বতে হরিৎবর্ণ শস্যক্ষেত্রগুলি সোপানশ্রেণীর ন্যায় যে কি শোভা পাইতেছিল, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। পর্ব্বত-দেহগুলি শুধু পাষাণ-গঠিত নহে, অভ্রমিশ্রিত থাকাতে

সূর্য্যকিরণে হীরকখণ্ডের ন্যায় চিক্ মিক্ করিতেছিল। চক্ষের পক্ষে তাহা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইল। আমি অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করিলাম। দেখিলাম প্রকাণ্ড পাইন বৃক্ষের কাণ্ডগুলি প্রস্তর-রূপে পরিণত হইয়াছে! দুরারোহ পার্ব্বত্য পথের উপরেই বৃহৎ প্রস্তর এমন ঝুলিয়া রহিয়াছে যে বোধ হয় এখনি হঠাৎ পড়িয়া টোঙ্গা শুদ্ধ বিচূর্ণ করিয়া দিবে। কিন্তু বিশ্ব-বিধাতার শিল্পকৌশল অবলোকন করিতে করিতে চিন্তাশক্তি পরাভব মানিল। তাঁহার এ বিস্তৃত জগতের রচনা-কৌশলের নিকটে ক্ষীণ মানবের বুদ্ধি, জ্ঞান, যুক্তি তর্ক কোথায় লয় পায়! এ স্বভাবের রাজ্যে সেই অনন্ত শিল্পী কখনও বিশালদেহ পর্ব্বতকে ধূলিরাশিতে, কখনও বা সুগভীর সাগরবক্ষ গগন-ভেদী উন্নত পর্ব্বতে পরি-ণত করিয়া কি অসীম শক্তিরই পরিচয় দিতেছেন! ক্ষুদ্রশক্তি হীনমতি মানবের চক্ষু এ মহান্ সৃষ্টিকৌশলের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া যে বিস্ময়ে অভি-ভূত হইয়া পড়িবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। আমাদের মনও সংসারের সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া অদৃষ্ট অসীম জগতে বিচরণ করিতে লাগিল। আমি টোঙ্গা পশ্চাতে ফেলিয়া বিতস্তাস্রোত করিতে করিতে অনেক দূরে যাইয়া পড়ি-লাম। এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাজ্যে আমার ন্যায় জীবও অমানুষিক সাহস লাভ করিয়াছিল। সরলভাবে পর্ব্বতশ্রেণী শির উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান, তাহার মূলদেশে বিতস্তার প্রবল স্রোত নিরন্তর ভীমবেগে আঘাত করিয়া বহিতেছে। নদীগর্ভে ভীমাকৃতি পাষাণস্তূপগুলি ঐরাবতের ন্যায় পতিত রহিয়াছে। বোধ হয় যূথসহ যূথনাথ অবগাহনে ব্যস্ত। কিন্তু স্রোতের সংঘর্ষণে ক্রমে তাহা বালুকারাশিতে পরিণত হইতেছে। স্রষ্টা এক আঘাতে ভগ্ন করিয়া আবার সুকোমল হস্তে প্রকৃতির দেহ কি নবীন সৌন্দর্য্যে শোভাময় করিয়া গড়িতে-ছেন, নয়ন তাহা দেখিয়া বিস্ময় মানিল। প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া গন্তব্য স্থলে লইয়া যাওয়া এ পার্ব্বত্যদেশে সহজ ব্যাপার নহে। সেই জন্য এ দেশবাসিগণ বৃক্ষাদি কর্ত্তন পূর্ব্বক একত্রে বন্ধন করিয়া বিতস্তা-স্রোতে ভাসাইয়া দেয়। স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে তাহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিয়া থাকে। এ কৌশল আমার নিকট নূতন বোধ হইল। স্রোতে ভাস-মান ঐ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় আমাকেও ভগ-বানের ইচ্ছাস্রোতে ভাসাইতে কতই আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। ভাবিলাম আমার নিয়ন্তার মহাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আমিও কেন এমনি ফলাফল চিন্তা না করিয়া সেই অনন্তের উদ্দেশে ছুটি না! নিজের দুর্গতির চিন্তাও তীব্রভাবে হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)।

নারীসুহৃদ্ মদনমোহন।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা, বাল-বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি বিবিধ সমাজসংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বদেশহিতৈষিতার অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তখন যে সকল বীরপুরুষ আত্মহারা হইয়া তাহাতে জীবন আহুতি দিয়া তাঁহার উৎসাহ-বহ্নি প্রবলবেগে সমুজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, ও যাঁহাদের সহায়তা ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংকল্পিত ব্রতসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না, তাঁহাদের নাম বিলুপ্তপ্রায়!

পরলোকগত শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি উৎসাহী ব্যক্তিগণ অগ্রবর্ত্তী না হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকৃত প্রস্তাবে বিধবাবিবাহ-সংস্কারক হইতে পারিতেন না। স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ন্যায় সৎসাহসী মহাত্মা না থাকিলে এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার এত শীঘ্র উন্নতি হইতে পারিত না এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে আমরা সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বা কামিনী রায়ের ন্যায় সুশিক্ষিতা মহিলা সকল দেখিতে পাইতাম না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহযোগীদিগের মধ্যে স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মহামতি বেথুন যখন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন, তখন কুসংস্কারান্ধ বঙ্গবাসী-দিগের মধ্যে ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া-ছিলেন। মদনমোহন সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় দুহিতাদ্বয়কে বেথুন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। ইহাতে তিনি জনসাধারণ ও স্বীয় আত্মীয় কুটুম্বগণ কর্ত্তৃক কি পর্য্যন্ত লাঞ্ছিত, অবমানিত ও নিপীড়িত হইয়া-ছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ মদনমোহন তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয়েন নাই। "কর্ত্তব্য বুঝিবে যাহা, নির্ভয়ে করিবে তাহা" এই প্রবাদবাক্য মদনমোহন স্বীয় জীবনে অতি সুন্দররূপে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন।

তৎকালে মদনমোহনের সৎসাহসে উত্তেজিত হইয়া আরও কয়েকটী মহাত্মা স্বীয় স্বীয় কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তাহাতে কুসংস্কার-শৈল ভেদ করিয়া স্ত্রীশিক্ষা একটী ক্ষীণধারার ন্যায় প্রবাহিত হইল। তৎপরে আরও শত শত ধারা তাহাতে মিলিত হওয়াতে এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা প্রবল-বেগবতী স্রোত-স্বতীর ন্যায় প্রবহমানা। কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষার "গোমুখী" তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সৎসাহস।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে মদনমোহন জন্মগ্রহণ

করেন। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি তাঁহার পিতৃব্য রামরতন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। মদনমোহনের পিতা রামধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত কলেজের কেরাণী ছিলেন। রামধনের অবসর গ্রহণের পর তদীয় ভ্রাতা রামরতন সেই পদ গ্রহণ করেন।

কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের পর মদনমোহনের উদরাময় হইল। তাঁহাকে বাড়ী গিয়া শয্যাগত থাকিতে হইল। পরে সুস্থ হইয়া আবার ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি দ্বিতীয়বার সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। এই বৎসরের শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্ররূপে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। ইঁহারা সহপাঠী। পরীক্ষায় বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রেণীর প্রথম ও মদনমোহন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন। মদনমোহন বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াও বিদ্যাসাগরের উপরে স্থানলাভ করিতে পারেন নাই। তাহা হইলেও উভয়ের প্রতিভা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রায় সমান ছিল। পড়াশুনায় উভয়ের মধ্যে অদম্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলেও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে এমন অনাবিল ও অপকট স্নেহ ও সৌহার্দ্দ ছিল যে, সকলেই তদ্দর্শনে বিমোহিত হইতেন।

১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে মদনমোহন সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে "রসতরঙ্গিণী" নামক কাব্য প্রণয়ন করেন। ইহা সংস্কৃত "রসতরঙ্গিণী" কাব্যের অনুবাদ। এই গ্রন্থে তর্কালঙ্কার মহাশয় অসামান্য কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পর মদনমোহন কবিতা রচনায় মনোযোগ দিয়াছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে মদনমোহন সুবন্ধুকৃত সংস্কৃত "বাসবদত্তা"র বাঙ্গালা অনুবাদ করেন। কাব্য দুই খানিতে তর্কালঙ্কার মহাশয় যে অসামান্য প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা ও কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে "রসতরঙ্গিণী" ও "বাসবদত্তা" কাব্য জগতের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে চির বিরাজমান থাকিবে। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, এ গুলি সুরুচি-মার্জ্জিত হইলে বড়ই ভাল হইত। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলিও কেমন মধুর! তাঁহার "প্রভাত বর্ণন—পাখীসব করে রব" পাঠে কাহার হৃদয়ে শৈশব-স্মৃতি ও গ্রাম্য প্রাকৃতিক ছবি জাগিয়া না উঠে?

ভুবনমালা ও কুন্দমালা কন্যাদ্বয়কে সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়াই মদনমোহনকে আমরা স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তক বলিয়াছি। বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে এ কথা অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হইবে না। পরলোকগত মধুসূদন গুপ্ত সর্ব্বপ্রথমে শবচ্ছেদ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সৎসাহসের জন্য ফোর্ট উইলিয়মে তোপধ্বনি হইয়াছিল,—মদনমোহনের সম্মানার্থ আমরা কি করিয়াছি? এক্ষণে শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা মাত্রেরই কর্ত্তব্য তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়া তাঁহার

সৎসাহসের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন করা। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মহাত্মা বেথুন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মদনমোহন কন্যাদ্বয়কে সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের কল্পনাকে সত্যে পরিণত করেন। এজন্য বেথুন-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ মদনমোহনের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। মদনমোহনের সৎসাহসের বলেই আজ বেথুন বিদ্যালয় কলিকাতা মহানগরীর রাজপথে উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। সেই সৎসাহসের বলেই আজ চোরবাগান ও রামবাগান বালিকা বিদ্যালয়, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, মহাকালী পাঠশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত এবং বঙ্গদেশের নগরে, নগরে গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার জয়-পতাকা উড়াইতেছে।

যে সময়ে বেথুনের বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, শিশুপাঠ্য পুস্তকের অভাব বুঝিয়া মদনমোহন সেই সময় শিশুশিক্ষার তিন ভাগ প্রণয়ন ও প্রচার করেন। এই প্রথমশিক্ষা পুস্তকগুলি যেমন সরল, তেমনি শিশুদিগের মনোরঞ্জন ও জ্ঞানবিকাশের সহায়। এই পুস্তক অবলম্বনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় ও কত সহস্র সহস্র বর্ণশিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে।

মদনমোহনের শিক্ষাদান-প্রণালী অতীব প্রীতিকর ছিল। তিনি ক্রমান্বয়ে কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট পাঠশালা, বারাসাত স্কুল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনার কার্য্য করিয়া শেষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহার পর কিছুদিন বহরমপুর কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করেন। মদনমোহন যে যে স্থানে শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানেই মধুর ব্যবহার ও সুশিক্ষা-প্রণালীর দ্বারা সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। (ক্রমশঃ)।

ইংরাজ-বুয়ার সন্ধি

"ক্ষমাগুণোহশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা।"

ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ এবং শক্তদিগের ভূষণ, এই প্রাচীন মহাবাক্যের সার্থকতা আমরা ইংরাজ-বুয়ার সন্ধিতে দেখিতে পাই। বুয়ারদিগকে সহস্র ধন্যবাদ যে, তাহারা সামান্য একদল কৃষক, ইংরাজরাজের ফুৎকারে উড়িয়া যাইবার কথা, কিন্তু তাহারা স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া একদিন দুই দিন নয়, এক মাস দুই মাস নয়, সুদীর্ঘ আড়াই বৎসরকাল মহোদ্যমে যুদ্ধ করিয়াছে—শত শত লোক হতাহত হইয়াছে, সহস্র সহস্র লোক বন্দী হইয়া দ্বীপান্তরিত ও দেশান্তরিত হইয়াছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, অবশিষ্ট যাহারা, তাহারা প্রাণপণে লড়িয়াছে এবং মহাবল ইংরাজকে বার বার ছিন্ন ভিন্ন ও বিপন্ন করিয়াছে। তাহাদের পরিণাম সমূলে

নিঃশেষিত হওয়া যখন তাহারা বুঝিল, তখন তাহারা শান্তভাব ও ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিয়া ইংরাজের আহ্বানে সন্ধিবন্ধনে স্বীকৃত হইল। তাহারা ইংলণ্ডেশ্বরকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু আত্ম-মর্য্যাদা পরিত্যাগ করে নাই। তাহাদের ভাষা, তাহাদের আত্মরক্ষা, ও সর্ব্বপ্রকার অধিকার রক্ষা এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়া তবে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে। এ জন্য তাহাদের অধিনেতা বোথা, ষ্টীন্, ডিলারে ও ডিওয়েটের অসম বীরত্বের সহিত তাঁহাদিগের সুবিবেচনা, শান্তি-প্রিয়তা ও দেশহিতৈষিতার অশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ইংরাজরাজকেও শতকোটি ধন্যবাদ করিতে হয়। শক্তের ভূষণ যে ক্ষমা, তিনি তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিয়াছেন। আড়াই বৎসর কাল ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অসংখ্য সৈন্যের যোজনা করিয়া, কত প্রভূত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া, কত দৃঢ় অবরোধ ভেদ করিয়া, কত যুদ্ধে শত্রু দলকে পরাভূত করিয়া এবং মৃগপালের ন্যায় তাহাদিগকে হত, তাড়িত বা বন্দী-কৃত করিয়া আপনার অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। আড়াই বৎসর গিয়াছে, আর ২॥ কেন, ৫ বৎসরকাল যুদ্ধ চালাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে লাভ বা পৌরুষ কি? একটী সাহসী বীরজাতি একবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত, ইংরাজ জাতিরও ধনপ্রাণ নাশের ইয়ত্তা থাকিত না। জয়োন্মত্ততার সময় প্রবৃত্তিবেগ সংযম করিয়া ক্ষমা অবলম্বন করা বড়ই কঠিন, এই জন্য ক্ষমা শক্তদিগের অমূল্য ভূষণ ও অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচায়ক। জগতে অপ্রকাশিত নহে, আমাদের সদাশয় রাজা ৭ম এডোয়ার্ড সর্ব্বাগ্রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধাবসানের আদেশ করেন এবং তাহাতেই শুভসন্ধি-প্রস্তাব ধার্য্য হয়। বুয়ার যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনার রাজেচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া যেরূপ সদ্বিবেচনা, বুদ্ধি-কৌশল ও শত্রুর প্রতি অসামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শনপূর্ব্বক কার্য্য সমাধা করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় ও চিরপ্রশংসার্হ।

বুয়ারযুদ্ধ হইতে কতকগুলি মহোপদেশ লাভ করা যায়ঃ—

(১) বর্ত্তমান সভ্যতার যুগ নিতান্ত শূন্য-গর্ভ। এ সভ্যতা সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সম্পূর্ণ স্বার্থপরতাই ইহার ভিত্তিমূল। তাহা না হইলে, সিংহ বরাহে যুদ্ধ বাধিলে পরাক্রান্ত বন্যজন্তু সকল যেমন উদাসীনভাবে দেখে, প্রবল পরাক্রান্ত জাতি সকল সেইরূপ ভাবে এই দুই বীর জাতির বল পরীক্ষা এত দিন ধরিয়া দর্শন করিতে পারিত না!! ক্ষুদ্র হলণ্ডকে সাধুবাদ দিতে হয়, তবু সন্ধি-বিষয়ে একটু চেষ্টা করিয়াছেন। মার্কিন, জর্ম্মণ, ফরাসী, রুসীয়া প্রভৃতি মহাজাতি-সকল দুর্ব্বল চিনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার দেহ-মাংস বিভাগে যেরূপ দলবদ্ধ হইয়াছিলেন, যদি এই কুরুক্ষেত্রের অভিনয় নিবারণের জন্য সেরূপ সমবেত হইতেন, তাহা হইলে কত ধন প্রাণ রক্ষা

পাইত ; জননী ধরিত্রীর মুখ কলঙ্কিত ও ম্লান না হইয়া কত উজ্জ্বল হইত এবং সভ্যজাতিদিগের মহত্ত্ব ও গৌরব কত বর্দ্ধিত হইত !!

(২) শান্তিরাজ (Prince of peace) খৃষ্টের ধর্ম্মোপদেশ অরণ্যে মুক্তাছড়ানর ন্যায় বিফল হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকের সংখ্যা সমুদ্রতীরের বালুকাকণার ন্যায় অসংখ্য—এক বৃটিষ সাম্রাজ্যেই তাহার সংখ্যা কে করে? কিন্তু ২॥০ বৎসরের মধ্যে শান্তির সুবার্ত্তা কে ঘোষণা করিয়াছে? প্রত্যুত ইংরাজ-জাতির ক্রোধ ও গর্ব্ব অনলে যিশুর প্রতিনিধিগণ কত ঘৃতাহুতি দিয়া তাহা প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন! দুই খ্রীষ্টাশ্রিত জাতির মধ্য হইতে খ্রীষ্ট ও তাঁহার স্বর্গরাজ্য অবসর লইয়া যেন শয়তানের রাজত্ব প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মের জ্যোতি ম্লান হইয়া খ্রীষ্টীয় সমাজের অপকলঙ্ক বৃদ্ধি করিয়াছে!! সন্ধি দ্বারা সেই অপকলঙ্ক কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষালিত হইল!

(৩) এক জাতি যত ক্ষুদ্র হউক, তাহাদের মধ্যে যদি অকৃত্রিম দেশহিতৈষিতা জাগ্রত হয়, তাহারা এক স্বর্গীয় বলে বলীয়ান্ হয় এবং অসাধ্যসাধন করিতে পারে। ক্ষুদ্র পিপীলিকারও দংশন করিবার শক্তি আছে, ক্ষুদ্র মশকও পশুরাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারে। বুয়ার বালকেরাও মহারথীর ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছে—স্ত্রীলোকেরাও বীরধর্ম্মের পরিচয় দিয়াছে।

(৪) বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার স্বাভাবিক এবং অহঙ্কার পতন ও অশেষ দুর্গতির মূল। জগতের ইতিহাসে কত মহা মহা রাজ্যের উত্থান ও পতন হইয়াছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে এই সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বীরত্ব সত্ত্বেও যাঁহারা শান্ত ও ধীর; অভ্যুদয়শীল হইয়াও যাঁহারা ক্ষমাশীল, সৌভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহাদের অঙ্কেই চিরস্থায়িনী হয়, নতুবা চঞ্চলা লক্ষ্মী অপাত্রকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

(৫) আসুরিক অভিনয়ের মধ্যে দেব-চরিত্রের দৃষ্টান্ত কি স্বর্গের দৃশ্য! ইংরাজ-শুশ্রূষাকারিণী রমণীগণ কি দৈন্য, কি ত্যাগস্বীকার, কি সাহস, উৎসাহ, অধ্যবসায় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া সুদীর্ঘকাল আহত ইংরাজ সৈন্যের সেবা করিয়াছেন, তাহা ইংরাজজাতির জাতীয় গৌরবের কীর্ত্তিস্তম্ভ।

(৬) মানুষে মানুষে বৈরভাব অগ্নির ন্যায়। অগ্নি ক্ষীণশিখ অবস্থায় এক ফুঁয়ে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, কিন্তু তাহা প্রজ্বলিত হইয়া সমুদায় পল্লী ও নগরব্যাপী হইলে প্রবল দমকলের জলেও সহজে নির্ব্বাপিত হয় না। বিবাদ বিসম্বাদ ব্যক্তিগত বা জাতিগত হউক, প্রথম উদ্যমেই তাহা নিঃশেষিত করা শ্রেয়ঃকল্প। প্রথম হইতেই শেষ পর্য্যন্ত এই মহামূল্য উপদেশ শিরোধার্য্য—ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ ও শক্তদিগের ভূষণ। ক্ষমার জয় হইলেই পৃথিবীতে প্রেমরাজ্য ও স্বর্গরাজ্য আনয়নের সুপথ হয়।

নূতন সংবাদ

১। পুনার এক ধনাঢ্যা ব্রাহ্মণী "পুনা জ্ঞান-সমাজ" নামক সভার গৃহনির্ম্মাণার্থ ৮০,০০০ টাকা দিয়াছেন।

২। ইংলণ্ডেশ্বর এতদূর সবল হইয়াছেন যে, গত ২৬এ জুলাই প্রিবি কৌন্সিলের এক অধিবেশনে উপস্থিত হন। এরূপ হইলে ঈশ্বরেচ্ছায় ৯ই আগষ্ট রাজ্যাভিষেক হইতে পারে।

৩। আগামী ১৫ই অক্টোবর জাপানের কিওটো নগরে "প্রজ্ঞা-পরামিতা" নামে এক ধর্ম্মমহামণ্ডল বসিবে। পূর্ব্বদেশীয় বিবিধ ধর্ম্মের আচার্য্য ও প্রতিনিধিগণ তাহাতে আহূত হইয়াছেন।

৪। আগামী ১৬ই ডিসেম্বর ফরাসী ইণ্ডো-চাইনা গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে এক "Oriental Congress" সভা হইবে, তাহাতে ভারতবর্ষ ও অন্য পূর্ব্বদেশীয় ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা হইবে।

৫। লর্ড কুর্জন ১লা আগষ্ট সিমলা ত্যাগ করিয়া মহীশূর, বাঙ্গালোর, দিল্লী ও রাজপুতানা পরিদর্শনপূর্ব্বক ২০এ তারিখে সিমলায় প্রত্যাগত হইবেন।

৬। বোয়ার সেনানায়ক ডিওয়েট, বোথা ও ডিলারে ইউরোপ্ পরিদর্শনে যাত্রা করিয়াছেন। ইহাঁদের বীরত্ব চির-পূজ্য।

৭। শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার দত্ত ও শিশিরকুমার বসু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান এবং শরৎকুমার ঘোষ ইতিহাসের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে আসিতেছেন।

৮। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ এডওয়ার্ডস সাহেব ৩ মাসের ছুটী লওয়াতে ডাক্তার পি. কে, রায় তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতেছেন। বাঙ্গালীর এ পদ এই প্রথম।

৯। রামপুর হাট হইতে একখানি রেল ট্রেন লুপলাইনে যাইতেছিল, হঠাৎ এক ঘূর্ণাবায়ু উঠিয়া এঞ্জিন ও ব্রেক্ভান হইতে সমুদায় গাড়ী উল্টাইয়া ফেলিয়া দেয়, তাহাতে অনেক লোক হতাহত হইয়াছে।

১০। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খুরদা ষ্টেসন হইতে প্রায় দুই মাইল লাইন বন্যাতে ভাসিয়া যায়। ফিরে রথ দেখিয়াও যাত্রিগণ যানাভাবে পুরীতে বদ্ধ হইয়া আছেন।

১১। ছোট লাট সার জন উডবরণ শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ময়মনসিংহে যাইতে পারেন নাই। ঢাকার নারায়ণগঞ্জে স্পেসাল ট্রেণে ময়মনসিংহের প্রতিনিধি-গণকে আনাইয়া অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

১২। এবৎসর বারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস ঠাকুর ল-লেক্চারার হইয়াছেন।

১৩। দুর্ভিক্ষ সাহায্য-প্রার্থীর ৭২হাজার

লোক কমিয়াছে, তথাপি ৪ লক্ষের অধিক ভিক্ষার্থী আছে।

১৪। ইংলণ্ড-রাজ-সচিব চেম্বার্লেন গাড়ী হইতে পড়িয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া হাঁসপাতালে ছিলেন, এখন তথা হইতে গৃহে নীত হইয়াছেন।

১৫। জয়পুরের মহারাজা বিলাতের রাজ-হাঁসপাতাল ফণ্ডে ৭৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১৬। চিকাগোর ধর্ম্ম-পার্লেমেণ্ট (Parliament of Riligion) মহাসভার আয়োজনকর্ত্তা ডাক্তার জন হেনরী বারোর মৃত্যুসংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম।

১৭। গত ৪ঠা জুলাই বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দের হঠাৎ মৃত্যু হয়। মান্দ্রাজের হিন্দুগণ বিরাট সভা করিয়া ইহাঁর স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিয়া ইনি ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

১৮। আর্য্যসমাজের মৃত পণ্ডিত লেখরামের বিধবা পত্নী জলন্দরের কন্যা-মহাবিদ্যালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি স্বামীর জীবন-বিমার ২০০০ টাকা গুরুকুলে দান করিয়া আর্য্যসমাজের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা

১। চরিত্র গঠন—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস সঙ্কলিত, মূল্য ॥০ আনা। অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকা ও জ্ঞানগর্ভ পুস্তক হইতে নীতিসূত্র, উপদেশ এবং আখ্যায়িকা সুবিবেচনার সহিত সংগৃহীত হইয়া এই পুস্তকখানি প্রস্তুত হইয়াছে। চরিত্র গঠনের উপযোগী যথেষ্ট উপাদান ইহাতে আছে। ইহা যে বালকবালিকাদিগের নীতি শিক্ষার বিশেষ সহায় হইবে বলা বাহুল্য।

২। প্রসূনাঞ্জলি—'স্নেহলতা', 'প্রেমলতা' রচয়িত্রী প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি সুভাবপূর্ণ চিন্তাকলিকা গদ্য ও পদ্যাকারে বিকশিত হইয়াছে। লেখিকার সকল মতের সহিত আমাদের ঐক্য না থাকিলেও তাঁহার চিন্তাশীলতা এবং ভাবের গভীরতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ইনি সুনিপুণা লেখিকা, ইহাঁর রচনা পাঠে লেখিকাগণ প্রীত ও উপকৃত হইবেন।

৩। মাধবী—শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত ও কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামে উৎসর্গীকৃত। মাধবী নবীন কবি-হৃদয়ের সম্মিলিত উচ্ছ্বাস-পুঞ্জ। ইহার ভাব ও ভাষা জীবন্ত। বিভিন্ন মনোরম বিষয়ের সমাবেশে মাধবী-কুঞ্জ বড়ই রমণীয় হইয়াছে। নবীন কবি উৎসাহ লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য।

৪। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্তের স্বল্প পরিচয়—শ্রীঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা।

মহর্ষির জীবন বর্ত্তমানকালের আদর্শ ঋষি জীবন, ইহা বিশেষরূপে অধ্যয়ন ও অনুসরণ করিতে পারিলে ঋষি-ঋণ কতক পরিমাণে পরিশোধ করা হয়। ঈশান বাবু এই জীবনের অনেক সার সার কথা লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহাতে মহর্ষির সুন্দর দুই খানি ছবিও আছে।

৫। বাঙ্গালির যশোগান—বাবু কামাখ্যা-চরণ ঘোষ বিরচিত, মূল্য ৵১০ আনা। বাঙ্গালী জাতির মঙ্গলোদ্দেশে জাতীয় প্রধান দোষগুলি গুণ বলিয়া শ্লেষোক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে। লেখা সরস পদ্যময় ও ওজোগুণসম্পন্ন। উপসংহারে সাদা কথায় কয়েকটী সুন্দর উপদেশ আছে। এতৎ-পাঠে বঙ্গপুরুষ রমণীগণ আমোদের সহিত শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

বামারচনা।

অশ্রু

(বন্ধুবিচ্ছেদ দিনে—২-১-০৯)।

ওলো অশ্রু!

নিরজনে যবে সুধু থাকি তোকে লয়ে,
প্রভুর করুণা জাগে নিভৃত নিলয়ে।
ঘোর শূন্য পূর্ণ মম তোর দেখা হ'লে,
স্বরগ প্রাণেতে জাগে মরুহৃদি গলে।
কঠোর সংসার পানে নাহি তুলি আঁখি,
ওলো অশ্রু! তুই মম স্নেহময়ী সখী।

২

প্রেমরূপী দেবতার আদর্শ ভুবনে,
তাই তোকে চাই এত আদর যতনে।
বিদগ্ধ প্রাণেতে শান্তি তোরি আগমনে,
তাই ডাকি আয় অশ্রু! বিশুষ্ক নয়নে।
সুধুই দুজনে রব কি ভয় ভাবনা?
আমি ত তোকেই চাই, কিসের লাঞ্ছনা?
ত্রিদিবের ছবি জাগে কঠোর হিয়ায়,
শান্তি ধারা ঢেলে দিস্ এ শুষ্ক ধরায়।
পরশ-মণিকে পাই তোর পরশনে,
তাই ডাকি আয় অশ্রু এ শুষ্ক নয়নে॥

শ্রী—

বিভুবালার স্মৃতি। *

পিসিমার খেদ।

প্রাণময়ী বিভুবালা কোন্ খানে যায়?
বিভু যে স্বর্গের বিভু,
পাপ জানিত না কভু,
অমরীর মত ছিল স্নেহ মমতায়। ১

* গত বর্ষের শ্রাবণে (১৯এ আগষ্ট) বিভুবালার বিয়োগে এই কবিতা লিখিত হইয়াছিল, স্থানাভাবে প্রকাশিত হয় নাই। বা, বো, স।

ললিত-লাবণ্য-ভরা শ্যামাঙ্গী প্রতিমা,
হাস্য-মুখী বন-ফুল,
মরতে মানবী ভুল,
গুণবতী মা আমার বাগ্‌দেবী রমা। ২
এমন করিয়া বিভু কোন্ থানে যাও ?
তব ভাই ভগ্নীগণ,
কাঁদিতেছে অনুক্ষণ,
দয়াময়ী বিভুবালা ফিরিয়া তাকাও। ৩
তোমা ধন হ'য়ে হারা জনক তোমার
হয়েছেন মর্ম্মাহত,
শোকশিখা জ্বলি শত,
দহয় হৃদয়, প্রাণে সুখ নাহি আর। ৪
বিভুবালা মা আমার প্রীতির কুসুম,
না হইতে বিকশিত,
হইলে মা নিমীলিত,
জীবন উষায় একি এল চির ঘুম। ৫
অকালে পড়িল ঝরি স্নেহের কমল!
নিয়ন্তার কি বিধান,
জানে না মানব-প্রাণ,
মর্ম্মভেদী শোকে শুধু ফেলে আঁখিজল।৬
জ্যোছনার রেখা বিভু রজত বল্লরী,
সে যে অলকার দ্যুতি,
অমরার প্রতিকৃতি,
সুরভিত মন্দারের অমিয়-মাধুরী।৭
স্নেহময়ী বিভুবালা! আয় মা আমার,
ধীরা স্থিরা সুগম্ভীরা,
বিভু-প্রেমে আত্ম-হারা
আদর্শ কুমারী মেয়ে গুণের আধার। ৮
এ হেন অমূল্য নিধি কে হরিয়া লয়?
বিভু যে প্রাণের বিভু,
শমন ছুঁওনা কভু,
হৈও না এমন করি কঠিন নিদয়। ৯
কেবল ফুটিতেছিল নবীন জীবন,
এ চারু মধুর ফুল,
মৃত্যু! করিলে নির্ম্মূল,
দহিলে অনল ঢালি কত হৃদিমূল। ১০
অকালে ছিঁড়িলে তুমি আশার ব্রততী,
বিদ্যাবতী বিভুবালা,
দেবীমূর্ত্তি ছাঁচে ঢালা,
গৃহ করমেও ছিলে, সুনিপুণা অতি।১১
আমরা এমন ধনে হইয়া বঞ্চিত
বদনে সরে না ভাষ,
করিতেছি হা হুতাশ,
অনশনে ধরাসনে হইয়া পতিত। ১২
এবার মুছিব আঁখি, কাঁদিব না আর,
খোকা গেল, বিভু গেল,
বল বুদ্ধি ফুরাইল,
হইল কোমল প্রাণ পাষাণ আকার।১৩
রাখিতে চাহি না বিভু! যাও তুমি যাও,
রোগে নিদ্রা নাহি ছিল,
যাতনায় প্রাণ গেল,
যাও বিভু জননীর কোলেতে ঘুমাও।১৪
কৈলাসকামিনী তুমি কোথা দয়াবতী!
তব সোহাগের মেয়ে,
স্বরগে চলিল ধেয়ে,
আশু বাড়াইয়া কোলে লও শীঘ্রগতি।১৫
প্রাণাধিকা বিভু তুমি পেলে স্বর্গলোক,
সেথানে খোকাও আছে,
বলিও তাহার কাছে,
অভাগিনী মা তাহার ম'রে আছে শোকে ১৬
যাও পুণ্যবতী বিভু! শান্তির ছায়ায়,
কি আর বলিব তোরে,

বলিতে কি কথা সরে ?
এইমাত্র বলি—খোকা আছে অমরায়।১৭
নিকটে রাখিও তারে, করিও যতন,
খেতে দিও গঙ্গাজল, এনে দিও সুধাফল,
একসঙ্গে ভাই বোন্ করিও ভ্রমণ।

রা।

চিন্তা

আয়ু ত ফুরায়ে এল, কত কাল আর,
এ মোহ নিদ্রার ঘোরে রব অচেতন ?
পড়িয়া রয়েছে কত কার্য্য আপনার,
কবে সব হবে শেষ ? নিকট শমন।১
কি করিনু এত দিন, জগতে আসিয়া ?
আলস্য বিলাস-স্রোতে ভাসায়ে জীবন,
কত কাজ রহিয়াছে এ বিশ্ব ব্যাপিয়া ;
কিছু না করিনু, শেষে কেবলি ক্রন্দন।২
"ক্ষুদ্র আমি কি পারিব ?"—এই কথা বলি
নিশ্চেষ্ট নাহিক যেন থাকি কদাচন।
সেই কথা মনে যেন জাগয় কেবলি—
ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীর সাগর বন্ধন।৩
তবু যে কদিন আর আছি পৃথিবীতে,
এক মনে চেষ্টা যদি করি প্রাণপণ,
নিশ্চয় পারিব কত কর্ত্তব্য সাধিতে,
চেষ্টায় হয় ত সব অসাধ্য সাধন।৪
হে বিভো, চরণে তব এই নিবেদন,
এ হেন সুমতি মোরে দাও দয়া ক'রে,
বিলাস-বাসনা সব দিয়া বিসর্জ্জন,
প্রাণ যেন দিতে পারি বিশ্ব-সেবা তরে।৫
অনাথ আতুর কত করে হাহাকার,
কেহ নাই তাহাদের সান্ত্বনা করিতে ;
আমি যেন তাহাদের হয়ে আপনার,
পারি সকলেরে নিজ কোলেতে টানিতে।৬
নিরাশ্রয় কত, পথে ঘুরিয়া বেড়ায়,
অন্ন নাহি জুটে দুটি, ক্ষুধায় কাতর,
কেহ নাহি তাহাদের বারেক সুধায়,
যেখানেই যায়, সবে করে অনাদর।৭
মাতৃহীন শিশু কত কেঁদে কেঁদে সারা,
কেহ ত তাদিগে কভু কোলে নাহি লয়।
অভাগী রমণী কত হয়ে পতি-হারা,
অনাথিনী একাকিনী ধূলায় লুটায়।৮
ইহারা সকলে মোর আপনার জেনে,
পারি যেন সকলেরে সান্ত্বনা করিতে,
মাতৃ-হীন শিশুদের বুকে টেনে এনে
মাতৃসম হয়ে যেন পারি গো পালিতে।৯
ক্ষুধার্ত্তেরে যদি দুটি অন্ন দিতে পারি,
বিধবার অশ্রুবারি মুছাই যতনে,
সার্থক জীবন বলি তবে মনে করি—
এই ত কর্ত্তব্য কাজ, মরত ভবনে।১০
এত কাজ রহিয়াছে তবে কেন আর,
মিছা কাজে আলস্যেতে জীবন কাটাই ?
যতটুকু পারি, করি কার্য্য আপনার,
পর-উপকার তুল্য ধর্ম্ম আর নাই।১১
দিন ত ফুরাল, তবু যে কদিন বাকি,
নিজ ভোগ-বিলাসিতা সকল ত্যজিয়া,
"বিশ্ব সেবা-ব্রত" মন্ত্র হৃদয়েতে রাখি,
পর-হিতে দিই যেন জীবন সঁপিয়া।১২

শ্রীমতী নী—

তুলসী স্তবক।*।

বর্ষা।

প্রস্রবণ শৈল + তটে করিলা বসতি
সৌমিত্রি সহিত প্রভু রঘুকুলপতি।
ব'য়ে যায় গোদাবরী সেই গিরি-পাদে,
বন্ধুর পাষাণ-পথে ঝর্ ঝর্ নাদে।
স্বতই সুন্দর গিরি নিঝর-মালায়,
তাহাতে বরষা আসি ভূষিয়াছে তায়,
মেদুর জলদপূর্ণ নিরখি গগন,
কহিছেন লক্ষ্মণেরে জানকী-জীবন!—
"লক্ষ্মণ! জলদ দেখি নাচিতেছে কেকী,
ভকত যেমন ভব-বন্ধন উপেখি,
অকাতরে বিতরিছে জীমূত জীবন,
ধন্য দাতা জানে যেই যাচকের মন।
সুনীল নীরদজালে খেলিছে চপলা,
খলের পিরীতি প্রায় সতত চপলা।
বরষিছে নত মুখে নামিয়া অম্বুদে,
বিদ্যা সম্পদেতে যথা অবনত বুধে।
দুই সীমা বাঁধি দুই গিরি শৃঙ্গ পরে
ত্রিবিধ জ্যোতির স্রোত সৃজিয়া অম্বরে,
সাজায় জীমূত-দেহ বাসব-কার্ম্মুক,
আশা উজলয়ে যথা আস্তিকের মুখ।
স্থানে স্থানে পর্ব্বতের সুনীল বিগ্রহে
শ্বেত অভ্রখণ্ড আহা! কি সুষমা বহে!
ফেন-বিন্দু কিবা ক্ষীরসিন্ধু লহরীর,
শোভিছে ক্ষীরোদশায়ী বরাঙ্গে হরির।
সলিল-প্রপাত গর্জ্জি সুগম্ভীর রবে,
শৈলশৃঙ্গ হ'তে পড়ে ধ্বনিয়া ভৈরবে,
সে ধ্বনিতে প্রতিধ্বনি তুলিছে কন্দর,
ধর্ম্ম-শাসনেতে যথা সাধুর অন্তর।
নীরবেতে ধারাপাত সহে শৈলগণ,
খলের বচন যথা সহয়ে সুজন;
ডাঙ্গা ভেদি ফুটিয়াছে নিঝর কেমন!
পাষণ্ডেতে হরি-প্রেম সুসঙ্গে যেমন।
কূল লঙ্ঘি গিরিনদী করেছে গমন,
অল্পবিত্তে উন্মত্ত পামর যেমন।
গোদাবরী পানে সবে করিতেছে গতি,
মহত আশ্রয় বিনা কোথায় মুকতি?
আবিল নবীন জল পরশি অবনী,
মায়া পাশে হয় জীব জড়িত যেমনি।
অবিরত নীর-পাতে পূর্ণ সরোবর—
সাত্ত্বিক গুণেতে যথা সাধুর অন্তর।
নদীর প্রবাহ বেগে সিন্ধুপানে ধায়,
শাশ্বতে ভকত জন মানসের প্রায়।
সাগরেতে নিজসত্তা হয় বিস্মরণ;
ইষ্টদেবে লভি ভক্ত তন্ময় যেমন।
উপাড়ি পড়িছে নীরে বিটপি-নিচয়,
অসতের স্তবে যথা অসতী-হৃদয়।
কিন্তু শৈল দাঁড়াইয়া রয়েছে অটলে,
দুষ্টের চাটুতে সতী—হৃদয় কি টলে!
লঙ্ঘিতেছে নদী-স্রোত সেতুর বন্ধন,
রাজ-দ্রোহী লঙ্ঘে যথা রাজার শাসন,

* উৎকল কবিবর রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর স্কুল ইনেস্পেক্টর মহোদয় কৃত উৎকল গ্রন্থ তুলসী স্তবকের বঙ্গানুবাদ। লেখিকা।

+ প্রস্রবণ—গোদাবরী তীরবর্ত্তী নির্ঝর-শোভিত স্বনাম-প্রসিদ্ধ পর্ব্বত।

আলি ভাঙি ব'য়ে যায় শস্যক্ষেত্রে বারি,
মর্য্যাদা লঙ্ঘয়ে যথা স্বতন্তরা নারী।
শুনিয়া জীমূত-মন্দ্র নিস্তবধ পিক,
মূঢ়ের সভাতে মূক যেমন ধার্ম্মিক।
ডাহুক বংশের কুঞ্জে সদা রত রাবে,
বহুভাষী জন্মে যথা আপন স্বভাবে।
সুশ্যামল দূর্ব্বাদলে হইয়া মণ্ডিত
নিদাঘ-বিশুষ্ক মহী কিবা সুশোভিত!
সরস যেমন হয় সাধক-হৃদয়,
শুষ্ক বৈরাগ্যেতে যবে ভক্তির উদয়।
অঙ্কুরিত তরুদলে নব কিশলয়,
সাধকের হৃদে যথা বিবেক উদয়।
অর্ক তরু যত সব পত্রিকাবিহীন,
সৌরাজ্যে তস্করকুল হয় যথা দীন।
ফুটিল কদম্বফুল পর্ব্বত কাননে,
কদম্ববান্ধব নব নীরদ নিস্বনে,
সুমধুর হরিনাম করিলে কীর্ত্তন,
পুলকে ভকত তনু শিহরে যেমন।
ঢাকিয়া গিয়াছে পথ ঘন লতিকায়,
বিধর্ম্মী রাজার রাজ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রায়,
মূর্খ রাজ্যে যেই মত বাড়য়ে আদর
নির্গুণের, গুণী জন হ'য়ে যায় পর।
ক্ষেত্র হ'তে বাছি ফেলে নীবার কৃষাণ,
হৃদি হ'তে সাধু যথা আত্ম-অভিমান।
বর্ষাগমে চক্রবাক পলায় ত্বরিত
মূর্খ রাজ্য হ'তে যথা পলায় পণ্ডিত।
নীর সত্ত্বে উষরেতে তৃণ না গজায়,
পাপের বিকারে সাধু কামনার প্রায়।

নানা জীব জন্তুগণে পূর্ণ এবে বন,
সৌরাজ্যেতে পরিপূর্ণ যথা প্রজাগণ।
পান্থগণ স্থানে স্থানে আটকিয়া রয়,
ইন্দ্রিয় যেমন, হ'লে জ্ঞানের উদয়।
কভু বা প্রবল বায়ু তাড়ায় জলদ,
কুপুত্র যেমন কুলধর্ম্ম ও সম্পদ।
কভু বা নিবিড় তম অবনী আবরে,
কভু বা ঝলসে ধরা তপ্ত রবি-করে,
কুসঙ্গেতে এই মত সুজ্ঞান বিনাশে,
সুসঙ্গেতে দিব্যজ্ঞান এমনি প্রকাশে।
মলিন হইয়া স্বচ্ছ সরসী-জীবন
তীর-বন-ছবি বুকে ধরে না এখন,
কলুষিত হ'লে যথা মানব-হৃদয়
পরগুণ গ্রহণেতে সমর্থ না হয়।
দেখ দেখ অগ্রে ওই সরোবর জলে,
পড়িয়া মণ্ডুক ক্রূর অহির কবলে—
কাঁদিতে কাঁদিতে, ঊর্দ্ধে উড়িতে দেখিয়া—
পতঙ্গ শিশুরে, লোভে গ্রাসিল লুফিয়া;
কালের কবলে হায়! এইরূপে ভাই,
কত ব্যথা পায় নর সীমা তার নাই!
তবু ইচ্ছা করে হায়! লভিয়া এ দশা—
মিটাইতে সদা ভব-ভোগের লালসা!
শ্যামল বরষা কাল উদ্ভিদের মিত্র,
নলিনী মলিনী শুধু নহে তা বিচিত্র।
প্রবল সলিল হ'ল তার পক্ষে যম,
অধিক সম্পদ ভাই বিপদ বিষম!

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

Registered No. C. 134

No. 469-70. September & October, 1902.

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ। ৭ম কল্প।

ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩০৯।

৪৬৯-৭০ সংখ্যা। ৩য় ভাগ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ স্কোয়ার বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵০, পশ্চাদেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকার শুভ জন্মোৎসব উপহার।

ভাদ্র, ১৩০৯।

ভারত সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা।

ভারত সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ড।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 469-70. Sept. & Oct., 1902.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ। ৪৬৯-৭০ সংখ্যা। ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩০৯। ৭ম কল্প। ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনীর চত্বারিংশ শুভ জন্মোৎসব।

১

হে বামাবোধিনী মম দুহিতৃ-রতন!
হে বামাবোধিনী মম আদরের ধন।
আজি কি চল্লিশ বর্ষে করি পদার্পণ
জীবনে বিভুর দয়া করিছ কীর্ত্তন?
গাও আজি প্রাণ খুলে হৃদয় ভরিয়া
"জয় জয় দয়াময় প্রাণেশ" বলিয়া।
গাও বলি পিতা প্রভু জীবনশরণ,
গাও জয় সিদ্ধিদাতা বিপদ্-তারণ,
গাও জয় সুখ-মোক্ষ-দায়িনী জননী,
গাও জয় জগদ্ধাত্রী পতিত-পাবনী।
তাঁহার কৃপার দান ভুঞ্জিয়া তাঁহার
জীবনের পথে হইতেছে আগুসার।
তাঁর কৃপা চিরদিন সহায় তোমার,
তাঁহার চরণে আজি কর নমস্কার।

২

আজি শুভ জন্মদিনে সাধ হয় মনে,
সাজাই তোমারে দিব্য রত্ন-আভরণে।
রাজকন্যা যারা কত বেশ ভূষা প'রে
ধনীর সমাজে সদা বেড়ায় আদরে,
পণ্ডিত-মণ্ডলে পায় গৌরব সম্মান,
কত কবি বাগ্মি-মুখে হয় যশোগান।
তোমার অদৃষ্ট-লিপি নহে সে প্রকার,
কেমনে বাসনা বল পূরিবে আমার?
দরিদ্রের ঘরে জন্ম—দরিদ্রের বেশ
ঘু'চবে না এ জীবনে তব কায়ক্লেশ।
তুষ্ট নিজে চিরদিন নিজ-অবস্থায়,
বেঁচে থাক সুখে থাক বিভুর কৃপায়।
জীবন উৎসর্গ করি চরণে তাঁহার,
ভক্তিভরে তাঁর পদে কর নমস্কার।

৩

জানি মা, তোমার অতি কঠোর সাধনা,
কেমনে পুষিবে হৃদে বিলাস-বাসনা ?
জনম-দুখিনী বঙ্গনারী অভাগিনী,
যার দুঃখশ্বাসে পূর্ণ গগন মেদিনী,
লোক-চক্ষু-অগোচরে করি সদা বাস
যাতনার কথা নারে করিতে প্রকাশ।
তাহার ব্যথার ব্যথী হয়ে অনুক্ষণ,
চাও তার অশ্রুবারি করিতে মোচন।
কত কোটি নারী-প্রাণ অজ্ঞান আঁধারে
বদ্ধ কুসংস্কার পাপাচার কারাগারে,
জ্ঞান ধর্ম্মে তা'দিগকে দেখি সমুন্নত,
হবে সুখী সমাপিবে জীবনের ব্রত।
অসাধ্য সাধন হয় কৃপায় যাঁহার,
তাঁর পদে বার বার কর নমস্কার।

৪

বরিষার মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশে
পূর্ণ শরদিন্দু যথা সুবিমল ভাসে ;
ভারত-দুর্দ্দিন যবে হবে অবসান,
মানব সমাজে হবে রমণীর স্থান,
দূরে যাবে ভ্রম মোহ স্বার্থ অহঙ্কার,
ন্যায়ের রাজত্ব হবে জগতে বিস্তার ;
জ্ঞান প্রেম পুণ্য বেশে হয়ে সুসজ্জিতা,
হাসিবে বঙ্গের মাতা, দুহিতা, বনিতা ;
হে বামাবোধিনী মম দুহিতৃ-রতন,
হে বামাবোধিনী মম হৃদয়ের ধন,
প্রাণ-ভরে হাসিও, ভাসিও সুখ নীরে,
আশা-সূত্র ধরি এবে চল ধীরে ধীরে ;
বাঞ্ছা-কল্পতরু বিভু করুণা-আধার,
তাঁর পদে কোটি কোটি কর নমস্কার।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বামাবোধিনীর নব বর্ষ—এই ভাদ্র মাসে বামাবোধিনী ৪০ বর্ষে পদার্পণ করিয়া, সিদ্ধিদাতা বিধাতার চরণে প্রণত হইতেছেন। অনুগ্রাহক গ্রাহক গ্রাহিকা, পাঠক পাঠিকা ও সকল হিতৈষী বন্ধুকে ইনি সাদরে অভিবাদন করিতেছেন। সকলে ইহাকে আশীর্ব্বাদ করুন্ ও ইহার উন্নতি ও কল্যাণের সহায় হউন্।

সম্রাটের রাজ্যাভিষেক—গত ৯ই আগষ্ট শনিবার ১২টা ৪০ মিনিটের সময় ইংলণ্ডেশ্বর ভারত-সম্রাট ৭ম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান যথারীতি ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবীতে নির্ব্বিঘ্নে ও সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে, এজন্য রাজরাজেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডপতিকে ধন্যবাদ। তিনি আমাদের প্রিয় সম্রাট্‌কে উৎকট পীড়া হইতে আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি ইহাঁকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাজধর্ম্ম পালনে সমর্থ করুন।

মহীশূররাজ—গত ৮ই আগষ্ট রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কুর্জ্জন মহীশূর রাজধানীতে উপস্থিত থাকিয়া যুবক মহারাজকে রাজ-পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তাঁহাকে যথাযথ উপদেশও দিয়াছেন।

বীরোচিত সম্মান—স্বদেশ-হিতৈষী বোথা, ডিলারে ও ডি ওয়েট স্বদেশ

আফ্রিকায় যেমন সম্মানিত, ইংলণ্ডেও সেইরূপ আদরণীয় হইয়াছেন। বুয়রযুদ্ধের অধিনেতা চেম্বার্লেন এখন দক্ষিণ আফ্রিকার সুব্যবস্থার জন্য তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণার্থ তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডে আহ্বান করিয়াছেন।

পরোপকারায় সতাং জীবিতং—বোথা, ডিলারে ও ডি ওয়েট যুদ্ধক্ষেত্রে যে অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা সেই জীবন স্বদেশের দুঃস্থ লোকদিগের সাহায্যার্থ ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহে নিয়োগ করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়াবলী কমিশন—ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সকল সংস্কারের জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল, তাঁহাদিগের এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। সভ্যদিগের আর সকলের মত একদিকে—আর বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত অন্য দিকে। রিপোর্টের মর্ম্ম—গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাশাসনের সমুদায় ভার গ্রহণ করেন। ইহা হইতে আশঙ্কা—জাতীয় শিক্ষা ও দেশীয় স্বাধীন কলেজ সকলের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। আশা করি লর্ড কুর্জ্জন সুবিবেচনার সহিত কার্য্য করিয়া উচ্চশিক্ষার উন্নতির পথ প্রসারিত করিবেন।

রাজ-হাঁসপাতাল ফণ্ড—লণ্ডনের লর্ড মেয়র রাজার অভিষেকে দান বলিয়া ১ লক্ষ ১৫ হাজার পাউণ্ড সপ্তম এডোয়ার্ডের হস্তে প্রদান করেন। রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া লণ্ডন হাঁসপাতালের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছেন।

মহিলা সভা—রাজ্যাভিষেক দিবসে বোম্বাইয়ের সার ভাল চন্দ্রের বাঙ্গালোতে এক মহিলা সমিতি হইয়াছে।

বেথুন-সমাধি-উৎসব — গত ১২ই আগষ্ট বেথুন সাহেবের ৫১ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বেথুন কলেজের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

কাঙ্গালী বিদায়—রাজ্যাভিষেক দিবসে কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে ৭।৮ হাজার কাঙ্গালী সমবেত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম অনাথবন্ধু সমিতির হস্তে ৫০০৲ টাকা অর্পণ করেন, তাহা হইতে পয়সা দান ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। গত ১৬ই আগষ্ট সমিতি সিটিকলেজ ভবনে প্রায় ৫০০ অন্ধ খঞ্জ ও আতুরদিগকে নূতন বস্ত্র দান করিয়াছেন।

সৎকার্য্যে দান—কলুটোলার বাবু মাণিকলাল শীল বেলগাছিয়া হাঁসপাতালে একটী ঔষধালয়ের জন্য ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

প্রতিবাদ সভা—গত ২২এ আগষ্ট ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টের প্রতিবাদে কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট সভা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সাধারণের অভিপ্রায় অবশ্যই বিবেচনা স্থলে গ্রহণ করিবেন।

লর্ড কুর্জনের গতিবিধি—লর্ড কুর্জন ২১এ অক্টোবর সিমলা ত্যাগ করিয়া

ডিসেম্বরের প্রথমে কলিকাতায় আসিবেন। পথে নানা স্থান পরিদর্শন করিবেন এবং জানুয়ারিতে দিল্লী দরবারের মহা সমারোহ করিবেন।

চিনের রাজমাতা—এই বিধবা মহারাণী অসাধারণ বুদ্ধিমতী এবং তাঁহার উপর চিনদিগের অগাধ শ্রদ্ধা। ইনি সম্প্রতি ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিধবা বিবাহ—গত ৮ই আগষ্ট আমেদাবাদ বিধবা বিবাহ সভার উদ্যোগে বেণিয়া জাতির মধ্যে এক বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডের নূতন মন্ত্রিসভা—(১) বালফোর—প্রথম ধনাধ্যক্ষ ও সিলমোহর রক্ষক; (২) লর্ড হালসবরী—লর্ড চান্সেলার; (৩) ডিবন সায়ার ডিউক—কৌন্সিলের সভাপতি, (৪) এ ডগলাস—হোম সেক্রেটারী; (৫) লর্ড লান্সডাউন—বিদেশীয় সেক্রেটারী; (৬) ব্রড্রিক—সামরিক সেক্রেটারী; (৭) লর্ড হামিল্টন—ইণ্ডিয়া আফিসের কর্ত্তা; (৮) লর্ড সেলবোরন — পোতবিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ; (৯) রিচি—এক্সচেকর চান্সেলর; (১০) ওয়াইণ্ডহাম—চিফ সেক্রেটারী, আয়র্লণ্ড; (১১) লর্ড বালফোর—চিফ সেক্রেটারী, স্কটলণ্ড; (১২) জেরাল্ড বালফোর—বাণিজ্য বোর্ডের অধ্যক্ষ; (১৩) লঙ—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বোর্ডের অধ্যক্ষ; (১৪) হান্‌বরী—কৃষি বোর্ডের অধ্যক্ষ; (১৫) লর্ড লণ্ডনডেরী—শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ; (১৬) অষ্টেন চেম্বার্লেন—পোষ্ট মাষ্টার জেনারল; (১৭-১৮) লর্ড লড্‌লে—আয়র্লণ্ডের বহির্বিভাগের এবং ওয়াইণ্ডহাম অন্তর্বিভাগের রাজ-প্রতিনিধি।

বিক্টোরিয়া স্মৃতিফণ্ড—লণ্ডন ফণ্ডের জন্য কানাডা ৪,৫০,০০০, কেপ কলোনী ৩ লক্ষ, নিউজিলণ্ড ১,২৫,০০০ এবং নেটাল ১,৫০,০০০ টাকা দিয়াছেন।

সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক।

বিধাতার অশেষ কৃপায় ইংলণ্ডেশ্বর ভারত-সম্রাট্ এডওয়ার্ড সাংঘাতিক পীড়া হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া গত ৯ই আগষ্ট (২৪এ শ্রাবণ) শনিবার বিধিবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানসহ রাজমুকুট ধারণ করিয়াছেন। এই অভিষেক ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সুপ্রসিদ্ধ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবীতে অভিষেকের জন্য এক মঞ্চ নির্ম্মিত হয়। বেলা ঠিক্ ১১টার সময় রাজা রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রার সহিত রাজকীয় যানে বকিংহাম রাজপ্রাসাদ হইতে যাত্রা করিয়া ১১টা ২৫ মিনিটের সময় আবীর ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হন। সমস্ত পথ লোকে লোকারণ্য, ভারতীয় সিপাহী সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া অপূর্ব্ব দৃশ্য উৎপাদন করিয়াছিল। দর্শকমণ্ডলী অবিশ্রান্ত জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং রাজ-দম্পতী

রাজা ৭ম এডওয়ার্ড।　　রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা।

মস্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জয়রোলের মধ্যে রাজ্ঞী অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া ধর্ম্মমন্দিরে আসন গ্রহণ করিলেন। পরে রাজা বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সম্ভ্রান্ত লোকমণ্ডলী সমভিব্যাহারে গিয়া রাজ্ঞীকে সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক সিংহাসনের সম্মুখস্থ চেয়ার অবলম্বনে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক কাণ্টারবরীর আর্চবিশপ প্রার্থনা করিতে গিয়া হৃদয়ের আবেগে অভিভূত হইয়া পড়েন। তাঁহার সহকারী ইয়র্কের আর্চবিশপ ও আর দুই জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহাকে ধরিয়া রাখেন, পরে সমুদায় অনুষ্ঠান যথাবিধি তাঁহাদ্বারা সম্পন্ন হয়। রাজা দেখিতে বেশ সুস্থ ও সবল ছিলেন, প্রার্থনা-কালে জানু পাতিয়া বসিয়া এবং বাইবেল পাঠ ও উপদেশ গ্রহণকালে দণ্ডায়মান ছিলেন, কেবল সঙ্গীতের সময় বসিয়াছিলেন। রাজা প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলে তাঁহার কটিদেশে তরবারি বন্ধন করিয়া দেওয়া হয়। মস্তকে রাজ-মুকুট অর্পণ করিবার সময় মহামহোল্লাস হয়—আলোকমালা জ্বলিয়া উঠে, তুরী ভেরী বাজিয়া উঠে, বালকবৃন্দ জয়ধ্বনি করে এবং মন্দিরের জয়ঘণ্টা উচ্চ রবে নিনাদিত হয়। পরে রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে যাজকগণ, রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্ত লোকমণ্ডলী নিকটস্থ হইয়া অধীনতা স্বীকার করিলেন। আবার ঢক্কা ও তুরী বাজিয়া উঠিল এবং সমবেত লোকমণ্ডলী "God save the

king" ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ মঞ্চের চারি দিকে রাজাকে ধরিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শন করিলেন এবং অভিষেকে জনসাধারণের অনুমোদন গ্রহণ করিলেন। পবিত্র তৈল রাজার মস্তকে দিয়া প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ রাজাকে অঙ্গুরীয়, রাজদণ্ড, গোলক প্রভৃতি রাজাভরণ প্রদান করিলেন এবং পৃথিবীর দুর্ল্লভ বস্তু বলিয়া এক খানি বাইবেল তাঁহার হস্তে দিলেন। মধ্যে মধ্যে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা ও ঈশ্বরের জয় গান হইতে লাগিল। লণ্ডনের বিশপ উপদেশ দান করিলেন। পরে কাণ্টারবরীর আর্চবিশপ অন্যান্য বিশিষ্ট ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের সহিত রাজার বন্দনা করিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন।

রাজার অভিষেকক্রিয়া সমাপ্ত হইলে কাণ্টারবরীর আর্চ্চবিশপ ও রাজা এডোয়ার্ডের অনুমতি লইয়া ইয়র্কের আর্চ্চবিশপ রাজ্ঞীর অভিষেক করিলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষ রাজ্ঞীর মস্তকে পবিত্র তৈল ঢালিয়া দিলে চারিজন লর্ড মহিষী তাঁহার মস্তকের উপর এক খানি চন্দ্রাতপ ধরিলেন। পরে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় এক অঙ্গুরীয় পরাইয়া দেওয়া হইল এবং মস্তকে কোহীনুরশোভিত মুকুট সংযোজিত হইল।

রাজা ও রাজ্ঞীর মুকুট ধারণের সময় যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহার মর্ম্ম এই :—

রাজার প্রতি—"হৃদয় সবল কর, সাহসে ভর দেও, ঈশ্বরের আদেশ সকল পালন কর ও তাঁহার আদিষ্ট পবিত্র পথে চল। ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইও না। সর্ব্বদা নিত্যধামের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চল, তাহা হইলে ইহ জীবনে সকল কার্য্যে সফলতা লাভে সমর্থ হইবে এবং তোমার গৌরবও অক্ষুণ্ণ রহিবে। তাহা হইলে পরলোকেও ঈশ্বর তোমাকে ধর্ম্মমুকুটে বিভূষিত করিবেন। ন্যায়ান্যায়ের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বরই প্রকৃত বিচার করিবেন। অদ্য তোমাকে যে পদে অভিষিক্ত করিলাম, সেই পদে দৃঢ়রূপে অবস্থিতি কর।"

রাজ্ঞীর প্রতি—"সম্মান, গৌরব ও আনন্দের আধার এই মুকুট পর। এ মুকুট সত্যধর্ম্মের (প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান) প্রকৃত সেবকেরাই পরিতে পান। অতি হীন অযোগ্য ধর্ম্মযাজক আমি, আমারই হস্ত দিয়া ঈশ্বর এই বিশুদ্ধ সুবর্ণময় মুকুট তোমার মস্তকে পরাইয়া দিলেন। তাঁহারই কৃপায় তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইবে; তোমার এ জীবন অন্তে পরলোকে তোমার নিত্য পতি প্রভু যিশু খৃষ্টের সহিত মিলিত হইবে। তিনিই ত পরম পিতা ও পবিত্র আত্মার সহিত চিরবিরাজমান থাকিয়া অনন্তকাল রাজত্ব করিতেছেন।"

অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ হইলে রাজদম্পতী পুনরায় মিলিত হইয়া ধর্ম্মমন্দির পরিত্যাগপূর্ব্বক মহা কোলাহলের মধ্য দিয়া রাজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

রমণীর সাম্রাজ্য প্রেমের রাজ্য।

এই বিশ্ব চরাচর প্রেমময় জগৎপতির অপার প্রেমের নিদর্শন, এই সুবিশাল জগৎ প্রেমের রঙ্গভূমি, এ সংসার প্রেমের তীর্থক্ষেত্র, এই মানব-জীবন প্রেমের খেলা, প্রেমের মধুর বাঁধনেই বাঁধা। মর-জগতের মূলাধার এ হেন যে প্রেম,—বিধাতা রমণীকে সেই পীযূষপূর্ণ প্রেমের কর্ত্রীরূপে সৃজন করিয়াছেন। অতএব সেই প্রেমকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তীকৃত করা, প্রেমের পূর্ণাঙ্গ সাধন করা এবং সেই প্রেমসাগরে আত্মবিসর্জ্জন করাতেই নারীর নারীত্ব, নারীর রমণীয়ত্ব, নারী-জীবনের উদ্দেশ্য।

অমিতপ্রভাবশালী প্রেমই সংসার সমরক্ষেত্রে নারীর অক্ষয় কবচ। এই প্রেমের বলে তিনি সর্ব্ব-বিজয়িনী, ইহারই প্রভাবে তিনি অসাধ্য সাধনে কৃতকার্য্য হন। জগৎ-নাট্যশালায় প্রেমের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অঙ্কগুলিই রমণীকর্ত্তৃক কি সুন্দর, কি মধুর, কি উজ্জ্বলরূপে অভিনীত হইয়া থাকে!

শত শত দর্শন বিজ্ঞানে যে মহা-পণ্ডিতের নাস্তিকতাকে বিদূরিত করিতে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল, প্রেমময়ী পত্নীর প্রেমের প্রভাব তাহা অনায়াসেই সম্পন্ন করিল, এবং পতির নিকট নারী-কুলকে গৌরবান্বিত করিল।

স্নেহময়ী জননীর পবিত্র মুখ-কমল স্মৃতি-পথারূঢ় হইবা মাত্র অসহায় পথিকের প্রাণ-বিনাশে উদ্যত পাষণ্ড দস্যু নর-হত্যায় ক্ষান্ত হইল, এবং মাতৃ-প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এইরূপে কত পুত্র, কত ভ্রাতা ও কত পতি যে জননী ভগিনী ও সহধর্ম্মিণীর স্নেহ, প্রীতি ও প্রেমের পবিত্র কুহকে পড়িয়া সৎপথে—পুণ্যপথে উপনীত হইয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে নিরক্ষরা হইয়াও রমণীগণ কি সুন্দর, কি মধুর চরিত্রসম্পন্না! আর পুরুষগণ উচ্চশিক্ষা, ও জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াও এবং শত প্রকারে শত শত সদুপদেশ লাভ করিয়াও, আশানুরূপ চরিত্রবান্ হইতে পারেন না কেন? অন্তর্নিহিত প্রেমের ইতর বিশেষই ইহার একমাত্র কারণরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নারীচরিত্রের এক প্রধান উপা-দান যে প্রেম, সেই প্রেমের বলেই রমণী ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা ও ক্ষমা-সহকারে অশেষ দায়িত্বপূর্ণ গৃহ-ধর্ম্ম পালন করেন, অশান্তি আতপ ও অপবিত্রতার ছায়া হইতে গৃহকে রক্ষা করেন, স্নেহ করুণার জাহ্নবী-ধারায় জীবের তাপিত প্রাণ শীতল করেন। এই প্রেমেই তাঁহাদিগের চরিত্রকে আদর্শরূপে গঠন করে, তাঁহা-দিগের মনোবৃত্তি নিচয়কে পরিস্ফুট করে এবং বিচিত্র সদ্‌গুণরাজীর সামঞ্জস্য সাধন

করে। এই জন্য রমণী-স্বভাব স্বতঃই মধুর ও কমনীয়, এবং এই নিমিত্তই তাঁহার সুকুমার স্কন্ধে জগৎপালনের গুরু-ভার অর্পিত হইয়াছে। মানবজীবনের উপক্রমণিকাতেই তিনি জননীরূপে শিশু-রূপী মানবের ভাবী চরিত্র সংগঠন করেন, ধাত্রীরূপে পালন করেন, ভগিনীরূপে কিশোরের প্রীতি বর্দ্ধন করেন, এবং পত্নীরূপে যুবার জীবনসঙ্গিনী হইয়া তাঁহার গন্তব্য পথে সুমধুর দ্যুতি বিতরণ করেন। সংগঠিত চরিত্র, পবিত্রস্বভাবা নারীর দৃষ্টিতে হৃদয় আশ্বস্ত হয়, নিঃশ্বাসের সৌরভে মন পবিত্র হয়, বাক্যে তাপিত প্রাণ শীতল হয়, এবং চরণরেণু স্পর্শে মরুভূমিও কুসুম-কাননবৎ প্রতীয়মান হয়। কবি গাহিয়াছেন—

"প্রেমের প্রতিমা স্নেহের সাগর,
করুণা নির্ঝর, দয়ার নদী,
হ'ত মরুময় সব চরাচর
জগতে নারী না থাকিত যদি।"

নারী প্রকৃতিরই যখন এতদূর মহিমা তখন নারী ধর্ম্ম ও নীতির সুবাতাস এবং জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইলে কতদূর উচ্চ চরিত্রবতী হইতে পারেন এবং তাঁহা দ্বারা এই সংসার পরি-চালনার ব্যাপার যে কতদূর সুচারুরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহা বর্ণনাতীত। কারণ তাঁহার সকল কার্য্যই প্রেম-প্রসূত। প্রেম তাঁহার হৃদয়-রাজ্যকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিয়াছে, সেইজন্য গৃহরাজ্য ত দূরের কথা, কিন্তু এমন কোন রাজ্যই নাই, যাহাকে তিনি প্রেমরূপ স্পর্শমণির সংস্পর্শে আনিয়া সুবর্ণময় করিয়া তুলিতে না পারেন। অধিকদূর যাইতে হইবে না, আমাদের প্রেমময়ী মহারাণী—জগৎ-পূজ্যা প্রজাবৎসলা ভিক্টোরিয়া দেবীই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

যে যে গুণ থাকিলে আদর্শ নারী-চরিত্র সম্পূর্ণ হয়, তাঁহাতে প্রচুর পরি-মাণে সেই সকল গুণ স্বভাবতঃই বিদ্যমান ছিল; তাহাতে আবার সর্ব্বাঙ্গীণ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় সেই চরিত্র যে কিরূপ রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল, কিরূপ নিরুপম জ্যোতি বিস্তার করিয়াছিল, তাঁহার গৃহরাজ্য এবং তাঁহার সাম্রাজ্যই তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন।

তাঁহার গৃহক্ষেত্রে বাস্তবিকই দেব-রাজ্যের ছায়াপাত হইয়াছিল এবং যদিও সেই দেবী-প্রতিমার দীনবৎসলতার, আর্ত্তের প্রতি করুণার, শোকাতুরের প্রতি সান্ত্বনা ও সহানুভূতির এবং গার্হস্থ্য জীবনের প্রেম, ভালবাসা ও ভক্তির মধুর মধুর চিত্র সকল মানস নয়নে প্রতিফলিত হইয়া উঠিতেছে, তথাপি অপ্রাসঙ্গিকতার আশঙ্কায় সে সকল স্বর্গীয় প্রেমকাহিনীর উল্লেখে আমরা বিরত রহিলাম। এ স্থলে কেবল, তাঁহার সাম্রাজ্য যে প্রেমরাজ্যেরই পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হইব। মহারাণী ভিক্টোরিয়া জগতের মহাজন বা মনস্বিনীদিগের ন্যায় অমর কীর্ত্তি কলাপ স্থাপন করিয়া যান নাই, কিন্তু শুদ্ধ পবিত্রতাময় প্রেমের

প্রভাবেই মর্ত্তভূমে নন্দন-কাননের অপূর্ব্ব পরিমল বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন এবং যুগযুগান্তরের জন্য মানবের স্মরণীয়া ও পূজিতা হইয়াছেন। ভগবৎ-প্রেরিত বিশ্ব-প্রেম ব্যতীত অন্য কোন সদ্গুণই এরূপ সর্ব্বজনসুলভ প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রেমই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। সে প্রেম সঙ্কীর্ণতাশূন্য, নির্ম্মল, প্রশস্ত ও বিশ্বব্যাপী। বুঝি ভগবানের চরণ-প্রসূত প্রেম-জাহ্নবীর একটী অমৃত ধারা তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে নিহিত হইয়াছিল এবং কালে তাহাই প্রবর্দ্ধিত হইয়া প্রেম-প্রস্রবণরূপে ক্ষুদ্র পশু পক্ষী, দরিদ্র বালক বালিকা, ও সামান্য পরিচারিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছিল। গৃহে সেই অক্ষয় অমর প্রেমের বিকাশ এবং সুবিশাল সাম্রাজ্য শাসনে তাহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি। যাঁহার অকপট উদার হৃদয়ের প্রত্যেক কার্য্যান্তরালে প্রেম-হিমাংশুর সুবিমল রশ্মি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাঁহার প্রিয় সাম্রাজ্য যে প্রেমের রাজ্য হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? এই প্রেমই স্বর্গীয় শান্তি ও আনন্দ কিরণপাতে তাঁহার রাজত্বের গৌরবপুষ্পকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল, এই প্রেমই তদানুষঙ্গিক স্নেহ করুণা ও দয়া প্রভৃতি সুকুমার গুণাবলীতে তাঁহাকে মহিমাময়ী আদর্শ-রাজ্ঞীরূপে পরিণত করিয়াছিল, এই প্রেমই ভগবানের প্রতি ধাবিত হইয়া নিষ্ঠারূপে তাঁহার চরিত্রের পূর্ণ সৌন্দর্য্য সাধন করিয়াছিল। তাই তিনি সাম্রাজ্যকে ন্যায় ও ধর্ম্মের ভিত্তির উপর সংস্থাপনে এবং আত্মপর, উচ্চনীচ ভেদাভেদ জ্ঞানরহিত হইয়া সাম্রাজ্য পরিচালনে সক্ষমা হইয়াছিলেন।

তাঁহার প্রেম যে কতদূর পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার সাম্রাজ্য যে বাস্তবিকই প্রেমের রাজ্য হইয়াছিল, তাঁহার সাম্রাজ্য শাসনের মধুর প্রণালীর বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই তাহা সম্যক্ প্রতীত হইবে।

তিনি সাম্রাজ্ঞী; সাম্রাজ্য সংরক্ষণ ও সাম্রাজ্য বিস্তার তাঁহার অবশ্যকরণীয় কার্য্য। তাই তিনি সমর ঘোষণা করিতেন, ন্যায়যুদ্ধে—ধর্ম্মযুদ্ধে বিজয়-লক্ষ্মী আকাঙ্ক্ষা করিতেন। কিন্তু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, ঘোরতর বিপক্ষও বিড়ম্বিত বা অন্যায়রূপে লাঞ্ছিত হইবে, ইহা তাঁহার অসহনীয়।

বুয়ারদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার কাহিনীর বর্ণনা শ্রবণ করিতে করিতে তিনি সংজ্ঞাহীনাবৎ ভূমিতে পতিত হইলেন! মরি, মরি, কি দেবতা-বাঞ্ছিত প্রেম, কি সুন্দর নারী-স্বভাব-সুলভ কমনীয়তা ও মধুরতা!

"না দিদি! আমরা নারী বিশ্ব-জননীর ছবি,
আমাদের শত্রু মিত্র নাই।
বরিষার ধারা মত অজস্র জননী-প্রেম,
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই!"

তাঁহারই চরিত্রে, তাঁহারই প্রেমে এই মহদুক্তি বুঝি পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছিল।

এইরূপ প্রেম যে আমাদের মহিমাময়ী

রাজ্ঞীর হৃদয়-স্বর্গে অবিরত লীলা করিত, আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা পর্য্যালোচনায় আমরা তাহার আভাস পাই।

যিনি এই বিশাল রাজ্যের রাজ্ঞী, অর্দ্ধেক পৃথিবী জুড়িয়া যাঁহার সাম্রাজ্য, তিনি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-পত্রে কখনও স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুমতি-সূচক স্বাক্ষর গ্রহণ করিবার জন্য যত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-পত্র প্রেরিত হইত, সকল গুলিতেই সেই মূর্ত্তিমতী করুণা-দেবী "ক্ষমা করা হইল" বলিয়া লিখিয়া দিতেন। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার বিচার অবজ্ঞা-জনিত উদ্বেগও তাঁহার কোমলতাকে বিপর্য্যস্ত করিতে সক্ষম হইত না। দৃঢ়তা ও কোমলতার অপূর্ব্ব সংমিলন, বজ্র ও কুসুমের মণিকাঞ্চন যোগ। অবশেষে পার্লিয়ামেণ্ট প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-পত্রে রাজ-স্বাক্ষরের প্রয়োজন নাই বলিয়া আইন বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। স্বর্গের সুষমাময়ী রাণীর কুসুম-সুকুমার কর-পল্লব নিষ্ঠুরতার কলঙ্ক হইতে চির-অব্যাহতি লাভ করিল!!

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম জাতি ধর্ম্ম বিচার রহিত করিয়া ইহুদীদিগকেও উপাধিদানের প্রথা প্রবর্ত্তনা করেন।

অধিকাংশ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীই ভারতবাসীকে 'কৃষ্ণকায় নিগার' বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদেরই মহামান্যা অধীশ্বরী সিপাহীবিদ্রোহের পর লর্ড ক্যানিংকে একবার লিখিয়াছিলেন যে, অসিতবর্ণ প্রজাবৃন্দের প্রতি আমাদিগের অণুমাত্রও ঘৃণা নাই এবং তিনি তাঁহাদের সম্পদ, সুখ, প্রীতি ও মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, ইহা যেন তাঁহাদিগকে অবগত করান হয়। কি প্রেমামৃতমাখা বাণী! গুণী যিনি, তিনিই গুণের আদর করিয়া থাকেন; প্রকৃত মানব যিনি, তিনিই মনুষ্যের গৌরব উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

ইতিপূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া বণিক্ কোম্পানির করে এ দেশের (ভারতবর্ষের) শাসন-ভার ন্যস্ত ছিল। তাহার কুশাসনের ফল সিপাহীবিদ্রোহ। এই বিপ্লব রাজ্ঞী মাতার মনে সংশয় জন্মাইল। তখন করুণাময়ী রাজ্ঞী অপত্য-প্রতিম প্রজাকুলের প্রতি অন্যায়, অবিচার ও উৎপীড়নের প্রবল আশঙ্কায় ভীতা হইয়া ধর্ম্ম, ন্যায়, প্রেম ও ক্ষমা-সুশোভিতা মায়ের করুণ-কোমল হস্তে ভারতের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন। ভারতবাসী ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইল। সেই সময়েই ভারতের জীবন্ত রাজ-লক্ষ্মী অমৃতনিষ্যন্দিনী অমর ভাষায় এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন। স্বর্গীয় বীণার সুরে, স্বর্গের রাগিণীতে, অপ্সরাকণ্ঠে গীত সেই অপূর্ব্ব ঘোষণা-পত্র পাঠ করিলে মস্তক সেই দেবীর চরণপ্রান্তে শত শত বার অবলুণ্ঠিত হয়।

এই ঘোষণাপত্রই ভারতের ভাগ্যাকাশের সুপ্রসন্ন রবি এবং ইহাই ভারত-বাসীর সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক অধিকার, আন্দোলন ও শ্রীবৃদ্ধির মূলে দেবতার আশীর্ব্বাদরূপে বিরাজমান।

সেই পুণ্যময়ী, মঙ্গলস্বরূপা দেবীর রাজত্বকাল শুধু রাজনীতি সম্বন্ধে নহে, কিন্তু ভারতের সর্ব্বপ্রকার সামাজিক কল্যাণেরও জনয়িত্রী। ভারতের তাড়িত-বার্ত্তাবহ, বাষ্পীয়পোত, লৌহবর্ত্ম, ডাক, বাষ্পালোক, তাড়িতালোক, মুদ্রাযন্ত্র ও শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার, হাইকোর্ট, স্ত্রীশিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহারই প্রেমরাজ্য হইতে সমুদ্ভূত হইয়া নিরপেক্ষ স্নেহ করুণার বিজয়-পতাকারূপে তাঁহার গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে। বিধাতার অজস্র দয়ার নিদর্শনস্বরূপ মহারাণীর রাজত্বকাল বৃটিশ সাম্রাজ্যেও যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। তিনি ইংলণ্ডের রাজনীতি-ক্ষেত্রে ন্যায়, ধর্ম্ম, প্রেম এবং সামাজিক জীবনে ক্ষমা, নিষ্ঠা, পরার্থ-পরতা ও পবিত্রতার অনুকূল স্রোত প্রবর্ত্তন করিতে বিশিষ্টরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং বহুল পরিমাণে সফল-কামও হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের রাজকুলকে অপবিত্রতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সর্ব্বগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া তিনি শুধু বৃটিস সাম্রাজ্যের নয়, কিন্তু সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। কারণ সর্ব্বদেশ প্রদেশের মহৈশ্বর্য্যশালী রাজ্যেশ্বরগণও যে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজ নৃপতিগণের রীতি নীতি ও শাসনপ্রণালীর অনুসরণে অভি-লাষী, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এখন তাঁহারই নৈতিক বলে এই রাজ-বংশ মেঘমুক্ত দীপ্ত শশধরের ন্যায় উজ্জ্বলাকার ধারণ করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে আলোক প্রদান করিতেছে।

তাঁহার ন্যায় সুদীর্ঘকাল—৬৪ বৎসর-কালব্যাপী সাম্রাজ্য সম্ভোগও ইংলণ্ডের অন্য কোন রাজা বা রাজ্ঞীর ভাগ্যে ঘটে নাই। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, পূর্ণ প্রীতির সহিত তাঁহার রৌপ্য, স্বর্ণ ও হীরক জুবিলীর উৎসব পর্য্যন্ত মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘকাল কঠোর দায়িত্ব মস্তকে লইয়া এবং গুরুভার রাজদণ্ড করে ধারণ করিয়া নির্ম্মল যশের রাজ্যে বিচরণ করা, সর্ব্বসাধারণের এরূপ হৃদয়ভরা, প্রাণপূর্ণ ভক্তি ও অনুরাগ আকর্ষণ করিয়া রাখা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এই বহুবর্ষব্যাপী, চিরস্মরণীয় রাজত্বে তাঁহার হৃদয়ের সমদর্শিতা, উদারতা, ন্যায়, ধর্ম্ম, প্রেম, করুণা, ক্ষমা ও বিশ্বহিতৈষণারূপ বিবিধজাতীয় কুসুম সকল সমভাবে সদ্যোবিকশিত অবস্থাতেই রক্ষিত হইয়াছিল। কোনটিই অপরিস্ফুট ছিল না, কোনটিই মলিনাকার ধারণ করে নাই। নিখিল জগতের সোহাগ ও প্রীতি লাভের ইহাই একমাত্র কারণ।

রামরাজ্যের ন্যায় তাঁহার প্রেমানুরঞ্জিত রাজ্যে প্রজাপুঞ্জ পরম সুখে বাস করিয়া-ছিল এবং এক অনির্ব্বচনীয় মধুর তৃপ্তিতে তাহাদের প্রাণ মন পরিপূর্ণ ছিল। অর্দ্ধেক পৃথিবী জুড়িয়া তাঁহার রাজ্য, সর্ব্বত্রই নিরপেক্ষ মধুর প্রেম, সর্ব্বত্রই অখণ্ড ভক্তি ও অক্ষুণ্ণ কৃতজ্ঞতার স্রোত! রমণীর সাম্রাজ্য না হইলে প্রেমের

এতদূর আধিপত্য স্থাপন সম্ভবপর হইত না।

লক্ষ্মীস্বরূপা নারী যেরূপ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে সর্ব্বপ্রকার অশান্তি উত্তাপ হইতে আপন গৃহকে প্রেমের শীতল ছায়ায় রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ অসীম দায়িত্বপূর্ণ আপন সাম্রাজ্যকেও তিনি সম্পূর্ণ আপনার করিয়া, মধুর প্রেমপ্রণালী অবলম্বনে সুন্দররূপে তাহার সংরক্ষণ ও পরিচালন করেন। প্রজার সুখে তিনি সুখী, প্রজার তৃপ্তিতে তাঁহার প্রাণ তৃপ্ত, প্রজার উন্নতিতে তাঁহারই শক্তি এবং প্রজার কৃতজ্ঞতার অশ্রুই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার।

ইংলণ্ডের রাজাকাশের প্রভাত তারা, রাজ-সরোবরের প্রফুল্ল নলিনী যে মহিমাময়ী ইংরাজ মহিলা এইরূপ আদর্শ রাজ্ঞীরূপে, সাম্রাজ্য শাসন ও পরিচালন করিয়া, তাহাকে প্রেমের রাজ্যে পরিণত করিয়া, সাম্রাজ্যময় করুণার সৌরভ ছুটাইয়া সমগ্র রমণীসমাজকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাকে শত শত বার, কোটি কোটি বার প্রণাম করিলেও অন্তর তৃপ্ত হয় না। তিনি ইংলণ্ডে ক্ষণজন্মা মনস্বিনী, ভারতে বিধাতার বরলব্ধ প্রজাকুলের আশার তারকা ও ভারত-রমণীগণের অশেষ কল্যাণের আকর।

হায়! সেই অতুলনীয়া রমণী-রত্ন, সেই পুণ্যময়ী ললনা-ললাম আজি কোথায়?—তিনি গুণগৌরবে মরজগতে অক্ষয় অমর কীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক, জীবনের মহাব্রত উদযাপন করিয়াছেন। জগৎময় পুণ্যের উচ্ছ্বাস উঠাইয়া, জগৎকে প্রেম শিক্ষা দিয়া, জগতের সর্ব্বলোক-পূজিতা হইয়া, নারীকুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া ১৩০৭ সালের ৯ই মাঘ তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

বিক্টোরিয়া চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের বিপুল গৌরব ও গুণাবলীর দিব্য-সৌরভ ভূমণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। তিনি ইহ জগৎ হইতে অনন্তকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মাধুরীমণ্ডিত স্মৃতি প্রত্যেক নর নারীর হৃদয়ে অক্ষয় রাজত্ব ও মধুর লীলা করিতেছে। জগৎ চিরদিনই তাঁহার পবিত্র ও পুণ্যময়ী স্মৃতি অনুশীলন করিয়া ধন্য হইবে। হিরণ্ময় কীর্ত্তিকলাপ ও হীরকমণ্ডিত সদ্‌গুণ-মালা পরিশোভিত 'ভিক্টোরিয়া' নাম অন্যান্য যাবতীয় রাজা ও রাজ্ঞীগণের নামাবলীর মধ্যে দ্যুতিমান মধ্যমণিরূপে যুগে যুগে কল্পে কল্পে কি জাতীয় কি বিজাতীয় ইতিবৃত্তের শোভা সংবর্দ্ধন করিবে;—ইহাতেই রমণীকুলের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে, "রমণীর সাম্রাজ্য প্রেমের রাজ্য" বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।*

* বিক্টোরিয়া পারিতোষিক রচনার ৫ম "রমণী সাম্রাজ্য প্রেমের রাজ্য" বিষয়ে যে কয়েকটী রচনা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে মেদিনীপুরের শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তিনি ১০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই রচনা সাদরে প্রকাশিত হইল। বা, বো, স।

নারীসুহৃদ্ মদনমোহন

(গত বারের শেষ)।

বহরমপুর কলেজে কিছুদিন কার্য্য করার পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কাঁদি মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত করেন। কাঁদিতেও মদনমোহন জীবনের মহাব্রত ভুলেন নাই। অনাথ বালক বালিকাদিগের ভরণপোষণের জন্য তিনি এক অনাথ-মন্দির স্থাপন করেন। নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া মদনমোহন এই সময়ে এক ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছিলেন। সত্য, ন্যায় ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি করিতে পারিতেন না এমন কাজই ছিল না।

কাঁদির নিকটস্থ মাকালতোড় নামক এক স্থানে প্রতি বৎসর এক একটী কৃত্রিম যুদ্ধ হইত। এই যুদ্ধে অনেকে হত ও আহত হইত। মদনমোহন এই বিভীষিকা নিবারণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। এমন কি একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ এই কুপথা নিবারণ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। মদনমোহন ইহা সত্ত্বেও ন্যায় ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই অসমসাহসিক কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইলেন না।

তিনি যখন অশ্বপৃষ্ঠে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন রণোন্মত্ত মুসলমানগণ তাঁহাকে সবেগে আক্রমণ করিল। মদন মোহনের অনুচরগণ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। কেবল একজন বিশ্বস্ত অনুচর প্রভুর সহকারিতা করিবার জন্য ধীরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই মদনমোহনের অশ্ব আহত হইল ও তৎসঙ্গে মদনমোহন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে সবেগে পতিত হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনায় মুসলমানগণ কিয়ৎ-পরিমাণে ভীত হইল ও কিছুক্ষণের জন্য উৎপাত হইতে নিবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে মদনমোহনের বিশ্বস্ত ভৃত্য তাঁহাকে তুলিয়া নিকটস্থ জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিল।

এই আকস্মিক ঘটনায় মদনমোহন অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি অল্প দিনের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষায় কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুনরায় মাকালতোড়ে গমন করিলেন ও অপরাধীদিগকে ধৃত করিয়া আদালতে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাভাবে অপরাধিগণ নিষ্কৃতি পাইল। বিচারের ফল শুনিয়া তেজস্বী মদনমোহন বলিলেন "অদ্য আমার অর্দ্ধমৃত্যু হইল!" এই ঘটনার পর তিনি পদত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। যেখানে ন্যায় ও সত্যের অবমাননা, মদনমোহন বিষের ন্যায় সে স্থান পরিত্যাজ্য মনে করিলেন!

হায়! হায়! এই অবমাননাই মদন-

মোহনের মৃত্যুর কারণ হইল! মনঃপীড়ায় দিন দিন তিনি ভগ্নোদ্যম ও হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন ও এই ঘটনার দেড়মাস-কাল পরে দুরন্ত বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে মদনমোহন পরিবার পরিজন ও অসংখ্য দীন দুঃখীকে কাঁদাইয়া পরলোক গমন করিলেন। ময়ূরাক্ষী-তটে তাঁহার দিব্য দেহ ভস্মীভূত হইল!

মদনমোহন সুন্দর পুরুষ ছিলেন। অনতি-দীর্ঘ-জীবনে সাহিত্য-জগতে, দয়া-দাক্ষিণ্যে, বীরত্বে, ধর্ম্মসাধনে যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশের পরম গৌরবস্থল। ভূমণ্ডলে কয়জনের মধ্যে একাধারে এতগুলি সদ্‌গুণের সমাবেশ দেখা গিয়াছে? সে দিব্যকান্তি মদন-মোহন এ জগতে নাই, কিন্তু তাঁহার শুভ্র কীর্ত্তিরাশি বিলুপ্ত হইবার নহে।

মহাত্মা ও গুণিজনের সম্মাননা আমাদের দেশে চির-বিরাজমান। বিশেষতঃ ভারত-ললনায় গুণ-পক্ষপাতিতা জগদ্‌বিখ্যাত। যে মদনমোহন নারীসমাজের উন্নতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, যিনি বঙ্গসাহিত্যের পথ-প্রদর্শক, যাঁহার সৎসাহসের বলে আজ লক্ষ লক্ষ বঙ্গরমণী শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইতেছেন, সেই দিব্য পুরুষ মদনমোহনের স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের পক্ষে যদি বঙ্গললনাগণ অবহেলা বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাদের জগদ্ব্যাপী যশে একটু কলঙ্কের রেখা কি পড়িবে না?

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদাসীনের চিন্তা

বিধুমুখী এবং বিনোদিনী মহানগরীর কোন এক পল্লীতে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের উভয়ের স্বামীই অতি অল্প বেতনে কাজ করেন বলিয়া এক বাড়ীরই দুই অংশে দুই পরিবার অবস্থিতি করেন। তাই বিধুমুখী ও বিনোদিনীর অনেক সময় মিলিত হইবার সুযোগ ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া অপরাহ্নে প্রায়ই একত্র হইয়া থাকেন। একত্র অবস্থান কালে কোনও গুরুতর বিষয়ের প্রসঙ্গে যে সময় অতিবাহিত করেন, তাহা নহে; কারণ যে সকল বিষয়ে একটু মাথা খাটাইতে হয়, একটু চিত্তসমাবেশ করিবার প্রয়োজন, সে সকল বিষয়ে তাঁহাদের বড় একটা রুচি নাই। পক্ষান্তরে লঘু বিষয় লইয়া হাস্য কৌতুক করা, কিংবা অলীক বাজে কথা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করা তাঁহাদের অভ্যস্ত হইয়া-ছিল। এক দিবস অপরাহ্ণ সময়ে দুই জনে বসিয়া নানা প্রসঙ্গ করিতেছেন, এমন সময় বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন —"আচ্ছা, বল দেখি ভাই, শোভাবাজারের

রাজারাই বড় কি, পাইকপাড়ার রাজারা বড় ?"

বিধুমুখী—এ কথা কি আর জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হয়, এ ত সকলেই জানে শোভাবাজারের রাজারা বড় ; উহঁাদের কি তুলনা আছে ?

বিনোদিনী—এই ত তোমার জ্ঞান ! পাইকপাড়ার রাজাদের সমান ঘর কলিকাতায় কেন, সমস্ত বঙ্গদেশে আছে কি না সন্দেহ।

বিধুমুখী—তোমার মত বোকা মেয়ে আর তুটি নাই। নাও, এ কথা বল্‌লে তোমাকে আর মুখ দেখাতে হবে না, সকলে তোমায় ছি ছি করবে !

বিনোদিনী—বটে ! তোমার স্বামী কি না শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে কাজ করেন, তাই এক পক্ষ টেনে কথা বলা হচ্ছে, তা না হলে ?

বিধুমুখী—বিনোদিনীর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই বাধা দিয়া বলিলেন "তা না হলে কি হ'ত ?" পাইকপাড়ার রাজাদের বড় বলতুম, এ প্রাণ থাক্‌তে তা হ'ত না, এমন একটা মিথ্যা কথাই আর নাই।

বিনোদিনী একটু ক্রুদ্ধ হইয়া—কি ভাই তুমি আমায় মিথ্যুক বল্‌ছ ? তুমি মিথ্যুক, তুমি স্বার্থপর, তুমি অন্ধ !

বিনোদিনীর তাদৃশ বাক্য বিধুমুখীর দেহে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন "তোমার সহিত কথা বলাই অন্যায়, তুমি কাকে কি বল তার হিসাব বুঝো না।"

বিধুমুখীর কথা শেষ হইতে না হইতেই সৌদামিনী সমরস্থলে উপস্থিত হইলেন। সৌদামিনী বুদ্ধিমতী এবং ধর্ম্মশীলা মহিলা, তিনি সহজে আন্দোলিত হইবার নহেন। কোনও বিষয় শ্রবণ করিলে তাহার সকল দিক্ দেখিয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হইতে সমর্থ। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দেখিলেন উভয় পক্ষ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন ; উভয়ের যেরূপ উত্তেজিত ভাব, আর একটু অগ্রসর হইলে হয় ত সংগ্রাম তুমুল হইয়া দাঁড়াইবে। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন "পাইকপাড়ার রাজা বড় কি শোভাবাজারের রাজা বড়, এই অসার বিষয়ের জল্পনায় কি লাভ ? এর চেয়ে অনেক ভাল কথায় সময় কাটাইলে ক্ষতি কি ?"

সৌদামিনী ঘা বুঝিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলেন না। তিনি বুদ্ধিমতী হইলেও বিধুমুখী ও বিনোদিনীর তৎকালীন মনের ভাবের ওজন করিয়া কথা বলিতে সমর্থ হন নাই, সুতরাং তাঁহার মূল্যবান্ কথা কয়টি যেন জোয়ারের জলে ভাসিয়া গেল। সংগ্রাম-নিরতা কোনও পক্ষই সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সৌদামিনী দেখিলেন তাঁহার সুপরামর্শ মাঠে মারা যায়, তাই কিয়ৎকাল মৌনভাবে সংগ্রামের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়ের বাগ্‌যুদ্ধের সীমা নাই। অবশেষে বিনোদিনী

নিরুপায় হইয়া সৌদামিনীকে মধ্যস্থতা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

সৌদামিনী প্রত্যুত্তরে বলিলেন "ভাই, আমি তোমাদের এ বিবাদ মীমাংসা কর্ত্তে পার্ব্ব না। আমি এরূপ কথায় কাল কাটান আর জলে ঢিল ছুড়ে মারা একই মনে করি। আমি এক দিন এক বাউলকে গান কর্ত্তে শুনেছিলাম 'হরি-প্রেমে প্রেমিক যারা, দেখ সদানন্দে ভাসে তারা, হরি-কথা বিনে কথা তারা কয় না এ প্রাণ গেলে।' সেই অবধি আমি মনে করেছি যে, যদি পারি হরি-কথা বিনে অন্য কথা কব না।"

বিনোদিনী—রেখে দাও তোমার ধর্ম্ম-কথা। তুমি যখন তখনই হরি-কথা পেড়ে থাক, ভাল হরি-কথার কি একটা সময় অসময় নেই ?

সৌদামিনী—যে নাম নিলে মুক্তি হয়, সকল পাপ ক্ষয় হয়, অসৎ চিন্তা দূরে যায়, মনের কষ্ট থাকে না, সে নাম নিতে কি আবার সময়ের বিচার কর্‌তে হবে ? এ নাম যখন তখন নিলেও ক্ষতি কি ?

বিধুমুখী সুযোগ বুঝিয়া কহিলেন—"ভাল, আমরা কি আর হরি-কথা বলি না ? কেবল কি "হরি" "হরি" বল্‌লেই হরি-কথা হয় ? আমরা ত একটা সত্য ঠিক্ করবার জন্য তর্ক কচ্ছিলাম। সত্য ঠিক্ করা কি হরির কাজ নয় ? দেখ বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা চর্চ্চা করেন, তাঁদের মধ্যে কত বাদ প্রতিবাদ, কত বই লেখা লেখি, আদালতে গিয়ে দেখ উকিলে উকিলে কত বিতণ্ডা, এ সকলেই কি গঙ্গায় ঢিল ছুড়ে ফেলা হচ্চে ?

সৌদামিনী—তুমি ত এখন দেখ্‌ছি শিষ্ট কথা বলছ। তাঁরা আর কি তোমাদের মত অসার কথা নিয়ে ঝগড়া করতে যান ? যাতে দশ জনের উপকার হয়, যাতে জগতের হিত হ'তে পারে, যাতে অন্ততঃ একটি লোকেরও উপকার হয়, এমন সত্য ঠিক্ করে নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা কর্‌লে ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমরা যে নেহাত বাজে কথা নিয়ে ঝগড়া করে নিজেদের মন খারাপ কর্চ্চ।

বিধুমুখী—সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণাই কি লোকের হিতের জন্য করা হয় ? ওদিন মাটির তলে যে একটা মূর্ত্তি পাওয়া গেল, তা নিয়ে দেখছি প্রত্নতত্ত্ববিৎদের মধ্যে খুব লড়াই চলছে, জিজ্ঞাসা করি এ লড়াই দ্বারা লোক সমাজের কি হিত হবে ?

সৌদামিনী—কোনও বিশেষ হিত না হ'লেও এটা একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সুতরাং এর মীমাংসা জন্য বাক্যব্যয় কল্লে ক্ষতি নাই। তোমাদের বিষয়টা কোন্ বিজ্ঞানের সত্য যে, তার জন্য এত লড়াই না করলেই নয় ?

বিধুমুখী—বিজ্ঞানের তত্ত্ব হোক বা না হোক্, এটা সত্য নির্দ্ধারণের বিষয় ত ? সত্য ঠিক্ করা যদি মানবের প্রকৃতি-সিদ্ধ হয়, তা হলে আমরা ত প্রকৃতির কাজই কচ্ছি, এতে আর একটা অন্যায় কি হ'ল ?

সৌদামিনী—ভাল তোমার কথা মেনে নিলেও কেবল দুই পক্ষের হাঁ ও না দ্বারা একটা সত্য ঠিক্ হয় না, তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগের দরকার। তোমরা সে বিষয়ে ত কেহ কিছু বল্‌ছ না, এক জন বলছ পাইকপাড়ার রাজা বড়, আর এক জন তাহা অস্বীকার কর্‌ছ। শোভাবাজারের রাজাকে বড় বলছ, কই কেউ ত কোনও প্রমাণ উপস্থিত কর্‌ছ না। এ বিষয়ে প্রমাণ কর্ত্তে হ'লে উভয় রাজস্বের কাগজ পত্র পরীক্ষা কর্ত্তে হয়। আয় ব্যয়ের তালিকা নিয়ে তলয়ে দেখ্‌তে হয়। কোন্ ভাণ্ডারে কি সঞ্চিত ধন আছে, তার একটা হিসাব নিতে হয়। আর কার কত কীর্ত্তিকলাপ, তারও তালিকা কর্‌তে হয়। কই তার ত কোনও প্রসঙ্গই দেখি না। কেবল কতকগুলি বৃথা কথারই শ্রাদ্ধ করিতেছ।

বিধুমুখী—তাই ত তোমার মত হাবা মেয়ে হ'লে পরের জন্য এত খাট্‌তুম। পরের জন্য এত খাটুনি খেটে দরকার?

সৌদামিনী—এখন বুঝি হ'ল পরের কথা? এখন বুঝি সত্য নির্দ্ধারণের দোহাইটি কমে গেল। সত্য ঠিক্ করা কি সোজা ব্যাপার? এ জন্য অনেক খাটতে হয়, মাথা ঘুরাতে হয়। গোলাপের বিছানায় শুয়ে শুয়ে টানা পাখার হাওয়া খেয়ে সত্য ঠিক্ করা চলে না। যারা অলস, তারাই কেবল কথা কাটাকাটি ক'রে সত্য সাব্যস্ত কর্ত্তে চায়। দুই পক্ষ দুই কথা বল্‌লে, প্রমাণ প্রয়োগের কোনও চেষ্টা নাই, অবশেষে "মুখস্য চোটাৎ" মুখের জোরে এক কথায় সব মীমাংসা করে। তোমাদের ত সে দশা হয়ে পড়েছে। যাক আমি তোমাদের খাতিরে অনেক কথা বলে ফেল্‌লুম। এ সব না করে "হরি" নাম কর্‌লেই ভাল ছিল।

বিধুমুখী—আবার পথ ছেড়ে চলে যাচ্ছ? আমি ত মনে করি ভাল কাজ-মাত্রই হরিনাম করা। পরের উপকার করাটা কি হরিনাম করা নয়?

সৌদামিনী—পরের উপকার যদি হরিনাম করাই হবে, তবে শাস্ত্রে "জীবে দয়া, নামে রুচি" দুই কথার উল্লেখ থাকৃবে কেন? এক নামে রুচি করার উপদেশ কর্‌লেই ত "জীবে দয়া" কথাও তার মধ্যে থাকৃত? আমার মনে হয় জীবে দয়া করাকে হরি নামের তুল্য ভাবা তোমার আমার মত ছার জীবের কাজ নয়। যাঁরা নাম কর্ত্তে কর্ত্তে নাম করাটাকে প্রকৃতির সামিল করে ফেল্‌তে পেরেছেন, তাঁদের ওটা সাজে। তাই বলি ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না।

বিধুমুখী—ভাই, আজ তোমার উপদেশে বড় ফল পেলাম। তুমি ঠিক্ বলেছ। অনেক সময় আমরা এরূপ অসার কথায় দিন কাটাই, তার চেয়ে হরি-নাম করাই ভাল। কিন্তু ভাই মনটা ত সব সময় বসে না। অন্য দশ বিষয়ে দৌড়ে যায়।

সৌদামিনী—দৌড়িতে দৌড়িতে ঠিক্ হবে। যিনি ঠিক্ কর্ব্বার কর্ত্তা, তিনি তোমার আগ্রহ দেখতে পেলে মনটাকে

ঠিক্ করে নেবেন। তোমার প্রাণের একটু আকুলতা চাই, তিনি সে টুকুই চান?

বিধুমুখী—বেশ বুঝলুম, তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাকলে তিনিই সব করে নিয়ে থাকেন। আজ হতে তাই কর্ব্ব, এখন সন্ধ্যা হয়ে এল, আজ ভাই বিদায় হই।

এই বলিয়া সকলে স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

চ, চ, কুশারি।

সঙ্ঘামিত্রা।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাণী ও সঙ্ঘামিত্রা।

রাণীর গান।

এ কেমন হ'ল মন আমার,
কি ভাব এযে, কিছুই বুঝতে যে পারিনে।
পাষাণ হৃদয় গলিল কেনরে,
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে?
কি মায়া এ জানে গো
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল গো,
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে।*

রাণী। বল নারি! কোথা তুমি কি শিখেছ মায়া,
নয়নে তোমার ওই ভাসে কার ছায়া?
কোন্ মোহমন্ত্র বলে
করিতেছ পলে পলে
আমার হৃদয়ে নব কুহক রচনা,
ছিন্ন যে হতেছে ধীরে বিষয়-বাসনা।
যেতেছে পাষাণ প্রাণ গলি করুণায়,
রাজত্বের গর্ব্বে আর তৃপ্তি কোথা হায়!
তটিনী-তরঙ্গ সম
নিয়ত এ চিত্ত মম
বুঝি না কিসের লাগি উন্মত্তের প্রায়?
বল নারি! সত্য করি পদ্মপত্র-জল—
তেমতি কি এ যৌবন—এ দেহ, চঞ্চল?
জলবুদ্বুদের প্রায়
নিমেষে মিশায়ে যায়
সত্যই কি ধন রত্ন ঐশ্বর্য্য সকল?
তবে বল কোথা আছে জীবনের সুখ?
আমার এ শ্রান্ত হিয়া,
কোথায় জুড়াবে গিয়া,
কোথায় উৎফুল্ল হবে এই ম্লান মুখ?

সঙ্ঘা। অপরাহ্নে বরষার মেঘ কেটে যায়
রবিকর ফুটে উঠে আকাশের গায়,
তেমতি কেটেছে তব
মোহ মেঘ; জ্ঞান নব
উঠিতেছে ফুটে মনে উজ্জ্বল আভায়,
হয়ো না চঞ্চল রাণি, প্রাণের তৃষ্ণায়।

। হায়, নারি, স্থির আর হয় কি অন্তর?
মনে হয় চতুর্দ্দিকে উঠিয়াছে ঝড়;

* "বাল্মীকি প্রতিভা হইতে উদ্ধৃত।

ক্ষুদ্র জীবনের তরী
ফেলিবে বিচূর্ণ করি
তাই রোষে উর্ম্মি তুলি আসিছে সাগর।
কোথা যাব, বলে দেও শুধাই তোমায়,
হইবে আমার হিয়া
নিরাপদ কোথা গিয়া ?
আজ আমি অসহায়, অতি নিরুপায়।

সন্ধ্যা। শুন বলি :—দেখিছ যে জাহ্নবীর তীর,
ওই তীরে ছিল রম্য
সুবর্ণ খচিত হর্ম্ম্য,
অই তীরে ছিল কীর্ত্তি বহু নৃপতির।
জাহ্নবীর স্রোত হায়, দৈত্যের মতন,
বিচূর্ণ বিলুপ্ত তাহা করেছে এখন!
জাহ্নবীর স্রোত প্রায়,
জেন রাণি, এ ধরায়
মানবের হৃদয়ের স্বর্ণ সৌধ রাশি
সবলে করিছে চূর্ণ বাসনা রাক্ষসী।
বাসনাই সংসারের অনর্থের মূল ;
কি যে সে কুহক জানে,
দুঃখ শুধু ডেকে আনে,
করে জীবনের আশা ভরসা নির্ম্মূল।
এই বাসনার লাগি শাক্য ভগবান্‌.
রাজ্যসুখ তুচ্ছ করি,
কত দিবা বিভাবরী,
করিয়া কঠোর তপ পেলেন নির্ব্বাণ।
এ নির্ব্বাণ লাভ করা সকলেরি চাই,
নাহি পথ ইহা ভিন্ন,
বাসনা হবে না ছিন্ন,
কোথাও পাবে না খুঁজি নিরাপদ ঠাঁই।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাণীর পরিচারিকাদ্বয়।

প্রথমা। দ্যাখলো দ্যাখ, গরিবের কথা বাসি হ'লে কেমন মিষ্টি লাগে! আমি আগেই বলেছিলুম, এই যে মেয়েটিকে ধরে আনা হ'ল, এ যেমন তেমন মেয়ে নয়। ওকে দেখ্‌তে ভালমানুষটির মত, তাতে কি? ওর পেটের ভেতর অনেক বিদ্যে সাদ্যি আছে। তখন ত আমার কথা কেউ কাণে তুল্‌লে না। এখন মজা দেখ ; মেয়েটা এমন ডাইনী, রাণীকে একেবারে গুণ করে খেয়ে ফেলেছে।

দ্বিতীয়া। ওলো ডাইনী নয়লো ডাইনী নয়। ডাইনী হ'লে বুঝি আর অমন চাঁদপানা মুখ হয়? পটলচেরা চোখ হয়? রাঙা দুটি ঠোঁট হয়? মিষ্টি মিষ্টি কথা হয়? নিশ্চয়ই একটা পরী; আকাশ থেকে নেমে এসেছে।

১মা। দূর পোড়ার মুখী! ডাইনী যে নয় তা তুই জান্‌লি কি করে? ডাইনী কি তুই দেখিছিস ?

২য়া। আমলো! এ যে দেখ্‌চি গায়ে পড়ে ঝগড়া কর্ত্তে এল। গাল্ দিস্ কেনলো লক্ষ্মী ছাড়ি? আমি নয় ডাইনী নাই দেখ্‌লুম। তা বলে রাজ্যের কেউ কি কখনো দেখে নাই ?

১মা। তা বোন, ডাইনী ফাইনী যা'ক। এখন বল্‌দেখি রাণীর কি উপায় হবে? রাণীর রাজত্বে মন নেই ; সংসারে মন নেই ; সাজগোজ কর্ত্তে মন নেই ; এমন যে সাধের গয়না গুলো, তা যত

রাজ্যের হাড় হাবাতে—যারা পেটে খেতে পায় না, তাদেরই বিলুয়ে দিচ্চেন। বলি, আমরা দিন রাত খেটে মচ্চি, দিবি তো নয় আমাদেরই দে। তাতো দেবেন না। আগে যাদের নামও শুন্‌তে পার্ত্তেন না, এখন সেই দুঃখী ভিখারী গুলোকেই সব দেওয়া হচ্চে!

২য়া। আরে ওতো তুচ্ছ কথা। আমি কোতয়ালের কাছে যা শুন্‌লুম।

১মা। কি শুন্‌লি রে?

২য়া। শুন্‌লুম রাণী নাকি আর ঠাকুর দেবতা মান্‌তে চান না? দেবী মা'র নৈবিদ্যি পাঁটা বন্ধ করে দিয়েছেন।

১মা। বলিস্ কিলো? দেবী মা কি তবে উপবাস করে থাকেন?

২য়া। তা আর থাক্‌বেন কেন? তুই কি মনে করিস্ দেবী মা তোর মতন? তোর যেমন রাণীর চাক্‌রিটি গেলে আর অন্ন জুটবে না; দেবীমা'র ত আর তা নয়? তিনি এ রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজ্যে চলে গেছেন; সেখানে কত লোক তাঁকে নৈবিদ্যি পাঁটা দিয়ে পুজা দিচ্ছে।

১মা। কোতয়ালের কাছে আর কি শুন্‌লি বল্ দেখি!

২য়া। শুন্‌লুম এ রাজ্যে জ'াত ফাতের বিচার থাক্‌বে না; বামন শূদ্দুর এক হ'য়ে যাবে।

১মা। ওমা! তবে এখন কি হবে? চল্‌তো একবার বুড়' মন্ত্রীটার কাছে যাই। তাকে গিয়া বলি, বুড় হয়ে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে? নইলে রাণীর দশা কেন দেখ্‌তে পাচ্ছ না? শীগ্‌গির ওঝা বৈদ্যি ডাক, আর ঐ ডাইনীটাকে তাড়িয়ে দেও; নইলে এ রাজ্যের আর কিছু থাক্‌বে না।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাণী।

ছিনু রাণী, ছিল মনে মোহ পরমাদ,
অহঙ্কারে গর্ব্বে হায়!
শ্রেষ্ঠ ভেবে আপনায়
করিয়াছি দোষ ত্রুটি শত অপরাধ।
দিয়াছি মরমে ব্যথা আমি সবাকার,
দরিদ্রের অশ্রুবারি
নিয়ত উপেক্ষা করি,
করেছি নির্দ্দয়া হয়ে শুধু অত্যাচার।
সমস্ত পাপের আজি হবে অবসান;
ত্যজিয়া স্বরাজ্য দেশ,
পরি সন্ন্যাসিনী-বেশ
সুদূর সিংহলে আজি করিব প্রস্থান;
কি আনন্দে কি হরষে উচ্ছ্বসিত প্রাণ!
সুখের তৃষ্ণায় ছিল পরিপূর্ণ মন,
দুঃখীদের অর্থ আনি
সাজিতাম বিলাসিনী,
আছিল অসংখ্য স্বর্ণ রত্ন আভরণ;
সকলি তা অকাতরে
হৃদয়ের প্রীতিভরে
অনাথিনী নারীদেরে করেছি অর্পণ;
কি পুলকে পূর্ণ এ জীবন!
কে জানিত কে যে ক্ষুদ্র, বিশ্বে বড়
কেবা?

বড় ভেবে আপনারে
অভিমানে অহঙ্কারে
লইয়াছি প্রতি দিন মানবের সেবা।
আজি ভিখারীর মত
উচ্চ শির করি নত
প্রেম ধন লয়ে যাব জগতের দ্বারে ;
নরনারী পশু পাখী
যারে নিরখিবে আঁখি,
তাহারি করিব সেবা শান্তি দিব তারে ;
বিলাইব সীমাহীন বিশ্বে আপনারে ;
কি আরাম পাইব সংসারে !
এত দিন ছিনু মোহে অজ্ঞান আঁধারে,
আজি জ্ঞানে ফুল্ল আঁখি
লজ্জা ভয় দূরে রাখি,
দেশে দেশে যাব নব সত্যের প্রচারে,
কি আরাম হৃদয় মাঝারে !
(সঙ্ঘামিত্রার প্রবেশ।)
এস বোন, সঙ্ঘামিত্রা, বড় সুখ প্রাণে,
আমি হীনা নারী হয়ে
সত্যের আলোক লয়ে
যাব তোমাদের সনে সিংহল পাটানে !
সঙ্ঘা। পেয়েছ জ্ঞানের জ্যোতি, শান্তি সুমধুর,
নির্ম্মল নিষ্কাম মনে
সুখে রাখ প্রজাগণে,
কেন রাজ্য ছেড়ে রাণী যাবে অতদূর ?
রাণী। কেন যাব ? হায় বোন, এখনো হৃদয়
বুঝিতে নারিলে মম ?
প্রভাতের পুষ্পসম
সুন্দর জীবন তব সরলতাময় ;—

আমা হ'তে আমারে যে করেছ হরণ,
তোমায় ছাড়িয়া আর
শিরে লয়ে রাজ্যভার
কেমনে করিব নিশি দিবস যাপন ?
সঙ্ঘা। সকল আসক্তি রাণী, গিয়াছে তোমার,
তবুও আমার প্রতি
কেন এ অন্যায় প্রীতি,
কেন এ আসক্তি বল হইল আবার ?
রাণী। এ আসক্তি প্রাণে যেন চির দিন রয়।
শুধু এ আসক্তি নয়, সদা মনে হয়,
যে বিমল সত্যে মোর
কেটেছে মোহের ঘোর,
নিয়ত পেতেছি নব শান্তি সুধাময় ;
এ সত্য প্রচার ভিন্ন
স্বার্থ হইবে না ছিন্ন,
শান্ত হইবে না এই অশান্ত হৃদয়।
সঙ্ঘা। সত্য বলিয়াছ রাণী,
নির্ম্মল সত্যের বাণী,
নিশীথের বংশীধ্বনি সম যাহা মনে
উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়াছে অতি শুভ ক্ষণে,
জগতের দ্বারে তাহা না করি প্রচার,
কেমনে হইবে চিত্ত সুস্থির তোমার ?
শুন রাণী, তবে বলি
আমার হৃদয় গলি
গিয়াছিল জননীর হেরি অশ্রুজল,
ভেবেছিনু হোক মোর সঙ্কল্প নিষ্ফল,
তবুও কঠিন হয়ে
সত্যের আলোক লয়ে
সন্ন্যাসিনী-বেশে ত্যজি সুখের সংসার,

ভাসাব না জননীরে অশ্রুনীরে আর !
রাজ-প্রাসাদেতে থাকি,
দীন দুঃখীদের ডাকি,
অকাতরে অন্ন বস্ত্র করি বিতরণ
করিব লোকের সব দারিদ্র্য মোচন।
কে জানে কে ডেকে মোরে মধুমাখা স্বরে
কহিল "হে কন্যা মোর,
যে উজ্জ্বল আলো তোর
সিন্ধুনীরে সূর্য্যসম ফুটেছে অন্তরে ;
রাখিস্ না সে প্রালোক প্রাণে রুদ্ধ করে,
দেখ্ চেয়ে নর নারী নিশি দিন ধরে।
বলিয়া ধনম্ দেহি
বলিয়া জনম্ দেহি,
আগ যজ্ঞ পশু বধ করিতেছে কত ;
জীবের শোণিতে হায় ! ধরণী রঞ্জিত !
চতুর্দ্দিকে হিংসা দ্বেষ রাক্ষসীর মত,
বক্ষে বসি মানবের
রক্ত ধারা হৃদয়ের
করিছে পুলকে পান নিয়ত নিয়ত।
সুখ শান্তি বিশ্ব হতে গেছে লুপ্ত হয়ে ;
মুক্ত করি আপনারে
যাও জগতের দ্বারে
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' নব সত্য লয়ে।"
এই বাণী শুনি প্রাণ হইল অধীর,
নূতন সত্যের মর্ম্ম
প্রচারিতে নব ধর্ম্ম,
করেছি সর্ব্বস্ব ত্যাগ, হয়েছি বাহির।
তুমিও সঙ্গিনী হবে—করেছ কামনা,
তবে এস দুই বোনে হয়ে হৃষ্টমনা,
যাই আত্মপর ভুলি,
গাই গান কণ্ঠ খুলি,
মাতা ধরণীর করি চরণ বন্দনা :—
(উভয়ের সঙ্গীত।)
"বন্দে মাতরং।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরং।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।"*

* এই দেশবিখ্যাত সঙ্গীতটি যে "আনন্দমঠ" হইতে উদ্ধৃত, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

৩ ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—প্রথম দর্শন।

শুভ্র চন্দ্রালোকে ধরাখানি ভাসমান। ধরণীর উচ্চ প্রাসাদে ও দরিদ্রের ক্ষুদ্র কুটীরে, সকল স্থানেই সমভাবে কৌমুদী-জাল বিকীর্ণ। মীর মহম্মদের হৃদয় কেবল অন্ধকারময়। কখন নৈরাশ্যে, কখনও ক্ষোভে তাহার মর্ম্মস্থল সমুদ্র তরঙ্গবৎ আলোড়িত, আহার বিহার কিছুতেই তাহার রুচি নাই। বানু বেগমের গৃহে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তামগ্ন অবস্থায় দিন

কাটাইতেছে। কিন্তু আজ অপেক্ষাকৃত উৎফুল্ল। বৃদ্ধ ধাত্রী সংবাদ দিয়া গেল যে, রমণী সুস্থ, তাহার জীবনের সঙ্কটাপন্ন দশা আর নাই, তবে আহার করিতে কিছুতেই চাহে না! অতি কষ্টে কেবল ২।৪টি বেদানার দানা খাওয়াইয়া রাখা হইয়াছে, কিন্তু এরূপে আর কয় দিন চলিবে? আপনি যাহা ভাল হয় করুন্। মীর সাহেবের অন্তঃকরণ আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিবি কি করিতেছে?" ধাত্রী উত্তর করিল "নিদ্রা আসিয়াছে।" ইহা শুনিয়া কহিলেন "আচ্ছা আমি একবার গিয়ে দেখিব।" এই বলিয়া বৃদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রাত্রি দশ ঘটিকা অতীত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এখনি মীর সাহেবের ভবনের চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর সুবর্ণ ছায়া মীর সাহেবের দ্বিতলস্থিত দ্বাদশ-দ্বার-শোভিত প্রকোষ্ঠে ছাইয়া পড়িয়াছে। গৃহস্থিত পালঙ্কোপরি কৃশাঙ্গী নিদ্রামগ্না যুবতীর মুখে বুকেও শত শত চন্দ্রকিরণ-রেণু বিক্ষিপ্ত। চাঁদের মধুর আলোতে যুবতীর প্রেমময় মলিন সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়াছে! শীতল সমীরণ একের পর আর ঠেলাঠেলি গৃহে প্রবেশ করিয়া যুবতীর অযত্ন-সম্ভূত রুক্ষ কেশরাশি লইয়া কত খেলা খেলিতেছে ও মাঝে মাঝে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিকটস্থ উদ্যান হইতে বেলি চামেলির মনোহর বিলাসময়ী সৌরভরাশি আনিয়া রমণীর ক্ষুদ্র নাসা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতেছে। এত উৎপাত চাঁদ ও বাতাস মিলিয়া করিতেছে, তথাপি বালা গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন! কেবল কয়েকটি দাসী চতুর্দ্দিকে প্রহরীস্বরূপা—বামা যেন অশোক বনে রাক্ষসীপরিবৃতা সীতা। বৃদ্ধা মীর মহম্মদকে সঙ্গে আনিয়া গৃহস্থিত দাসী-দিগকে বিদায় দিয়া যুবতীর শয্যার অতি সন্নিকটে বসিবার স্থান করিয়া দিল এবং কহিল "এখন আপনি কিছুক্ষণ নীরবে থাকুন। আমার সহিত আজ দিনের বেলা অনেক কথা কহিয়াছে। পূর্ব্ব কথা অল্প অল্প স্মরণ হইতেছে। কেবল জানিতে চাহে এখানে কি প্রকারে আসিয়াছে ও তাহার স্বামী কোথায়? এই বলিয়া অজস্র অশ্রু-পাত করিতে থাকে, আর কেবল "গঙ্গা মাই কোথায় তুমি," এই এক বুলি তাহার নিকটে সর্ব্বদা। আমি অল্প অল্প জানাইয়াছি যে, সে জলে ভাসিয়া যাইতে-ছিল, হঠাৎ আপনার চক্ষে পড়াতে এখানে আনিয়া অনেক চিকিৎসায় তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। জমীদারকে অনুনয় করিলেই তোমার কুশল হইবে বলিয়া বিবিধ প্রলোভন দেখাইয়াছি। কিন্তু সায়েব, এ মেয়ে ভুলিবার নয়, কেবল "গঙ্গামাই গঙ্গামাই" করিয়া কাঁদে। সে ত মুসলমানের জল গ্রহণ করিবে না, তাই সামান্য ফলাহারে প্রাণ ধারণ করিয়া আছে।" জমীদার নীরবে ধাত্রীর কথায় কর্ণ নিমগ্ন করিতেছেন, কিন্তু নয়ন মন সেই সুন্দর মুখখানির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সকল কথোপকথনের শব্দে রমণীর

নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। নেত্র উন্মীলন করিবামাত্র সম্মুখে মীর মহম্মদকে দেখিয়া রমণী হঠাৎ শয্যা হইতে একেবারে উঠিয়া বসিলেন ও ভয়ে ত্রস্ত হইয়া যেন কোনরূপে সেখান হইতে কোনদিক দিয়া পালাইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। জমীদার পথ আগুলিয়া কহিলেন "বিবি পিয়ারী, কেন ভয় পাইতেছ? এখানে তোমার কিসের ভয়? এ অধম তোমার হুকুমের তাঁবেদার। তোমার যাহা আজ্ঞা হইবে, তাহাই এখনি সাধিত হইতে পারে, কেবল একটি ছাড়া"—সেটি কি তাহা আর বলিলেন না। পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গী নিকটে শ্যেন দেখিলে প্রাণভয়ে লুকাইয়া পিঞ্জরের প্রত্যেক শিকটি আশ্রয় ভাবে জড়াইয়া ধরে। রমণী তদবস্থ ভাবে সরিয়া যাইতে লাগিলেন—ভয়ে দুঃখে তাহার হৃদয়ে আর বল রহিল না—কাঁদিয়া ফেলিলেন ও করপুটে অতি কাতর-বচনে কহিলেন "মহাশয়! আমি ভিখারীর নারী, আমার এ ঐশ্বর্য্যে কাজ কি? আমি ইহা চাহি না, আমাকে পথ দিউন, আমি বনের পাখী, বনই আমার আশ্রয়।" মোহাসক্ত জমীদার মীর মহম্মদ কাতরোক্তিতে দ্রবিত না হইয়া আরও আকৃষ্ট হইয়া নিকটে গিয়া রমণীর অশ্রুজল মুছাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তখন রমণীর শোণিত উষ্ণ হইয়া ধমনীতে ধমনীতে প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। অতিরুক্ষ কর্কশ ভাবে কহিলেন "সাবধান! আমাকে স্পর্শ করিও না, আমরা হিন্দু রমণী, সতীত্বের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারি। দূরে থাক্, যবনের ছায়া স্পর্শ করিলেও আমাদের পাপ হয়।"

মীর মহম্মদ যুবতীর সাহস দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন, প্রকাশ্যে কহিলেন "সুন্দরি, আমি ত ঐ চরণে জীবন দিতে প্রস্তুত আছি। তোমার ঐ রূপরাশি আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমি স্ব-ইচ্ছায় তোমার পথের কণ্টক নহি।" যুবতী দেখিলেন ইহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া দুরূহ। আপাততঃ উহার নিকট বল প্রকাশ করায় ফল নাই। তখন কৌশলজাল বিস্তার করিয়া কহিলেন "দেখ আমি স্বপ্ন পাইয়াছি যে, এক বৎসর একান্তে বসিয়া মানস পূজা করিয়া ও গঙ্গাজল পান' এবং হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া ব্রত পালন করিব; পরে যা হয় ঘটিবে। আমার স্বপ্নাদিষ্ট সন্ন্যাসী পুরুষের বিধান প্রত্যহ হরিদ্বারের প্রবাহিণী জাহ্নবী হইতে জল আনিয়া পূজা ও ব্রত পালন করিতে হইবে।"

মীর মহম্মদ রমণীর রূপশিখায় দগ্ধ হইতেছিলেন; তখন তিনি দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য, ঘোর মোহে তাহার মনবুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; অতএব তাহার কথায় তখনি সম্মত হইলেন ও বলিলেন এখনি তোমার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আমার এখানে কিসের অভাব? মনে মনে ভাবিল হরিণী বুঝি জালে পড়িল। নিঃশঙ্কচিত্তে বলিয়া ফেলিলেন "নফর আমার হিন্দু, তাহাদ্বারা

এ কাজ হইবে।" নফরের নাম উচ্চারণ করিবামাত্র যুবতী শিহরিয়া উঠিল। এ কে? সেই নফর দাস? আর এ মহল কি তাহার প্রভু জমীদারের? তবে কিরূপে কে তাহার স্বামীর অঙ্ক হইতে তাহাকে কাড়িয়া আনিল? এইরূপে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত একের পর আর তরঙ্গের মত তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু তিনি অচল পাষাণ-স্তূপের মত সেই মত্ত মাতঙ্গের সম্মুখে অবিচলিত ভাবে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। মীর মহম্মদ ভাবিলেন তিনি কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আশা-পবনে তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত শীতল হইল। কহিলেন "এখনি তোমার জন্য সকল হিন্দুয়ানির কারখানা করিতেছি, আমিও ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিব, সুন্দরি! যদি তোমার দেবতা অনুকূল হন।"

তখনি বানু বেগমের কক্ষে আসিয়া আজ্ঞা দিলেন হিন্দু দাসী ভিন্ন কেহ যেন নূতন বিবির মহলে না যায় এবং অন্যান্য যাহা প্রয়োজন, তাহা নফর দাস করিবেন। বানু বেগম দেখিলেন গতিক ভাল নয়। মুখে বলিলেন "বিবি কি হিন্দু-কন্যা? তাই আজ সপ্তাহ হইয়া যায়, ফলাহারে জীবন কাটাইতেছে, ধন্য উহাদের জাতীয় মাহাত্ম্য!" এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া কয়েক দিন পরে আজ একটু আশ্বস্ত-হৃদয়ে মীর মহম্মদ বাটীর বাহির হইয়া বায়ু সেবন করিতে গেলেন, সঙ্গে বয়স্য নফর দাসও চলিল। দোষীর চিত্ত সর্ব্বদাই শঙ্কিত, সুতরাং বাহির হইতেও মনে এক প্রকার উদ্বেগ জন্মিতে লাগিল। এক খানি বদ্ধ পাল্কি গাড়িতে বসিয়া উভয়ে পরামর্শ আঁটিতে আঁটিতে চলিলেন। গাড়িখানি নির্জ্জন, মানব-পদ-পরিত্যক্ত স্থান দিয়া মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিল। জমীদার মৃদু স্বরে কহিলেন "একটু বাগ ফিরেছে, দেখ আর এক সপ্তাহেই আরও পোষ মেনে আসবে, কিন্তু এখন একটা এই বখেড়া করেছে। তা হোক্ না কেন, আমার উহাতে ক্ষতি কি? এ মহলের রক্ষী হইয়া দিবা নিশি রহিয়াছি—এমন কি বড় বেগম সাহেবার পর্য্যন্তও গতি বিধি নাই।" নফর প্রভুর সন্তোষোৎপাদনার্থে অতি গর্ব্বিত স্বরে কহিলেন "জনাবের যে মোহনমূর্ত্তি, আর একবার চক্ষের সমক্ষে দাঁড়াইলেই সে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে একেবারেই ভুলে যাবে! আচ্ছা এখন বলুন সে কি চায়?" মীর মহম্মদ রমণীর ব্রতের উল্লেখ করিলেন। নফর কহিলেন "আ! তার জন্যে ভাবনা কি? আমি এক কলসী কেন, বিশ কলসী গঙ্গাজল এনে দিতে পারি, আর হুজুরের সুখের জন্য গঙ্গাকে একেবারে বেঁধে এনে আপনার খাস মহলে রাখ্‌তেও পারি। একবার হুকুম পেলেই হয়।" সেই দিন হইতে বন্দোবস্ত হইয়া গেল, প্রত্যহ এক কলসী ব্রহ্মাবর্ত্ত ঘাটের জল নূতন বিবির জন্য নূতন মহলে যাইবে। এই কার্য্যের জন্য নফর দাসের স্ত্রী দ্বারা অতি বিশ্বস্ত একটি প্রাচীনা রমণী নিযুক্ত হইল। মীর মহম্মদ কিয়ৎক্ষণ পরে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন

ও সেই শুভ দিনের প্রত্যাশায় এক একটি দিবস রজনী পলে পলে কাটাইতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—স্বপ্নযোগে।

এক দুই করিয়া দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু যে শুভ মুহূর্ত্তের আশয়ে মণিমালা এত দুঃখে কষ্টে জীবন ধারণ করিয়া আছেন, তাহার কখনও উদয় হইবে কি না কে জানে? আজ তিন মাসকাল অতীত হইয়া গেল—কত বার সূর্য্য উদিত হইল, চন্দ্র অস্ত গেল; আলোক অন্ধকার, একের পর আর যাতায়াত করিয়া গেল, কিন্তু মণিমালার হৃদয়ের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে এখনও একটি আলোক-রেখা জ্বলিল না। সেই যে তমসাময়ী রজনীতে গভীর গঙ্গা-গর্ভে মগ্ন হইয়া প্রাণের অন্তস্তল নিরাশায় ডুবিয়া গিয়াছিল, এখনও সেই নিরাশা-বাত্যা প্রবলরূপে বহিয়া এই ঐশ্বর্য্যশালী দ্বিতল কক্ষে মণিমালাকে ঘোর দুঃখের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে! তিনি কেবল পিঞ্জরাবদ্ধা কুরঙ্গিণীর মত অহর্নিশ বনপথে তাঁহার নয়ন মন নিয়োজিত করিয়া রাখেন। দিবারজনী, জাগ্রতে নিদ্রায়, একই প্রকার কল্পনা তাহার চক্ষে বিভাসিত হইত। সেই চির-পরিচিত সুপরিষ্কৃত শান্তিময় ভবনটি, সেই আড়ম্বর-বিহীন যৎসামান্য তৈজস পত্র ও সেই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটি, নানা লতা গুল্ম বিভূষিত মন্দিরের ও সেই রমণীয় প্রত্যক্ষ দেবতার শ্রীমুখমণ্ডল ক্রমান্বয়ে স্মৃতি-পটে সাগর-তরঙ্গের ন্যায় বহিয়া যাইত, ও সেই মুহূর্ত্তে হৃদয়-নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া অশ্রুজলের প্রবল বন্যা ছুটিত। সেই অশান্তির দীর্ঘ দিনে কে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে? আপনি কাঁদিতেন, আপনি ধৈর্য্য ধরিয়া নীরবে রহিতেন। যখন চক্ষু মেলিয়া দেখিতেন এই প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠ মধ্যে একখানি অঞ্চল এমন নাই যে তাহার অবারিত নয়নধারা মুছায়, একটি শব্দ এমন নাই যে তাহা হইতে মধুর সান্ত্বনা-বাণী উত্থিত হয়, একটি হৃদয় এমন নাই যাহার সহানুভূতি-কণা তাঁহার হৃদয়ে ঢালিয়া দেয়; তখন সেই নির্জ্জন নিথর গৃহ হইতে—তখন সেই সাহারা মরু-হৃদয় হইতে কেবল সেই অনাথনাথের অন্বেষণ ও আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। মণিমালা কেবল ভাবিতেন কিরূপে আবার সেই গঙ্গাতীরের সৈকতভূমিতে স্বামী রঘুনাথের পাদ বন্দনা করিবেন। কত মিলন—কত বিরহের স্বপ্ন তাঁহার উন্মীলিত নেত্রের উপর দিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু কোন মতেই উদ্ধারের ছিদ্র পথ খুঁজিয়া পাইতেন না। গঙ্গাজল এখন তাঁহার সর্ব্বস্ব, সেই পরিমিত জল লইয়া স্নান আহার পান করিতেন। প্রত্যূষে—অতি প্রত্যূষে জাগ্রত হইয়া স্নান সমাপনপূর্ব্বক একান্তচিত্তে দেবাদিদেবের আরাধনা করিতেন—যতক্ষণ না সূর্য্যদেব অস্ত গমন করিতেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইত না। পরে সন্ধ্যা সমাগত হইলে যৎকিঞ্চিৎ ফল

ও জল গ্রহণ করিয়া রজনী অতিবাহিত করিতেন। একদিন নানা চিন্তা-বিজড়িত হইয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সেই কুশাসনের উপর শীর্ণ বিবর্ণ তনুখানি বিন্যস্ত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করত একান্তচিত্তে রঘুনাথের দীন প্রশান্ত বদনখানি ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রা আসিয়া ঘেরিল। স্বপ্নময়ী ছায়া তাহার শিরোদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। মণিমালা দেখিলেন একটি অতি প্রাচীন শিবমন্দিরের মধ্যে গৈরিক বসন-ধারী এক জন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাঁহার পবিত্র শুভ্র কান্তির তেজ চারি দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যেন হাত বাড়াইয়া কেবল ডাকিতেছেন "আইস আইস, আমি সন্তাপিত পীড়িত ক্লিষ্ট প্রাণে সান্ত্বনা ঢালিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত, আইস আইস" এই বলিয়া এক খণ্ড ভূর্জ্জপত্র লইয়া দান করিতেছেন ও কত অন্ধ, আতুর, অত্যাচার-ক্লিষ্ট নর নারী উহা গ্রহণ করিয়া মহা হৃষ্টচিত্তে চলিয়া যাইতেছে। মণিমালাও সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের নিকট হাত পাতিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী তাঁহাকে ভূর্জ্জ-ত্বক না দিয়া এক-গাছি শুষ্ক তৃণ দিলেন এবং কহিলেন "এই তৃণভেলকে অকূল সমুদ্র পার হইবে।" মণিমালা সেই তৃণগাছি লইয়া রুক্ষ জটাযুক্ত কেশরাশির মধ্যে নিহিত করিতেছেন, ইত্যবসরে যেন কাহার পদ-শব্দ তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, অমনি সোণার স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া দেখেন সম্মুখে জমীদার মীর মহম্মদ লুব্ধনেত্রে তাঁহার সুপ্তসৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেছে। মণিমালা তাহাকে দেখিয়া ভয়ে জড় সড় হইয়া সরিয়া বসিলেন। এখন রাত্রিকাল, ধরণী নিস্তব্ধ, সংসার এখন বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর কোলে শিশুর মত ঘুমাইতেছে। এমন সময় পাপী তাপী রোগী ও ভোগবিলাসী বই কে আর জাগ্রত? মণিমালা এখন এই প্রকোষ্ঠে একাকিনী, কেবল সেই অসহায়ের সহায় তাঁহার প্রহরী। মীর মহম্মদ অতি মৃদুস্বরে কহিলেন "সুন্দরি! ব্রত উদ্‌যাপন কবে হইবে? আমার জীবন মরণ তোমার হাতে, আশায় আশায় কত দিন রাখিবে?", এই বলিতে বলিতে তাহার মদিরামত্ত লোহিত নয়নযুগল দিয়া দর দর ধারে শ্রাবণের ধারা বহিতে লাগিল। আজ তাহার হৃদয়-কবাট একেবারে উন্মুক্ত, প্রাণের সকল পিপাসা নিবৃত্তি করিতে ব্যগ্র। দীর্ঘায়ত বিস্ফারিত লোচন-যুগলের অশ্রু পতনে রেশমী অঙ্গরাখার পকেট হইতে একখানি সুচিকণ রুমাল লইয়া নিজেই চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। মণিমালা নিমীলিতনেত্রে বিপদ্‌ভঞ্জন ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, তাঁহার হৃৎপিণ্ড বেগে দুলিতেছে—ভাবিলেন হায় আজি বুঝি ঘোর নিশীথে ডুবিলাম, অবলার সর্ব্বস্ব যায়!! মীর মহম্মদ চিত্তের আবেগে যখন রুমাল টানিয়াছেন, সেই সময়ে তাঁহার পকেট হইতে একখণ্ড কাগজে জড়ান একটী পেনসিল পড়িয়া গেল, কিন্তু তিনি তখন আর সেটা বুঝিতে পারিলেন না।

মণিমালার রূপ তাহার নয়ন মন সকলি অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। জমীদার আবার কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কহিলেন "অয়ি জ্যোতির্ম্ময়ি! একবার এ অধমের প্রতি চাহিয়া দেখ।" মণিমালা বিষম সঙ্কট দেখিয়া কহিলেন "মহাশয়! কাছে আসিবেন না, আমার ব্রত যেন ভঙ্গ না হয়, তাহা হইলে এ জীবন আর রাখিব না।" জমীদার এবার প্রশমিত হইলেন। তাহার কর্ণকুহরে যেন কেহ অমৃত সিঞ্চন করিয়া গেল—কহিলেন "আর একবার তোমার মধুর বচন শুনাও!" মণিমালা করপুটে কাতরভাবে কহিলেন "আপনি এখন প্রতিগমন করুন, আমার ব্রত উদ্‌যাপনের আর বিলম্ব নাই, আজ অষ্টমী, এই পৌর্ণমাসীতেই শেষ হইবে। অতএব এখন আর বাধা বিঘ্ন কেন দিতেছেন?" মীর সাহেবের আসন টলিল, "এইবার বিবি তবে গেলাম, তবে বিদায় হই, দেখা যাক্" বলিয়া তাহার অসংযত চিত্ত ও অবশ দেহ লইয়া বানু-বেগমের গৃহে প্রবেশ করিলেন। একের পর আর 'দে পিয়ালা' 'দে পিয়ালা' করিয়া উপর্য্যুপরি মত্তমাতঙ্গিনী সুরা নদীর প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। মীর মহম্মদ চলিয়া যাইবার পর, মণিমালা কাগজখানি কুড়াইয়া লইলেন। সেখানি একটী পেন্‌সিল লিখিত সামান্য কাগজ, তাহাতে কাহার নাম ধাম নাই, কেবল এইটুকু লিখিত আছে "সাবধান! এখনও পাগলা গঙ্গাতীর ছাড়ে নাই।" এই দুই ছত্র পাঠ করিয়া মণিমালার প্রাণের ভিতর যেন সাগর উথলিয়া উঠিল। তিনি আশা, নিরাশা, হর্ষ, উদ্বেগ নানা ভাব-বিমিশ্রিত এক অপূর্ব্ব চিন্তায় মগ্ন হইলেন ও কিয়ৎ-ক্ষণ একচিত্তে নিজ ইষ্ট দেবতার চরণ ধ্যান করিয়া পরিশেষে বলিলেন "দেখি ব্রত উদ্‌যাপন হয় কি না।" পর দিবস যখন তাঁহার গঙ্গাজল-বাহিকা আসিয়া জলের কলসী রাখিয়া গেল, তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন "ওগো মা, আমার একটি কাজ করিবে?" সে হঠাৎ আজ এরূপে সম্ভাষিত হইয়া আশ্চর্য্যভরে চাহিয়া রহিল। তাঁহার সঙ্গে বৃদ্ধা ধাত্রী সল্‌মতী প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্তা, সুতরাং না জানিয়া হাঁ না বলিতে পারে না। অবশেষে কহিল "কি আজ্ঞা হয়?" মণিমালা কহিলেন "তুমি ত দেখ্‌ছি হিন্দু-কন্যা, আমার ব্রত শেষপ্রায়। অদ্য হইতে পঞ্চম দিবস পর্য্যন্ত আমি এক শত অষ্টোত্তর বিল্বপত্র ও রক্ত চন্দন দিয়া ইষ্ট দেবতার পূজা করিব, তুমি আনিবে কি?" সে কহিল "হুজুর সাহেবের হুকুমের অপেক্ষা।" বৃদ্ধা ধাত্রী কহিল "আচ্ছা চল্ মালিকের কাছে, সেখানে ঠিক্ হ'য়ে যাবে।" উভয়ে বানুবেগমের মহলে সায়েবের কাছে অনুমতি চাহিতে গেল। কিন্তু তাহারা ভাবিল "এত সামান্য কার্য্যের জন্য আবার কে এত্তালা করে? উহারা যেন ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে, আর পারে না, দিন রাত লুকোচুরি ক'রে থাকতে পারা যায় না বলিয়া বৃদ্ধা

তাহাকে কহিল "তুই এনে দিস্ লো।" গঙ্গাজল-বাহিকা যথাসময়ে বিল্বপত্র ও চন্দন আনিয়া দিয়া গেল। প্রত্যহ মণিমালা সেই সন্ন্যাসিদত্ত তৃণ গাছটি দিয়া চন্দন দ্বারা বিল্বপত্রে দুর্গানাম অঙ্কিত করিয়া নিম্নে লিখিতেন "আর ত জীবন রহে না, পৌর্ণমাসী ত আগত, উদ্ধার কবে হইবে?" সেই বিল্বপত্রগুলি প্রতি দিন গঙ্গাজলে ভাসাইবার আজ্ঞা দিতেন। দাসী যে কলসী পূরিয়া জল লইয়া আসিত, সেই কলসীতে বিল্বপত্র লইয়া জলে বিসর্জন করিত। মণিমালার দিন যত যায়, ততই আশা ভরসা ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)।

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

১। জাপানের অনেক গ্রাম ও নগরে অদ্যাপি এই কুসংস্কার প্রচলিত আছে যে, অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কাগজের মূর্ত্তি হস্তে লইয়া নৃত্য করিলে দহ্যমান গৃহের অগ্নি আপনা হইতেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

২। গ্রীনলণ্ডে একখানি মাত্র সংবাদপত্র আছে। মিঃ মোয়েলার নামক এক ভদ্র লোক একাকী সেই পত্রিকার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি উহার সম্পাদক, লেখক, মুদ্রাকর, কম্পোজিটর ও কার্য্যাধ্যক্ষ। পত্রিকা খানি পাক্ষিক।

৩। অনেক বড় বড় শারীরতত্ত্ববিদের মত এই যে, উচ্চৈঃস্বরে গান করিলে ফুসফুসের ও পরিপাক শক্তির ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়। এই জন্য জার্ম্মাণির সেনাপতি আজ্ঞা দিয়াছেন যে, পদাতিক সৈন্যগণ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করিবার সময় ইচ্ছামত সমর-গীত গান করিবেক।

৪। প্রাচীনকালে রোম নগরবাসিনী রমণীগণ একদা দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, কৃত্রিম উপায়ে তাঁহারা শ্মশ্রু ও গুম্ফ উৎপাদন করিবেন। ক্ষৌর কার্য্য দ্বারা এবং নানা প্রকার রাসায়নিক প্রলেপ প্রয়োগে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এই অস্বাভাবিক বাসনা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হয়েন। রোমের পুরুষগণ ইহাতে বড়ই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়েন। পরিশেষে সম্রাট্ স্ত্রীলোকদিগের গুম্ফ ও শ্মশ্রু ধারণ জন্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাদিগের ঐ প্রবৃত্তি দমন করেন।

৫। অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ করিতে হইলে ইয়োরোপের অনেক জাতির লোকেরা "হিস্ হিস্" শব্দ করেন। কিন্তু দেশ-পরিব্রাজকগণ দেখিয়াছেন যে, পশ্চিম আফ্রিকাবাসিগণ বিস্ময় প্রকাশ জন্য, জাপানীরা শ্রদ্ধা প্রকাশ জন্য, বস্থুটো জাতির লোকেরা প্রশংসা ভাব প্রকাশ

জন্য এবং হেব্রাইডিস্ দ্বীপবাসিগণ সুন্দর দ্রব্য দেখিলে ঐরূপ "হিস্ হিস্" শব্দ করিয়া থাকে।

৬। যে আপেল্ ফল পৃথিবীর নানা স্থানে দুর্ম্মূল্য, সেণ্ডউইচ দ্বীপের বনে সেই ফল অসংখ্য অসংখ্য ফলিতে দেখা যায়। ঐ দ্বীপবাসিগণের নিকট ঐ ফল বিশেষ প্রিয় নহে।

৭। সমগ্র পৃথিবীতে যত মদের ভাঁটি আছে, তাহার অর্দ্ধেক গুলি জর্ম্মণি দেশে। জর্ম্মণি বর্ত্তমান সভ্য দেশ সকলের মস্তক।

৮। হিমালয় পর্ব্বতে বর্ত্তমান কালে একজাতীয় হরিণ দেখা যায়, তাহা পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। আমেরিকার কোনও পর্ব্বতের নিকট মৃত্তিকার এক নিম্ন স্তরে ঐ জাতীয় হরিণের কঙ্কালময় দেহ পাওয়া গিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে, অতি পুরাকালে ইয়োরোপ, আসিয়া ও আমেরিকা এক বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল, সাগর দ্বারা বিভক্ত ছিল না, উক্ত আবিষ্কার তাহারই প্রমাণ।

৯। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, পঞ্চাশ বৎসর পরে বর্ত্তমান বাষ্পীয় যানের স্থান গ্যাস যান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে পারে, এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ডাক্তার লড্ উইগ্ মণ্ড নামক এক জন জার্ম্মণ বৈজ্ঞানিক গ্যাস্ উৎপাদনের এরূপ সহজ প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন যে, গ্যাসের সাহায্যে রেলগাড়ী চালাইতে অতি সামান্য ব্যয় পড়িবে। গ্যাস্ ব্যবহারে ব্যয় হ্রাসের সম্ভাবনা থাকিলে বাষ্পের পরিবর্ত্তে উহারই ব্যবহার প্রচলিত হইবে সন্দেহ নাই।

১০। পূর্ব্বে একশত বৎসর বয়স্ক মানুষ অনেক দেখা যাইত। কিন্তু ক্রমে দীর্ঘজীবী লোকের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে সমগ্র ইংলণ্ডে ১৪৬ জন, স্কটলণ্ডে ৪৫ জন, নরওয়ে রাজ্যে ২৩ জন, সুইডেনে ১০ জন, স্পেনে ৪০১ জন, জর্ম্মণিতে ৭৮ জন এবং সার্বিয়া প্রদেশে ৫৭৫ জন এক শত ও তদধিক বৎসর বয়স্ক লোক আছেন। দক্ষিণ আমেরিকায় এক ব্যক্তির বয়ঃক্রম দেড় শত বৎসর হইয়াছে। সুইজারলেণ্ড দেশে শতায়ু লোক এক জনও নাই।

দেবী স্বর্ণময়ী

(শেষ)।

মাঝে মাঝে পেটের বেদনা ও তাহার সঙ্গে জ্বর হইতে লাগিল। এই অসুস্থ শরীর লইয়াও আত্মীয় স্বজনের সেবা করিতে বিরত হন নাই। স্বর্ণময়ীর যখন

শরীরের এইরূপ অবস্থা, তখন পুত্র এলাহাবাদের সন্নিকটবর্ত্তী নাইনী নামক স্থানে বদলী হইলেন। এই স্থানে আসিয়া স্বর্ণময়ী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বাঙ্গে শোথ হইল। এইরূপ অবস্থায় দেখিয়াছি নিষেধ বাক্য সত্ত্বেও অতি কষ্টে—আস্তে আস্তে এঘর ওঘর করিয়া তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য করিতেন। স্বর্ণময়ী এই সময় সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটীকে বিলাত পাঠাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই পুত্রটী সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং চিরকাল পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত বলিয়া স্বর্ণময়ী ইহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাল বাসিতেন। তিনি এক দিকে গুরুতর কর্ত্তব্য ও অন্য দিকে পুত্র-বাৎসল্য এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরীরের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, পুত্রটীকে বিলাত পাঠাইয়া মৃত্যু সময় তাহার মুখ দেখিতে পাইবেন না জানেন। সে বিদেশে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইবে, তাহাও বুঝিতেন। স্বর্ণময়ী হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিলেন। দারুণ পীড়ায় চলৎশক্তি,—উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছে, মৃত্যু সন্নিকট। পুত্রকে জাহাজে তুলিয়া দিবার জন্য তাহাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। একে ভীষণ ব্যাধি, তাহার উপর মর্ম্মভেদী যাতনায় স্বর্ণময়ীর পীড়া আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সন্তান ভয় পাইয়া বলিল "মা, আমি তোমাকে এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া কি করিয়া বিলাত যাইব? আমার যাইতে একটুও ইচ্ছা হইতেছে না।" মাতা মনের আগুন চাপিয়া উৎসাহ দিয়া বলিলেন "বাবা, ভয় নাই, আমি ভাল হইব, আমার কাজ ত এখনও শেষ হয় নাই। তুমি ফিরিয়া আসিয়া আবার আমাকে দেখিবে।" হায়! হায়! সে দেখা আর হইল না। পুত্রকে কত উপদেশ—কত আশ্বাস দিলেন। শরীর কিন্তু আর মানসিক যন্ত্রণা চাপিয়া রাখিতে পারিল না। যে দিন পুত্র রওনা হইবে, তাহার পূর্ব্ব দিন জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িল। পর দিন প্রত্যূষে জাহাজ কলিকাতা ছাড়িবে। শেষ রাত্রিতে উঠিয়া বাটী হইতে রওনা হইতে হইবে। পাছে পুত্র ঘুমাইয়া পড়ে, এই ভাবিয়া মাতা প্রায় ১০৫° ডিগ্রি জ্বর লইয়া রাত্রি জাগিয়া রহিলেন। যথাসময়ে পুত্রকে লইয়া জাহাজ ঘাটে গেলেন এবং দগ্ধ প্রাণকে চাপিয়া হাসিতে হাসিতে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। বাসায় আসিয়া জ্বরের প্রকোপ এত বাড়িল যে, তিন দিন তিন রাত্রি অজ্ঞানাবস্থায় কাটাইলেন। এই বার কলিকাতায় কিছু দিন চিকিৎসার পর তাঁহার উত্থান-শক্তি একেবারে রহিত হইয়া গেল। নানা কারণে কলিকাতা ছাড়িয়া স্বর্ণময়ী এই অবস্থাতেই ঢাকায় জ্যেষ্ঠা কন্যার নিকট গমন করিলেন। ঢাকায় রীতিমত ডাক্তারী, তৎপরে কবিরাজী এবং অবশেষে আবার ডাক্তারী চিকিৎসা হইল। কিন্তু যে

দুরন্ত ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার হাত হইতে কিছুতেই নিস্তার পাইলেন না। দিন দিন যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল। শুইয়া শুইয়া সকলের খোঁজ খবর লইতেন—কাহার খাওয়া হইল, কাহার হইল না ইত্যাদি সমুদায় তদন্ত করিতেন। যে কয় দিন ছিলেন, কেবল "কাঁথুর (সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের কাঁথীতে জন্ম হেতু ডাক নাম) মুখ আর দেখিলাম না, দয়াময়ী আমাকে মুক্ত কর" এই বলিতেন। দিন দিন শরীর খারাপ হইতে লাগিল। প্রতি দিন ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে তাঁহার নিকট ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত করিতে বলিলেন। পূজ্যপাদ দুর্গানাথ রায় মহাশয় প্রতি দিন প্রাতঃকালে আসিয়া স্বর্ণময়ীর নিকট প্রার্থনা ও সঙ্গীত করিতেন। ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র ছুটী লইয়া আসিয়া মাতাকে দেখিয়া গেলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর প্রত্যূষে স্বর্ণময়ীর বাগ্‌রোধ হইল, কিন্তু জ্ঞান সম্পূর্ণ রহিল। তিনি ইঙ্গিত করিয়া সকলকে নিকটে আসিতে বলিলেন। সকলে নিকটে আসিলে প্রত্যেকের মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সৎ পথে থাকিবার জন্য ইশারা করিয়া বলিলেন। পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট টেলি গ্রাম করার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "তোমরা বোঝ না সে সরকারী কাজ্ করে, ছুটী পাবে না; কেবল মনের উদ্বেগে দিন কাটাইবে।" কিন্তু এইরূপ অবস্থায় ক্রমাগত ইশারা করিয়া পুত্র, মাতা ও খুল্লতাতের নিকট টেলিগ্রাম করিতে বলিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহারা কেহই সে সময় আসিতে পারেন নাই। বাগ্‌রোধ হইলে ঔষধ সেবন করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইশারা করিয়া বলিলেন "তোমরা আর আমাকে কষ্ট দিও না, আমি এখন শীঘ্র মুক্ত হইতে পারিলেই বাঁচি।" জামাতা ডাকিয়া বলিলেন "মা! ব্রহ্মসঙ্গীত শুনি-বেন? দুর্গানাথ বাবু আসিয়াছেন।" মাতা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। দুর্গানাথ বাবু সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিলেন, স্বর্ণময়ী তাহাতে যোগ দিলেন। ২১শে তারিখ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় স্বর্ণময়ী সকল দুঃখ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। আশ্চর্য্য! মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্ব্বে যে শরীরে অসহ্য যাতনার চিহ্ন দেখিয়াছিলাম, মৃত্যুর পরক্ষণেই তাহা অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল। মনে হইতে লাগিল যেন ভয়ানক কষ্টের পর সুখে শান্তিতে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। সে কি দৃশ্য জীবনে কখনও ভুলিব না।* এমন মুখশ্রী কখনও দেখি নাই। এমন শান্ত সুন্দর ভাব কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। স্বর্ণময়ীর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি যে সৎদৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অবি-নশ্বর হইয়া থাকিবে। সংসারে যে কাজ

* দেবী স্বর্ণময়ীর স্বামী কালীনাথ দেবেরও দেহে মৃত্যুর পর অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শ্রী ফুটিয়াছিল। তাহা দেখিয়া ঘাটের লোকেরা বলিয়াছিল এ নবীন সন্ন্যাসী কোথা হইতে আসিলেন? বা, বো, স।

করিবার জন্য বিধাতা পুরুষ তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা যথোপযুক্তরূপে সম্পন্ন করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গস্থ আত্মা তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাহারা মাতার সাধু দৃষ্টান্ত আদর্শ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে ও তাঁহার সন্তান নামের যোগ্য হইতে পারে। শান্তিদাতা পরমেশ্বর স্বর্গময়ীর স্বর্গস্থ আত্মার শান্তি বিধান করুন্।

জিজ্ঞাসা।

১

সে এবে যথায়—
এ দেশের দিবা নিশা সেখানে কি যায়?
এখানে যে সমীরণ,
জুড়াইছে জীবগণ,
এই বায়ু সেখানে কি লাগে তার গায়?
সেও কি জ্যোছনা রেতে,
চাঁদের আলোক পেতে,
বসে থাকে সৌধ-শিরে কিম্বা জানালায়?
আমাদের দিবানিশি সেখানে কি যায়?

২

এ দেশের বসন্ত কি বিরাজে সেখানে?
তার সে তমাল-শাখে,
আমাদের পাখী ডাকে,
আমাদের ফুল ফোটে চেয়ে তার পানে?
সেথা কি জলধি-জলে,
আমাদের ঢেউ চলে,
সেখানে কি বীণা বাজে আমাদের তানে?
আমাদের সুখ-সাধ পশে কি সেখানে?

৩

এ দেশের ভালবাসা সেখানে কি রয়?—
অনুকূল সুখে দুখে,
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস বুকে,
চির দিন অনশ্বর চির-মৃত্যুঞ্জয়;
এমনি মমতা প্রীতি,
এমনি সুখের স্মৃতি,
সে দেশের প্রাণে প্রাণে জড়া'য়ে কি রয়?
এ দেশের ভালবাসা সেখানে কি হয়?

৪

তাই যদি হয় তবে কিসের বেদন?
মাঝখানে বৈতরণী দু'পারে দুজন!
সাঁতারিয়া একবার,
চলি যাব পর পার;
মরণের পরে পাব সোণার জীবন;
অমানী যামিনী গেলে,
ঊষা আসে হাসি ঢেলে,
বিধুরের তরে মিলে মধুর মিলন?—
ভয় কি, ক'দিন পরে পাব দরশন।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি—রচয়িত্রী।

স্ত্রীলোকের অধ্যবসায়।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের নানা গুণ আছে বটে, কিন্তু অধ্যবসায় গুণের প্রবলতা বড় দেখিতে পাই না। এখনকার স্ত্রী-জাতির শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতির অনেক বিবরণ পাঠ করিতেছি, কিন্তু অধ্যবসায়িনী স্ত্রীলোকের সংখ্যা যেন ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়। আমি বর্ত্তমান প্রস্তাবে কয়েকটি অধ্যবসায়িনী স্ত্রীলোকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে আকাঙ্ক্ষা করি। পাঠিকা মহাশয়াগণ ইহা কেবল পাঠ করিয়া যেন ক্ষান্ত না হয়েন, এরূপ আশ্চর্য্য অধ্যবসায়ের আলোচনা করিয়া যাহাতে অধ্যবসায়িনী হইতে পারেন তাহারই চেষ্টা করেন, আমার এই অনুরোধ।

আমি কেবল বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের কথা লিখিব। মুসলমান-শাসনকালে দিল্লীর সম্রাট্-সিংহাসনে জগদ্বিখ্যাত আকবর যখন অধিরূঢ় ছিলেন, সেই সময়ে একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রথিত আছে, রাজা মানসিংহ পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোককে বন্দী করিয়া পশ্চিমে লইয়া গিয়াছিলেন, ঐ স্ত্রীলোক তাহাদের অন্যতম। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই স্ত্রীলোকের "সমরু" বিবি নাম হইয়াছিল। কি কারণে বলিতে পারি না, কিছু কাল পরে সমরু বিবি মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার "নব্য-ভারত" এবং "সঞ্জীবনী" পত্রে সমরু বিবির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি (১৩০৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের) "প্রবাসী" নামক মাসিক পত্রে আর একজন ভদ্রলোক, কতিপয় পংক্তি মাত্র লিখিয়া, সমরু বিবির কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অধ্যবসায়ের কথা উল্লেখ করেন নাই। যাহাহউক, সমরু খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়া রোমান কাথলিকদিগের মত মালা পরিত, ধূপ ধুনা জ্বালাইয়া ধ্যানে বসিত, পুষ্পাঞ্জলি করিয়া যিশু-মাতা মেরির পূজা করিত এবং গৈরিক বসন পরিয়া ও সুদীর্ঘ সুচিক্কণ কেশ রাখিয়া পথিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সমরু দেখিতে খুব সুন্দরী ছিল; গীত ও বাদ্যে সে সময়ে আগ্রা, এটোয়া, কানপুর, বুলন্দসহর, আলিগড়, মথুরা প্রভৃতি স্থানের সুবিখ্যাতা নর্ত্তকী ও গায়িকাগণ সমরুর অত্যন্ত প্রশংসা করিত। এ স্থলে নিরপেক্ষ ভাবে বলা উচিত, প্রথম বয়সে সমরুর চরিত্র নির্দ্দোষ ছিল না, কিন্তু পরিণামে সমরু ধার্ম্মিকা হইয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। সমরু বিবি রীতিমত গির্জ্জায় গিয়া ঈশ্বরোপাসনায় যোগ দিত এবং খ্রীষ্টানদিগের দ্বারা নানা

প্রকারের সাহায্য ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইত। বিবি লেখা পড়া জানিত না, তাহা নহে। তাহার কীর্ত্তিমালার ইতিবৃত্তানুসন্ধান করিয়া আমরা সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি যে, তাহার অতি সুন্দর লেখা পড়া জ্ঞান ছিল এবং সে অসাধারণধীশক্তিসম্পন্না বলিয়া জনসাধারণমধ্যে প্রভূত খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থা হইয়াছিল। যাহা হউক, গির্জ্জা-মধ্যে পাদ্রী সাহেবদিগের বক্তৃতা শুনিয়া, বিশেষতঃ পাদ্রী সাহেব-দিগের এবং অন্যান্য খ্রীষ্টানদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া সমরু বুঝিল, মুসলমান রাজপুরুষেরা স্বভাবতঃ খ্রীষ্টানদিগের ঘোরতর বিপক্ষ এবং বিদ্বেষী। যাহাতে বিধর্ম্মী খ্রীষ্টানেরা তাহাদের গির্জ্জা, পুস্তকালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য এক কাঠা ভূমিও না পায়, যাহাতে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচলিত না হয় ইত্যাদি বিষয়ে মুসলমান শাসনকর্ত্তারা খুব দৃষ্টি রাখিতেন। দেশীয় বা বিদেশীয় খ্রীষ্টানকে কেহ হত্যা করিলেও রাজপুরুষেরা সে কথায় বিশেষ কর্ণপাত করিতেন না। সম্রাট্ আকবর তখন সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন বটে, কিন্তু সম্রাটের কাণে কি দেশের সকল খবর পৌঁছিয়া থাকে? রাজপুরুষেরাই প্রকৃত কর্ত্তা, সম্রাট্ নিজে সাম্রাজ্যাধিপতি-মাত্র। যাহাহউক সমরু বিবি খৃষ্টানদিগকে অভয় ও উৎসাহ দানে সান্ত্বনা করিত এবং প্রতিজ্ঞা করিল, "যতদিন পর্য্যন্ত আমি আকবর সম্রাটের দ্বারা আগ্রা-নগরীতে খৃষ্টীয় মাহাত্ম্য প্রচারের পথ প্রশস্ত করিতে সক্ষমা না হইব, যতদিন পর্য্যন্ত আগ্রায় রীতিমত খ্রীষ্টীয় আশ্রম ও বিপুল খ্রীষ্টীয় সম্পত্তি স্থাপিত না হইবে, ততদিন আমি আমার মাথায় কেশ বাঁধিব না এবং কোনও প্রকারের মিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করিব না।" সে সময়ে এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় খ্রীষ্টানেরা ভাড়া দিয়া অতি সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। সমরুকে অনেকে চিনিত ও জানিত, সুতরাং সমরু এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে শুনিয়া অনেক লোকে বিশেষতঃ প্রতিবাসী ও প্রতি-বাসিনীগণ তাহাকে উপহাস, বিদ্রূপ এবং তাচ্ছিল্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমরু বিবি তাহাতে অণুমাত্রও ক্ষুণ্ণা বা ভগ্নোৎ-সাহিনী হইল না। সে অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল। লোকে তাহাতে চমৎকৃত হইয়া গেল। ক্রমে অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে নৃত্যগীত ও বাদ্য বিদ্যায় সমরু বিবি এমন আশ্চর্য্য পারদর্শিতা ও প্রখ্যাতি লাভ করিল যে, যে স্থানে বসিয়া সে গান করিত অথবা বাদ্যযন্ত্র বাজাইত, সে স্থান দিয়া কোনও ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যোপলক্ষে দ্রুতগতিতে চলিয়া গেলেও তাহাকে তাহার গান শুনিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। কিছু দিন পরে ঘটনাচক্রে সম্রাট্ আকবরের কর্ণকুহরে সমরুর যশঃ-সৌরভ গিয়া প্রবেশ করিল। সম্রাট্ আকবর নানা বিদ্যায় বিভূষিত ছিলেন এবং কোনও ধর্ম্মেরই বিরোধী ছিলেন না। তিনি সমরুকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ

করায় রাজপুরুষেরা সমরুকে পথের ধারে দাঁড় করাইলেন। যথাসময়ে অশ্বপৃষ্ঠে মহা ধুমধামের সহিত ভারত-সম্রাটপ্রবর' সেই বিধর্ম্মী বাঙ্গালী স্ত্রীলোককে দেখিতে আসিলেন। পথে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সে সময়ে গৈরিকবসন-পরিহিতা, এলোকেশী, পুষ্পদাম-বিভূষিতা, কণ্ঠমালা-ধারিণী সমরু বেহালা হস্তে অতি মধুর স্বরে তান ছাড়িল। সেই কোকিলকণ্ঠ-বিনিন্দিত তান, সেই সা রি গা মা-সিদ্ধ অপূর্ব্ব অতুলনীয় তান, সেই উর্দ্দু ভাষার মহাপ্রেমময়ী মধুমাখা কবিতার তান, আকাশ ও পাতালকে মাতাইয়া সম্রাটের চিত্তকে অবশ করিয়া ফেলিল। সম্রাট্ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ভূমিতলে পতিত হয়েন দেখিয়া রাজপুরুষেরা তাঁহাকে নীচে নামাইলেন। অপূর্ব্ব সুন্দরী সমরুর অপূর্ব্ব বেশ এবং অতুলনীয় গীত ও কণ্ঠস্বর উপলক্ষ করিয়া সম্রাট্ বলিলেন "আমি মানুষী দেখিতেছি না, ইহা ত সাক্ষাৎ জীবন্ত-দেবীমূর্ত্তি!" সায়াহ্নসময়ে সম্রাট্ চলিয়া গেলেন। আর একবার সম্রাট্-প্রাসাদে সম্রাটের সহিত সমরুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিছু দিন পরে আকবরের সহিত সমরুর বিবাহ হইল। ইতিপূর্ব্বে সম্রাটের অন্তঃপুরে মুসলমান, হিন্দু, পার্শী প্রভৃতি সহধর্ম্মিণী ছিলেন, এবারে খ্রীষ্টান রমণী তালিকাভুক্তা হইলেন। ইতিহাসে লিখিত আছে, সম্রাট্ আকবরের নিজের প্রকৃত ধর্ম্ম কি ছিল, তাহা কেহ জানিত না অথবা তিনি কাহাকেও জানিতে দিতেন না, কিন্তু তিনি সকল প্রকার ধর্ম্মের উৎসাহ দিতেন এবং সময়ে সময়ে সকল জাতীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। যাহাহউক, বিবাহ হইবার পরেও সমরুর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিথিল হইল না, বরং অতিরিক্ত আর একটি নব-প্রতিজ্ঞা অধ্যবসায়-হুতাশনে আহুতি দিলেন। সমরু বিবি এখন সমরুবেগম বলিয়া প্রখ্যাতা হইলেন, সুতরাং আমি অতঃপর তাঁহাকে বেগম বলিয়াই উল্লেখ করিব। বেগম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "যতদিন পর্য্যন্ত আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হইবে, ততদিন আমি সম্রাটের অঙ্গ স্পর্শ করিব না।" আকবর বাদসাহ যখনই বেগমের প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেন, তখনই বেগমকে ধুপ ধুনা জ্বালাইয়া ধ্যান ধারণায় নিযুক্তা দেখিতেন অথবা অতীব ভক্তিমাখা সুস্বরে "আল্লা উক্কো য়শ্‌ য়েশো ইসুফুদ্দর্‌ নাশ, মিনল্‌ জিন্নতে উন্‌নাশ্‌" প্রভৃতি (কোরাণের) আয়েৎ অর্থাৎ শ্লোক পাঠ করিতে দেখিতেন। বেগমের ব্রহ্মচারিণীর বেশ, দেবীমূর্ত্তি, অপূর্ব্ব দেবভক্তি, কোরাণ পাঠ, ধ্যান প্রভৃতি দেখিয়া ও শুনিয়া সম্রাট্ আকবর বেগমের গৃহে প্রবেশ করিতে ভীত হইতেন এবং তাহাকে স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিতে সাহস করিতেন না। একদিন ভয়ে ভয়ে বেগমের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন বেগম তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা খুলিয়া বলিলেন। বেগমের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, সম্রাট্ তাঁহার

আবেদন গ্রাহ্য করিলেন। সেই দিন অবধি সমরু বেগম সম্রাট্ আকবরের রীতিমত বনিতা বলিয়া গণ্যা হইলেন। পাঠক ও পাঠিকাগণ! সম্রাট্ আকবর এখন আর জীবিত নাই। সমরু বেগমও ধরাধাম হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সম্রাট্ আকবরের নাম ও কীর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে আগ্রায় সমরু বেগমের নাম ও কীর্ত্তি লক্ষ কণ্ঠে গীত হইতেছে। সমরুর এই অসাধারণ অধ্যবসায়ের কি আশ্চর্য্য ফল ফলিয়াছে তাহা শুনিতে চাও কি? কেবল শুনিলে আমি সন্তুষ্ট হইব না, তোমরা আগ্রা নগরীতে গিয়া সমরুর চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিসমূহ স্বচক্ষে দেখিয়া আইস। সমরুর অসাধারণ অধ্যবসায়ফলে রোমান কাথলিক খ্রীষ্টানেরা আগ্রা নগরীর বহির্দ্দেশে যে প্রভূত ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন, তাহার দৈর্ঘ্য দুই মাইল, প্রস্থ এক মাইল। কেবল তাহাই নহে, দশ সহস্র টাকা বার্ষিক আয়ের জমিদারীও তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সুপ্রশস্ত ভূমি-খণ্ডে দুইটি কলেজ, একটি বোর্ডিং হৌস্, ৭টি সুন্দর কূপ, ৩টি সরোবর, ১৭টি কুঠি, ১টি অতি বৃহৎ গির্জ্জা, ২টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গির্জ্জা, বালকবিদ্যালয়, রোমান-কাথলিক কন্ভেণ্ট, লর্ড বিশপের অতি সুন্দর ও বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ৫০টি পর্ণ-কুটীর, মৃত ব্যক্তিদিগের সমাধিক্ষেত্র, বালকদিগের ক্রীড়াক্ষেত্র, পাকশালা, বালিকা-বিদ্যালয়, ব্যাণ্ড্ ঘর, ৫টা বাঙ্গালা ঘর প্রভৃতি অট্টালিকায় ঐ ভূমিখণ্ড সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। সমরু বেগমের সমাধি এই ভূমিখণ্ডে হইয়াছিল। লর্ড বিশপের প্রাসাদের নিকটে প্রকাণ্ড সমাধিস্তম্ভ এখনও বর্ত্তমান। তদ্ভিন্ন ফল ফুলের বাগান ইত্যাদির ত কথাই নাই। এ সকল ছাড়া ১৩ খানি গ্রাম নিষ্কর জায়গীর আছে। এখনও তালিকা শেষ হয় নাই। ৮ খানি গ্রামের স্ত্রীলোক ও পুরুষ সমুদায়ই রোমানকাথলিক খ্রীষ্টান!! এই গ্রামগুলি সমরু বেগম স্বয়ং দান করিয়া গিয়াছেন। এখন বল দেখি, অধ্যবসায়ে কি না হয়? স্বীকার করি, অনেক সময়ে অনেকে অতি মন্দ কর্ম্ম সাধন জন্য অধ্যবসায়ী হয়, কিন্তু উদ্দেশ্যের কথা আমি তুলি নাই, আমি কেবল অধ্যবসায়ের কথাই লিখিতেছি। আগ্রার যে অংশে রোমান-কাথলিকদিগের সম্পত্তি ও আশ্রম আছে, তাহার নাম "ছিল্লী ইট মহলা।" পাঠিকারা ইহা স্বয়ং দেখিয়া আসিতে পারেন।

এইবারে আর দুইটি বাঙ্গালী স্ত্রী-লোকের অধ্যবসায়ের কথা লিখিব। ইহঁাদের কীর্ত্তি এখনও বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমান। হুগলীর প্রায় দেড় ক্রোশ উত্তরে বাঁশবেড়িয়া নামকগ্রামে ত্রয়োদশ-চূড়া-সমন্বিত প্রসিদ্ধ "হংসেশ্বরী মন্দির" অধ্যবসায়িনী বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের এক অতি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। যোগসাধন-প্রণালীর গূঢ় সঙ্কেত ইহাতে জাজ্বল্যমান। জমিদার-পত্নী রাণী শঙ্করী দাসীর যত্নে, ব্যয়ে, উৎ-সাহে ও অধ্যবসায়ে ইহা নির্ম্মিত। পূর্ব্ব-কালে মহারাষ্ট্রীয় বর্গীদিগের আক্রমণ হইতে

রক্ষা প্রাপ্তির জন্য ইহার চতুর্দ্দিকে গড় ও খাদ ছিল, ক্রমে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই মন্দির দেখিবার যোগ্য।

এইবারে শেষ কথা। হুগলী জেলার অন্তর্গত তড়া আঁটপুর গ্রাম বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রাম, কলিকাতা হাইকোর্টের সুদক্ষ বারিষ্টার মিষ্টর আর, মিত্র (রাজনারায়ণ মিত্র) মহাশয়ের জন্মভূমি। মিত্রবংশ খুব প্রাচীন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশ; অনেক বৎসর পূর্ব্বে এই বংশে একজন অতি ধার্ম্মিক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও নানা গুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। সদাচার, সভ্যতা, দয়া, ধর্ম্ম, দান, ধ্যান, দেব দ্বিজে ভক্তি, অতিথি ও অনাথ পালন, বৈষ্ণবসেবা প্রভৃতি কার্য্যে এই স্ত্রীলোক অতি "নিষ্ঠাবতী" হিন্দুরমণী বলিয়া সর্ব্বসাধারণমধ্যে পূজনীয়া ছিলেন। ইনি অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেন। এক দিন মনে মনে ভাবিলেন, "আমাদের দেশে যত দেবালয় (মন্দির) নির্ম্মিত হয়, সেগুলি অ-ব্রাহ্মণের সহায়তায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। মুসলমান, চণ্ডাল, বাগ্দী প্রভৃতি জাতীয় মজুরের দ্বারা মন্দির তৈয়ার হয়; চেষ্টা করিলে কেবল ব্রাহ্মণের সহায়তায় একটি পবিত্র দেবালয় প্রস্তুত হইতে পারে না কি?" পাঠক পাঠিকা মহাশয়! আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে তার, রেল বা পোষ্টাফিষ ছিল না। তখন একটু গঙ্গাজল আনিতে হইলে সুদূর ত্রিবেণী অথবা কলিকাতায় বহুব্যয়ে লোক পাঠাইতে হইত। পথে দস্যু ভয়ও ছিল। এক কলস গঙ্গাজল আনিতে হইলে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে অথবা বর্ষায় ভিজিতে ভিজিতে কিম্বা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডময়ূখমালায় বিদগ্ধ হইতে হইতে কলসবাহী মনুষ্যকে অনেক দিন ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে হইত। যাহাহউক এই ধার্ম্মিকা রমণী একটি মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য কৃতসংকল্পা হইলেন। ঐ মন্দিরের ইষ্টক ব্রাহ্মণের হাতে তৈয়ারী; উহার কর্দ্দম, ফ্রেম প্রভৃতি ব্রাহ্মণে প্রস্তুত করিয়াছেন; ব্রাহ্মণের হাতে ইষ্টক দগ্ধ হইয়াছে; ব্রাহ্মণের দ্বারা গঙ্গাজল আনাইয়া ইষ্টক প্রস্তুত করা হইয়াছে, পুকুরের জলের একবিন্দুও ব্যবহার করা হয় নাই; ব্রাহ্মণ মিস্ত্রির দ্বারা মন্দিরের গাঁথনি কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে; কাষ্ঠের কাজ ব্রাহ্মণেরাই প্রস্তুত করিয়াছেন এবং চূণ শুর্কি ইত্যাদি যাহা কিছু প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অ-ব্রাহ্মণ ব্যক্তি তৈয়ার বা আনয়ন করিতে অধিকারী হয় নাই। ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি ঐ মন্দিরের এক তিল প্রমাণ কার্য্যও করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয় নাই। এখন ভাবিয়া দেখ, এরূপ অধ্যবসায় কি সাধারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, অথচ এগুলি কেবল স্ত্রীলোকেরই কীর্ত্তি। তাহাতেই বলিতেছি, পুরুষের অধ্যবসায় অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধ্যবসায় দশগুণ অধিক।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ভুবনেশ্বর তীর্থ।

পুরীর পথে এই ভুবনেশ্বর তীর্থ। ইহা হাবড়া হইতে ২৭০ মাইল। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের খুরদা ষ্টেষণ হইতে পুরীর শাখা রেলট্রেণ ধরিতে হয়; এই খুরদার আগেই ভুবনেশ্বর। ইতিহাস-পাঠকেরা জানেন, খৃষ্টাব্দ ৫০০ হইতে ১১৩০ পর্য্যন্ত ছয় শতাধিক বর্ষকাল কিশোরীবংশ উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। তাঁহারা শৈব ছিলেন এবং ভুবনেশ্বর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। তাঁহারা অজস্র ব্যয়ব্যসন করিয়া রাজধানীকে সহস্র সহস্র শিব-মন্দিরে বিভূষিত করেন, তাহারই ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া দর্শক-দিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া থাকে। জগন্নাথযাত্রীদিগের অনেকেই এই ভুবনেশ্বর তীর্থ দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করেন। এ বৎসর রথোপলক্ষে লক্ষাধিক লোক এই তীর্থ দর্শন করিয়াছেন। তাহাদের ভক্তি ও বিশ্বাসকে ধন্যবাদ, কিন্তু তাহাদের এক এক দিনের দুঃখ ক্লেশ অবর্ণনীয়।

ভুবনেশ্বর ষ্টেষণ হইতে তীর্থস্থান প্রায় এক ক্রোশ, পদব্রজে বা গো-শকটে যাইতে হয়। গোরুর গাড়ীর যাতায়াতের ভাড়া ।০ আনা মাত্র। পথে যাইতে যাইতে উড়িষ্যার স্থপতিবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়—কোথায়ও কেবল প্রস্তর গাদা করা, কোথায়ও তাহা সামান্য শিল্পকৌশলে সজ্জিত, সেই শিল্পকৌশল উন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে ভুবনেশ্বর মন্দির নির্ম্মাণে কারু-কার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে।

ভুবনেশ্বর মন্দির উদ্দেশে চলিতে চলিতে অসংখ্য শিবের মন্দির দেখা যায়। তাহাদের কতকগুলির নামোল্লেখ করা যাইতেছে:— রামেশ্বর, কেদারেশ্বর, মুক্তেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, ভগবানীশ্বর, পরশু-রামেশ্বর, জম্বেশ্বর, মৈত্রেশ্বর, মেঘেশ্বর, শ্রীরামেশ্বর।

ভুবনেশ্বরের পথে প্রথমেই দুইটী সুন্দর মন্দির আছে। পাণ্ডা বলিল তাহাদের নাম রামেশ্বরের ও লবকুশের মন্দির। বোধ হয় রামোপাসকগণ শিবের মন্দিরকে এইরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের চেষ্টায় নিকটে মহাবীর হনুমানও পূজার স্থান পাইয়াছেন।

কেদারেশ্বর মন্দিরে কতকগুলি কুণ্ড আছে—যথা গৌরীকুণ্ড, চাল-ধোয়া কুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, হলদী কুণ্ড, গাটিয়া (বড়) মরীচি কুণ্ড। চাল-ধোয়া কুণ্ডে ভোগের জন্য চাল ধোওয়া হয়। মরীচি কুণ্ডের জল পান করিলে সন্তান হয়, এই জন-প্রবাদ আছে এবং বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদের জন্য অর্থ দিয়া কুণ্ডের জল ক্রয় করা হয়। শুনা যায় ইহাতে বৎসরে হাজার টাকার জল বিক্রয় হয়। মুক্তেশ্বর শিবমন্দিরটী তত

উচ্চ না হইলেও দেখিতে বড় সুন্দর। এই স্থলে কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, গৌরী-দেবী ও মহাবীরের মন্দির আছে।

তৎপরে কোটি তীর্থ, ভগবানীশ্বর ও পরশুরামেশ্বরের মন্দির অতিক্রম করিয়া বিন্দু সরোবরে উপনীত হওয়া যায়। রাজা রাণী, ব্রহ্মেশ্বর, মেঘেশ্বর—কেদারেশ্বর হইতে কিছু দূরে। গবর্ণমেণ্ট ভগ্ন মন্দির সকল মেরামতের জন্য ৫০০০ টাকা দিয়াছেন এবং কতক মেরামত হইয়াছে।

বিন্দু সরোবর একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা। ইহা পবিত্র হ্রদ বলিয়া আখ্যাত। শুনা যায় ইহার চারি দিকে এক সময় ৫০০০ শিবমন্দির ছিল, এখন তাহার অধিকাংশ অদৃশ্য হইয়াছে। ইহার উত্তরে উত্তরেশ্বর, পূর্ব্বদিকে বাসুদেব ও দক্ষিণে ভুবনেশ্বর ও মধ্যস্থলে জগতী মন্দির।

ভুবনেশ্বর মন্দির পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরেরই অনুরূপ উচ্চ, বৃহৎ ও আশ্চর্য্য কারুকার্য্যে পূর্ণ। পাথরের উপর এমন সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ আর অল্প স্থানে দেখা যায়। কালাপাহাড় অনেক খোদিত মূর্ত্তি বিকৃত ও ধ্বংস করিয়াছে, তথাপি যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। মন্দিরের দুইটী পৃথক্ প্রাঙ্গণ আছে, তাহা তত বৃহৎ বা সুপরিস্কৃত নয়। ভুবনেশ্বর মন্দিরে লিঙ্গরাজ শিব প্রতিষ্ঠিত। ইহার পরিধি ৮।৯ ফিট্। তাহার চারি দিকে রাশিচক্র অঙ্কিত। অনেক প্রাচীন হিন্দুবিগ্রহের ন্যায় ইহাঁর স্থান এক তমসাচ্ছন্ন গৃহে, ক্রমাগত অন্ধকারের মধ্যে উচুঁ নীচু পথ দিয়া ইহাঁর নিকট যাইতে হয়। খুব আলো জ্বালিয়া অতি সাবধানে না গেলে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। ভুবনেশ্বরীর একটী পিত্তলের ছোট মূর্ত্তি বাহিরে স্থাপিত দেখা যায়। তদ্ভিন্ন পার্ব্বতী, জগন্নাথ, পতিত-পাবন, মদনমোহন, কার্ত্তিকেয়, নন্দী (বৃহৎ পাথরের বৃষ), গোপালনী দেবী এবং আরও কয়েকটী শিবের মন্দির দৃষ্ট হয়। ভুবনেশ্বরের প্রকাণ্ড মহল চারি দিকে অতি উচ্চ সুদৃঢ় প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহার সম্মুখে অরুণস্তম্ভ আছে এবং ভিতরে পুরীর অনুরূপ নাটমন্দির ও ভোগ-মন্দির আছে। তথায় ভোগের আট্‌কে কিনিতে পাওয়া যায়। জল ব্যবহারের জন্য ভিতরে দুইটী বৃহৎ কূপ আছে। বাসুদেবের মন্দিরও বড়, তাহাতে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বিন্দুসরোবর ছাড়া আরও কয়েকটী সরোবর আছে, যথা দেবী-পা-ভরা, গোসাগর, পাপনাশন, নলকুণ্ড ইত্যাদি। প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট ৩০০০ টাকা দিয়াছেন। দেবী-পা-ভরা পুষ্করিণীর নূতন পঙ্কোদ্ধার হইয়াছে, তাহার চারি দিকে অসংখ্য ছোট ছোট মন্দির। ইহার নিকটেই হাঁসপাতাল, ডাকঘর ও পুলিশ। ভুবনেশ্বর-মন্দিরের অব্যবহিত বহির্ভাগে একটী মধ্যশ্রেণী স্কুল আছে।

খণ্ডগিরি—ভুবনেশ্বর হইতে ৩ মাইল দূরে। ইহা প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তি এবং বিশেষ দর্শনীয়। দুই দিকে দুই পাহাড় কাটিয়া সুন্দর ঘর প্রস্তুত হইয়াছে।

পূর্ব্বদিকের পাহাড়ের নাম খণ্ডগিরি, পশ্চিম দিকের পাহাড়ের নাম উদয়গিরি। উদয়-গিরিতে পাথরের সিড়ি বাহিয়া প্রায় ৩টা তালগাছ সমান উচ্চে উঠিতে হয়। সর্ব্বো-পরি স্তরে দুইটী মন্দির, তাহার একটীতে ৫টী বৌদ্ধমূর্ত্তি পাথরে কাটা; তাহা লোকে পূজা করিয়া থাকে। নিম্নতলে মহাবীরের মূর্ত্তি আছে, তাহারও পূজা হইয়া থাকে। নিম্নতলে পাহাড়কাটা বারাণ্ডাওয়ালা গৃহশ্রেণী; অনেক ঘর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। গৃহপ্রাচীরে খোদিত মূর্ত্তি অনেক দেখা যায়। পশ্চিমে পাহাড়কাটা এক বৃহদা-কার কুণ্ড, তাহাতে প্রচুর জল আছে। একটী উৎস দিয়া এই জল আসিতেছে, সুতরাং কখনও শুষ্ক হয় না। যে মন্দিরের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার দক্ষিণে এক বৃহৎ প্রাঙ্গণে শত শত সমাধি, তাহার উপর বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল সাজান রহিয়াছে।

ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরির মধ্যস্থ পথে পুরীর ভূতপূর্ব্ব রাজার সমাধি-মন্দির আছে। কিঞ্চিৎ দূরে কপিলেশ্বরে কপিলনাথ মহা-দেব ও কালিকা দেবী প্রতিষ্ঠিত। চৈত্রমাসে এখানে উৎসব ও মেলা হইয়া থাকে।

কাশ্মীর-চিত্র।

(গত প্রকাশিতের পর)।

পথে উষ্ট্রারোহী আরবগণ স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া চলিতেছে, মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। ইহাদের শয়ন ভোজনাদি জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক সকল কার্য্য উষ্ট্র পৃষ্ঠেই কেমন সুন্দর ভাবে নির্ব্বাহ করে, তাহা দর্শন করিয়া বড় আমোদিত হইলাম। আমরা মধ্যাহ্ন সময়ে উড়ি নামক স্থানে ডাক বাঙ্গালায় পঁহুছিলাম। এ বাঙ্গালাও মহা-রাজার নির্ম্মিত। গতরাত্রির বিশ্রামস্থল বাঙ্গালা অপেক্ষা এটী অনেক বৃহৎ, শয়না-দির জন্য সুসজ্জিত সুবিস্তৃত অনেক ঘর পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। চারি-পাশে উন্নত গিরিমালা, একটী সমতল ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে বাঙ্গালাটী ঠিক্ চিত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। টোঙ্গার দারুণ কষ্টে অধীর হইয়া গন্তব্য বাঙ্গালাতে পঁহুছিবার জন্য মন যে কিরূপ আকুল হইয়াছিল, কোনও কথায় তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। স্নান ও আহারের পর ভ্রমণে বাহির হইলাম। বিতস্তা পূর্ব্ববৎ গর্জ্জন করিয়া নিম্নে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু তীর অতি উচ্চ ও দুরা-রোহ বলিয়া নদীবক্ষে অবতরণ করার সুবিধা হইল না দেখিয়া একটু বিষণ্ণ হইলাম। পারাপারের জন্য রজ্জু নির্ম্মিত দোলা সেতু দর্শন করিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। সঙ্কীর্ণ একগাছা দড়ি ঝুলিয়া রহিয়াছে, মনে হয় অনেক পুরাতন। সম্মুখে শিখদের মৃত্তিকানির্ম্মিত এক ভগ্ন দুর্গ দৃষ্ট হইল। সর্ব্বসংহারকারী কালের

অত্যাচারে ইহা ধ্বংসাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ স্থলেও অত্যন্ত শীতের প্রভাব অনুভব করিলাম। অযত্নসম্ভূত অসংখ্য জাতীয় সুন্দর ফুল ও পত্রের বর্দ্ধনশীল শোভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বিতস্তাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বভাবের যে প্রশান্ত মনোহারী স্বর্গীয় লাবণ্য দেখিলাম, তাহার কি বর্ণনা করিব! এক একটী স্থানের দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, ইহাই বুঝি সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট শোভাপূর্ণ স্থান। কিন্তু যতই অজ্ঞাত অদৃষ্টপূর্ব্ব রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, ততই প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া নয়ন মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে। সত্যসত্যই মনে হইতে লাগিল যেন মায়ারাজ্যে বিচরণ করিতেছি। চারিদিকের অসীম সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে চলিতে সম্মুখের ডাক বাঙ্গালা হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলাম। রাত্রির ঘোর অন্ধকারে চারিদিক্ আবৃত, এমন সময়ে ফিরিবার কথা মনে হইল। এ দিক্ ওদিক্ অন্ধকারে ঘুরিয়া অনেক কষ্টে বাঙ্গালায় পঁহুছিলাম; শীতে শরীর অবশ হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পর দিনের যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত থাকিতে হইল। শীতে এত কম্বল ঢাকিয়াও শরীর গরম হইল না, শীতের তাড়নায় ভাল নিদ্রা হইল না। কখন রাত্রি শেষ হইবে, সেই অপেক্ষায় রহিলাম। রাত্রি থাকিতে যাত্রার ধূম পড়িল। শীতের জন্য নড়িতেও ইচ্ছা হয় না। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া কম্বলে শরীর ঢাকিয়া প্রভাতের অস্ফুট আলোকে আবার গন্তব্য পথে যাত্রা করিলাম। শীতের কথা কি লিখিব, নিঃশ্বাসের সহিত শরীরের অভ্যন্তরে যেন তুষাররাশি প্রবেশ করিতে লাগিল। টোঙ্গাতে এক ভাবে উপবেশন করিয়া শরীর অবশ হইয়া গেল। উচ্চ পর্ব্বতগাত্র হইতে মহাশব্দে নিঝরের ধারা নীচে পতিত হইয়া আকাশপথে বাষ্প উদ্গরণ করিতেছে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। টোঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে একদল আরব-শিশু দৌড়িতে দৌড়িতে অতি সুন্দর স্বরে উর্দ্দু ভাষায় কোরাণের কবিতা আবৃত্তি করিতেছে তাহা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকগণ সুপক্ক আপেল ও নাসপাতি ফল গাড়ার সম্মুখে উপস্থিত করিল। আমরাও আগ্রহের সহিত ক্রয় করিতে লাগিলাম। পয়সাতে ৮।১০টা ফল, তাহাও এমন সুপক্ক ও মিষ্টরসে পূর্ণ যে, কালকাতায় থাকিয়া কখনও তেমন ফল আস্বাদন করি নাই। পাহাড়গুলির গাত্র ঝরণার জলে ধৌত হইয়া গোলাপী বর্ণের স্রোত বহিতেছে দেখিয়া আমোদিত হইলাম। আজ আমাদের টোঙ্গা ভ্রমণ শেষ হইবে। বিতস্তার স্রোতে নৌকারোহণ করিবার কথা শুনিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত দুই পার্শ্বের অতুল সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া চলিলাম। আজ প্রকৃতির যে শোভা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম, কোনও কথায় তাহার বর্ণনা হয় না। দুই ধারের পর্ব্বতরাজী বিবিধ বর্ণের ফুল

পাতায় আচ্ছাদিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে—ঠিক্ যেন একখানা সুন্দর গালিচা বিস্তৃত রহিয়াছে! অতি যত্নেও উদ্যানে যে সকল ফুল জন্মে না, এই পার্ব্বত্য দেশ সেই সকল দুষ্প্রাপ্য কুসুমে বিভূষিত। বিধাতা উদ্ভিদ্ রাজ্যের সকল সৌন্দর্য্য যেন একত্রে সম্মিলিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা কাশ্মীর উপত্যকার যত বিচিত্র দৃশ্য হৃদয়ে আঁকিয়াছিলাম, তদপেক্ষা অনেক গুণে অধিক রমণীয় শোভা দর্শন করিলাম। এ পর্ব্বতের মূল দেশে শস্যভারে অবনত ধান্যক্ষেত্র ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দুই ধারে পুরুষ রমণী উৎসাহের সহিত শস্য কর্ত্তনে ব্যস্ত। তাহাদের পরম লাবণ্যময় মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। পথে প্রকাণ্ড নির্ঝর পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া বেগে গর্জ্জন করিতে করিতে বিতস্তার স্রোতে মিলিত হইতেছে দেখিয়া স্রষ্টার মহান্ ভাবে হৃদয় ডুবিয়া গেল। স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ প্রস্তর ভেদ করিয়া রক্তবর্ণ নির্ঝর-ধারা বহিতেছিল, এ দৃশ্যও দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলাম। যত দূর অগ্রসর হইতেছি, পর্ব্বত-দুহিতা বিতস্তা আমাদের সহযাত্রিরূপে চলিয়াছে। স্থানে স্থানে স্রোত মহাবেগ ধারণ করিয়া পার্ব্বত্যদেশ কম্পিত করিয়া বহিতেছিল। নির্জ্জন রাস্তা ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে নদীর ভীম কল্লোলধ্বনি হৃদয়কে এক অপূর্ব্ব গম্ভীরতার মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিল। ভাবের উচ্ছ্বাসে সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বিজন গহনপূর্ণ স্থান আনন্দে অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নসময়ে ডাক বাঙ্গালায় পঁহুছিলাম। এই বাঙ্গালা নূতন নির্ম্মিত ও নানা প্রকার গৃহসজ্জায় পূর্ণ ছিল। আমরা প্রত্যেক যাত্রী এক একটী ঘরের অধিকার লাভ করিয়া পরম সুখী হইলাম। ক্রমাগত টোঙ্গা আরোহণ করিয়া শরীরের অস্থিগুলি যেন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, বিষম ব্যথায় নড়িতেও কষ্ট বোধ হয়। বাঙ্গলায় পদার্পণ করিয়া যেন নূতন বল লাভ করিলাম। আর যদি টোঙ্গা আরোহণ করিতে না হইত, তবে বাঁচিতাম। বাঙ্গালার চারি দিকেই উচ্চ গিরিমালা আকাশে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান। সমতল ক্ষেত্রের উপর ডাক বাঙ্গালা। সম্মুখে বিতস্তা অবিরামগতিতে চলিয়াছে। স্নানাহারের পর আবার বেড়াইতে বাহির হইলাম এদেশের গৃহগুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ও সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে গঠিত। তুষারপাতের ভয়ে সকল গৃহেরই উপরিভাগ অনুচ্চ ও সমতল। গৃহের উপরিভাগে গমনাগমনের পথ রহিয়াছে। সঙ্কীর্ণ বস্ত্রাবাসের মধ্যেও অনেক লোক সপরিবারে বাস করিয়া থাকে। আমরা তাহাদের গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রন্ধনাদির প্রণালী দেখিয়া বিলক্ষণ আমোদ বোধ করিলাম। দুই এক-জন রুটী উপহারে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইল। অধিকাংশ লোক নিতান্ত দরিদ্র, তথাপি এরূপ আতিথ্যের দেখিয়া হৃদয় মুগ্ধ হইল। বিতস্তার তীরে

অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়াইলাম। এই গিরি-মালাবেষ্টিত রাজ্যের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া নয়ন মন বিমুগ্ধ হইয়া গেল। বিধাতার অনন্ত প্রসারিত রাজ্যে স্বভাবের কতই অদ্ভুত শোভা বিরাজ করিতেছে, তাহা যত ভাবিলাম, মন ততই বিস্ময়-সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। জ্যোৎস্নালোকে বিচরণ করিতে করিতে প্রকৃতির প্রশান্ত গম্ভীর যে শোভা লক্ষ্য করিলাম, তাহা বর্ণনীয় নহে। এ সকল স্থানে তুষার-ব্যাঘ্রের বিলক্ষণ উৎপাত আছে শুনিয়া সত্বর ডাক-বাঙ্গালাতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলাম। শীতের প্রভাবের কথা বলিবার নহে, অনেক গরম বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়াও দাঁতগুলি শীতে ঠক্ ঠক্ করিতে লাগিল। রাত্রিতে শীতের তাড়নায় ঘুম হইল না। অতি প্রত্যুষেই পুনরায় যাত্রার গোলমাল আরম্ভ হইল। (ক্রমশঃ)।

পুরাণকথা—চন্দ্রের কাহিনী

পুরাণে চন্দ্রের শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ বিষয়ে একটী সুন্দর উপকথা আছে পাঠিকা ভগিনীরা ইহা শুনিয়া আমোদিতা হইবেন এবং পুরাণকারদিগের কল্পনা-শক্তি অনুভব করিতে পারিবেন। এই উপকথাটী লিপিবদ্ধ করিলাম।

চন্দ্রদেব পুরুষ দেবতা। রাজর্ষি দক্ষের অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্য্যন্ত সপ্তবিংশতি কন্যা ছিল। আমাদের দেশের কুলীন কুমারীদিগের হৃদয়হীন পিতার মত দক্ষ এই সাতাইশ কন্যাকে, এক চন্দ্রের সহিত বিবাহ দিয়া "কন্যাদায়" হইতে মুক্তি লাভ করিলেন! কন্যাগণকে পতিগৃহে পাঠাইবার সময়ে জামাতা চন্দ্রকে শ্বশুর দক্ষরাজ বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন, যেন এই সাতাইশ ভার্য্যাকে চন্দ্র একই রকম প্রীতি, আদর ও যত্ন করেন। এ রকম উপদেশ পালন করা কত দূর সম্ভব, তাহা আমরা বলিতে পারি না; ভুক্তভোগী মহাশয়দিগের উপরে বিচারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

যাহাহউক শ্বশুরের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া সাতাইশটী সহধর্ম্মিণী লইয়া চন্দ্রদেব গৃহধর্ম্ম পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এ রকম "সার্ব্বভৌমিকতা" চন্দ্রের ভাল লাগিল না। তাই কিছু দিন পরেই তিনি অন্যান্য ভার্য্যাগণকে ভরণপোষণ মাত্র প্রদান করিয়া কেবল রোহিণীকেই জীবন-সহচরী করিলেন—একনিষ্ঠায় অভ্যস্ত হইলেন।

কাজে কাজে পতিত্যক্তা সহোদরাগণ এক-হৃদয় হইয়া, রোহিণীকে দারুণ ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। রোহিণীর মত অধিকার পাইবার জন্য প্রতিকূল স্বামীর নিকটে নানাবিধ দাবি দাওয়া করিতে

লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। চন্দ্রদেব রোহিণী ভিন্ন অন্যান্য স্ত্রীর মুখাবলোকনেও অনিচ্ছুক হইলেন।

তখন উপায়ান্তর অভাবে ছাব্বিশটী ভগিনী একত্র হইয়া পিতার নিকটে গমন করিলেন। পতির প্রতিকূলতা, বিষম পক্ষপাতিতা এবং নিজেদের মনস্তাপ সকল কথাই পিতাকে বলিলেন

তনয়াদিগের দুঃখের কথা শুনিয়া দক্ষ-রাজ দুঃখিত হইলেন; তাঁহারা সকলেই প্রাপ্তবয়স্কা, স্বেচ্ছাচারিণীর মত অকস্মাৎ পিতৃ-গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই জন্য কিছু ভর্ৎসনাও করিলেন। তার পরে তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া চন্দ্রলোকে গমন করিলেন। তৎকালে এই সব যাঁতা-য়াত কিরূপে নির্ব্বাহিত হইত, তাহা পুরাণ-কারেরা কিছুই বলেন নাই।

চন্দ্রমা নিজ শয়ন-কক্ষে বসিয়া প্রিয়তমা রোহিণীর সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতে-ছিলেন; প্রান্তরমধ্যে পান্থ অপ্রত্যাশিত মেঘোদয় দেখিয়া যেমন ভীত ও ক্ষুব্ধ হয়, সহসা শ্বশুরের আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়া দ্বিজ-রাজও সেইরূপ ভীত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। সসম্ভ্রমে রাজর্ষিকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন।

জামাতার পূজা গ্রহণ করিয়া দক্ষরাজ আবার চন্দ্রকে পূর্ব্বানুরূপ উপদেশ দিলেন। চন্দ্রও সে কথা শিরোধার্য্য করিলেন।

দক্ষ বিদায় হইলে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা প্রভৃতি ভগিনীগণ স্বামীর চারি পাশে ঘেরিয়া বসিলেন। কিন্তু চন্দ্রের তাহা ভাল লাগিল না। কিছুক্ষণ পরে অন্য সকলকে ছাড়িয়া রোহিণীর নিভৃত স্থানে গমন করিলেন।

সুতরাং ছাব্বিশটী ভগিনী আবার মিলিতা হইয়া পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং পিতার নিকটে স্বামীর অসদ্ব্যবহারের কথা বলিতে লাগিলেন। জামাতার স্বেচ্ছাচারিতা ও অবাধ্যতায় দক্ষ কুপিত হইলেন; বলিলেন "এবারেও আমি চন্দ্রকে ক্ষমা করিব; চল তোমাদের লইয়া আর একবার তাহার নিকটে যাই।"

দক্ষ কন্যাগণসহ চন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলে চন্দ্র অধিকতর শঙ্কিত হইলেন। শ্বশুরের প্রীতি-কামনায় অধিকতর যত্নে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তখন রাজর্ষি কিছু রুক্ষ ভাবে জামাতাকে দোষের কথা বলিলেন; ভবিষ্যতে তাঁহাকে যেরূপ সাবধান ও সতর্ক হইতে হইবে তাহা শিখাইয়া দিলেন এবং এবারে এই সকল কথার অন্যথা করিলে চন্দ্রের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে, তাহাও বুঝাইলেন। শ্বশুরের সমস্ত কথাই চন্দ্রদেব অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

রাজর্ষি চলিয়া গেলে কয়েক দিন পর্য্যন্ত শশধর তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেন। অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি স্বামীকে পাইয়া পরম সৌভাগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু বহুপত্নীক হইয়া জীবন যাপন করা চন্দ্রের প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইয়াছিল; তাহাতে রোহিণীতেই তাঁহার হৃদয় মুগ্ধ; এরূপ অবস্থায় যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল!—

চন্দ্রদেব আবার সকল ভার্য্যাকে ছাড়িয়া রোহিণীরই "নিজস্ব" হইয়া পড়িলেন।

পতিত্যক্তা ভগিনীগণ দুঃখ, ক্রোধ ও হিংসায় অধীরা হইলেন। একদিন ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, মঘা, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, উত্তর-ভাদ্রপদ এই নয় সহোদরা রোহিণীকে একাকিনী পাইয়া, বহুবিধ কটু বাক্য বলিয়া অবশেষে নির্ম্মম প্রহার করিতে লাগিলেন। প্রকৃত পক্ষে রোহিণী দোষী কি না—বিশেষতঃ রোহিণী এতাদৃশী শাস্তির উপযুক্তা কি না, দারুণ বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা তাঁহাদিগকে সে বিচার করিতে দিল না। এই সময়ে সহসা চন্দ্রদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী রোহিণীর প্রতি দারুণ অত্যাচার হইতেছে দেখিয়া যেমন ব্যথিত হইলেন, তদধিক কুপিত হইলেন। সপত্নীগণের হস্ত হইতে রোহিণীকে মুক্ত করিয়া, অত্যাচারিণী ভার্য্যাদিগকে অভি-শাপ দিলেন যে, "পাপীয়সীগণ! তোরা নির্দ্দোষীকে পীড়ন করিয়াছিস্, এই পাপে অযাত্রিক নক্ষত্র হইয়া থাক্। অদ্য হইতে তোদের উদয়-দিনে কেহ যাত্রা প্রভৃতি শুভকর্ম্ম করিবে না।" তদবধি নয় ভগিনী অযাত্রিক নক্ষত্র হইয়া রহিলেন।

স্বামীর নিকট তিরস্কৃতা ও অভিশপ্তা হইয়া নয় ভগিনী অধিকতর উত্তেজিতা হইলেন। ছাব্বিশজনে আবার গোপনে পরামর্শ করিয়া পিতার নিকটে চলিলেন। সেখানে গিয়া পিতার পদতলে পড়িয়া তাঁহারা সকল কথা নিবেদন করিলেন; অবশেষে বলিলেন "পিতঃ! আর আমরা পতিগৃহে যাইব না; তিনি রোহিণীকে লইয়া সুখে থাকুন। আপনি আমাদিগকে একটু আশ্রয় দিলে অবশিষ্ট জীবন আপনার কাছেই কাটাইব।"

তনয়াদিগের কথা শুনিয়া ও অবস্থা দেখিয়া রাজর্ষির আর ধৈর্য্য রহিল না, তিনি ক্রোধে স্ফুরিতাধর হইলেন; সর্ব্বাঙ্গে কাল ঘর্ম্ম ছুটিল; নাসারন্ধ্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; সেই অগ্নি হইতে দ্বিতীয় কৃতান্তরূপ এক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিল।

সেই ভীষণাকৃতি পুরুষ, প্রজাপতি দক্ষকে করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলিল "প্রভো! আমার নাম কি? আমাকে কি জন্য সৃষ্টি করিলেন? আমি এখন কোথায় বাস করিব?" দক্ষ উত্তর করিলেন "তোমার নাম রাজযক্ষ্মা রোগ; তুমি চন্দ্রকে ক্ষয় করিবে। চন্দ্রের দেহে বাস করিতে যাও।"

যক্ষ্মা চন্দ্রের শরীর অধিকার করিল। দিনে দিনে রোহিণী-বল্লভ ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইতে লাগিলেন। রোহিণী প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা করিয়াও পতিকে কিছুমাত্র সুস্থ করিতে পারিলেন না। এ দিকে চন্দ্রের দারুণ রোগ হওয়াতে পৃথিবী ওষধিশূন্য হইতে লাগিল। মুনিঋষিগণ যজ্ঞ করিবার উপকরণ সমূহ মিলাইতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ ধ্যানযোগে সমস্ত অবগত হইলেন।

তখন সকলে একাগ্রচিত্তে রাজর্ষি দক্ষের স্তব করিতে লাগিলেন। চন্দ্র-বিহনে পৃথিবী টিঁকিবে না, একথা রাজর্ষিকে বারংবার বুঝাইয়া চন্দ্রকে আরোগ্য করিতে প্রার্থনা করিলেন। ইহা শুনিয়া দক্ষ শতমুখে চন্দ্রের দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং চন্দ্রের মত পাপাচারীর যে ঐরূপ রোগগ্রস্ত হওয়া উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত, তাহাও বলিলেন।

কিন্তু মুনিঋষিরা নিরস্ত হইলেন না। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ দক্ষকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং চন্দ্রের আরোগ্য ভিন্ন জগৎ ধ্বংস হইবে সেই কথা বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের উপদেশানুসারে চন্দ্রদেবও দক্ষের চরণে পতিত হইয়া মুক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

তখন দক্ষরাজ কথঞ্চিৎ সদয় হইয়া বলিলেন "যদি চন্দ্র এখন হইতে সপ্তবিংশতি ভার্য্যাকে সমভাবে প্রীতি করিতে পারে, যদি কখনও পক্ষপাতিতা না করে, তাহা হইলে রাজ-যক্ষ্মা চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিবে।"

ব্যাধিক্লিষ্ট জীবন্মৃত চন্দ্রমার আর সে তেজ নাই। তিনি পুলকিত-চিত্তে, শপথ পূর্ব্বক দক্ষের বাক্যে স্বীকৃত হইলেন। তখন রাজর্ষি অসিক্নি নদীতে চন্দ্রকে স্নান করাইলেন। স্নানান্তে চন্দ্রের শরীর হইতে যক্ষ্মা বহির্গত হইল এবং আশ্রয় প্রার্থনা করিল। দেবর্ষি মহর্ষিগণ তাহাকে বলিলেন তুমি নরলোকে যাও, সুরাপায়ী, অজিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রবিধি-উল্লঙ্ঘনকারী মানবদিগের দেহ তোমার আশ্রয় স্থান হইল।" যক্ষ্মা প্রসন্ন মুখে চলিয়া গেল।

রোগ-মুক্ত সুধাংশু নিজ দেহে ক্ষীণ জ্যোতিঃ অনুভব করিয়া দক্ষরাজকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দক্ষ উত্তর করিলেন "তোমার পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য আর সে পূর্ণত্ব প্রত্যহ হইবে না। এখন হইতে শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুইটী পক্ষ হইল। শুক্ল পক্ষে চন্দ্রকলা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইবে এবং পূর্ণিমায় পূর্ব্বের মত ষোল কলা সম্পূর্ণ হইবে। আবার কৃষ্ণ পক্ষে চন্দ্রকলা দিনে দিনে হ্রাস হইয়া অমাবস্যায় একেবারে অদৃশ্য রহিবে। বোধ হয় ভয়ঙ্কর যক্ষ্মার তাড়নায় চন্দ্রদেব "দেবত্ব" হারাইয়াছিলেন, তাই নিতান্ত "ভালমানুষের" মত এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। আমাদেরও দুরদৃষ্ট—নহিলে মাসে এক দিন ভিন্ন পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাইলাম না কেন?

যে নদীতে চন্দ্র স্নানান্তে মুক্তি লাভ করিলেন, যাহার তীরে দাঁড়াইয়া দক্ষ চন্দ্রকলার এইরূপ ভাগ করিলেন, সেই নদীর নাম চন্দ্রভাগা হইল।

ইহার পরে সত্য সত্যই চন্দ্র সাতাইশ ভার্য্যাকে লইয়া গৃহধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি যে এক এক ভার্য্যার গৃহে এক এক দিন বাস করিতেছেন, সে কথার সত্যতা পাঠিকা ভগিনী পঞ্জিকা খুলিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা বিদায় হই।　　　শ্রীমা——

পণ্ডিত কে ?

যৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণপূর্ব্বক পুনরায় আপন রাজ্য-প্রার্থী হইলেন এবং সঞ্জয় দ্বারা সকল সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন, তখন তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র অতি বিকল-চিত্ত হইয়া পড়িলেন। নানা দুশ্চিন্তায় তাঁহার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিদুরের সন্ধানে দ্বারীকে পাঠাইলেন। দ্বারী আজ্ঞামাত্র বিদুরকে আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন অন্ধ ভূপতি অতিশয় দুঃখিত ভাবে কহিলেন "বিদুর ! আমার বড় কষ্ট হইয়াছে। সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন, কল্য আবার তিনি সভামধ্যে তাঁহার বক্তব্য সকল বর্ণনা করিবেন। আমি সেই সকল আলোচনাতেই অস্থিরমনা হইয়া পড়িয়াছি। এখন ত যুদ্ধ অনিবার্য্য, জানি না আমাকে কোন্ পাপ আশ্রয় করিয়াছে, যদ্দ্বারা এই কৌরবকুল সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিতে পারিতেছি না। অহে বিদুর ! তুমি আমাকে কিছু হিতবাক্য বল, তুমি এই রাজর্ষি-বংশের মধ্যে জ্ঞানবান্।" বিদুর কহিলেন "মহারাজ ! সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে আপনি অন্ধতাবশতঃ রাজত্বের অনধিকারী হইয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছেন ও তিনি কেবল দয়াধর্ম্মের জন্য এখন এত ক্লেশ সহিয়া বেড়াইতেছেন। ইহা কি মঙ্গলকর ? মহারাজ শ্রবণ করুন্ আমি বলিতেছি রাজ্যপালন ও শাসন পরম পণ্ডিতের কার্য্য। দুঃশাসন দুর্য্যোধন শকুনি প্রভৃতির হস্তে এই বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করা কি মূঢ়তা নহে ? এক্ষণে আমি আপনাকে পণ্ডিতের কি কি লক্ষণ তাহা জানাইতেছি। ঐ সকল গুণগ্রাম যাহাতে থাকে, সেই ব্যক্তি বহুল প্রাণিবর্গের সুখ দুঃখ বিচারের যোগ্য রাজা।

যে পুরুষের আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, যিনি ধর্ম্মে নিয়ত রতি ও তিতিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং অর্থদ্বারা কখনও হীনতা প্রাপ্ত হন না, তিনিই পণ্ডিত নামের যোগ্য। লজ্জা, আত্মাভিমান, ঔদ্ধত্য, রাগ, অহঙ্কার, দম্ভ, সুখ দ্বারা যিনি অনাকৃষ্ট হইয়া অর্থের আদর করেন, তিনিই পণ্ডিত। যাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্ম ও মন্ত্রণা যে পর্য্যন্ত না কার্য্যে পরিণত হয়, তাবৎ গোপনে থাকে, তিনিই পণ্ডিত। যাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যে কিছুতেই কেহ ব্যাঘাত দিতে পারে না, অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে যাঁহার কোন প্রকার ভয় আসক্তি, বৃদ্ধি ক্ষতি বা সুখ দুঃখ জ্ঞান থাকে না, তিনিই পণ্ডিত। যে পুরুষের বুদ্ধি নানা বিষয়ে ব্যাপৃত অথচ ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত, তিনিই পণ্ডিত। বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ শক্তির পরিমাণে কার্য্য করেন, কোন

বস্তুকেই তুচ্ছ মনে করেন না। তাঁহারা সকল বিষয় শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন। তাঁহাদিগকে প্রশ্ন না করিলে উত্তর দেন না ও সম্পূর্ণরূপ না জানিয়া অর্থের পশ্চাদ্বর্ত্তী হন না। বিশুদ্ধ পণ্ডিতেরা অপ্রাপ্য বস্তুর ইচ্ছা করেন না ও নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না এবং উপস্থিত বিপদেও বিচলিত হয়েন না। যে ব্যক্তির কর্ম্ম সম্পূর্ণ নিশ্চিত, কখনও ভঙ্গ হয় না, ও যিনি আপন ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়া বশ্যাত্মা হয়েন, তিনিই পণ্ডিত। পণ্ডিতেরা সদা মহৎ ও সাধু কার্য্য করেন, ঐশ্বর্য্যযুক্ত কর্ম্মের জন্য উদ্যোগী হয়েন, তাঁহাদের পক্ষে যাহা হিতজনক তাহার প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট হয়েন না। পণ্ডিতেরা নিজ-সম্মানে হর্ষযুক্ত ও অপমানে দুঃখিত হয়েন না। যে মনুষ্য সকল কার্য্যে ও সকল বিষয়ে বিজ্ঞ, সেই পণ্ডিত।

যিনি বাক্যকথনে অকুণ্ঠিত অর্থাৎ বক্তৃতাকালে যিনি অবাধে অনর্গল বলিতে পারেন ও লোকসম্বন্ধীয় নানা প্রকার আশ্চর্য্য কথা কহিতে পারেন, তর্কে বিতর্কে প্রতিভাযুক্ত হন, অতি সহজে গ্রন্থের অর্থ করিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত। যাঁহার বুদ্ধি শাস্ত্রের অনুযায়ী ও শাস্ত্র সেই বুদ্ধির অনুযায়ী, তিনিই পণ্ডিত।

যে ব্যক্তি মহানুভবগণকে অসম্মান করেন, নিজে শাস্ত্র-জ্ঞানশূন্য হইয়া গর্ব্বিত হয়েন, দরিদ্র হইয়া উদারচিত্ত হয়েন, নিকৃষ্ট কার্য্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে চাহেন, তিনি মূঢ় নামের যোগ্য। যে ব্যক্তি নিজের অর্থ ত্যাগ করিয়া পরার্থে দৃষ্টি করে ও মিত্রতার অনুরোধে মিথ্যা আচরণ করে, সে মূঢ়চেতা। যাহারা শত্রুকে বন্ধু মনে করে এবং বন্ধুর প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া থাকে, কেবল দোষযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহারাই মূঢ়চেতা। যে ব্যক্তি অনুপযুক্ত কামনা করে ও যোগ্য বিষয়ে নিঃস্পৃহ এবং আপনার অপেক্ষা শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বেষ করে, সেই ব্যক্তি মূঢ় বলিয়া খ্যাত। যে মনুষ্য অলস, দীর্ঘসূত্রী ও সর্ব্বদা সংশয়যুক্ত, যাহার আত্মীয় বান্ধবে প্রীতি নাই ও পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, দেব আরাধনায় ভক্তি নাই, সেই জন মূঢ়।

পণ্ডিতেরা কহেন যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র বিশ্বাস স্থাপন করে ও বিনা আহ্বানে গৃহে প্রবেশ করে, অজিজ্ঞাসিত হইয়া অনেক সম্ভাষণ করে, সেই জন মূঢ়। যে আপনার দোষ অন্যের প্রতি আরোপ করিয়া তাহার নিন্দা করে, অক্ষম হইয়াও ক্রোধ প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি মূঢ়।

বিদুর আরও কহিলেন "হে রাজন্! যে ব্যক্তি নিজ ক্ষমতা না বুঝিয়া অনায়াসে দুর্লভ বস্তু পাইতে ইচ্ছা করে, সেও মূঢ়। যে ব্যক্তি শাসনের যোগ্য নহে, তাহাকে দমন করিতে চাহে ও ধনবিদ্যাহীন নীচাশয় কৃপণ ব্যক্তির ভজনা করে, তাহার অপেক্ষা আর মূঢ় নাই। যিনি সর্ব্ব বিদ্যা বুদ্ধি ও শ্রীযুক্ত হইয়াও অহঙ্কৃত

না হয়েন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। যাহার ধনের অভাব নাই, সে ব্যক্তি যদি পোষ্যগণকে না দিয়া নিজেই উত্তম আহার বিহারে সকল অর্থ ব্যয় করে, তাহার অপেক্ষা মূর্খ কে হইতে পারে? একের দুষ্কর্ম্মে অনেকেই ভুগিয়া থাকে। ভোগ করিলেই কষ্টের অবসান হয় বটে; তথাপি যে করে, সে লিপ্ত থাকে। একটি বাণে একটি পক্ষী হত হইতেও পারে ও না হইতেও পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বুদ্ধিবলে রাজা ও রাজ্য সকলি উচ্ছিন্ন হয়। হে রাজন্! বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারাই মানুষ অকর্ম্ম সুকর্ম্ম করিয়া থাকে। বুদ্ধি দ্বারা সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকারে শত্রু মিত্র ও উদাসীনকে বশীভূত করুন্। একমাত্র বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যা অকার্য্য স্থির করা এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি জয় করিয়া অমাত্য, সুহৃদ্, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল এই ছয়টি বিশেষরূপে জানিয়া আর স্ত্রী, দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া, পান, কটুবাক্য, কঠোর দণ্ড ও অর্থ দূষণ এই সাতটি পরিত্যাগ করিয়া সুখী হউন।

শ্রীনি—দেবী।

।৽

আমাদের জ্ঞান নাই বলিয়া কি ধর্ম্মকেও পরিত্যাগ করিব? না কখনই না। আসুক না শত সহস্র বিপদ্, তাহা অক্লেশে অতিক্রম করিয়া যাইব। ধর্ম্মরূপ পর্ব্বতের গুহায় যে আশ্রয় লইয়াছে, বাহিরের ভীষণ ঝটিকা তাহার কিছুই করিতে পারে না। আইস, ভগ্নীগণ, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি। তিনি আমাদিগকে পাপের হাত হইতে রক্ষা করিয়া অমৃতময় পরমেশ্বরের ক্রোড়ে লইয়া যাইবেন। যে ধর্ম্মকে রক্ষা করে, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। আমরা সকলেই এক পরলোকের যাত্রী, এখানে আমাদিগকে কোথাও যাইতে হইলে, যেমন পাথেয় সংগ্রহ করিয়া তবে পথ চলিতে হয়, সেইরূপ আমাদিগের পরলোকের জন্য ধর্ম্মধন সংগ্রহ করি। আমাদের যাহার যতটুকু সাধ্য, ততটুকু করিয়া ধর্ম্মধন সঞ্চয় করি। আমরা যদি প্রতিদিন একটি করিয়া পয়সা রাখি, তবে এক বৎসরে ৫৷৶৹ হইয়া থাকে। আমাদের যতদিন জীবন আছে, ততদিন যদি অল্প অল্প করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করি, তবে কি মৃত্যুকালেও ৫৷৶৹ হইবে না? নিঃসম্বল যাওয়া অপেক্ষা তাহা কি ভাল নয়? আমার কিছুই হইল না বলিয়া হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলার ন্যায় অযতন করিলে আর কি হইবে? আশায় বুক বাঁধিতে হইবে। ঈশ্বর ধর্ম্মরূপ হস্ত বাড়াইয়া পাপী তাপীকে ডাকিতেছেন। আমরা যদি মা'র হাত ধরি, মা'র ডাক শুনি, তবে নির্ভয়ে এ দুর্গম পথ অতিক্রম

করিতে পারিব। সংসারের কোলাহল হইতে একটু নির্জ্জনে যাইলে মা'র ডাক আরও স্পষ্ট শুনিতে পাইব। আজ হইতে আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরা ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিব না—ধর্ম্মেরই আশ্রয় লইব। ঈশ্বর আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দিন, তিনি আত্মাতে শান্তি, মনে আনন্দ, ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল প্রদান করিতেছেন। তাঁহার অপার দয়া ও করুণা স্মরণ করিয়া, আমরা যেন প্রতিদিন তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দেই। ধর্ম্মকে আমরা রক্ষা করি, ধর্ম্ম যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন।

হে পরমাত্মন্! এই বিশাল জগতে অগণ্য গ্রহনক্ষত্র সকল নিয়ত ভ্রাম্যমাণ হইতেছে—সকলেই তোমার নিয়মরজ্জুতে বদ্ধ রহিয়াছে। কি জড়পদার্থ, কি চেতন, সকলেই তোমার অধীন ও তোমার নিয়মে চালিত হইতেছে, কেহ কাহার গতি অতিক্রম করিতে পারে না; দেব! ধন্য তোমার মহিমা, ধন্য তোমার রচনা-কৌশল! ক্ষুদ্র জীব আমি তোমার সৃষ্টি-রহস্য কি বুঝিব? ও তোমাকেই বা কি করিয়া ধারণা করিব? তোমাকে জানিবার ক্ষমতা আমার নাই। বাক্য তোমায় বলিতে গিয়া পরাস্ত হয়; মন তোমাকে মনন করিতে গিয়া নিবৃত্ত হয়। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই তোমাকে জানা যায়, কিন্তু আমার সে জ্ঞান কোথায়? দয়াময়! তোমায় জানি না, কিন্তু ক্ষুদ্র হৃদয়ে তোমাকে পাইবার আশাটুকু আমি সযত্নে পোষণ করিতেছি, এই আশাই আমাকে জীবিত রাখিয়াছে। আমি সতত ভয়ে ভয়ে সারা হই, পাছে আমার এই আশালতার মূলচ্ছেদন করিয়া ফেলি। তাই অকিঞ্চন সলিল সেচন করি, পাছে শুষ্ক হইয়া যায়। আমার আর কি আছে? এই আশাকেই বক্ষে ধারণ করিয়া কত সন্তর্পণে জীবন-সংগ্রামে চলিতেছি। যখন জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া পড়ি, তখন আশাই আমাকে বলে উঠ, চল; তিনি পাপীর বন্ধু, তুমি তাঁহাকে পাইবে; তখন আমার প্রাণে বল আসে। কিন্তু আশা মাত্রেই কি শেষ হইবে? না তোমায় পাইব? দয়াময়, কি ব'লে তোমায় সম্বোধন করিলে আমার হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিবে? তাহা আমি জানি না, এমন ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। দয়াময়, আমি মূর্খ, আমার বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, আমি শুনিয়াছি, তোমাকে উপলব্ধি করিবার জন্য বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন করে না। তুমি কেবল মনুষ্যের ব্যাকুলতা দেখ। আমার হৃদয়কে তোমার জন্য ক্রন্দন করিতে শিখাও, আমার পাপ-কালিমা তোমার প্রেমনীরে বিধৌত করিয়া লও। আমাদের উপর তোমার করুণা বর্ষিত হউক। তুমি আমাদের সকলের আত্মার কল্যাণ বিধান কর, তুমি আমাদের হৃদয়ে প্রেমের রাজ্য স্থাপন কর, জগতে শান্তি সংস্থাপিত হউক—এই তোমার চরণে প্রার্থনা

ইন্দিরা দেবী।

নবীন-ভারতী

একজন মানুষের এক ভূত চাকর জুটিয়াছিল। সে ক্ষণেকের জন্যও স্থির নয়—কেবল বলে "কাজ দেও, কাজ দেও, কাজ দেও।" প্রভু যে কাজ দেয়, তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিয়া আবার বলে কি করিব? মনিবের সহিত চাকরের এই বন্দোবস্ত ছিল যে, সে কোনও বেতন লইবে না, কিন্তু কাজ না পাইলে মনিবের ঘাড় ভাঙ্গিবে। কাজ করিয়া একটু ফুরসুদ পাইলেই মনিবের ঘাড় ভাঙ্গিতে আইসে, মনিব আবার একটা ফরমাস করেন। কিন্তু ভূতকে কত কাজ দিবেন? চতুর প্রভু শেষে একটা উপায় ঠাওরাইলেন। উঠানে একটী খুঁটী পুতিলেন এবং বলিলেন "দেখ ভূত, তোমাকে একটী কাজ দিতেছি, কখনও বসিয়া থাকিতে পারিবে না—এই খুঁটীর গোড়া ধরিয়া বাহিয়া ইহার মাথার উপর উঠিবে, আবার তথা হইতে নামিবে; আবার উঠিবে, আবার নামিবে; আবার উঠিবে; আবার নামিবে—এইরূপ ক্রমাগত করিতে থাক; যতক্ষণ না থামিতে বলি, থামিবে না।" ভৃত্য ভূত তাই করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং দেখিল তাহার কাজ আর ফুরায় না। সে ক্রমে দ্রুততর বেগে উঠে নামে। অবশেষে তাহার অস্থিরতা গিয়া সে সুস্থির হইল এবং মনিবের চিরবাধ্যতা স্বীকার করিল।

মানুষের মন এই ভূত, সর্ব্বক্ষণ চঞ্চল এবং কিছুতেই সুস্থির ও বশীভূত হইতে চায় না। কিন্তু ঈশ্বরের নাম লইয়া মূলাধার হইতে সহস্রারে + ক্রমাগত উঠিতে নামিতে যদি তাহাকে অভ্যস্ত ও রত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মন সুস্থির ও বশীভূত হয়। মনকে স্থির করিতে পারিলেই প্রকৃত সাধনা আরম্ভ হয় এবং সেই সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়।

"মন্ত্রের স্বরূপ হন অখিলের পতি,
সেই মন্ত্র সিদ্ধ করলে একধাম প্রাপ্তি

+ যোগীদিগের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সুষুম্না নাড়ী আছে, তাহার মূল নিম্নে মূলাধারে এবং অগ্রভাগ মস্তিষ্কে; সেখানে সহস্রারে বা সহস্রদল পদ্মে পরমাত্মা বিরাজমান। এই সহস্রারে স্থিতি করিতে পারিলে ব্রহ্মযোগ ও ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হয়।

* স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র রায় একজন ভক্ত-সাধু ছিলেন। তিনি যুবাবয়সে যে ঈশ্বর সাধন আরম্ভ করেন, প্রৌঢ় বয়সে অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহাতেই আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। তিনি লোক-চক্ষুর অগোচরে গভীর আধ্যাত্মিক ভক্তিযোগ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া ক্রমে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। অদ্য নমুনাস্বরূপ একটী দেওয়া গেল।

রামায়ণের অবতরণিকা।

জগদ্‌গুরু ভারতীয় ব্রহ্মর্ষিগণ জগতের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের জন্য যে সকল উপদেশশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত ;—জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ড আত্মা, কর্ম্মকাণ্ড শরীর। সমঞ্জস ও অখণ্ড ভাবে এই দুই কাণ্ডের সংযোগই সনাতন ধর্ম্ম। সনাতনধর্ম্ম-মূলে এই বিরাট বিশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত। কালপ্রবাহে মানবকুলের ক্রমশঃ বিস্তার ও বৈচিত্র্য অনুসারে শাস্ত্র-সকলও ক্রমশঃ বিস্তার ও বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহের নাম বেদ। বেদ প্রথমে ঋক্ হইতে আরব্ধ হইয়া ক্রমশঃ ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব—চারিভাগে বিস্তৃত হয়। অনন্তর উহাতে বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যোজিত হয়। পরে দৃষ্ট হইল,—শুধু ঐ সকল বেদশাস্ত্রে লোকের অভাব মিটিতেছে না বহুকালব্যাপী কঠোরতম সাধনা এবং তদনুরূপ আচার্য্যলাভ বিনা বেদোদিত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য বেদশাস্ত্র সকল যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি কতিপয়মাত্র যোগীর নিজস্ব হইয়া রহিল। কিন্তু ভূতভাবন ঈশ্বরের এমন ইচ্ছা নয়, যে, তাঁহার কেবল কতিপয়মাত্র সন্তান আত্মোন্নতি লাভ করিবে, এবং আর সকলেই উন্নতির বাহিরে পড়িয়া থাকিবে। মানবসাধারণের পূর্ণ উন্নতি বিনা তাঁহার বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের আশা নাই। মনুষ্য নিজে উন্নত হইয়া অন্যান্য জীবমণ্ডলীর কল্যাণসাধন করুক, বিশ্ববিধাতা এই ইচ্ছায় মানবাত্মায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দিয়া মানবকে শ্রেষ্ঠ জীব করিয়াছেন। অতএব মানবের আত্মোন্নতির অভাব, সর্ব্বজীবের পক্ষে ঘোর অকল্যাণ।

জগদীশ্বর জগতের অভাব সর্ব্বকালেই নিবারণ করেন। বেদ-সংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র যদি কতিপয় পাত্রমধ্যে নিবদ্ধ রহিল, তবে মানবসাধারণের উন্নতির উপায় কি? মন্ত্র-ব্রাহ্মণ-সূক্ত-সূত্রাদি আকারে প্রদত্ত উপদেশ গ্রহণ ও ধারণ করিতে ত সাধারণে সমর্থ নহে। তবে এ অভাবের পূরণ কিরূপে হইবে? বিশ্বজনীন চরিত্রের পূর্ণ আদর্শ বিনা বিশ্ববাসীর চরমোন্নতি হইতে পারে না। সেই পূর্ণ আদর্শ একমাত্র ঈশ্বর। নিরাকার ঈশ্বর ত কাহারও অনুকরণীয় নহেন। সহানুভূতি না হইলে অনুচিকীর্ষা হয় না। সহানুভূতি সজাতীয়মধ্যেই অধিক উন্মেষিত হয়। এজন্য মানবের সহানুভূতি মানবের প্রতি অধিক। মানব আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানবের চরিত্রই অনুকরণ করে। অতএব মনুষ্যলোকের জন্য মনুষ্যরূপী পূর্ণ আদর্শ চাই, এবং সে আদর্শের মূর্ত্তিটী ও তদনুরূপ হওয়া চাই। তখন করুণাময় সর্ব্বশক্তি-

মানের ইচ্ছায়, স্বয়ং সনাতন-কর্ত্তব্যপালন-ধর্ম্ম, বিশ্ব-জীবন-বিমোহন আকারে মূর্ত্তিমান্ হইয়া, রামরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। অকস্মাৎ ত্রিলোকীর অন্তস্তল ভেদ করিয়া জয়ধ্বনি উঠিল। দুষ্টের আসন টলিল, শিষ্টের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল।

সর্ব্বগুণাকর, ধর্ম্মসেতু রামচন্দ্র যখন সর্ব্বকর্ত্তব্যের পূর্ণ আদর্শরূপে প্রস্ফুটিত হইলেন, তখন জগৎপাবন রামচরিত্র যুগযুগান্তরের মানবের কল্যাণের জন্য অক্ষয় অমৃতময় অক্ষরে লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগদীশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জগতের কোনও অভাবই রাখেন না, এবং তাঁহার কোনও কর্ম্মই অসম্পূর্ণ রাখেন না। তাই তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণব্রহ্ম। সেই করুণাময়ের ইচ্ছা, অচিন্তনীয় ঘটনাসূত্রে মহর্ষি বাল্মীকির হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। তখন বাল্মীকিরূপ ব্রহ্মা হইতে সর্ব্বলোকের সম্পূর্ণ উপযোগী —রামায়ণরূপ দ্বিতীয় বেদের আবির্ভাব হইল।

"বেদবেদ্যে পরে পুংসি জাতে দশরথাত্মজে।
বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাদ্রামায়ণাত্মনা॥"

(রামানুজ)

পরমাত্মা-নামে যিনি বেদেতে বিদিত,
রামরূপে ভবে তিনি হইলে উদিত—
নব বেদ রামায়ণ ভবের বৈভব,
মহর্ষি-বাল্মীকি-কণ্ঠে হইল উদ্ভব।

রামের জীবন বুদ্ধ-খৃষ্ট-চৈতন্যাদির ন্যায় সন্ন্যাসীর জীবন নহে, সর্ব্বলোকের অনুকরণীয় আদর্শভূত গৃহস্থ-জীবন। যোগী সন্ন্যাসীরা গৃহিগণের মঙ্গলার্থে অনেক উপদেশ রাখিয়া যান বটে, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া নিজ নিজ চরিত্রে সে সকলের দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান না, এজন্য তাঁহাদের উপদেশ, অমূল্য হইলেও তাদৃশ ফলোপধায়ক হয় না। দেখ! মনুর দশটী ধর্ম্ম-লক্ষণ এবং খ্রীষ্টের দশটী আদেশ চিরকাল কেবল বচনেই রহিয়া গেল। সংসারক্ষেত্রে নামিয়া এবং সকলের অন্তর্গত হইয়া প্রতিপদে পুণ্যময় চরিত্রের প্রভাবে রামচন্দ্র সকলকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই রামের সিংহাসন জগতে "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" প্রতিষ্ঠিত, এবং ত্রিভুবনে অতুলনীয় বলিয়া, রামরাজ্য "রামরাজ্য"—নামেই ধর্ম্মরাজ্যের একমাত্র উপমা। 'রামায়ণ'—শব্দের অর্থ—রামচরিত, ইহা বেদ-কোরাণ-বাইবেল প্রভৃতির ন্যায় বাচনিক উপদেশশাস্ত্র নহে। কর্ত্তব্যপরম্পরাই মানবজীবন, এবং সামঞ্জস্যরূপে অর্থাৎ পরস্পর অবিরোধী ভাবে সমস্ত কর্ত্তব্য পরিপালনই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা ও পূর্ণতা, এবং উহাই সচ্চিদানন্দধামের সুপ্রশস্ত সোপান। রামচরিত রামায়ণে ভগবান্ বাল্মীকি অমৃতলোকের সেই সোপান-পংক্তি স্তরে স্তরে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। অতএব বাল্মীকির রামায়ণ জগতের সর্ব্বোত্তম ধর্ম্মশাস্ত্র।

সর্ব্বকর্ত্তব্যপালনের পূর্ণ মূর্ত্তি রামচন্দ্র সর্ব্বসাধারণের সমান সম্পত্তি হইলেও,

সেই মহাসাগরে (১) একেবারে প্রবেশ লাভ করা দুর্ব্বলের পক্ষে সহজ নহে। অতএব নিতান্ত দুর্ব্বল অধিকারীরাও যাহাতে সেই মহীয়ান্ আদর্শ-সাগরে অনায়াসে প্রবেশলাভ করে, তজ্জন্য অসংখ্য প্রবেশ-মার্গ রামায়ণে দেখিতে পাইবে। সে পথগুলি এমনি আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত, যে, প্রত্যেকটীর সঙ্গেই সেই মহাসাগরের অপূর্ব্ব সংযোগ। যেমন সমুদ্রে গিয়া পড়িতে হইলে, অগ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল, বিল, নদ, নদী দিয়া মহানদীতে প্রবেশ করিতে হয়, অনন্তর মহানদী দিয়া, ক্রমশঃ আয়ত হইতে আয়ততর পথে সমুদ্রগামী হইতে হয়, রামায়ণের রামানুগত এক একটী চরিত্রও সেইরূপ। লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, জনক, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, সুমন্ত্র, ভরদ্বাজ, গুহক-চণ্ডাল, হনুমান্, সুগ্রীব, জটায়ু, লব, কুশ, প্রভৃতি পুংচরিত্র, এবং সীতা, সুমিত্রা, অনসূয়া, লোপামুদ্রা, শ্রমণা, ত্রিজটা প্রভৃতি স্ত্রীচরিত্র রাম-সাগরের এক একটী সরণী। এই সকল সরণী অতি দুর্ব্বল মানবের পক্ষেও সুগম। একটী সরণী আর একটীর সহিত, আর একটী অপরটীর সহিত—এইরূপে সকলগুলিই পরস্পর অনুগত ও সুসংযুক্ত। কেন না, কর্ত্তব্য-মাত্রই সনাতন-ধর্ম্ম-মূলক হওয়ায়, পরস্পর সজাতীয় এবং অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুবর্গের ন্যায় অতি মধুরভাবে মিলিত। মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, জ্যেষ্ঠভক্তি, পতিভক্তি, প্রভু-ভক্তি, দাম্পত্য প্রেম বন্ধুবাৎসল্য, দীন-কারুণ্য প্রভৃতি পবিত্র প্রেমমাত্রই সেই অদ্বৈত প্রেমসাগরের ভিন্ন ভিন্ন বিবর্ত্ত। মাতৃভক্তি, পতিভক্তি প্রভৃতির যেটী ইচ্ছা অবলম্বন করিয়া চল, ক্রমে অন্যান্য ভক্তিও আপনা আপনি আসিয়া তোমাতে মিলিত হইবে, এবং শেষে তুমি সর্ব্বভক্তির পূর্ণ আধার প্রেমসাগর ভগবানে গিয়া পঁহুছিবে। (২)

পক্ষান্তরে, মন্থরা, কেকয়ী, শূর্পণখা প্রভৃতি স্ত্রীচরিত্রের, এবং রাবণাদি পুং-চরিত্রের ভীষণতার পরিমাণ যেরূপ, উহাদের উপযোগিতার পরিমাণও সেই-রূপ। পাপের সজ্ঘর্ষণ বিনা পুণ্যের জ্যোতি ফোটে না। তাই ও সব ভীষণ চরিত্র রামায়ণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শাণযন্ত্রের সজ্ঘর্ষণ বিনা কি হীরকের প্রকৃত জ্যোতি স্ফুরিত হয়? যদি কৈকেয়ী না থাকিত, তবে রামের সৌন্দর্য্য কি অত ফুটিত? অশোকবনে

(১) যেরূপ অসংখ্য নদীনদাদির একাধারে সংস্থিতি ও পরিণতি—মহাসাগর, সেইরূপ অসংখ্য কর্ত্তব্যের একাধারে সংস্থিতি ও পরিণতি—রামচন্দ্র। এজন্য রামচন্দ্র মহাসাগর।

(২) যদি কেহ বলে,—আমার আছে, মাতৃভক্তি নাই, অথবা আমার সোদর-স্নেহ আছে, সোদরা-স্নেহ নাই। ইত্যাদি বিসদৃশ কথা কেহ বলিলে, বুঝিও যে, তাহার কাহারও প্রতি প্রকৃত ভক্তি বা স্নেহ নাই। সে যাহাকে ভক্তি বা স্নেহ বলিতেছে, সে স্বার্থের আকর্ষণ মাত্র। যথার্থ ভক্তি ও স্নেহ থাকিলে, তাহা ভক্তিভাজন ও স্নেহাস্পদমাত্রেই সঞ্চারিত হয়।

লোমহর্ষণ অত্যাচারে নিযুক্ত—ভীষণ রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা সীতাকে যত সুন্দরী দেখিয়াছি, তাঁহার তত সৌন্দর্য্য অযোধ্যায় দেখি নাই। অযোধ্যার সীতা নির্ম্মল আকাশের চন্দ্রমা, অশোকবনের সীতা কৃষ্ণমেঘমালায় বেষ্টিত চন্দ্রমা; কাহার সৌন্দর্য্য অধিক? কষ্টি পাথরে স্বর্ণরেখার ন্যায় এবং কাল-মেঘে বিদ্যুল্লতার ন্যায় ঘোরতর পাপের ক্ষেত্রেই ধর্ম্মের প্রকৃত প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাইবে। যে কেকয়ীকে একদিন নিষ্ঠুরার একশেষ দেখিয়াছি, তাহাকেই শেষে কোমলতার মূর্ত্তি ও রামগতপ্রাণা দেখিলাম। যে রাক্ষসগণকে একদা রামের ঘোর শত্রু ও নর-বানর-কুলের সংহারে নিযুক্ত দেখিয়াছি, শেষে তাহাদিগকেই নর-বানরের সহিত মহাপ্রেমে মিলিত হইয়া রামের জয়ধ্বনি করিতে দেখিলাম। রামের গুণে শিলাও মানবী হইল, কাষ্ঠও স্বর্ণ হইল, চণ্ডাল-চণ্ডালীও দেবতা হইল। অবশেষে তিনি কোটি কোটি জীবকে মুক্তিদান করিলেন, এবং ভবিষ্যৎ মানববংশের উদ্ধারের জন্য ভব-সাগরে অক্ষয় ধর্ম্ম-সেতু রাখিয়া গেলেন। জগৎপাবন রামচরিত্রের এমনি প্রভাব! টীকাকার রামানুজস্বামী সত্যই বলিয়াছেন;—

"বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা রাম-সাগর-গামিনী।
পুনাতি ভুবনং কৃৎস্নং রামায়ণমহানদী॥"

—বাল্মীকি-হিমাদ্রি হ'তে হ'য়ে প্রবাহিত,
শ্রীরাম-সাগরে যাহা হইল মিলিত,
সুরধুনী-রূপী সেই ত্রিলোক-পাবন—
রামায়ণ বিশ্ববাসী জীবের জীবন।

(ক্রমশঃ)

বামাবোধিনীর জন্মোৎসব সম্মিলন

গত ২১এ ভাদ্র শনিবার ৯নং আণ্টনি-বাগান ভবনে বামাবোধিনীর শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে একটী বন্ধু-সম্মিলন হয়, তাহাতে বামাবোধিনীর লেখক লেখিকা এবং শুভানুধ্যায়ী কতকগুলি বন্ধু উপস্থিত হন। প্রথমে একটী ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইলে সম্পাদক বামাবোধিনীর প্রতি ভগবানের করুণার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ইহার উন্নতি ও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। পরে তিনি বামাবোধিনীর জন্ম হইতে গত ৩৯ বৎসর জীবনের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু বামাবোধিনীর উন্নতি সাধনের জন্য কয়েকটী প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইল এবং তিনি স্ত্রীলেখিকার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ „মোহিনীমোহন এবং বামাসুন্দরী পারিতোষিক নামে ৫টাকা করিয়া বৃত্তি দুইটী প্রদান করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা হইল। বামাসুন্দরী-

পারিতোষিক সুভাষিণী দেবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভিক্টোরিয়া পারিতোষিক-রচনা কণ্ড হইতে "মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবন হইতে কি কি শিক্ষা লাভ করা যায়" এই বিষয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য ১০ টাকা পারিতোষিক মেদিনীপুর-নিবাসিনী শ্রীমতী ক্ষীরদকুমারী দেবীকে প্রদান করা হইয়াছে, ইহাও জানান হইল।

অতঃপর শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় যথাবিধি স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বক বামাবোধিনীর মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা যাহাতে বামাবোধিনীর লেখা সম্পন্ন হয়, এ বিষয়ে শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন এবং প্রাচীনা হিন্দুনারীদিগের গুণ-ব্যাখ্যা করিয়া পুরাণ সকল হইতে কত হিতকর প্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে, তাহা সবিস্তর বর্ণন করেন। তিনি রামায়ণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখিকাকে তাঁহার প্রচারিত সমুদায় পুস্তকের এক এক খণ্ড ও ২০৲ টাকা পারিতোষিক দিবার অঙ্গীকার করিলেন। কবিরত্ন মহাশয়ের বক্তৃতার মর্ম্ম স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

অবশেষে কিঞ্চিৎ জলযোগ হইয়া সম্মিলনের কার্য্যশেষ হইল।

এই সভার প্রস্তাবানুসারে বামাবোধিনীর স্থায়িত্ব ও উন্নতির সহায়তার জন্য একটী সমিতি স্থাপিত হইল। নিম্নলিখিত মহিলা ও মহোদয়গণ তাহার সভ্য। আবশ্যক মত সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে :—

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু
ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীমতী মানকুমারী বসু
" নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী
" হেমলতা রায়
" শান্তশীলা মজুমদার
" অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত
" সরোজকুমারী দেবী
" কাদম্বিনী দেবী
" নিস্তারিণী দেবী
" সুশীলাবালা সিংহ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন
শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ
" " গোবিন্দচন্দ্র বসু
" " শরদিন্দু বিশ্বাস বি এ
" " বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি, এল
" " নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস
" " মন্মথনাথ সিংহ
" " সত্যপ্রিয় দত্ত
" " নৃত্যগোপাল সরকার
" " উমেশচন্দ্র দত্ত—সম্পাদক।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু।

ভারতের সুসন্তান প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর নাম সভ্য জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সমাজে পূজিত হইতেছে, ইহা ভারতবাসীর পক্ষে সামান্য

গৌরবের বিষয় নয়। ইনি বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য্য গবেষণা-বলে ইংলণ্ডের বিদ্বজ্জনসমাজে যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাহার সুসংবাদ সময় সময় আমরা বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণকে অবগত করিতে ত্রুটি করি নাই। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু বিলাতের বৈজ্ঞানিক সভায় নিজের উদ্ভাবিত বিজ্ঞানের অদ্ভুত প্রক্রিয়া প্রদর্শনার্থে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ক্রমান্বয়ে দুইবার সস্ত্রীক ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়া পতিত বাঙ্গালী জাতিকে গৌরব-মঞ্চে যেরূপ উন্নত করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যেক বঙ্গসন্তান তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিবেন। তারবিহীন (wireless) তাড়িত বার্ত্তা প্রেরণ সম্বন্ধে ডাক্তার বসু প্রথম বার বিলাত যাত্রা করিয়া লণ্ডন নগরীর বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্দের সমক্ষে প্রতিপন্ন করেন যে, বিনা তারে সমুদ্রের পরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্তও অনায়াসে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ধন লাভ ইহাঁর উদ্দেশ্য থাকিলে ইনি এই সকল অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়াবলে বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিতেন। এক অসীম শক্তি চেতন ও জড় জগতে সমান ভাবে কার্য্য করিতেছে, ডাক্তার বসু এই আশ্চর্য্য ভাব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলে প্রতিপন্ন করিয়া সভ্যজগতের সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন। মানব নিয়মের আকর্ষণে অনন্তের চরণাশ্রয় করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে, ডাক্তার বসু অকাট্যরূপে এই মহান্ সত্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "সাধনাতেই সিদ্ধ" এই মূল মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ইনি তন্ময়চিত্তে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর তত্ত্ব আবিষ্কার জন্য দিবানিশি ব্যস্ত। বাহ্য বিষয়ে তিনি একপ্রকার জ্ঞানরহিত বলিলেই হয়। প্রতিভার আকর বঙ্গের খ্যাতনামা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা ১০৫ ডিগ্রী তাপ বিশিষ্ট ভয়ানক উত্তপ্ত দিনে বিনা পাথায় তাঁহাকে বিজ্ঞানের গবেষণায় গভীরভাবে মগ্ন দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে গাহিয়াছিলেন, "ভারতের কোন্ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি? হে আচার্য্য জগদীশ!" পাঠক পাঠিকাগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, ভারতের এই সুসন্তান বিদেশীদিগের নিকট অসংখ্য সম্মান ও জয়-মাল্য লাভ করিয়া এক মাস মধ্যে মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ইনি শুধু বিজ্ঞানবিৎ নহেন, স্ত্রীজাতির সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য একান্ত ব্যাকুল। আশা করি স্বদেশীয় নর নারী ইহাঁর প্রতি সমুচিত সম্মাননা প্রদর্শনে বিরত হইবেন না।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

(১৩০৮ জৈষ্ঠের বঙ্গদর্শন।)

ভারতের—কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি
তুমি? হে আচার্য্য জগদীশ?
কি অদৃশ্য তপোভূমি বিরচিলে এ সাধনে
নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে!
কোথা পেলে সেই শান্তি! এ উন্মত্ত
জনকোলাহলে?
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্ত্তে বিশ্বের
কেন্দ্রমাঝে দাঁড়াইলে একা তুমি?

এক যথা একাকী বিরাজে—সূর্য্যচন্দ্র
পুষ্পপত্র, পশুপক্ষী—ধূলায় প্রস্তরে'—
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ, নিত্য যথা নিজ—
অঙ্ক পরে দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ
সঙ্গীতে।
মোরা যবে মত্ত ছিনু অতীতের অতি দূর
নিষ্ফল গৌরবে—পরবস্ত্রে—পরবাক্যে
পর ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে—
কল্লোল করিতেছিনু, স্ফীত কণ্ঠে,
ক্ষুদ্র অন্ধ কূপে।
তুমি ছিলে কোন্ দূরে,
আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়েছিলে ?
সংযত গম্ভীর করি মন
ছিলে রত তপস্যায়—অপরূপ
রশ্মি অন্বেষণে—লোক লোকান্তের
অন্তরালে—যেথা পূর্ব্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিয়া
একের সাক্ষাতে দাঁড়াতেন। বাক্যহীন
স্তম্ভিত—বিস্মিত—যোড়হাতে !
হে তপস্বী ! ডাক তুমি সামমন্ত্রে
জলদ গর্জ্জনে—"উত্তিষ্ঠত নিবোধত !"
ডাক শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ড তর্ক হতে।
সুবৃহৎ বিশ্বতলে ডাক মূঢ়
দাম্ভিকেরে—ডাক দাও তব শিষ্যদলে
একত্রে দাঁড়াক তারা—তব হোম-হুতাগ্নি
ঘিরিয়া, আবার এ ভারত আপনাতে
আসুক ফিরিয়া। নিষ্ঠায়—শ্রদ্ধায়—ধ্যানে
বসুক সে অপ্রমত্ত-চিত্তে
লোভহীন—দ্বন্দ্বহীন—শুদ্ধ শান্ত
গুরুর বেদীতে।

নূতন সংবাদ।

১। গত ১৩ই আগষ্ট লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ বারদ্বারীতে স্বর্গীয় মহারাজা মানসিংহের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমের ছোটলাট প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বক্তৃতা করেন, আমাদের ছোট লাটও উপস্থিত ছিলেন এবং তদুপলক্ষে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন। অযোধ্যা-বাসিগণ তাঁহারও একটী প্রতিমূর্ত্তি তথায় স্থাপন করিবার অভিলাষী।

২। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী পূজার ছুটী উপলক্ষে ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এক মাসের রিটর্ণ টিকিট দিবেন

৩। গত আগষ্ট মাসে অনেক স্থানে ভূমিকম্প ও জলকম্প ভিন্ন ভিন্ন দিনে ও সময়ে হইয়াছে। মান্দ্রাজের জ্যোতির্বিৎ একদিনে সমুদয় ভারতব্যাপী যে প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের গণনা ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা সৌভাগ্যক্রমে মিথ্যা হইয়াছে।

৪। গত ৩০এ আগষ্ট মার্টিনিক দ্বীপে পুনরায় আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে মণ্টবুজ নামক স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

৫। বর্ত্তমান্ ইংলণ্ডেশ্বরী অভিষেক অনুষ্ঠানে ভারতীয় শিল্পিনির্ম্মিত গাত্রাচ্ছাদন

ধারণে পরম প্রীত হইয়া লেডী কুর্জনকে লিখিয়াছেনঃ—

"আপনার পছন্দমতে ভারতীয় শিল্পিগণ আমার জন্য যে অভিষেক" পরিচ্ছদ বয়ন করিয়াছিল, কেহ তাহার কোনও খুঁত ধরিতে পারেন নাই, তাহার সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। অভিষেক-স্বরূপ শুভঘটনায় ভারতীয় পরিচ্ছেদ পরিধানে আমার বড় আনন্দ হইয়াছে। আশা করি, আপনি এই সংবাদ ভারতে প্রচার করিবেন।" রাণীজি দীর্ঘজীবিনী ও পরমসুখিনী হউন্।

৬। আগামী কন্‌গ্রেসের সময় আহামিদাবাদে যে শিল্পপ্রদর্শনী হইবে, বরদার মহারাজা তাহার সভাপতি হইবেন।

৭। সুপ্রসিদ্ধ আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশুমোহন কেম্ব্রিজের ট্রাইপো পরীক্ষা ও বারিষ্টারী পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গত ২৪এ আগষ্ট কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

৮। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু ইউরোপের নরওয়ে প্রভৃতি নানাস্থান পরিদর্শন করিতেছেন। তিনি ডবলিনের এক বৈজ্ঞানিক সভায় আহূত হইয়াছেন। আগামী অক্টোবরের প্রথমেই তিনি সস্ত্রীক স্বদেশে প্রত্যাগত হইবেন।

৯। কলিকাতা-হাইকোর্ট ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত পূজোপলক্ষে বন্ধ হইয়াছে। বিচারপতি ষ্টিফেন ও হেণ্ডারসন বন্ধের সময় বিচার করিবেন।

১০। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া অনেক লোক মারা গিয়াছে।

১১। ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস ডোবর নগরের স্বাধীনতা পাইয়াছেন। নগরবাসীরা তাঁহাকে সমারোহে ভোজ দিয়াছে।

১২। জাপানের কিয়েটো ধর্ম্ম-সমিতি আগামী এপ্রেল মাসে হইবে। এই সময় জাপানে পঞ্চম বার্ষিক শিল্পপ্রদর্শনও হইবে। ভারত-প্রতিনিধিগণ যত অধিক যাইতে পারেন, ততই ভাল।

১৩। ষ্টেট সেক্রেটারী ময়ুরভঞ্জ রেলওয়ে নির্ম্মাণ মঞ্জুর করিয়াছেন। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বারিপদ রোড হইতে ময়ুরভঞ্জ রাজধানী পর্য্যন্ত ৩৮॥ মাইল রেল হইবে।

১৪। আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর কুচবেহারের মহারাণী ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন। মহারাজা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আগামী নবেম্বরে আসিবেন।

১৫। সেণ্ট হেলেনা হইতে সেনাপতি ক্রঞ্জি সপরিবারে ও সদলে মুক্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

১৬। আগামী দিল্লী দরবারে বাঙ্গলা দেশের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন :—

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং দুই জন পিউনি জজ, রেভিনিউ বোর্ডের দুই জন সভ্য, পুলিস ইন্সপেক্টর

জেনারেল, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর, বাঙ্গালা প্রদেশের কয়েকজন সম্পাদক, কলিকাতা করপোরেসনের প্রেসিডেণ্ট, চেম্বর অব কমার্স, বাঙ্গালা ব্যাঙ্কের সেক্রেটরি, পুলিস কমিশনর এবং তিনজন রেলওয়ে এজেণ্ট।

১৭। ৯ই সেপ্টেম্বর শ্রীহট্ট-সম্মিলনীর পারিতোষিক বিতরণ ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউট হলে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনরেবল্ ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে দুইটী বালিকা সংস্কৃত ও ইংরাজী কবিতার সুন্দর আবৃত্তি করিয়াছেন।

১৮। ভারতবর্ষীয় রেল সমূহে গত ১৯০১ সালে ১১১৪ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং ৯৭০ জন আহত হইয়াছে।

১৯। দিল্লীদরবারে ইউরোপ খণ্ডের শতাধিক বিখ্যাত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। লর্ড কিচেনার সদলে আসিতেছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। "ধর্ম্ম ও কর্ম্ম"—গত বৈশাখ হইতে প্রতিমাসের পূর্ণিমায় এই নূতন পত্রখানি প্রকাশিত হইতেছে। এরূপ ধরণের পত্রিকা আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার সম্পাদক যেমন ধর্ম্মক্ষেত্রে, সেইরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবীণ অভিজ্ঞ পত্রিকার প্রথমে যে সুন্দর বৃহৎ চিত্রখানি দিয়াছেন, তাহা তাঁহার মানসিক ভাব ও উদ্দেশ্যের বিশদ চিত্র। কল্পবৃক্ষ হইতে ধর্ম্ম ও কর্ম্মরূপ দুই শাখা বিনির্গত হইয়াছে। ধর্ম্মক্ষেত্রে যোগধ্যান পূজার্চ্চনা সংকীর্ত্তন, শিক্ষা, দান ও আতিথেয় ব্যবস্থা এবং নানাবিধ চিকিৎসা দ্বারা "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" তাহার উপায় করা। কর্ম্মক্ষেত্রে—কৃষি, নানাবিধ শিল্প, বাণিজ্য এবং স্বদেশরক্ষার উপায় বিধানার্থ সামরিক বিধিব্যবস্থা। মানবপ্রকৃতি এব মানবসমাজের পূর্ণ আদর্শ ইহাতে অঙ্কিত এই আদর্শানুসারে সমাজ গঠিত হইলে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মিলনে পৃথিবী স্বর্গলোক এবং মনুষ্য দেবতা হইয়া যাইবে। লেখা সরল এবং সাধারণ পাঠকগণের উপযোগী। ধর্ম্মোপদেশ ও সংসার নির্ব্বাহের জ্ঞাতব্য বিবরণ ইহাতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। পত্রখানির মূল্য ৫ এক পয়সা মাত্র। ধনাঢ্য রাজা জমিদার প্রভৃতি এরূপ পত্রিকা বহুসংখ্যক লইয়া দরিদ্র প্রজা প্রভৃতির মধ্যে বিতরণ করিলে তাহাদের অর্থের সার্থকতা এবং পত্রিকার উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা হয়।

২। সঙ্গীত-মুকুল, ৪র্থ সংস্করণ, নীতি-বিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য /১০ আনা। ছোট ছোট বালকবালিকাদের জন্য ইহাতে অনেকগুলি সুললিত পরমার্থ সঙ্গীত এবং কৌতুককর খেলা প্রভৃতির অভিনয় আছে। ইহা যে কতদূর ছেলে-

মেয়েদের প্রিয় হইয়াছে, অল্পকাল মধ্যে ইহার ৪র্থ সংস্করণই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক গৃহে ইহার স্থান হওয়া বিধেয়।

৩। পৌরাণিক কাহিনী—শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু প্রণীত, মূল্য ।• আনা। ইহাতে মহাভারত হইতে সংগৃহীত ১০টী আখ্যায়িকা আছে। বিচক্ষণতার সহিত উপাখ্যানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। লেখা সরল ও বিশুদ্ধ এবং বেশ চিত্তাকর্ষক। পাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিয়া পৌরাণিক অভিজ্ঞতার সহিত অনেক নীতি ও ধর্ম্মের আদর্শ ও উপদেশ সংগ্রহে সমর্থ হইবেন।

বামারচনা।

পূর্ণ চারিবর্ষ।

এস আজি চিরসখে, বৈকুণ্ঠ-নিবাসি!
দেখ আজি মরধামে,
কার প্রাণ তব নামে,
নব প্রেম অনুরাগে আসিয়াছে ভাসি।
নিরখিবে নব ভাবে,
নব ছন্দে, নব রাগে,
তব পুণ্য প্রেমানন, নব বধূ সম;
দেবলোকে দেবপ্রাণ
মাগিছে মর্ত্ত্যের দান
দেবধন বিনিময়ে মরতের ধন।
মর্ত্ত্যের শরীর মন,
হইল কৃতার্থ ধন্য,
লভি দেব প্রেমামৃত বসি মরলোকে;
আজি এই শুভ ক্ষণে,
দোঁহে মিলি এক সনে,
নিরখিব বিভুমুখ, বিভু প্রেমালোকে।
ইহলোক পরলোক পরম দেবতা
মহা পুণ্য—প্রেম-রবি
যে মহা মিলন ছবি
দেখাইলে মরপ্রাণে, যে শুভ বারতা—
স্বর্গ হতে অবতরি,
শুনাইলে কৃপা করি,
কর চির-সঞ্জীবিত তোমারি গৌরবে,
প্রকাশ হে নব নব,
বিশ্বাস মাধুরী তব,
সম্পদের সুখ-নীরে, দুঃখ মহাহবে।
এ জীবনে প্রেমময়,
হোক্ তব ইচ্ছাজয়,
তব প্রেমজ্যোতিঃ-পূর্ণ পুণ্য-অলঙ্কার,
মর্ত্ত্যের মলিন অঙ্গে সাজাও আমার।

শ্রীমতী রেবারায়

পিতৃপদে।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

পূজিতে পিতার পদ কি আছে ধরায়,
ওহেন পবিত্র পদে কিবা দিব হায়!
পিতার চরণতলে,
থাকিব আনন্দে গ'লে,

ধোয়াব চরণ দুটী নয়নের জলে,
এ বিনা কোথায় পাব কি আছে ভূতলে ?
ভক্তিভাবে পিতৃপদে বসি সযতনে,
হৃদয়ের ফুল দিব পিতার চরণে,
কিছু দিতে নাহি আর
পিতৃপদে, তনয়ার,
লও শুধু এই পিতঃ স্নেহ উপহার,
এ বিনা কি দিব পিতঃ কি আছে আমার ?
পূজিয়ে পিতার পদ ভুলি আপনায়,
সংসারে আনন্দ-সুধা পিতার শ্রীপায়,
ধনরত্ন সবি ছার,
পিতার চরণ সার,
মনের বাসনা শুধু পূজিতে চরণ,
তোমার চরণ পূজি জুড়াব জীবন।

তোমার চরণতলে সঁপি এ জীবন,
সস্নেহে বাড়াও পিতঃ পবিত্র চরণ,
স্বর্গসুখ নাহি চাই,
যদি ও চরণ পাই,
ক্ষুদ্র উপহার পিতঃ করিনু অর্পণ,
তুচ্ছ বলি ঘৃণা করি করোনা বর্জ্জন।
পিতার স্নেহের ঋণ কে শোধিতে পারে ?
আশীর্ব্বাদ কর পিতঃ তব তনয়ারে,
তোমার চরণে মন,
থাকে যেন সর্ব্বক্ষণ,
নিত্য নিত্য পূজি তোমা কৃতার্থ হইব,
এ বিনা ধরণী মাঝে কি সুখে থাকিব ?

শ্রীমতী—

বরিষার চাঁদ।

হাসি-মাখা চাঁদ কেন গো মলিন,
একি হেরি আজ নূতন খেলা !
কই সে তোমার ভুবন-ভোলান
পরাণ মাতান লহর তোলা ? ১
কই শশধর ! সরসীর তীরে
কুমুদীর পানে চাহিয়ে সুখে,
ত্যজিয়া সরম হৃদয় খুলিয়ে
হাসি ঢেলে দেওয়া প্রিয়ার মুখে ? ২
যমুনার জলে তালে তালে তালে
লহরে লহরে উজান বয়ে—
বীচিমালা রাশি—পরে ভাসি ভাসি
চলে যাওয়া সেই উধাও হয়ে ? ৩
কোথা চাঁদ আজি সেই জল-খেলা,
সেই সমীরণে ভাসিয়ে যাওয়া ?
কোথা সেই তব মধুর জ্যোছনা,
হাসিতে জগৎ ভরিয়ে দেওয়া—! ৪
তরু-শিরে শিরে পাতায় পাতায়
কই চাঁদ তব জ্যোছনা-কণা ?
কই চাঁদ সেই ঘুমান কোকিল
হাসিয়ে জাগায়ে সে গীত শুনা ?৫
কেন গো চাঁদিমা ঢেকেছ অম্বরে
মধুর ভুবন-ভোলান হাসি !
কেন কিবা দুঃখে আবরি রেখেছ
হে চাঁদিমা ! তব ও রূপরাশি ?৬
অভিমান আজ করেছ কি চাঁদ!
ঢেকেছ কি তাই মধুর হাসি ?
ব্যথা বুঝি মনে পেয়েছ চাঁদিমা
তাই কি ঢেকেছ অমিয়রাশি ?৭
না ;—
নির্ম্মল জ্যোছনা ছড়াইয়ে যবে

হাসিয়ে জগৎ হাসাতেছিলে,
তখন সে দিনে জগতের জনে
দেছে বুঝি ব্যথা 'কলঙ্কী' বলে ?৮
তাই কি লাজেতে বদন আবার
লুকায়েছ হাসি মধুর চাঁদ !
জলদের কোলে আঁধারের ছায়ে
পাতিয়াছ তাই মানের ফাঁদ ?৯
ঢাক ঢাক তব ও মধুর হাসি,
ঢাক ঢাক ঢাক অমিয়রাশি,
আঁধারে মাখান ও রূপের ছটা
দেখিতে হে চাঁদ ! বড় ভালবাসি ॥১০
যদি নভোবাসী ! মানবের মন
দেখিবারে পার দেখাই তোমা,
অমনি আমার প্রাণের জোছনা
মুছে গেছে শুধু জাগিছে অমা !১১
সে আঁধার মাঝে অমনি চাঁদিমা
আছে গো লুকান হৃদয়ে মোর।
তোমারি মতন টিপি টিপি টিপি
ছড়ায়ে জোছনা হৃদয়-চোর ॥১২
তাই শশধর তোমার ও হাসি
বড় ভালবাসি, এসেছি তাই,
প্রাণের মাঝের ও মূরতি খানি
তোমার ছবিতে দেখিয়ে যাই ।১৩
ঘুচিলে বরিষা আসিলে শরৎ
হাসিবে আবার নীলিম-গায়।
ঘুচে যাবে তব বিষাদ-মূরতি,
ভেসে যাবে মনে মিলন-বায়।১৪
কিন্তু সুধাকর ! এই যে আঁধার
এই যে আমার প্রাণের শশী,
আর কি কখন ঘুচায়ে বিষাদে
হাসিবে আবার মধুর হাসি ?১৫

শ্রীমতী ননীবালা দেবী—মজঃফরপুর।

মোহিনীমোহন বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে।

আজি —ঘোর বিষাদের তান
ঢালে হৃদি-বীণা।
দেখে না আশার আলো
মানে না সান্ত্বনা ॥
বৃথাই প্রয়াস হায় !
গাহিতে সুখের গান।
ভাঙ্গা তন্ত্রী ভেদি কভু
উঠে কি মধুর তান ?
এস অশ্রু ! এস আজি
ঘোর কুহেলিকা,
জগত ডুবিয়ে থাক,
আবরণে মুখ ঢাক
ঘন শোক আঁকা।
তুমি গো প্রকৃতি !
শোকার্ত্ত অশ্রুই চায় জগতে এ রীতি।
আজি অশ্রু-মাঝে প্রেমময়ের কিরণ
প্রতিভাত হয় যদি
জুড়াবে জীবন ॥
সহস্র তানেতে গেয়ে বিরহের গান,
যদি শান্তি দেখা পাই,
জুড়ায় এ প্রাণ ॥
কিবা ক্ষতি জগতের ?
গাও হৃদি-বীণা'
বিয়োগের ম্লান গীতি
এস গো সান্ত্বনা।

শ্রীমতী—

Registered No. C, 134

No. 471. November, 1902.

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ। ৪৭১ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩০৯। নবেম্বর, ১৯০২। | ৭ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্তৃক ৯নং আর্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৹, পশ্চাদের বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 471. November, 1902.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ। ৪৭১ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩০৯। নবেম্বর, ১৯০২। | ৭ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গের ছোট ও বড় লাট—ইহাঁরা পীড়িত হইয়াছিলেন, আরোগ্য লাভ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।

ডাক্তার জে, সি, বসু—ভারতের সুসন্তান জগদীশচন্দ্র বসু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার ও প্রচারে পাশ্চাত্য সভ্য-জগতের নিকট খ্যাতি লাভ করিয়া গত ১৩ই অক্টোবর সস্ত্রীক কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। ইহাঁদ্বারা ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। সমুদায় ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসীদিগের নিকট ইনি বিশেষ সম্মানার্হ।

রামমোহন মহোৎসব—গত ২৭ এ সেপ্টেম্বর স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের ৬৯ সাংবৎসরিক স্মরণার্থ উৎসব সিটি কলেজ ভবনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বৃহৎ কলেজ হলে অনেক লোক স্থান পান নাই। এ সভায় সুবিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি আই ই, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজার গুণব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন। আদ্যন্ত রাজার স্বরচিত গীত হইয়াছিল। এই দিবস ভারতের অন্যান্য স্থানেও স্মরণোৎসব হইয়াছে।

আদর্শ দান—বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনী মাণকজী ওয়াডিয়া এক জন ক্রোর-পতি। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল

বিপন্ন লোকের সাহায্যার্থ তিনি আপনার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন। সম্পত্তি কয়েক জন ট্রষ্টীর হস্তে থাকিবে। তন্মধ্যে তিনি স্বয়ং একজন ট্রষ্টী থাকিবেন।

দুর্ঘটনা—(১) নলহাটীর নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রাম জলপ্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক লোক গৃহহীন ও অন্নবস্ত্রের অভাবগ্রস্ত। গবর্ণমেণ্ট ও ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন।

(২) মান্দ্রাজ অঞ্চলে এক নদীর সেতু ভাঙ্গিয়া সমুদায় আরোহি-সহ ট্রেণ জলমগ্ন হইয়াছে। বহুসংখ্যক লোকের শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে।

(৩) ঝড় ও বন্যাতে সিসিলির মডিকা নামক স্থানে বহুলোকের মৃত্যু হইয়াছে—ক্ষতির সীমা নাই। ষ্ট্রম্বলী-আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে—এটনারও হইবার সম্ভাবনা।

(৪) জাপানের ইয়কোহামার নিকট ঝঞ্ঝাবাতে ৫০০ লোক মৃত ও অনেক গৃহ ভগ্ন হইয়াছে।

(৫) পাহাড় ধসিয়া পড়াতে দার্জিলিঙের রেলপথ কয়েক দিনের জন্য বন্ধ হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়াবলি কমিশন—কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় হল, ইউনিবার্সিটি ইনষ্টিটিউট হল ও অন্যান্য স্থানে কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে সভা হইয়াছে। বঙ্গদেশ এবং অন্যান্য প্রদেশের নগরে নগরে এ সম্বন্ধে প্রকাশ্য সভা হইয়া তাহাদের মন্তব্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইতেছে।

চীন রুস সন্ধি—তিব্বতের স্বাধীনতা অন্য কোন জাতি হরণ না করে, এ জন্য চীন ও রুস সন্ধিবদ্ধ হইয়াছেন।

রুস-জাপান—আজি-কালি রুসিয়া ও জাপানের বড়ই বন্ধুত্ব। উভয় দেশের বাণিজ্যোন্নতির জন্য মস্কো নগরে এক সভা হইয়াছে। জাপানী রেসম বয়নার্থ মিনস্কে এক কল স্থাপিত হইয়াছে।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতি চিহ্ন—গত ৩১এ আশ্বিন দেওঘর স্কুলে বসু মহাশয়ের এক প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচিত হয়। এতদুপলক্ষে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। বাবু শিশির কুমার ঘোষ সভাপতির কার্য্য করেন।

বিবেকানন্দ স্মৃতি—স্বর্গগত (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) বিবেকানন্দের পরলোক গমনে শোক প্রকাশার্থ কলিকাতার টাউন হলে এবং বোম্বাই সহরে বিরাট সভা হইয়াছিল। বিবেকানন্দের উপর মাতৃভূমির বহু আশা ছিল। ইঁহার অকাল বিয়োগে আমরা বিশেষ শোকার্ত্ত।

রাজ্ঞীর পিতৃগৃহে গমন—রাজ্ঞী আলেক্জান্দ্রা পিতৃভবন দেনমার্কে গমন করিয়া দেশের লোকের সমাদর-ভাজন হইয়াছেন।

ভাগ্যবিপর্য্যয়—পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের পৌত্র দলিপ সিংহের ইংরেজ বিবীর গর্ভজাত পুত্র প্রিন্স ভিক্টর

৮৭৭৫ টাকা দেনার জন্য বিলাতের দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় লইয়াছেন।

বিক্টোরিয়া ছাত্রীবৃত্তি ফণ্ড— লেডী কুর্জনের যত্নে এই ফণ্ডে প্রায় ৭ লক্ষ টাকার সংস্থান হইয়াছে।

মৃত্যু—এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রবীণ উকীল বাবু দ্বারকা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম। ইনি বহুগুণে ভূষিত ছিলেন এবং বিদেশে বাঙ্গালীর মান রক্ষা করিতেছিলেন।

তীর্থযাত্রা

(৪৬৯ ৭০ সং—১৬৫ পৃষ্ঠার পর)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাতীরে।

নির্জ্জন গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণযুবক রঘুনাথ গৈরিক বসনধারী হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া বিশ্বপতির ধ্যানে নিমগ্ন। হৃদয়ের শত শত আশায় কেবল এক ওঁকার জপ করিয়া শান্তি যাচ্ঞা করিতেছেন। সংসারের সুখ দুঃখ সংসারেই আবদ্ধ, সেখান হইতে আর উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। বিমল সৈকতভূমি তাঁহার আসন হইয়াছে, পার্শ্বে তর তর বেগে স্নিগ্ধ সলিলময়ী জাহ্নবী হিমালয়ের পদ চুম্বন করিয়া বহিয়া যাইতেছে, অচল অটল গিরিবর কেবল দৃঢ়চেতা হইয়া নীল আকাশের দিকে সেই মহাভূমানের জন্য আকুলিত নেত্রে চাহিয়া আছেন। রঘুনাথ এই পর্ব্বতরাজির গাম্ভীর্য্য দেখিয়া ভাবেন হায়! আমি, কবে এইরূপে পূর্ণ প্রেমে পরম ব্রহ্মের চরণে সকল উৎসর্গ করিব—কবে আমি, মানবীয় স্নেহ প্রণয় ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বস্ব বিভুপদে অর্পণ করিব। হায়! আমার কবে অজ্ঞানতা ঘুচিবে, কবে আমি এই মোহময়ী মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইব। তাঁহার দেবীস্বরূপিণী জননী ও সৌন্দর্য্যময়ী পতিপ্রাণা পত্নীর অভাব এমন পবিত্র দেবময় ভূমিতেও আসিয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া তুলে। এমন শান্তিময় পুলিনেও তিনি কখন কখন অশ্রুজলে গঙ্গাতীরবর্ত্তী সোপানভূমি সিক্ত করিয়া তুলিতেন। একদিন মধ্যাহ্নকালে যখন মার্ত্তণ্ডদেব প্রখর কিরণ বিকীর্ণ করিয়া গঙ্গাবক্ষ উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই সময় রঘুনাথ স্নানার্থ জলে নামিলেন। তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মণিমালার দাসী জল লইয়া গিয়াছে ও নির্ম্মাল্য বিল্বপত্র ভাসাইয়া গিয়াছে। বিল্বপত্রগুলি জলের তরঙ্গে রঘুনাথের নিকট দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, উহারা নিত্যই ভাসিয়া যায়, বায়ু তাহাদের পরিচালক। রঘুনাথের হঠাৎ দৃষ্টি পড়াতে দেখিলেন পত্রে পত্রে কত ছত্র যেন অঙ্কিত। তুলিয়া দেখিলেন

দুর্গা নাম, উদ্ধার প্রার্থনা। তৎপাঠে রঘুনাথ স্তম্ভিত হইয়া সোপানোপরি উপবিষ্ট হইলেন—ভাবিলেন হায়! একি! এ কাহার হস্তাক্ষর? কে কারাগারে, কে বা বন্দিনী? কোথায় মৃত না জীবিত অবস্থায়—স্বর্গে না মর্ত্ত্যে? কতই আন্দোলন তাঁহার চিত্তসাগরে একের পর আর উঠিতে পড়িতে লাগিল। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পত্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। অবশেষে তাহা তুলিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন ও অনেক বার সেইগুলি স্থির দৃষ্টিতে দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া ভাবিলেন ইহা যেন আমার মণিমালারই হস্তাক্ষর দেখিতেছি, তবু নয়ন মনের সন্দেহ অপনোদন হইতেছে না। ভাবিলেন আমি কি ভ্রান্ত, আজ তিন মাস হইল সে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, আমি এখনও তাহার জীবনের আশা করিতেছি। এই আন্দোলনেই তাঁহার দিবা নিশি অতিবাহিত হইল। পর দিবস আবার সেই সময়ে সেই কলসী কক্ষে স্ত্রীলোকটী আসিয়া বিল্বপত্র ভাসাইয়া জল লইয়া গেল। রঘুনাথ আবার সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলেন। এইরূপে যখন ৪।৫ দিবস কাটিয়া গেল, তখন রঘুনাথ নীরবে সেই স্ত্রীলোকটীর পশ্চাদনুসরণ করিলেন। দেখিলেন রমণী কলসী কক্ষে জমীদার মীর মহম্মদের অন্দরে প্রবিষ্ট হইল। রঘুনাথ ফিরিলেন। তাঁহার আর সে পূর্ব্বমূর্ত্তি নাই। তিনি এখন জটা-শ্মশ্রু-বিমণ্ডিত গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসী। সুতরাং এই মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতার ভিতরে কেহই লক্ষ্য করিয়া দেখিল না। তিনি আপন কার্য্য সাধনপূর্ব্বক এক পথ দিয়া গিয়া অন্য পথ দিয়া ফিরিয়া আবার সেই নিজ আশ্রমে উপনীত হইয়া বন্ধুবরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধুটির কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাঁহার নাম গিরিভূষণ। তিনি পাহাড়ী ব্রাহ্মণ, ইংরাজী লেখা পড়া জানেন, পুলিশে চাকরি করেন। যুবক রঘুনাথের সমবয়স্ক, দেখিতে গৌরবর্ণ ও বলিষ্ঠ দেহ। উহার পরিবারের মধ্যে কেবল স্ত্রী ও দুটি পুত্র কন্যা। রঘুনাথের এখন সহায়সম্পত্তিআশাভরসা ইনিই। রঘুনাথ যদিও ক্রমে ক্রমে সংসারের মায়া কাটাইতেছেন, কিন্তু এই বিল্বপত্র লিখিত দুর্গা নামে তাঁহার হৃদয়ের ছিন্ন তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছে। আবার তাহার হৃদয় মন ঘুরিয়া ফিরিয়া সংসার-চক্রে বাঁধা পড়িতেছে। গিরিভূষণ সর্ব্বদাই বন্ধুর নিকট আসিয়া থাকেন, আজিও সেইরূপ আসিয়া দেখেন রঘুনাথ সেখানে নাই। তিনি কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন—ভাবিলেন "আজ কি তাহার ধৈর্য্য পাশ একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল? তিনি কি মণিমালার বিসর্জ্জন-ভূমির মায়া কাটাইয়া আজ প্রস্থান করিলেন?" এই চিন্তায় আলোড়িত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, পথিমধ্যে রঘুনাথের সহিত দেখা হইল। উভয়েই উভয়ের ঈপ্সিত বস্তু পাইলেন। গিরিভূষণ উৎসুকচিত্তে জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায় গিয়েছিলে? আজ কি নূতন

ভিক্ষার যোগাড় হইয়াছে লোকালয়ে?” রঘুনাথ বলিলেন “চল আবার আশ্রমে, সেইখানে দেখিবে।” এই বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বর্ণন করিলেন। রঘুনাথের বন্ধু সহর্ষে কহিলেন “এইবার খেই ধরেছি, অপেক্ষা কর আর দু একদিন” বলিয়া সেই ত্রিপত্রগুলি লইয়া চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

নবীনা চুড়িওয়ালী!

বেলা দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়। মধ্যাহ্নের খর রবির কিরণ এখনও প্রশমিত হয় নাই। পশু পক্ষী প্রত্যেক জীব এ সময় ছায়াতলে বিশ্রাম করিতেছে। পথে ঘাটে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এই সময় রাজপথ শূন্য, এক একবার কেবল মনুষ্যপদের সমাগম হইতেছে। সেই কোলাহলশূন্য মার্গ দিয়া একটি নবীনা রমণী ঝুড়ি কক্ষে জমিদারের বাটী খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ক্রমে ক্রমে রমণী জমিদারের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সম্মুখেই ফটকে লালপাকড়িধারী দীর্ঘশ্মশ্রু-গুম্ফ-শোভিত দরওয়ান রামসিং পাঁড়ে দণ্ডায়মান। সাধ্য কি তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে পঞ্চমবর্ষীয় বালকও অন্দরে প্রবেশ করে? রমণী সুন্দরী না হইলেও যুবতী—হাস্যমুখী, বাক্যের পারিপাট্য অতিশয়। দরওয়ানজির নিকট উপনীত হইয়া এক লম্বা চৌড়া সেলাম করিয়া বলিল “আপনি নস্য ব্যবহার করেন না?” এই বলিয়া একটি রৌপ্যমণ্ডিত কৌটা শুদ্ধ নস্য উহার হাতে দিয়া কহিল “ইহা একবার ব্যবহার কর, পরে জানিতে পারিবে কত উপকারী।” দরওয়ানজী আজ পাঁচ বৎসর বিপত্নীক হইয়া আছেন, রমণীর কণ্ঠস্বর বাঁশরীর মত উহার কর্ণে বাজিল। দরওয়ানজি অযাচিত উপহারে আরও মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। পরে তাহার ঝুড়িটি সমুদয় ওলট পালট করিয়া দেখিতে-ছেন। রমণী মনে মনে কহিল “ইহাই ত আমার উদ্দেশ্য।” দরওয়ানজি এটা কি ওটা কি? নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রমণী কহিল “এ সকল চুড়ি বড় লোকের মেয়েরা পরে, ইহা যে সে লোকের যোগ্য নহে। বড় আশা ত করিয়া আসিয়া-ছিলাম, তবে আপনার অনুগ্রহ হইলে আজ কিছু লাভ করে যেতুম। দরওয়ানজি কহিলেন “না না, তাহা কখনই হইতে পারে না, অন্দরে প্রবেশ নিষেধ।” রমণী বিনয় করিয়া কহিল “আচ্ছা এইখান থেকেই কিছু বিক্রী করান।” এইবার দরওয়ানজীর চক্ষুলজ্জা ধরিল—বাহির, হইতে দাসীকে ডাকিলেন। দাসী দিব্য নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল, বিরক্তি-স্বরে কহিল “আ মর মিন্‌সে, দিবানিশি খেটে মরি, একটু জিরুবার যো নাই, কেনরে বাপু কিসের এত ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি,” বলিতে বলিতে রমণীর কোমল মুখ খানি নয়নগোচর হইল। দাসী তখন বলিয়া উঠিল “এ আবার কেগা, চোবে ঠাকুর, কোথা থেকে আন্‌লে? সেই ছবিওয়ালি বুঝি, ওপাড়ার

নফর বাবুর বাসায় একদিন দেখেছিনু বটে।” রমণী বাধা দিয়া বিনীত ভাবে কহিল “তোমার কাছে এসেছি, যদি তুমি দয়া কর, তবে আমরা গরীব মানুষ দু পয়সা হাতে করে যাই।” দাসী ঘাড় নাড়িয়া বলিল “বাপরে তাও কি হয়, অন্দরে গতিবিধি হবার যোটি কি?” রমণী এইবার কদম্বতুল্য মুখখানি দাসীর কানের কাছে লইয়া অতি মৃদু স্বরে কি বলিল, তাহাতে উহার মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তখন সুর বদলাইয়া কহিল “আচ্ছা দেও, তোমার জিনিসপত্র দেখাইয়া আনি।” রমণী অতি উৎকৃষ্ট কয়েক যোড়া চুড়ি ও কয়েক খানি চিত্র উহার হস্তে দিল, তন্মধ্যে একখানি চিত্র একটি তরুণবয়স্ক সন্ন্যাসীরও ছিল। বলিল “দামের জন্য চিন্তা নাই, বিবি সায়েবদের হাতে পরাইয়া দিও কেবল। দাসী অন্দরে প্রবিষ্ট হইল। জমীদারগৃহিণী স্বীয় কক্ষে উপবিষ্টা—অন্যমনস্কভাবে যেন কি ভাবিতেছেন—গাঢ় চিন্তার রেখায় মুখ-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন। দাসী শশব্যস্ত হইয়া যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় চুড়ির স্তবক ও ছবিগুলি আনিয়া কর্ত্রীর নিকটে রাখিল। গৃহিণী দ্রব্যগুলির মনোহারিত্ব ও নবীনত্ব দেখিয়া আপনার কথা কিয়ৎক্ষণের জন্য ভুলিয়া গেলেন। উৎসাহপূর্ব্বক কহিলেন “এ আবার কোথা পেলি গা?”

দাসী কহিল “একটী স্ত্রীলোক এই সকল জিনিস বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। যদি আজ্ঞা করেন, তবে ডাকি। আহা! বড় ভাল মেয়েটী দেখতে। তবে হুজুরের যে কড়া হুকুম, তাই ভয় করে, নতুবা আর কি বলবো বেগম সাহেবা? আমরা ত তোমারই নেমকের লোক। যার জন্য এত কাণ্ড সেত কদিন বা টিঁকিবে? অনাহারে থেকে থেকে ত কঙ্কালসার হয়েছে, তবে কেন এত জেলখানার সকলে পচে মরে?” গৃহিণী দাসীকে বাধা দিয়া কহিলেন ডাক না, সে মেয়ে মানুষ, দৈত্য নয়, আর মীর সাহেব ত রাত্রি ভিন্ন আসছেন না।” দাসী তখনই ছুটিয়া গিয়া বিক্রেত্রী রমণীকে আনিয়া হাজির করিল। রমণী বিনা দরদামে গৃহিণীর মনোনীত চুড়ী যোড়াটা পরাইয়া দিল। পরে জিজ্ঞাসিল হুজুরের কোনও ছবি পছন্দ হইল না? এই বলিয়া ছবির বাক্সটী খুলিয়া দেখাইতে লাগিল। হিন্দু মুসল-মানী অনেক রকমের দেব দেবীর চিত্র দেখাইল। হিন্দুয়ানি চিত্র কয়েক খানি দেখিয়া গৃহিণীর হঠাৎ নূতন বিবির কথাটা মনে পড়িয়া গেল। তিনি ভাবিলেন আজ আমি এই উপহার লইয়া বন্দিনীকে একবার দেখিব। ইহা স্থির করিয়া হরিদ্বারে জাহ্নবীতীরস্থ সন্ন্যাসী ও চণ্ডী-দেবীর চিত্র দুইখানি লইলেন। গৃহিণীর সুগোল বাহুযুগলে চুড়ির অতিশয় বাহার হইয়াছে বলিয়া বিক্রেত্রী রমণী প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু গৃহিণী তাহাতে আপ্যায়িত ও প্রফুল্ল না হইয়া অমর্ষান্বিত হইতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না, একটি উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস

নীরবে তাঁহার বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া গেল! চুড়িওয়ালি রমণী তাহা লক্ষ্য করিল। পরে কহিল "হুজুর সাহেবের অনুমতি হয় ত আমি বিদায় হই। বোধ হয় এ মহলে আর কেহ নাই। বেগম সাহেবা ত পূর্ণ লক্ষ্মী, তাঁহারই রাজ্যপাট সকলি, নতুবা অনেক বড় বড় বিবিদের গলায় একটা না একটা কণ্টক থাকে।" ইহা শুনিয়া দাসীগণ নীরবে পরস্পরের মুখ চাহাচাহি আরম্ভ করিল, কিন্তু সাধ্য নাই কেহ কোনও কথা প্রকাশ করে। গৃহিণী সকল জিনিসপত্রের দাম দিবার জন্য ভিতরে গেলেন, সেই অবসরে তাহার পিসী ঠাকুরাণী চুড়িওয়ালীর কাছে ঘেঁসিয়া কানে কানে কি বলিল। চুড়িওয়ালী কহিল "মা গো সব পারি, এক বার দেখাইতে যদি উহাকে"। পিসী বলিলেন "তাত সহজ নয়। আচ্ছা বলে দেখব। সে যে বাহির হয় না; সেই যে দোতালার ঘরে উঠেছে, আর নামে না।" চুড়িওয়ালি মনে মনে কহিল যথেষ্ট হইয়াছে। এদিকে মণিমালা দ্বিপ্রহরের পূজা সমাপন করিয়া উঠিলেন এবং তাহার চির অভ্যস্ত গীতটী যাহা এক দিন কি প্রাতে কি সন্ধ্যায় সকল সময় সকল রাগিণীতেই রঘুনাথ গাহিতেন, তাহাই যেন এখনও দিবানিশি উহার কর্ণকুহরে বাজিত, সময়ে সময়ে প্রাণের আবেগে উচ্ছ্বসিত বন্যার ধারার ন্যায় প্রবল বেগে করুণ স্বরে বাহির হইয়া পড়িত। তখন আর উথলিত অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারিতেন না। এইবার তিনি গদ গদ স্বরে গাহিয়া উঠিলেন—

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং।
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।" ইত্যাদি

চুড়িওয়ালির কর্ণে বীণাধ্বনিবৎ শব্দটি পশিয়া গেল। সে চকিতভাবে চারিদিকে চাহিয়া দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল "এ গীতধ্বনি কি বেগম সাহেবের মহলের বাহির হইতে আসিতেছে?" দাসীরা কহিল "না, এ অন্য মহলের"। চুড়িওয়ালি মনে মনে অনেকটা বুঝিল, কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল এবং সোজা গিরিভূষণের স্ত্রীর নিকট গিয়া জমীদার মহলের চিত্র আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে লাগিল। স্ত্রী সেই সকল বৃত্তান্ত স্বামীকে জানাইলেন।

গিরিভূষণ এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়া উঠিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

পাপপুণ্যের ফলাফল।

পাপং কুর্ব্বন্ পাপকীর্ত্তিঃ পাপমেবাশ্নুতে ফলং। পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যমত্যন্তমশ্নুতে ॥
পাপকার্য্যে পাপকীর্ত্তি ফল পাপময়। পুণ্যকার্য্যে পুণ্যকীর্ত্তি পুণ্য সে অক্ষয়।

রসায়ন বিদ্যা।

Nitrogen (নাইট্রোজেন) যবক্ষারজান

সাঙ্কেতিক চিহ্ন N; পরমাণুর ভার ১৪।

ইতিহাস — ১৭৭২ অব্দে এডিনবরা-নিবাসী রুদরফোর্ড (Rutherford) সাহেব না দাহক না দাহ্য এবং প্রাণ-রক্ষণে অক্ষম এমন একটী বায়ুর অস্তিত্ব অবগত হন। ইহার অনতিকাল পরে চ্যাপটাল (Chaptal) সাহেব ইহা সোরাতে অবস্থিতি করে বলিয়া ইহার নাম নাইট্রোজেন দেন। সোরাকে বাঙ্গালা ভাষায় যবক্ষার বলে বলিয়া ইহার বাঙ্গালা নাম যবক্ষারজান। শতাংশিকের ০° উষ্ণতায় ৭৫০ মিলিমিটর চাপে ১১·১৯ লিটর নাইট্রোজেনের ভার ১৪ গ্রাম, এজন্য ইহা সমায়তন হাইড্রোজেন অপেক্ষা ১৪ গুণ ভারী।

অবস্থা—অসংযুক্ত অবস্থায় বায়ুরাশির ৪/৫ অংশ নাইট্রোজেন। সংযুক্ত অবস্থায় জন্তু ও উদ্ভিদ শরীরে, যবক্ষার, যবক্ষার-দ্রাবক, এমোনিয়া প্রভৃতি পদার্থে পাওয়া যায়। ইহা মাংস, দুগ্ধ ও শস্যের প্রধান উপাদান।

ধর্ম্ম—নাইট্রোজেন বর্ণ গন্ধ ও স্বাদহীন স্বচ্ছ, অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থ। ইহা জলে অতি অল্প পরিমাণে দ্রব হয়; ১০০ পাইণ্ট জলে ১·৫ (প্রায় ২ ভাগ) পাইণ্ট দ্রব হয়। ইহা বায়ু অপেক্ষা অল্প লঘু। বায়ুর ভার ১ ধরিলে, ইহার ভার ·৯৭২ ধরা যায়। যবক্ষারজান স্বয়ং বিষধর্ম্মী নহে; তবে যে ইহার মধ্যে কোনও জন্তু নিমগ্ন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ঘটে, অম্লজানের অভাবই তাহার কারণ। কিন্তু মর্ফিয়া ষ্ট্রিকনিয়া প্রভৃতি কয়েকটী ভেষজে ইহা আছে। যবক্ষারজান উদ্জানের ন্যায় দাহ্য নহে। অম্লজান দ্বারা যেরূপ দহন ক্রিয়া সাধিত হয়, ইহা দ্বারা তাহাও হয় না। ইহার মধ্যে বাতি প্রবিষ্ট করিয়া দিলে নিবিয়া যায়। ইহাকে চাপ ও শৈত্য সহযোগে তরল অবস্থায় আনা যায়। যবক্ষারজান সহজে অন্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয় না। ইহার ন্যায় নিস্তেজ পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই। কিন্তু ইহা নিজে নিস্তেজ হইলেও ইহার সহিত অম্লজান ও উদ্জান সংযোগে এমোনিয়া ও নাইট্রিক এসিড নামক দুইটী অতি তেজস্বী পদার্থ উৎপন্ন হয়। অক্সিজেনকে তরল রাখা নাইট্রোজেনের প্রধান ধর্ম্ম। ফলতঃ যে সকল বস্তুতে যবক্ষারজান অধিক পরি-মাণে আছে, সেই সকল বস্তুই প্রধান খাদ্য, একারণ শস্য, দুগ্ধ, মাংস প্রধান খাদ্য।

প্রস্তুতপ্রণালী—

১। একটী ক্ষুদ্র পাত্রে একখণ্ড জ্বলিত ফস্ফরস স্থাপন করিয়া কোনও জলপূর্ণ পাত্রে ভাসাইয়া দাও। পরে একটী প্রশস্ত

মুখ ফানসাকার পাত্র অর্থাৎ বেল জার উহার উপর এরূপ ভাবে স্থাপন কর যে উহার কিয়দংশ জলমগ্ন থাকে। ফস্ফরস অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া ফস্ফরিক এনিউরাইড শ্বেতধূমাকারে উত্থিত হয়; পরে অম্লজান নিঃশেষিত হইলে ঐ ধূম জলে দ্রব হয়; পাত্রমধ্যে ১/৫ অংশ জল উঠে; তখন উহাতে বিশুদ্ধ যবক্ষারজান পাওয়া যায়।

২। যদি ফস্ফরস দগ্ধ না করিয়া ২।১ দিন উত্তপ্ত গৃহে অমনি রাখা যায়, তাহা হইলে ফস্ফরস ক্রমে ক্রমে অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া ফস্ফরস ট্রায়ক্সাইড্ উৎপাদন করতঃ জলে দ্রব হয় ও পাত্র-মধ্যে বিশুদ্ধ যবক্ষারজান পাওয়া যায়।

৩। উত্তপ্ত তাম্রের (copper) ভিতর দিয়া বায়ুর স্রোত চালাইলে তাম্র বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করে, তখন উহাতে বিশুদ্ধ যবক্ষারজান পাওয়া যায়।

৪। এমোনিয়ার ভিতর দিয়া ক্লোরিন (Chlorine) গ্যাসের স্রোত চালাইলে ক্লোরিন H গ্রহণ করিয়া হাইড্রক্লোরিক এসিড উৎপন্ন করে ও N বিমুক্ত হয়। যথা—

$২(H_৩N)+৩Cl_২=৬(Hcl+N_২)$।
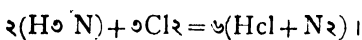
৫। এমোনিয়া নাইট্রাইটকে উত্তপ্ত করিলে N প্রাপ্ত হওয়া যায়; ঐ লবণ হইতে জল ও N বিমুক্ত হয়, যথা—

$NH_৪ No_২=২H_২o+N_২$
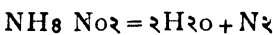
৬। একটী বোতলের ভিতর কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া উহার ভিতর পুরু করিয়া লৌহচূর্ণ বিছাইয়া দাও, পরে বোতলটী অধোমুখ করিয়া কোন জলপাত্রে রাখিয়া দাও, দিন কয়েক উত্তপ্ত গৃহে রাখিলে N বিমুক্ত হয়।

পরীক্ষা—(১) ইহার মধ্যে জ্বলিত বাতি প্রবিষ্ট করিয়া দিলে নিবিয়া যায়।

(২) ইহার মধ্যে কোন প্রাণী নিমজ্জিত করিলে মরিয়া যায়।

AMMONIA (এমোনিয়া)।

ক্ষারযবক্ষারজান। চিহ্ন $NH_৩$;
মৌলিক গুরুত্ব ১৭।

ঘনতা ৮.৫; আপেক্ষিক গুরুত্ব ০.৫৯।

ইতিহাস—উত্তর আফ্রিকার অন্তঃ-পাতী লিবিয়া নামক মরুতে—যেখানে জুপিটার এমন দেবের মন্দির আছে, তথায় রাত্রিকালে অনেক উষ্ট্র শয়ন করিত, তাহাদের মলমূত্রের পরিণামে অনেক নিশেদল উৎপন্ন হইত; আর-বীয়েরা ইহা প্রথমে প্রাপ্ত হয়। তাহারা ইহাকে স্যাল এমোনিয়াক (Sal Ammoniac বা নিশেদল) অথবা এমোনিয়ার লবণ ও তদুৎপন্ন বাষ্পকে এমোনিয়া কহে।

শতাংশিকের ০ অংশ উষ্ণতায় ৭৬০ মিলিমিটর চাপে ১১.১৯ লিটর এমো-নিয়ার ভার ৮.৫ গ্রাম। অতএব ইহা সম আয়তন হাইড্রোজেন অপেক্ষা ৮.৫ গুণ ভারী।

অবস্থা—ইহা অসংযুক্ত অবস্থায় বায়ু-রাশিতে কিয়ৎ পরিমাণে আছে; এবং জন্তুগণের মলমূত্রে, উর্ব্বরা মেটেল মাটীতে

ও আগ্নেয়গৈরিক গ্যাসবিশেষে সংযুক্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্ম—এমোনিয়া বর্ণহীন, স্বচ্ছ, বায়বীয় পদার্থ। ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র। বিশুদ্ধ এমোনিয়া আঘ্রাণ করা সুকঠিন; আঘ্রাণ করিলে চক্ষু দিয়া জল নির্গত হয়। ইহার আস্বাদ ক্ষার। ইহা বায়ু অপেক্ষা লঘু; বায়ুর ভার ১ ধরিলে ইহার ভার ৫৯ ধরা যায়। জল ও শৈত্য সহযোগে ইহাকে তরল ও কঠিনাকারে আনা যাইতে পারে। ৩৯অংশ শীতল হইলে ইহা তরল হয় ও ৯০অংশ শীতল হইলে জমিয়া কঠিন হয়। ৯৭॥• পাউণ্ড বায়ুর চাপে ইহাকে তরলাকারে আনা যায়। ইহা অতিশয় উগ্র; এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা ইহাকে উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। ইহা দাহ্য, কিন্তু অল্প তাপে দগ্ধ হয় না। ইহা ক্ষারধর্ম্মাক্রান্ত; এসিডের ধর্ম্ম নষ্ট করাই ইহার ধর্ম্ম। ইহা তাপে দ্রব হয়; ১ ভাগ জলে ৭০০ ভাগ এমোনিয়া দ্রব হয়। এমোনিয়া জলে দ্রব করিয়াই লাইকার এমোনিয়া প্রস্তুত করে। পূর্ব্বে মৃগশৃঙ্গ হইতে এমোনিয়া নিষ্কাশন করিত বলিয়া ইহাকে স্পিরিট-অব-হার্টস-হর্ণ কহে।

সংগ্রহপ্রণালী—

১। এক ভাগ চূণ ও দুই ভাগ নিশেদল একত্র করিয়া উত্তপ্ত করিলে এমোনিয়া বিমুক্ত হয়, যথা—

$২NH_৪Cl + CaO = CaCl_২ + H_২O + ২NH_৩$।
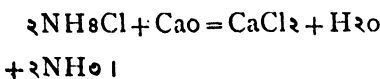
২। পাথুরিয়া কয়লায় শতকরা দুই ভাগ যবক্ষারজান থাকে। কোনও অবরুদ্ধ পাত্রে ঐ কয়লা উত্তপ্ত করিলে তদন্তর্গত উদ্জান যবক্ষারজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া এমোনিয়ারূপে বাহির হইয়া আইসে।

৩। লাইকার এমোনিয়া উত্তপ্ত করিলে এমোনিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পরীক্ষা—(১) এমোনিয়াপূর্ণ বোতল মধ্যে জ্বলিত বাতি প্রবিষ্ট করিলে নিবিয়া যায়।

২। এমোনিয়াপূর্ণ বোতল জলমধ্যে উপুড় করিয়া রাখিলে এমোনিয়া জলে দ্রব হইবে এবং বোতলের ভিতর জল উঠিবে।

৩। ইহা দ্বারা এসিডসিক্ত লাল লিটমস নীলবর্ণে পরিণত হয়।

৪। ইহার মধ্যে সাদা কাগজ দিলে পিঙ্গলবর্ণ হয়।

৫। গন্ধ দ্বারা এমোনিয়ার সত্তা নির্ণয় করা যায়। কোনও পাত্রে এমোনিয়া আছে কি না, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে একটী কাচের নল হাইড্রোক্লোরিক এসিডে লগ্ন করিয়া কোন এমোনিয়াপূর্ণ বোতলে নিমগ্ন করিলে উহা হইতে নিশেদলের ধূম উত্থিত হয়।

NITRIC ACID (নাইট্রিক এসিড) বা HYDRIC NITRATE (হাইড্রিক নাইট্রেট)।

যবক্ষারদ্রাবক।

চিহ্ন—$HNO_৩$; মৌলিক গুরুত্ব ৬৩।

তিনভাগ অম্লজেন, ১ ভাগ হাইড্রোজেন

ও ১ ভাগ নাইট্রোজেন সংযুক্ত হইয়া দুই ভাগ নাইট্রিক এসিড প্রস্তুত হয়।

ইতিহাস—প্রাচীন রাসায়নিকেরা ইহাকে একোয়াফর্টিস (Aquafortis) অর্থাৎ বীর্য্যবান্ জল ও স্পিরিট অব নাইটার (Spirit of Nitre) কহিতেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন স্বর্ণ ও প্লাটিনম্ ভিন্ন সকল প্রকার ধাতু ইহাতে দ্রব হয়, এজন্য তাঁহারা ইহাকে এসিড অর্থাৎ দ্রাবক কহিতেন। তৎপরে ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে ক্যাভেণ্ডিস (Cavendish) ইহার প্রকৃত সমাস আবিষ্কার করেন। বায়বীয় অবস্থায় শতাংশিকের ০° উষ্ণতায় ৭৬০ মিলিমিটর চাপে ১১.১৯ লিটর নাইট্রিক এসিডের ভার ৩১.৫ গ্রাম।

ধর্ম্ম—নাইট্রিক এসিড বর্ণহীন, গন্ধরহিত, স্বচ্ছ, তরল পদার্থ। ইহার আস্বাদ তীক্ষ্ণ অম্ল। এক গ্লাস জলে ২১ ফোঁটা এই এসিড মিশ্রিত করিলে সমুদয় জল অম্লস্বাদ হয়। গায়ে লাগিলে গা পুড়িয়া যায়। কিন্তু জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গায়ে দিলে গা পুড়িয়া যায় না, পীতবর্ণ দাগ হয়। ইহার সংযোগ শ্বেতবর্ণ পশমাদি পীতবর্ণ হয়। প্রবল যবক্ষার দ্রাবকে কিছুক্ষণ তুলা ভিজাইয়া রাখিলে ঐ তুলা বারুদধর্ম্মাক্রান্ত হয় অর্থাৎ উহাকে বন্দুকে পুরিয়া আওয়াজ করা যাইতে পারে। স্বর্ণ ও প্লাটিনম্ ভিন্ন সকল ধাতুই ইহাতে দ্রব হয়। তাম্র লৌহ প্রভৃতি ধাতু টুকরা, ইহার মধ্যে নিক্ষেপ করিলে এক প্রকার পাটলবর্ণ ধূম এবং ঐ সকল ধাতুর রূপান্তর ও গুণান্তর হয়। বায়ুসংস্পর্শে ইহা হইতে লালবর্ণ ধূম উত্থিত হয়। ঔষধরূপে ব্যবহার করিলে ইহা দ্বারা অনেক রোগের শান্তি হইতে পারে। জলের ভার ১ ধরিলে ইহার ভার ১.৫২।

সংগ্রহ প্রণালী—

১। যবক্ষারজানযুক্ত যে কোনও পদার্থ লইয়া গন্ধকদ্রাবক সংযুক্ত করিলে যবক্ষার দ্রাবক বিমুক্ত হয়।

২। পটাসিয়ম বা সোডিয়ম-নাইট্রেট সল্ফিউরিক এসিডের সহিত সংযুক্ত করিলে নাইট্রিক এসিড পাওয়া যায়, যথা—

$$KNO_3 + H_2SO_4 = KHSO_4 + HNO_3।$$
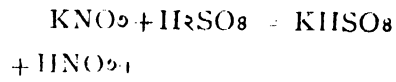
পরীক্ষা—

১। ইহা নীলবড়ীর দ্রাবণকে ধৌত করে।

২। নাইট্রিক এসিডে তাম্র দস্তা নিক্ষেপ করিলে সবুজবর্ণ ধূম উত্থিত হয়।

৩। গ্রীন্ সাল্ফেট্ অব আয়রনকে অলিভ্ ব্রাউন অর্থাৎ কটাবর্ণে পরিণত করে।

৪। একটী গ্লাসে তার্পিণ তৈল রাখিয়া এই দ্রাবক আস্তে আস্তে ঢালিলে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে।

৫। ইহাকে গন্ধকদ্রাবকের সহিত মিশ্রিত করিয়া হীরাকসের জলের উপর ঢালিলে উভয়ের সন্ধিস্থলে একটী কৃষ্ণবর্ণ দাগ হয়।

৬। ইহা মর্ফিয়া দ্বারা রক্তবর্ণ হয়।

৭। নাইট্রিক এসিডে স্বর্ণ দ্রব হয় না, কিন্তু নাইট্রিক এসিড ও লবণদ্রাবক মিশ্রিত জলে দ্রব হয়।

৮। দুই ভাগ নাইট্রিক এসিড ও এক ভাগ হাইড্রক্লোরিক এসিড মিশ্রিত করিলে যে একোয়া রিজিয়া বা দ্রাবক-রাজ উৎপন্ন হয়, তাহাতে সকল ধাতু দ্রব হয়

সন্দেহে বিভ্রাট

(৪৬৮ সংখ্যা—১২১ পৃষ্ঠার পর।)

এইবার তাহাদের সুখের সংসারে, আর সে সুখশান্তি রহিল না। সন্দেহের তীব্র হলাহলে চারুর হৃদয় জর্জরিত হইয়া গেল। সে অনেক চেষ্টা করিয়াও পূর্ব্বের হাস্য প্রফুল্লতা রক্ষা করিতে পারিল না। তাহার আর সন্ধ্যায় বেড়াইতে যাওয়া হয় না। সন্ধ্যা হইলেই চারুর মাথা ধরে, সে শয্যা হইতে কোনও মতে উঠিতে পারে না। তাহার কারণ চারু দু'দিন নলিনীদিগের সহিত একাকী অনেকক্ষণ গঙ্গার তীরে বসিয়াছিল। "তোমরা অগ্রসর হও, আমি আসিতেছি" বলিয়া আর সুধীরচন্দ্র আসেন নাই, তাহারা যখন ফিরিতেছিল, তখন পথে দেখা হইয়াছিল। চারু তাহাতে বুঝিল তাহার সহিত বেড়াইতে তাহার স্বামীর আর ভাল লাগে না। তাহার পর দিন হইতে তাহার মাথা ধরার ছুতা হইল। সুধীরচন্দ্র প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাহার মাথায় অডিকলমের পটি দিয়া স্মেলিং সল্টের ঘ্রাণ লওয়াইয়া ঔষধাদি খাওয়াইতেন। পরে তিনি একাকীই ভ্রমণে যাইতেন। চারু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তিনি প্রত্যহই এক সময়ে যাইতেন। দারুণ সন্দেহে ও অভিমানে তাহার হৃদয় পুড়িতেছিল, তবু সে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। অবশেষে সে এক উপায় স্থির করিয়া দাসীকে ডাকিল। দাসী আসিয়া সহাস্য-মুখে বলিল, "কি গো মা লক্ষ্মী, অসময়ে তলব কেন" ?

"বিন্দা, তুই একটি কাজ ক'রতে পারিস ? তুই না হ'লে কেউ পার্ব্বে না !"

"বিন্দা না পারে কি ? এখনি কি কোথাও যেতে হবে ? না কিছু খেতে দিবে ?"

"ঠাট্টা নয়, পার্‌বি কি না বল্ ?"

বিন্দা চারুর পিত্রালয়ের দাসী। অতি শৈশবকাল হইতেই তাহাকে পালন করিয়াছে। বিন্দার চারুর বয়সী এক কন্যা ছিল, শৈশবেই তাহার মৃত্যু হয়। যখন সে চারুদের বাড়ীতে চাকরী করিতে যায়, তখন চারুকে পাইয়া সে সন্তান-শোক

ভুলিয়াছিল। চারু বিন্দাকে দাসীর মত দেখিত না। তাহার প্রতি চারুর অসীম স্নেহ ছিল। বিন্দা চারুর কম্পিত কণ্ঠের স্বরে তাহার অতি নিকটে আসিয়া দেখিল তাহার চখে জল। সে তখন করুণকণ্ঠে কহিল, "মা লক্ষ্মী, কেন কাঁদ্‌চ? তোমার কিসের দুঃখু মা? আমায় বল্‌বে না"

কম্পিতকণ্ঠে চারু কহিল, "তুই আজ সন্ধ্যায় বাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখে আসবি বাবু রোজ কোথা যায়। দেখিস, বাবু যেন তোকে দেখ্‌তে না পায়। সে বাড়ীটা বেশ করে চিনে আস্‌বি। খুব শীঘ্র আসবি, কেমন, পার্‌বি ত?"

"পার্‌ব না কেন? কিন্তু মা, তুমি লেখা পড়া জান, এ কাজটা কি ভাল হবে? সোয়ামী গুরুলোক, তা'র উপর এত অবিশ্বাস কেন? আর তুমি মা কত পুণ্যি করেছিলে, তাইত এমন শিবের মত সোয়ামী পেয়েছ! বাছারত কোনও দোষ নাই।"

"তুই যাবি কি না বল্? অত শাস্তর আওড়াতে ত তোকে ডাকি নাই। না যদি পারিস ত চলে যা।"

"তুমিত আমার শাস্তর মা লক্ষ্মী। তুমি যা বল্‌বে আমি না বল্‌তে পার্‌ব না।" এই বলিয়া বিন্দা বিদায় লইল।

সন্ধ্যার সময় মাথা ধরার ভান করিয়া চারু শয্যা গ্রহণ করিল। সুধীরচন্দ্র অনেকক্ষণ তাহার নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন, মাথায় কত আদর করিয়া অডিকলমের পটি দিলেন। তাহার পর উঠিয়া নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যা ভ্রমণে বাহির হইলেন। পশ্চাতে বিন্দা দাসী অলক্ষ্যে চলিল।

হায়! রমণীর দুর্ব্বল মন, তোমার প্রণয়ে এত সন্দেহ—এত অসন্তোষ কেন? বালকেরা নূতন খেলিবার দ্রব্য পাইলে কত সোহাগে—কত আদরে বুকে দুই দিন ধরিয়া রাখে, পুরাতন হইলে তাহা দূরে রাখিয়া দেয়। তবু তাহাদের ক্ষুদ্র প্রাণে পুরাতন দ্রব্যের প্রতি স্নেহ বদ্ধমূল। পুরুষের কি শুধু খেলায়—শুধু প্রণয় আরাধনায় দিন কাটিতে পারে? সংসার কি তাহাদের নিকট খেলিবার স্থান? পুরুষের সাংসারিক সামাজিক কত কর্ম্ম রহিয়াছে, প্রণয়ের প্রথম উদ্বেগ শান্ত হইলে তাঁহারা সযত্নে প্রণয়পাত্রকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া আপন কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হন। দুর্ব্বল রমণী, তোমাদের প্রেম ভিন্ন কিছুই সম্বল নাই, তাই তোমাদের এত দুঃখভার। চারু যদি একটু বুঝিয়া, একটু দেখিয়া স্বামীকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিত, হয় ত তাহা হইলে আর এই গভীর যন্ত্রণা সহিতে হইত না।

বিন্দা আসিয়া সে বাড়ী চিনিয়া আসিয়াছে বলিল। চারু সেই রাত্রে তাহার সহিত গিয়া সেই বাটী দেখিয়া আসিল। সে কষ্টহারিণীর ঘাট হইতে ফিরিবার সময় সেই শুভ্রবসনা রমণীকে সেই বাটীর সম্মুখে দেখিয়াছিল। সে দিন সে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া সে বাটী চিনিয়া

রাখিয়াছিল, তাহার সম্মুখে একটি গ্যাস পোষ্ট ছিল। চারু বিনা বাক্যব্যয়ে, যন্ত্রণা-বিকৃত-হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিল। সুধীরচন্দ্র সে রাত্রে যখন কথাবার্ত্তা কহিতে গেলেন, সে ভাল করিয়া কথাও কহিল না। নিত্য এই নূতন প্রকারের অভিমানে সুধীরচন্দ্রের বিরক্তি বোধ হইতেছিল, তিনি বিশেষ কিছু না বলিয়া আপন শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। এক শয্যায় শয়ন করিয়া স্বামী স্ত্রী উভয়েই প্রায় জাগিয়া রাত কাটাইলেন। কিন্তু অভিমানে কেহ কাহারও মান ভাঙ্গিতে পারিলেন না।

সে রাত্রে মনে মনে চারু এক নূতন উপায় স্থির করিতেছিল। কি করিয়া সে ডাকিনীর হাত হইতে স্বামীকে উদ্ধার করিবে তাহাই ভাবিতেছিল। সন্ধ্যার সময় সুধীরচন্দ্র পুনরায় চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় চারু শয্যায় পড়িয়াছিল, এমন সময় নলিনী সেই গৃহে প্রবেশ করিল। নলিনী দেখিল চারু কাঁদিতে-ছিল, তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি হাসিয়া উঠিয়া বসিল। নলিনী সেই শয্যায় বসিয়া পড়িল, তাহার পর ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "চারু কি হয়েছে? কাঁদ্‌ছ কেন? সুধীর বাবু কোথায়?"

"কাঁদব আবার কেন? তিনি বেড়া-ইতে গেছেন।"

"তিনি একাই গেছেন বোধ হয়, কারণ আমাদের ইনি ত বাড়ীতেই আছেন।"

"তোমার যেমন, তোমার 'ইনি' না হলে বুঝি আর বেড়াতে যেতে নাই?"

"চারু সত্য কথা বল্‌বি! কেন কাঁদ-ছিলি, আমায় লুকাসনে, তোকে এত ভাল বাসি তবু এত ছলনা?"

নলিনীর এই স্নেহ সম্বোধনে চারুর রুদ্ধ অশ্রুজল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে উপাধানে মুখ লুকাইল। নলিনী সস্নেহে চারুর মস্তক আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইল, তাহার পর ললাটের অযত্নে পতিত কেশগুচ্ছ সরাইয়া, অঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়া দিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমি বল্‌বো তোর কি হইয়াছে?"

চারু বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাহার মুখের-প্রতি চাহিয়া রহিল।

"সেই পীরপাহাড়ের মেয়েটাই তোর সর্ব্বনাশের মূল, আমি তা বুঝেছি।"

"তোমায় কে বল্‌লে?"

"বল্‌বে আবার কে? যা'র যেখানে ব্যথা, তা'র সেখানে হাত। আমি মেয়ে মানুষ, আমি যদি না বুঝব ত বুঝবে কে?

"সে কে?"

"তাও খোঁজ নিতে কি কসুর করেছি, সে খ্রীষ্টানী কি ব্রহ্মজ্ঞানী তাত বুঝা যায় না। একাই থাকে, ও বাড়ীটা ওর নিজের। কবে এসেছে তা কেউ বল্‌তে পার্‌লে না। বাড়ীতে মেয়ে ইস্কুল করে, ছোট ছোট মেয়েদের পড়ায়, সেলাই শেখায়। নিশ্চয়ই ভদ্র ঘরের মেয়ে।"

"ভদ্র ঘরের মেয়ে সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে, অমন রূপসী!"

"সুধীর বাবু রোজ সন্ধ্যা বেলা সেইখানে যান, তুই এই বেলা মুঙ্গের ছেড়ে পালা। নহিলে তোর স্বামীকে ডাকিনীর হাত থেকে রক্ষা করা মুস্কিল হবে।"

"কি আশ্চর্য্য ! উনি স্বাধীন, উনি না গেলে আমি কি করিব ?"

"যেমন করে হয় উপায় করবি, ত্রেতা যুগে রাক্ষসের হাত থেকে রাম সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন। কলিযুগে সব উল্টা, রাক্ষসীর হাত থেকে সতী পতি উদ্ধার করিবে।"

"আমি কি করিব ?"

"এত লেখা পড়া শিখে ছাই কি হল ? উপায় না করিতে পারিলে চলিবে কেন ? স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী। স্বামী যদি ধর্ম্মে পতিত হন, স্ত্রীর কি তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত নয় ?"

"আমি ত ভাই অত ধর্ম্ম কর্ম্ম বুঝি না। আমার একমাত্র ধর্ম্ম স্বামী। স্বামীই আমার ইষ্টদেবতা। আমি পাপিষ্ঠা, নহিলে অমন স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইব কেন ?"

"আচ্ছা, আমি আজ একবার ঘরে গিয়া পরামর্শ করি। আমার মতে, তুই একবার নিজে গিয়া তার হাতে পায়ে ধরে অন্য কোথাও যেতে বল্। যত টাকা চায় দিস্, তোর ত টাকার ভাবনা নাই। ভাই, আমি আপাততঃ এর একটা উপায় বলি।"

"কি উপায় ?" এমন সময় সুধীরচন্দ্রের পদশব্দ পাইয়া, নলিনী আপনার গৃহে চলিয়া গেল।

পর দিন বৈকালে চারুশীলা একখান ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকাইয়া আনিয়া, বেড়াইতে যাইবার জন্য বাহির হইল। সুধীরচন্দ্র যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাইতেছ ?" চারু কহিল "মুন্সেফ বাবুদের বাড়ী"। নলিনীর সহিত মুঙ্গেরের সকলকারই পরিচয় ছিল, সেই সূত্রে চারুর সহিতও আলাপ হইয়াছিল। সুধীর বাবু সে কথায় আর অবিশ্বাস করিলেন না বা দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন না।

বিন্দা গাড়ীওয়ালাকে পথ দেখাইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে চলিতে বলিল। গাড়ী আসিয়া সেই শুভ্রবেশধারিণী রমণীর গৃহের দ্বারে থামিল। গাড়ী থামিবামাত্র সেই রমণী একটী কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন। বিন্দা বলিল "সুধীর বাবুর পরিবার আসিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া রমণীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। চারুশীলা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া রমণীর সহিত কক্ষে প্রবেশ করিল। বিন্দা গাড়ীর নিকট দাঁড়াইয়া রহিল।

রমণী অতিশয় মৃদুকণ্ঠে চারুশীলাকে একখানি বেত্রাসন দেখাইয়া বসিতে অনুরোধ করিল। চারু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। রমণী কোনও উপায় না দেখিয়া কহিল "আপনার কি আমাকে কিছু বলিবার আছে ?"

জড়িতকণ্ঠে চারু কহিল "হাঁ, আমার স্বামী কি এখানে প্রত্যহ আসেন ?"

"আসেন বইকি? ওঃ তুমিই তাঁহার স্ত্রী? আমি এত বারণ করি, সে পুরাণ সম্পর্ক ভুলিতে বলি, তবু শুনেন না। প্রত্যহই আসেন।"

চারুর চক্ষে জল বহিতে লাগিল, সে ছুটিয়া রমণীর হাত ধরিয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বলিল—

"তোমায় দেখিয়া ত দয়াশীলা বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি দয়া করিয়া আমায় উদ্ধার কর। নহিলে আমার স্বামী ধর্ম্মে পতিত হইবেন। আমার জীবন রক্ষা কর।"

"আমি কি করিব বল? তিনি আমার বিগত জীবনের কথা, আমার সন্তানদের কথা শুনিতে এত ভাল বাসেন যে, প্রত্যহই তাহাদের কথা বলি আর তিনি কাঁদিতে থাকেন। আমি বার বার আসিয়া মায়া বাড়াইতে মানা করি—বলি সমাজের লোকে তোমাকে কত কি বলিবে। তাহাতে তিনি বলেন "শুধু দেখিতে আসিতেছি বইত না, তাহাতে কি ধর্ম্মে পতিত হইব? লোকে কিছু বলে বলিবে, তাহাতে কি?"

"ওঃ সন্তানও হইয়াছিল। তাই মায়া ত্যাগ করতে পারেন না বলিয়া প্রত্যহ আসেন।"

"তুমি কি বলিতেছ?"

"আমি তোমায় মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমার যথেষ্ট অর্থ আছে, তুমি যত চাও দিব। তুমি আর আমার স্বামীকে দেখা দিও না। এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাও। তোমার সন্তানের লালনপালনার্থে যাহা কিছু চাই, আমি সমস্ত দিব। তুমি আমার স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আমার জীবন রক্ষা কর। আমি বলিতেছি তোমার নিকট আসিয়া আমার স্বামী ধর্ম্মে পতিত হইতেছেন।

"জগদীশ্বর!!" এই কথা বলিয়া রমণী দুই হস্তে তাহার আনন আচ্ছাদিত করিয়া, নিকটস্থ একটী আসনে বসিয়া পড়িল। ঠিক্ সেই সময় সেই কক্ষে অপর কোনও মনুষ্যের ছায়া পড়িল, চারু ফিরিয়া দেখিল তাহার স্বামী। তাঁহার মুখে চক্ষে বিরক্তি ও ক্রোধের ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রভাসিত হইয়াছে। তিনি চারুর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রোষ-বিকম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন—

"যথেষ্ট হইয়াছে চারু, আর না। আমার সম্মুখে আমার দুঃখিনী ভগিনীকে যথেষ্ট অপমান করিয়াছ। আমি সব শুনিয়াছি। স্ত্রীলোকের স্বভাবকে ধন্য। কথায় কথায় স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস? এই বলিয়া তিনি সেই রমণীর নিকটে গিয়া, সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া, তাহার পার্শ্বে বসিয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "কমলা ক্ষমা কর, বোন। আমার দোষেই তোমাকে আজ এত কষ্ট ও অপমান সহিতে হইল। আমি ভাবিয়াছিলাম, দু এক দিনের মধ্যেই তোমার আপত্তি সত্ত্বেও সব কথা আমার স্ত্রীকে বলিয়া তোমায় গৃহে লইয়া যাইব। কিন্তু আমার আজ সে আশা ফুরাইল।

সুধীরচন্দ্রের চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

চারু চিত্রার্পিতের মত মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গাড়িতে উঠিল। বিন্দা বাবুকে দেখিয়া যথেষ্ট ভয় পাইয়াছিল, গাড়ীওয়ালাকে গাড়ী জোরে ছুটাইতে বলিল। (ক্রমশঃ)

গৃহলক্ষ্মী

নিশ্চিন্ত, মাতার কোলে, বালক যেমতি
লভে সুখের সুষুপ্তি; আমিও তেমতি—
অজ্ঞান তিমিরে, দূরে, ছিলাম নিদ্রিত;
ভুলে কেহ ডাকিত না, ফিরে না চাহিত।
কে তুমি, আমার, আজ, কুটীরে এসেছ?
স্বর্গীয় আলোকে গৃহ উজ্জ্বল করেছ।
অজ্ঞান তিমিরে ঘেরা আমার হৃদয়,
স্বর্গীয় জ্যোতির তুমি করেছ আলয়?
কিন্তু, দেবি! আমি অতি দীন, অকিঞ্চন;
তোমারে পূজিব দিয়া অমূল্য রতন,
নাহি মম হেন শক্তি। হৃদয় আমার
আছে, আছে তাহে প্রীতি, ভক্তি আছে আর।
প্রীতি-ভক্তি উপাদানে পূজিব তোমারে,
"গৃহলক্ষ্মী" তুমি, থাক, গৃহ আলো করে।

প্র, না, চৌধুরী।

বিবিধ তত্ত্ব-সংগ্রহ।

১। একজন উদ্ভিজ্জ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন যে, ইয়োরোপে দশ হাজার, উত্তর আমেরিকার ব্রিটিষাধিকৃত প্রদেশ সমূহে পাঁচ হাজার, অষ্ট্রেলিয়ায় দশ হাজার, ভারতবর্ষে পনর হাজার এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় দশ হাজার বিভিন্নজাতীয় বৃক্ষ লতাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

২। নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিবার প্রথা বহুকাল হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করিবার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রথম সেতু নির্ম্মিত হয়। এই সেতু কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপরে রোমানগণ প্রস্তর দ্বারা সেতু নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন। লৌহ-সেতু প্রথমে চীন দেশে নির্ম্মিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপ খণ্ডে সর্ব্বপ্রথম বৃহৎ লৌহ-সেতু নির্ম্মিত হয়।

৩। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একটী কুক্কুরের কথা বলিতেছি। কথিত আছে ইউলিসিসের একটী কুক্কুর ছিল। তিনি ট্রয়নগরে যুদ্ধযাত্রা করিলে পর তাঁহার কুক্কুরটী বিমর্ষ হইয়া তিনি যে সমুদ্র-পথে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথের দিকে নয়ন ফিরাইয়া বসিয়া থাকিত।

কুড়ি বৎসরকাল সে এইরূপে কাটাইবার পর যখন ইউলিসিস্ ছদ্মবেশে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার কুক্কুরটীই তাঁহাকে প্রথম চিনিতে পারিল এবং চিনিতে পারিয়াই তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল, তাহার পদলেহন করিতে লাগিল এবং তদবস্থাতেই প্রভুর মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিল।!

৩। দেখা যায় কুক্কুর শয়ন করিবার পূর্ব্বে কয়েকবার গোলাকারে ঘুরিতে থাকে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ কুক্কুরের এই অভ্যাসের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কুক্কুর যখন বনবাসী জন্তু ছিল, তখন সে দীর্ঘতৃণ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ধরাশায়ী করিয়া স্বীয় শয়নের স্থান প্রস্তুত করিত। এখনকার গৃহপালিত কুক্কুর উহার পূর্ব্বতন বনবাসী জন্মদাতার সংস্কার পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া অদ্যাপিও অকারণে উক্ত অভ্যাসের দাস হইয়া রহিয়াছে।

৫। এডিসন্ আমেরিকায় একজন সুপ্রসিদ্ধ তাড়িত-বিজ্ঞানবিৎ মহাপণ্ডিত। তিনি সম্প্রতি তাড়িত-শক্তিবাহক একটী যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলেন ঐ যন্ত্রের সাহায্যে ট্রামগাড়ী কিম্বা তাড়িত-শকট অতি অল্প ব্যয়ে চালাইতে পারা যাইবে। এক্ষণে তাড়িতশক্তি উৎপন্ন করিবার জন্য যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার সাহায্যে যে ব্যয়ে ত্রিশ মাইল ট্রামগাড়ী বা তাড়িত-শকট চালান যায়, এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে সেই ব্যয়ে এক শত মাইল চালান যাইবে। এডিসন্ বলেন তাঁহার এই নব তাড়িত-যন্ত্র অল্পব্যয়সাধ্য হওয়াতে আমেরিকায় অল্পকাল মধ্যে অশ্বযানের স্থানে কেবল তাড়িতযানই ব্যবহৃত হইবে। অন্যান্য দেশেও যে কিয়দংশে তাহা হইবে, তদ্বিষয়েও তাঁহার সন্দেহ নাই।

৬। আরবদিগের মধ্যে প্রথা আছে যে, অতিথি অভ্যাগতের সহিত আলাপ পরিচয় হইবার পর গৃহস্বামী যদি তাহাকে কাফি পান করিতে দেন, তাহা হইলে তিনি অতিথির প্রতি কুত্রাপিও শত্রুতাচরণ করেন না। কথিত আছে যে, একদা একজন আরব কলহসঞ্জাত রোষবশে অপর এক আরবের শিরশ্ছেদন করে। তৎপরেই সে দ্রুতপদে নিহত ব্যক্তির পিতার নিকট উপস্থিত হইলে উক্ত ব্যক্তি তাহাকে কাফি পান করিতে দেন। কিয়ৎকাল পরে নিহত ব্যক্তির বন্ধুবর্গ তাহার পিতাকে ঐ নিদারুণ সংবাদ দিবার জন্য উপস্থিত হয়। তাহারা হত্যাকারীকে সেইখানে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে। নিহত ব্যক্তির পিতা হত্যাকারীকে তৎক্ষণাৎ মার্জ্জনা করিলেন। বলিলেন "ঐ যুবককে যখন কাফি পান করিতে দিয়াছি, তখন সে আমার পুত্রবৎ; উহাকে আমি শাস্তি দিতে বলিতে পারি না।"

৭। বিদ্যাবতী রমণীদিগের অনেকেই পক্ককেশা। জেন পোর্টার ৭৪ বৎসর বয়সে মরেন। কুমারী মিটফোর্ড ৬৯; বিবি

মার্সেট ৮৯; বিবি বারবল্ড ৮২; বিবি র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ ৫৯; হানামুর ৮৮; কুমারী হ্যারিয়েট্‌ লি ৯৫; কুমারী এজওয়ার্থ ৮২; বিবি সমারভিল ৯২; ক্যারোলাইন হারসেল ৯৫ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন।

৮। আশ্চর্য্য বিশ্বাস—ফিজি দ্বীপের নরমাংসভক্ষকেরা মাটাওয়ালু নামক দেবতার পূজা করিয়া থাকে, তাঁহার ৮টী উদর এবং আহারের বিশ্রাম নাই। দেবতা যেমন, তাঁহার উপাসকেরাও তেমনি ঔদরিক।

৯। টঙ্গান জাতির বিশ্বাস পূর্ব্বকালে সূর্য্য বড় শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাইত, এই জন্য দিন রাত্রি ২৪ ঘণ্টার অনেক কম ছিল। এক দিন একটী মানুষ এক ফাঁস দিয়া তাহাকে ধরিল, তদবধি সে আস্তে আস্তে যাইতে বাধ্য হইল।

১০। প্রাচীন পেরুভিয়ারা বিশ্বাস করিত যে, সূর্য্য এক সময়ে পৃথিবীতে আসিয়া দুইটী ডিম্ব পাড়িয়া যায়, তাহা হইতেই নরনারীর উৎপত্তি।

১১। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের বিশ্বাস যে, সূর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং চন্দ্র তাহার পত্নী। ইহাদের এক জাতি ভয়ানক গরম দেশে বাস করিত, তাহারা কেবল চন্দ্রের পূজা করিত, বলিত সূর্য্যের পূজার কোনও প্রয়োজন নাই।

কাশ্মীর চিত্র

বিতস্তা বক্ষে নৌকারোহণ।

গত কয়েক দিন ক্রমাগত দুর্গম পার্ব্বত্য পথে টোঙ্গারোহণ-জনিত ক্লেশে শরীরের অস্থিগুলি যেন স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। আজি সেই মহাক্লেশের অবসান হইবে বলিয়া সহযাত্রী অনেক আশা ভরসার কথা বলিলেন। সেই কথা শুনিতে শুনিতে অতি প্রত্যূষে সেই ভয়ঙ্কর শীতে ৩।৪ খানা পুরু কম্বলের অভ্যন্তর হইতে ক্লান্ত দেহ টানিয়া লইয়া যাত্রা করিলাম। "বড়মূলা" পঁহুছিলেই টোঙ্গাপর্ব্ব শেষ হইবে, ভাবিয়া অবসন্ন শরীর মন আবার সজীব ভাবে পূর্ণ হইল। আজি প্রথম হইতে কেবল সমতল ভূমি ভেদ করিয়া চলিতেছি। দুই পার্শ্বে হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্রের কি মনোহারিণী শোভা! বহুকালের পরিত্যক্ত প্রিয়তম জন্মভূমির দৃশ্য যেন চক্ষুর সমক্ষে ভাসিতে লাগিল। দুরারোহ হিমাচল-বক্ষোভ্যন্তরে সুজলা শস্যশ্যামলা এমন সমতল ভূমি যে বিরাজ করিতেছে, নিম্ন ভারতবর্ষের লোক তাহা কি কল্পনায় ভাবিতে পারে? পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ৯টার সময় পথপ্রদর্শক সহযাত্রী "ঐ বড় মূলা দেখা যায়" বলিয়া সম্মুখের দৃশ্যে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। চাহিয়া বোধ হইল, ঠিক্‌ নানাকারুকার্য্যখচিত একখানা সুদৃশ্য গালিচা বিস্তারিত রহিয়াছে। "Who had

not heard the vale of Kashmir?" কবিগুরু মূরের এই কবিতাটী পাঠ করিতে করিতে মনে হইল কবিবর এই মনোহর স্থান প্রত্যক্ষ করিয়াই অমন হৃদয়োন্মাদিনী গীতি-কবিতা লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

"বড় মূলা" পঁহুছিবামাত্র (House Boat এর) নৌকার অধিকারিগণ দলে দলে আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল। কাহার নৌকায় উঠিব? এই কঠিন সমস্যায় পড়িলাম। পথপ্রদর্শক সহযাত্রীটি আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত স্থির করিয়া যখন নৌকারোহণ করিতে আহ্বান করিলেন, তখনকার আনন্দ বর্ণনাতীত। আমাদের মনোনীত প্রকাণ্ড নৌকাখানা অনেক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সকল গুলির মেজেই নূতন সতরঞ্চে আচ্ছাদিত ও প্রচুর-গৃহ-সজ্জা-পূর্ণ। আমরা প্রত্যেকের বাসের জন্য স্বতন্ত্র এক একটা প্রকোষ্ঠ পাইলাম। টোঙ্গার বাসের অসহ্য কষ্টের পর বাসের এমন যে সুবিধা ঘটিবে, তাহা কল্পনায়ও ভাবি নাই। অসহ্য শীত নিবারণ জন্য ঘরে ঘরে সুন্দর চিমনী পর্য্যন্ত দেখিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে দ্রব্যাদি সুশৃঙ্খল করিয়া রাখিলাম। বিতস্তাবক্ষ হইতে চারিদিকের তুষারমণ্ডিত গিরি-মালার প্রশান্ত দৃশ্য লক্ষ্য করিতে করিতে মন শান্তিরসে ডুবিয়া গেল। বিতস্তা এখান হইতে অতি মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হইতেছে! সেই ভীমা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি আজি কোথায় লুকাইয়াছে! নদীটী এখানে এত অপ্রশস্ত যে, উভয় পারের লোক অনায়াসে পরস্পরের সহিত কথা বার্ত্তা বলিতে পারে। খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া প্রায় অপরাহ্ণসময়ে মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। স্রোতের প্রতিকূলে অত বড় প্রকাণ্ড নৌকা "গুণ" টানিয়া চালাইতে চালাইতে তেমন শীতের মধ্যেও তাহারা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইল। রন্ধনের জন্য আর একখানা নৌকা ভাড়া করা হইল। সুন্দর গৃহ অপেক্ষাও এই নৌকা-বাস আরামজনক বোধ করিলাম। এরূপ নৌকারোহণ আমাদের দেশে ধনী লোকের ভাগ্যেও ঘটে না। পথে রজকের সাহায্য পাইবার উপায় নাই, সেই জন্য সকলেই নিজ নিজ পরিধেয় পরিষ্করণের উপকরণ সঙ্গে লইলাম। আজি এমন পুষ্পাভরণা, সুজলা, শ্যামলা ভূমির নয়ন-বিমুগ্ধকরী সুষমা নিরীক্ষণ করিয়া এত দিনের ভ্রমণক্লেশ ও প্রচুর অর্থব্যয় সর্ব্বাংশে সার্থক জ্ঞান হইল। গ্রীষ্ম-তাপিত বিবাদবিসম্বাদপূর্ণ দুর্ভিক্ষপীড়িত নিম্ন ভারতের মলিন দৃশ্য হইতে কাশ্মীর-রাজ্য-প্রবেশ স্বর্গগমন মনে হইল। পরদিন অপরাহ্ণসময়ে "সুরপুর" বন্দরে পঁহুছিলাম। স্থানটী যথার্থই সুরপুর। বিতস্তা এই স্থানে প্রশস্তদেহে ও খর-স্রোতে চলিতেছে। তীরদেশে পরম সৌন্দর্য্যশালী বালকবালিকাগণ গৃহ-কার্য্যে ব্যস্ত। এমন নির্দ্দোষ সৌন্দর্য্য-ভূষিত নরনারী নয়নগোচর করিবার সৌভাগ্য কখনও জীবনে ঘটে নাই।

অনিমেষচক্ষে ইহাদিগের স্নানাদি দেখিতে দেখিতে ভাবিলাম, দিগঙ্গনাগণ বুঝি জল-ক্রীড়া করিতেছে। এ পর্য্যন্ত একটিও খর্ব্বনাসিক কি কৃষ্ণকায় লোক দেখি নাই। যেমন দুগ্ধালক্তবিমিশ্রিত বর্ণ, তেমনি ভ্রূ ও নয়ন যুগল আকর্ণ বিশ্রান্ত! ভ্রমরকৃষ্ণবর্ণ নিবিড় কেশদাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বেণীবদ্ধ ভাবে কটিদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত দেখিয়া বোধ হইল যেন দুর্গা প্রতিমাগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে বিতস্তা-কূলে সজ্জিত রহিয়াছে। শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকের এই অতুলনীয় রূপ দেখিয়া ভাবিলাম, অবস্থাপন্ন লোকের শ্রী কত না আশ্চর্য্য! এই দুরন্ত শীতের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকাগুলির বাসন মাজা, বস্ত্র ধৌত করণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে করিতে অলক্তের ন্যায় রক্তবর্ণ কোমল হস্ত দুখানি নীলবর্ণ হইয়াছে, লক্ষ্য করিয়া ইচ্ছা হইল নিজের হাতে কাজগুলি সম্পন্ন করিয়া এই সুন্দর মূর্ত্তিগুলি পরিস্কৃতভাবে সম্মুখে রাখি। এমন মনোহর কুসুম রাজোদ্যানেই শোভা পাইবার উপযুক্ত। এ দেশের স্ত্রীলোকেরা ক্ষুদ্র শিশুসন্তান বক্ষে লইয়া নৌকাবাহন হইতে ক্ষেত্রাদির কঠিন পরিশ্রমজনক কার্য্য পর্য্যন্ত যেরূপ প্রফুল্লভাবে সম্পন্ন করিতেছে, তাহা দর্শন করিয়া বিস্ময় জন্মিল। বঙ্গদেশীয়া রমণীগণ যে সংসার কার্য্য করেন, ইহাদের তুলনায় তাহা গণনাযোগ্যই মনে হয় না। স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদ যেমন সুন্দর, তেমনি শীলতা-রক্ষণোপযোগী। এসম্বন্ধে সভ্য কলিকাতা-বাসিনীদের কথা স্মরণ হইয়া অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল।

"সুরপুর" একটী বিখ্যাত বন্দর। কাশ্মীরযাত্রীদিগকে কয়েক দিনের আহার্য্য এ স্থান হইতে ক্রয় করিতে হয়। নৌকা লাগাইয়া পথ প্রদর্শক সহযাত্রীটি খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহার্থ বন্দরে উঠিলেন। বিতস্তা পারা-পার জন্য একটী সুদৃঢ় কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু রহিয়াছে। আমি এই সুযোগে নৌকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক বিতস্তার তীর-দেশে অনেক দূর ভ্রমণ ও সূর্য্যাস্তের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। প্রদোষসময়ে উপাদেয় দ্রব্যা-দির বোঝা লইয়া সহযাত্রী প্রত্যাগত হইলেন। রাত্রিতে রাজভোগে ভোজন হইল। আজ এই বন্দরে রাত্রি যাপনের প্রস্তাব শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। বিমল জ্যোৎস্নাপূর্ণ রজনীতে ছাদের উপরে উপবেশনপূর্ব্বক প্রকৃতির প্রশান্ত সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিতে করিতে রমণীকণ্ঠ-বিনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। বাদ্যের তালে তালে নূপুর-ধ্বনিও শ্রুত হইল। মাঝিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, দিনের কঠোর শ্রমের পর গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সঙ্গীত নৃত্যাদি আমোদ পারিবারিক নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য বলিয়া এ স্থানে প্রচলিত। হতভাগ্য বঙ্গদেশের পুরুষগণ কি ঘৃণিত আমোদ প্রমোদের অনুরোধে কত অধঃ-পাতের পথে যায়, গভীর দুঃখের সহিত তাহা স্মরণ হইল। অনুকরণ-পটু

সভ্যতাভিমানী লোকদের প্রকৃতির ক্রোড়ে বর্দ্ধিত এই জাতি হইতে শিক্ষা করিবার বিষয় যে অনেক রহিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? মুসলমান সমাজের প্রচলিত অবরোধ-প্রথা এখানে দৃষ্ট হইতেছে না। আরব রমণীগণ দ্রুত অশ্বারোহণে অকাতরে যাতায়াত করিতেছে। অধিকাংশ দরিদ্র পরিবার গৃহপালিত পশু পক্ষী লইয়া বারমাস নৌকাতেই বাস করে। প্রকৃতি দেশীয় লোকদিগকে অনুপম সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা এত ভয়ানক অপরিষ্কার যে, তাহার বর্ণনা সম্ভবে না।

(ক্রমশঃ)।

আত্ম-বিস্মৃতি।

Our birth is but a sleep and forgetting
The soul that rises with us, our life's star
Hath had elsewhere its setting
And cometh from afar."

স্বপ্নময় এ জীবন সদা মনে হয়,
হেথাকার সুখ দুঃখ
প্রীতিভরা প্রিয় মুখ—
সব যেন এক স্বরে, এক কথা কয়,
স্বপ্নময় এ জীবন সদা মনে হয়।

দিন যায় নিশা আসে,
পুনঃ উষা পরকাশে,
আলোকে আঁধারে কিন্তু এক ভাব রয়,
স্বপ্নময় এ জীবন সদা মনে হয়।

ফুটে ফুল, উঠে চাঁদ সুনীল আকাশে,
বিমল কৌমুদী-দীপ্ত বসুন্ধরা হাসে,
শীত গ্রীষ্ম ঋতু ছয়,
সুখের বারতা কয়
গুঞ্জে অলি কুঞ্জে পিক কুহরে মধুর,
আনন্দ সুখেতে ধরা রহে ভরপুর।

কিন্তু এই কোলাহল সৌন্দর্য্যের তলে
মুগ্ধ শিশু মানবাত্মা কোন্ মন্ত্রবলে!
নিশি দিন হতজ্ঞান,
স্বপ্নে সত্য অনুমান,
লোভ ক্ষোভ হিংসা দ্বেষ উঠে পলে পলে,
মুগ্ধ শিশু মানবাত্মা কোন্ মন্ত্রবলে!

শরীর শোষণ করি পৌরুষসাধন
করে নর কত খ্যাতি বিত্ত উপার্জ্জন,
কত সাধ কত আশা,
কত প্রীতি ভালবাসা—
ছায়া সম আছে তায় করি আবেষ্টন,
তার মাঝে মনে হয় স্বপ্ন এ জীবন।

ক্ষুদ্র শিশু মানবাত্মা বড় ক্ষুধাতুর,
ভোগ্য বস্তু সুখ-সেব্য সংসারে প্রচুর;
দশেন্দ্রিয় দশ হাতে
যোগাইছে বিধি মতে,
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ সুমধুর,
তবে কেন মানবাত্মা আকুল আতুর?
যত পায় তত চায়, আশা ত মিটে না—
অতৃপ্ত সংসার রসে সতত রসনা।

বিভোরে মদিরা পিয়ে,
আছে জ্ঞান হারাইয়ে,
মাঝে মাঝে হয় কিন্তু চকিতে চেতনা,
তখনি উথলি উঠে হৃদয়-বেদনা।

অমনি অলস আঁখি পক্ষ্ম পাল্‌টিয়ে
আপন নিলয় প্রতি দেখে সে চাহিয়ে—
সুবর্ণের ঘর,দ্বার,
পিতা মাতা আপনার
কত দূর আসিয়াছে পশ্চাতে ফেলিয়ে,
উঠে অতীতের স্মৃতি সকলি জাগিয়ে।

শরীরের রক্ত-স্রোত প্রত্যেক শিরায়
উদ্বেলিত—উত্তেজিত তীব্রগতি ধায়।

উন্মত্ত পাগল পারা
ছুটে যায় দিশেহারা,
সংস্কারের শত রজ্জু কিন্তু বাঁধা পায়,
না চলিতে বদ্ধ জীব পড়য়ে ধরায়।

অমনি আসক্তি কুল শত কোলাহলে
স্নেহের চুম্বনে তায় তুলে লয় কোলে,
মোহের ব্যজন করে
ধীরে ধীরে সেবা করে,
স্বরগের শিশু ডুবে নরকের তলে,
পূর্ব্ব স্মৃতি লুপ্ত হয় বিস্মৃতির জলে।

শ্রী শ—

বনবাসিনীর পত্র

বনযাত্রার বিবরণ।

নন্দগ্রামে যাত্রা করিয়া "পাবন" সরোবরের ধারে যাত্রা স্থাপিত হইল। শুনা যায় শ্রীমতী রাধিকা জীউয়ের প্রিয়সখী বিশাখা দেবীর পিতা এই সরোবর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এখানে বনের বিশেষ কোনও শোভা নাই। মধ্যে মধ্যে বন এবং একাদশটী কুণ্ড আছে। কুণ্ডগণের নাম যথা—মতি কুণ্ড, খেলওয়ারী কুণ্ড, ছাঁচ কুণ্ড, আচ কুণ্ড, জলবেহার কুণ্ড, কৃষ্ণ কুণ্ড, ললিতা কুণ্ড, উদ্ধব কুণ্ড, যশোদা কুণ্ড, সূর্য্য কুণ্ড, এবং মোহন কুণ্ড। এখানেও বর্ষাণের ন্যায় পাহাড়ের উপর দর্শন। এই পাহাড়ের উপর ব্রজবাসিগণ বাস করেন এবং এখানে হাট বাজারের ন্যায় অনেক দোকান পসার আছে। পাহাড়ের তিন স্থানে নন্দ বাবা, যশোদা মা এবং কানাই বলাই নামক বিগ্রহ দর্শন আছে। এই মন্দিরটী অতি সুন্দর এবং রাজবাটীর ন্যায় সুপ্রশস্ত। গোঁসাইজী এখানে এক রাত্রিতে সমুদয় শিষ্য শিষ্যাণী লইয়া নৃত্য গীতাদি করিয়া থাকেন। চাঁদনী রাত্রিতে উচ্চ পাহাড়ের উপরে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিত মনোহর দেবমূর্ত্তি দর্শন এবং সহস্রাধিক লোকের নৃত্যগীত-বাদ্য প্রভৃতির মহানন্দ কোলাহল এবং নিম্নে বহুদূরব্যাপী নীরব নির্জ্জন ধবলাকার প্রান্তর এবং কচিৎ দুই একটী লতাকুঞ্জের ঝোপ ধ্যানমগ্ন ঋষির নির্জ্জন কুটীরের ন্যায় শোভমান! এই উচ্চ

স্থানের বায়ু কখনও মৃদু ভাবে চামর ব্যজন করিতেছে, কখনও শোঁ শোঁ শব্দে বহিয়া ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। মন্দির-প্রাঙ্গণের বাতায়ন সন্নিকটস্থ ছত্রীর উপর বসিয়া এই সমস্ত প্রাকৃত অপ্রাকৃত দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে মন কখনও উদাস ভাব ধারণ করে; কখনও ভূলোক ছাড়িয়া বুঝি ব্রহ্মলোকে আসিয়াছি বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া যায়। এই সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কি এক ভাবে মুগ্ধ হইয়া প্রায় সকলেই নৃত্যগীত করিতে থাকে। এই মহা-নৃত্যের পরে গোঁসাইজী স্বহস্তে লাড়ু, পেড়া, বর্‌ফি প্রভৃতি রাশি রাশি মিষ্টান্নের হরিরলুট করিয়া থাকেন এবং অসংখ্য কণ্ঠের "কানাইয়া লালকী জয়, দাউ-দয়ালকী জয়, নন্দবাবা যশোদা মেইয়াকী জয়" প্রভৃতি জয়ধ্বনিতে অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত হয়। অপর যে দুই স্থানে দর্শন আছে, তথায় কোনও সমারোহ হয় না। একটী মন্দিরে যশোদানন্দন নামে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন আছে। অন্য একটী মন্দিরে গিরিধারিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। আর নিম্নে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তি, মহাপ্রভুর বৈঠক এবং একটী শিবমন্দির আছে এবং পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডগুলির তটে তটে এক একটী দেব-মূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। নন্দগ্রামে তিন দিন বাস করিয়া যাত্রা উঠিল। পথিমধ্যে মধুকুণ্ড, ঝুম্‌নি কুণ্ড, গোবিন্দ কুণ্ড এবং ললিতা কুণ্ড ছাড়াইয়া করেলা নামক স্থানে যাত্রা স্থাপিত হইল। করেলা চন্দ্রা-বলীর শ্বশুরালয়। এ স্থানের কোনও সুন্দরত্ব নাই, কেবল অপ্রশস্ত বিলের ন্যায় একটী কুণ্ড আছে এবং নিকটস্থ গ্রাম মধ্যে শ্রীনাথজীর মুকুট বলিয়া একটী মুকুট এবং দাউজী দর্শন আছে। এখানে এক দিন বাস করিয়া প্রভাতে পথিমধ্যে বিছুয়াবন নামক অতি মনোহর একটী বনে যাত্রা স্থাপিত হইল। এখানে গোঁসাইজী রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। আমরা বনের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রাস-লীলা উপেক্ষা করিয়া সেই বহুদূর-বিস্তৃত গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগি-লাম। যতই বনমধ্যে প্রবেশ করি, ততই বনের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতে লাগি-লাম। কাননের শোভার সীমা নাই—কোন স্থানে বিবিধ কুসুমপূর্ণ লতাকুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কুসুমগন্ধে, ভ্রমর-গুঞ্জনে, দৃশ্যের রমণীয়তায় মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইতেছি; কোন স্থানে মুকুলিত তরূপরি নানাবিধ বিহঙ্গম-গণ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শ্রবণ-রসায়ন মধুর গীতি গান করিতেছে, উক্ত তরু-তলে বসিয়া একাগ্রচিত্তে কতক্ষণ তাহাই শুনিতেছি; কোন স্থানে শিখিগণ বিস্তারিতপুচ্ছে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে দেখিয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছি। শিখিগণ আমাদিগকে দেখিয়া বনমধ্যে লুক্কায়িত হইতেছে আর কেকা রবে ডাকিয়া যেন অন্য সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেছে এবং সকলেই সমস্বরে যেন ঘৃণাব্যঞ্জক

স্বরে ডাকিয়া উঠিতেছে। এইরূপ বিচরণ করিতে করিতে আরো একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হইল। দেখিলাম অনতিদূরে একটী প্রকাণ্ড মৃগযূথ। সেই মহাযূথের সকল মৃগগুলিই স্বর্ণবর্ণ, কেবল একটি কৃষ্ণবর্ণ; আবার সেই কৃষ্ণবর্ণ হরিণটীকে মধ্যস্থলে রাখিয়া অন্যান্য হরিণগুলি তাহার চারিদিকে বেড়িয়া পরমানন্দে বিচরণ করিতেছে। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দর্শনে আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। আমরা উক্ত দৃশ্য আরো ভাল করিয়া দেখিবার আশায় তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম; কিন্তু অবোধ মৃগকুল তাহা বুঝিল না। অথবা যেমন শুনিয়াছি দেববালাগণ লোকচক্ষুর অগোচর নীরব শান্তিময় কাননে প্রেমের খেলা খেলিতে খেলিতে সহসা পাপী তাপী নর মানবকে দেখিয়া চমকিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়; আমাদিগকে দেখিয়া এই মৃগযূথও তদ্রূপ ঊর্দ্ধে কর্ণ তুলিয়া সচকিত নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া বায়ুবেগে দীর্ঘ দীর্ঘ লম্ফে পলাইতে আরম্ভ করিল এবং ক্ষণকালের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমাদের দেখার সাধ মিটিল না, নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। কিন্তু হৃদয়মধ্যে যেন কি আগুন জ্বলিতেছিল; কোন মতে শান্ত করিতে পারিতেছিলাম না। ইতিমধ্যে শ্যামল তমালের নিবিড় বন দেখিতে পাইয়া উভয়ে তমাল বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কতক্ষণ তথায় বসিয়া উভয়েই পাগলের মত আবোল তাবোল কত কথাই বকিলাম। মনেরও স্থিরতা নাই, কথারও ঠিক্ নাই. কতই হাসিলাম, কতই কাঁদিলাম। এই সময় আমাদের এই ভাব যদি কেহ দেখিত, তবে যথার্থই উন্মাদ না বলিয়া থাকিতে পারিত না। এ দিকে বাসাবদন হইতে কতদূর আসিয়া পড়িয়াছি তাহার স্থিরতা নাই; কখন আসিয়াছি, কখন যাইব কিছুই মনে নাই। কতক্ষণই বসিয়া আছি। সঙ্গিনী আমার বেশ সঙ্গীত করিতে পারে। আমি বলিলাম ভাই! তুমি গান করিয়া মনকে শান্তিদান কর। তখন সঙ্গিনী সেই সময়োচিত সঙ্গীত প্রণয়ন করিয়া গাহিতে লাগিলেন :—

কোন্ বনে লুকায়ে আছ ওহে বাঁকা বংশীধারী।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ ওহে প্রাণসখা হরি॥
(তোমার)　বনবিহারী নাম শুনে,
　　ভ্রমণ করি বনে বনে,
লুকায়ে আছ কোন্ বনে, দাসীরে নৈরাশ করি॥
(আমরা)　দেখা পেলে তরুলতা,
　　জিজ্ঞাসি তোমার বারতা,
(তারা) দুঃখী দেখে কয়না কথা, ওহে দীনবন্ধু হরি।
সুধাই যদি মৃগকুলে, তোমার কথা দেয় না বলে,
বায়ুবেগে ধায় যে চলে, সচকিত দৃষ্টি করি।
ময়ুর ময়ুরী দেখে, তোমার কথা সুধাই ডেকে,
(তারা) পরিহরি যায় আমাকে, কেকারবে ঘৃণা করি।

সুধাই যদি গিরিবরে, কোথায় আছেন গিরিধরে,
সহজে দেয় নিরুত্তরে, সে ত মুনি মূর্ত্তি ধারি।
(তবে)　কে দরদি আছে হেথা,
　　কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা,
কারে বা কই মনের কথা; চারিদিক্ শূন্য হেরি।

বসন্ত-কামিনী ভণে, এস হে হৃদয় কাননে,
দাঁড়াও হে শ্রীরাধার সনে; হেরিব যুগল মাধুরী।

গীতি সমাপ্ত হইলে পর বহুদূর হইতে বালককণ্ঠে হৈ হৈ শব্দ শুনিতে পাইলাম। চাহিয়া দেখি কতকগুলি মহিষ লইয়া কয়েকটী বালক বনমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তখন যেন আমাদের ঘুমঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, সত্বর যাত্রাভিমুখে গমনোদ্যত হইলাম। কিন্তু নিবিড় কাননে প্রবেশ করিয়াছি, কোথায় বা পথ, কোথায় বা যাত্রা, কিছুরই নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন চঞ্চল হইল এবং বালকগণের নিকটেও যাত্রার কোনও সন্ধান না পাইয়া একটু চিন্তিত হইলাম। পরে যখন সেই বিপদ্‌হারীর চরণে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিলাম, তখন যেন সাহস পাইলাম এবং উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলাম—"তোমার হাতে করি আত্ম সমর্পণ, রাখ আর মার যা ইচ্ছা আপন—এ মহা পাতকী তোমার হাতে মলে নবজীবন পাবে।" ইত্যাদি বলিতে বলিতে যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিলাম। কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছি, কোন্ দিকে যাইতেছি কিছুরই স্থিরতা নাই—যাত্রারও কোনও সাড়া শব্দ নাই। কতক্ষণ এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে কতকগুলি কাহার অর্থাৎ যানাদিবাহককে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে যাত্রার লোক বলিয়া চিনিলাম। তাহারা যেখানে বড় বন দেখে, তথা হইতে অনেক কাষ্ঠ সংগ্রহ করে, কারণ সকল স্থানে কাষ্ঠ মিলে না। তখন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ হাঁটিয়া যাত্রা পাইলাম। বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, যাত্রীদের অনেকেরই ভোজন ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা তাড়াতাড়ি পিয়াস নামক কুণ্ডে স্নান করিয়া মাধুকরীতে প্রবৃত্ত হইলাম। যথাযোগ্য মাধুকরী সংগ্রহ করিয়া আহার করিতে না করিতে যাত্রা উত্থানের সময় হইল। ত্রস্তভাবে আহারাদি সমাপন করিয়া যাত্রীর সঙ্গে চলিলাম। পথিমধ্যে খদির নামক বন, খয়ের নামক গ্রাম, খয়ের নামক কুণ্ড, দাউজী, গোপীনাথজী এবং সত্যনারায়ণ দর্শন করিয়া জাবটে যাত্রা চলিল। (ক্রমশঃ)।

ঈশ্বরের নামাবলী।

(৪৪৪-৪৫ সংখ্যা—৩৩৫ পৃষ্ঠার পর)।

ঝঞ্ঝাটহরণ, ঝটিতি-দুঃখনিবারণ, ঝাড়ন, ঝুলী। (১)

টলন-রহিত, টীকাটিপ্পনীহীন, টানের বস্তু, টোপর।

ঠগবঞ্চন, ঠগলাঞ্ছন, ঠকুর, ঠাকুর, ঠিক্ বস্তু।

ডঙ্কাবাদক, ডম্বরহীন, ডর-বিহীন, ডর-নিবারণ, ডিম্বোদ্যত, ডিয়স্ (২), ডোরবন্ধক।

(১) ভক্তের হৃদয়-সম্বল।

(২) লাটিন ভাষায় ঈশ্বরের নাম।

ঢক্কাবাদক (৩), ঢাকন, ঢাকা, ঢাল (৪), ঢুণ্ডি।

তটস্থ, তটিনীবিহারী, তড়িৎভব, ততস্ত-তোহস্তঃ, তৎপর, তৎসৎ, তত্ত্ব, তত্ত্ব-বিদ্, তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বাতীত, তত্ত্বাবধায়ক, তত্ত্বাবধারক, তত্ত্ববিদ্, তন্ত্রমন্ত্রসাধন-ধন, তন্নতন্নবিচারলব্ধ, তপোলভ্য, তমোঘ্ন, তমোপহ, তমোহর, তরি, তলাতলাতীত, তর্কাতীত।

তাত, তাৎপর্য্য, তাৎপর্য্যগ্রাহী, তাপ-নাশন, তাপিতহৃদয়রঞ্জন, তারণ, তারক, তারকব্রহ্ম, তারা, তারিণী।

(৩) ধর্ম্মের ঢাক যিনি বাজান। (৪) বিশ্বাসীর অম্লাচ্ছাদক।

তিতিক্ষু, তিলক, তীক্ষ্ণতম, তীর্থপতি, তীব্রজ্যোতিঃ।

তুরীয়, তুলনারহিত, তুষ্টিদায়িনী, তৃপ্তি-হেতু, তৃষিত-হৃদয়-বারি, তেজঃ, তেজস্বী, তেজোময়, তেজোরূপঃ, তোষণ, তোল-কারী (৫), ত্যাগী।

ত্রাসন, ত্রাসনাশন, ত্রাসিতাশ্রয়, ত্রাণ-কর্ত্তা, ত্রাতা, ত্রিকালদর্শী, ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিগুণাতীত, ত্রিগুণাত্মক, ত্রিজগৎপতি, ত্রিতাপহরণ, ত্রিদশগুসেবিত, ত্রিদশনাথ, ত্রিদিবেশ, ত্রিধাম, ত্রিভুবনপতি, ত্রিলো-কেশ, ত্রুটিনাশন, ত্রুটিহীন, ত্রিবর্গফল-বিধাতা, ত্রিসন্ধ্যাবন্দিত, ত্রৈগুণ্যাতীত, ত্র্যম্বক।

(৫) বিচারক।

সত্যশতকম্।

সত্যধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্ম কুরুতে নরঃ।
তদেব সফলং কর্ম্ম সত্যং জানীহি সুব্রতে॥

সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ যে কর্ম্ম করয়,
সফল সে কর্ম্ম হয়, জানিও নিশ্চয়। ৩১

নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥

সত্যসম ধর্ম্ম, পাপ মিথ্যার সমান
নাই ভবে, তাই সবে সত্যে সঁপ প্রাণ ৩২

সত্যব্রতাঃ সত্যনিষ্ঠাঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ।
কুলসাধনসত্যা যে নহি তান্ বাধতে কলিঃ॥

সত্য ব্রত সত্যধর্ম্ম, যদি সত্যে মতি।
দুরন্ত কলিও তবে না করে দুর্গতি॥৩৩

মনোবাক্যসমং সাধুং প্রকৃতব্যবহারিণম্।
চিন্তামণিমিবোদারং প্রবাঞ্ছন্তি নরামরাঃ॥

মনোবাক্য সাধু যার সত্য আচরণ,
চিন্তামণি সম তারে বাঞ্ছে সর্ব্বজন ৩৪

সত্যমাসাদয় পরং সত্যান্মুক্তির্হি লভ্যতে।
তদেতামমলাং দৃষ্টিমবলম্ব্য মহামতে॥

সত্যোদয়ে মানবের নিশ্চয় মুকতি,
নির্ম্মল নয়নে সত্য হের মহামতি ৩৫

শিবিভূপঃ কপোতায় মাংসমঙ্গবিকর্ত্তনম্।
দদৌ মুদিতয়া বুদ্ধ্যা অঙ্গীকৃততয়ানয়া॥

সত্যবাদী শিবিরাজ সত্যের কারণ,
দেহমাংস কবুতরে করে বিতরণ। ৩৬

বরং কূপশতাদ্বাপী বরং বাপীশতাৎ ক্রতুঃ।
বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাদ্বরম্॥

শত কূপ হতে বাপী শ্রেষ্ঠ যেইরূপ,
শত বাপী হ'তে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সেইরূপ;

শত যজ্ঞ হ'তে শ্রেষ্ঠ পুত্র একজন,
শত পুত্র হ'তে শ্রেষ্ঠ সত্য সনাতন। ৩৭
প্রকটেহত্র কলৌ দেবি সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ।
স্থাস্যত্যেকং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ো ভবেৎ॥
কলিতে দুর্ব্বল হবে ধর্ম্ম সমুদয়,
বলবান্ সত্য রবে, হও সত্যময়। ৩৮
সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপোব্যর্থমূষরে বপনং যথা॥
সত্য বিনা জপতপ বৃথা দেবার্চ্চন,
সকলি নিষ্ফল যথা উষরে বপন। ৩৯
সত্যধর্ম্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা।
অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
শৌচে সত্যে ধর্ম্মে সদা শুদ্ধ আর্য্যগণ,
দেহ শুদ্ধ জলে, সত্যে শুদ্ধ হয় মন। ৪০
মিত্রাণি বন্ধুরিপবো রাজানো ব্যবহারিণঃ।
সত্যবাদিনি তত্ত্বজ্ঞে বিশ্বসন্তি মহাধিয়ঃ॥
শত্রু মিত্র রাজা কিংবা ব্যবহারি-জন,
সত্যবাদী জনে করে বিশ্বাস স্থাপন। ৪১
সর্ব্বসম্পৎপ্রদং ভগং সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্।
সত্যবাণী সুলতায়াঃ ফলং ভবতি পাবনম্॥
সকল সম্পত্তি লাভ সৌভাগ্যবর্দ্ধন,
সুফল সুকথা-লতা করে বিতরণ। ৪২
দ্বন্দ্বোপশমসীমান্তং সংরম্ভজ্বরনাশনম্।
সর্ব্বদুঃখাতপাম্ভোদং সুনৃতং হি রঘূত্তম॥
দ্বন্দ্বদুঃখ ক্রোধজ্বর সত্যে নষ্ট হয়,
দুঃখ আতপের সত্য অম্বুদ নিশ্চয়। ৪৩
মিত্রীভূতাখিলরিপুর্যথাভূতার্থদর্শনঃ।
দুর্লভো জগতাং মধ্যে সত্যামৃতময়ো জনঃ॥
সত্যে শত্রু মিত্র সত্যে বিভু দরশন,
দুর্লভ জগতে বটে সত্যবাদী জন। ৪৪
নানিষ্টাৎ প্রপলায়ন্তে নেষ্টাদায়ান্তি তুষ্টতাম্।
প্রকৃতক্রমসংপ্রাপ্তাস্তত্ত্বজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ॥
ইষ্টানিষ্টে সত্যবাদী তুষ্ট রুষ্ট নয়,
আপন কর্ত্তব্য সত্যে রাখে সে হৃদয়। ৪৫
অনপায়ি সুখং সারং সুনৃতাদ্ যদবাপ্যতে।
ন তদা সাধ্যতে রাজ্যান্ন কান্তাজনসঙ্গমাৎ॥
অক্ষয় আনন্দ হয় সত্যে যেইরূপ,
কান্তা-সহবাসে রাজ্যে নহে সেইরূপ। ৪৬
সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি॥
সত্যরূপ পরব্রহ্ম সত্যে তপোদয়,
সত্যমূল ক্রিয়াসব, সত্য শ্রেষ্ঠ হয়। ৪৭

নূতন সংবাদ।

১। দিল্লী দরবারে রাজ-সহোদর কনটের ডিউক সম্রাট্ এডওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্ব করিবেন। ডিউক সস্ত্রীক ডিসেম্বরের শেষে ভারতে পৌঁছিবেন।

২। ভারতের প্রধান সেনাপতি পামারকে বিদায় দান করা হইয়াছে। নূতন প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনার শীঘ্র ভারতে পৌঁছিয়া স্বীয় পদ গ্রহণ করিবেন।

৩। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক ও গ্রন্থকার এমিলে জোলা গৃহমধ্যে নিদ্রাকালে আলোর বিষাক্ত বাষ্প আঘ্রাণে প্রাণ হারাইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীও মরিতে মরিতে বাঁচিয়াছেন।

৪। বিশ্ববিদ্যালয়াবলী কমিসনের রিপোর্টের উপর মন্তব্যসহ এক সার্কুলার পত্র লর্ড কুর্জন সকল প্রদেশীয় শাসন-

কর্ত্তার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় লইয়া নূতন আইন ব্যবস্থাপন করিবেন। তাঁহার বাণী কতকটা অভয়প্রদ।

৫। ভারতপ্রান্ত চিত্রলে গত ৬ই অক্টোবর ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া অনেক অনিষ্টাপাত হইয়াছে।

৬। ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণ ফণ্ডে ত্রিপুরার মহারাজা ২০০০৲ এবং দ্বারভাঙ্গার মহারাজা রামেশ্বর সিং ১৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৭। বর্দ্ধমানের যুবক মহারাজার অভিষেক অনুষ্ঠান নবেম্বরে হইবার কথা ছিল, ছোট লাটের পীড়া আরোগ্য না হওয়াতে তাহা স্থগিত হইয়াছে।

৮। মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকে ১০ লক্ষ টাকার কিছু অধিক ব্যয় হয়, ৭ম এড্ওয়ার্ডের অভিষেকে ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পড়িয়াছে। সরকারী ব্যয় ছাড়া আরও কত ব্যয় হইয়াছে। তার পরে ভারতে দরবার প্রভৃতিতে ব্যয়।

৯। বুয়ার কয়েদীদিগের হাজার হাজার এখনও সেণ্ট হেলেনা, সিংহল প্রভৃতি স্থানে আছে। সেনাপতি বোথা প্রভৃতি ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দুঃস্থ দেশবাসীদের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

১০। আগামী ২৩এ ডিসেম্বর আমেদাবাদ নগরে অষ্টাদশ কনগ্রেস বসিবে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

১১। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের রবার্ট নামক এক নিগ্রো ভারত সিবিল সার্বিস পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১২। বুয়ার সেনাপতি ডিওয়েট দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ বিষয়ে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, অষ্ট্রেলিয়ার এক গ্রন্থপ্রচারক তাহা ৩ লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন।

১৩। ফ্রান্সে বিবাহিত দম্পতীদিগের শতকরা ২০ জন নিঃসন্তান। সভ্যদেশের রীতিই স্বতন্ত্র।

১৪। আমেরিকার ভেনজিউলা প্রদেশে রাজবিদ্রোহ হইয়া মহা সমর চলিয়াছে।

১৫। আফ্রিকায় এক পাগলা মোল্লা অনেক দলবল সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ পক্ষের কতক সেনা ও সেনাপতিকে হতাহত করিয়াছে।

১৬। নিউ ইয়র্ক সহরে ১বৎসরের মধ্যে যে দিন সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাহা ১৫ ঘণ্টা, লণ্ডন সহরে ১৬॥ ঘণ্টা, সেণ্ট পিটর্সবর্গে ১৯ ঘণ্টা, ফিনলণ্ডে ২২ ঘণ্টা এবং স্পিটস্বার্গেনে ৩॥ সাড়ে তিন মাস।

১৭। কালিফোর্ণিয়া দ্বীপে একটী সুবৃহৎ বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার পরিধি ১৫৪ ফুট ৮ ইঞ্চি। এই বৃক্ষ বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সমুদায় বৃক্ষ অপেক্ষা বৃহৎ।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। প্রেম—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত—২য় সংস্করণ। আমরা এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সমালোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয় সংস্করণ আরও সুন্দর আকারে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এ পুস্তক সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই বলা যায় যে, প্রেমের নিদান, উচ্ছ্বাস ও পরিণতি সকলি ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। প্রেম সম্বন্ধে দেশীয় বিদেশীয় প্রেমিক মহাজনদিগের রসামৃত পূর্ণ উক্তিতে গ্রন্থখানি সুসজ্জিত। ইহার যে অংশ পাঠ করা যায়, তাহাই ভাল লাগে। ইহা পাঠে হৃদয় পবিত্র হইয়া পূর্ণ পবিত্র প্রেমময়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরূপ পুস্তকের উপযুক্ত বহুল সমাদর প্রার্থনীয়।

২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগের কার্য্যবিবরণ—১৯০১ সালের আয় পূর্ব্বস্থিত সহিত ৮৫৪॥৶০, ব্যয় ৪৫৩৸০ বাদে হস্তে স্থিত ৪০০৸৶০ আনা। এই ফণ্ড হইতে গত বৎসর ২০টী বিধবা, ১৭টী ছাত্র, ৪টী ছাত্রী, ৬টী অন্ধ, ১টী কুষ্ঠী ও ৮টী দুঃস্থ পরিবার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। সাহায্য জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে দরিদ্রদিগকে প্রদত্ত হয়। এরূপ অনুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে সর্ব্বসাধারণের সাহায্যদান বিধেয়।

৩। বঙ্গমঙ্গল—মূল্য ৶০ আনা। লেখকের নাম নাই, ৯৮ নং হারিসন রোড শ্রীকুঞ্জবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি সুকবির হৃদয়ের ভাষায় লিখিত এবং দেশহিতৈষণার উদ্দীপনাপূর্ণ। ইহা প্রত্যেক বঙ্গবাসীর পাঠ্য। এইরূপ ভাবগ্রহ করিতে করিতে যদি মৃত বঙ্গে জীবন আইসে।

বামারচনা।

সম্বৎসর।

(ছোট মামীর শোকস্মৃতি।)

হইতেছে কালচক্র ঘূর্ণিত সদাই ;
কত হৃদিপিণ্ড তায় নিষ্পেষিত হয়ে যায়,
উচ্চ নীচ ধনী দীন ভেদাভেদ নাই।
সেই দিন পুনঃ আজি দিল দরশন,
যে দিন নিষ্ঠুর কাল ছিন্ন করি স্নেহজাল
হরিয়া লইল সেই কুমারী-রতন।

সেই দিনে বিভুবালা কাঁদায়ে সবায়
ভবন আঁধার করি ধরাধাম পরিহরি
ভু-দরশন তরে গেল অমরায়।
সেই দিন হতে বিভু-শূন্য নিকেতন
করিতেছে হাহাকার, শূন্য শয্যা গৃহ তার
দেবী বিসর্জ্জন-অন্তে মণ্ডপ যেমন।

বিভুর বিয়োগে শুধু গৃহশূন্য নয়,
কত স্নেহময় প্রাণ শোকানলে দহ্যমান
হইয়াছে চিরতরে নিরানন্দময়।
যে আঘাতে সেই দিন হৃদি হৈল চূর,
আরোগ্য না হল আর, তদুপরি পুনর্ব্বার
দারুণ আঘাত কৈল নিয়তি নিঠুর।
মানব-হৃদয় বুঝি বজ্রলেপময়!
সহে এত ঝঞ্ঝাঘাত, এত ঘাত প্রতিঘাত,
তথাপিও এ হৃদয় বিদীর্ণ না হয়।
অশান্তি অনলে মন অহরহ জ্বলে,
দাবানলে দহে বন, জানে তাহা সর্ব্বজন,
কে জানে দহিছে হৃদি সদা কি অনলে?

সম্বৎসর কাল আজি হইল পূরণ—
দেখি নাই বিভুবালা, সে হাসি অমিয়-ঢালা,
সরলতা-মাখা মুখ সুষমা-সদন।
গাহিতে গাহিতে পুণ্যময় বিভু নাম
মর্ত্ত্যলোক পরিহরি গিয়াছ অমরাপুরী
জননীর স্নেহ-ক্রোড়ে লভিতে বিরাম।
নহে এ মাটীর ক্ষিতি তব যোগ্য স্থান,
দুঃখময় এই দেশ নাহিক শান্তির লেশ,
দেবীর উচিত নহে হেথা অবস্থান।
নিজ যোগ্য স্থানে বিভু গিয়াছ এক্ষণে—
জগদীশ-কৃপা-বলে জননীর স্নেহ-কোলে
সুখে থাক চিরদিন শান্তি-নিকেতনে।

সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে।

জাগরে সুষুপ্ত বীণা জাগ আর বার,
মধুর ঝঙ্কার তুলে
গাহরে বিষাদ ভুলে,
উঠুক নিখিল বিশ্বে আনন্দ অপার ॥১
বাজরে নীরব বীণা বাজ একবার।
যে সুরে বাজিয়াছিলে
ইন্দ্রপ্রস্থ যজ্ঞস্থলে,
যুধিষ্ঠির রাজসূয়ে নহে বর্ব্বিবার ॥২
সেই সুমঙ্গল সুরে আজিও গাহরে।
যুগ যুগান্তর পরে,
ভারতের বক্ষপরে,
রাজ-অভিষেক শোভিছে ফিরে ॥৩
বাজরে মধুর বীণা উৎসাহ ভরে।
ব্রিটিষের সিংহাসন,
পুন আজি সুশোভন,
বিক্টোরিয়া-সুনন্দন বিরাজ করে ॥৪

বাজরে নীরব বীণা মৃদু গম্ভীরে।
বিঘ্ন বাধা শত শত,
ব্যাধি পীড়া দুষ্ট ক্ষত,
দুঃখ ব্যথা ঢেকে ছিল রাজ-শরীরে ॥৫
বলরে নীরব বীণা আজি সবারে।
এড়াইয়া নানা ক্লেশে,
স্নিগ্ধ বরষার শেষে,
ঝলমল রাজশিরে মুকুট করে ॥৬
রাজ-অভিষেক গাথা গাহরে ফিরে।
নাহিরে বাল্মীকি ব্যাস,
কে পূরাবে অভিলাষ,
প্রাচীনে নবীন গাথা রচিবে ধীরে ॥৭
গাহরে আমার বীণা সুখ-লহরে।
সপ্ত সমুদ্রের বারি,
আন সবে সুরনারী,
শুভাশীষ বরষি সম্রাটশিরে ॥৮

এসগো বীণাবাদিনী নন্দনবনে।
মিলিয়া অমরাকুল,
তুলিয়া মন্দারফুল,
ধরগো বিজয়-মালা রাজ-সদনে ॥৯
কল্যাণ মঙ্গল বাণী বীণা-স্বননে
মুক্তপ্রাণ যুক্তকরে,
প্রফুল্ল প্রীত অন্তরে,
যাচগো ভারত-প্রজা বিভু চরণে ॥১০
সুবর্ণ ফলিত হোক রাজ-প্রাঙ্গণে,
দুর্ভিক্ষ দরিদ্র হীন
অন্ন বিনা তনু ক্ষীণ
আছে প্রজা লাখে লাখে দীননয়নে ॥১১
রাজ-নীতি ধর্ম্ম-নীতি গাহগো বীণা,
দীনাতুর ধনবান,
কর সবে সাবধান,
ইঙ্গিত কটাক্ষপাত তব করুণা ॥১২
আজিকে আনন্দ শুধু গাহগো বীণা।
আহারে বা অনাহারে;
রোগে শোকে সকাতরে,
মুছিয়া নয়নধারা চাপি বেদনা ॥১৩
সর্ব্বকণ্ঠে সমতানে গাহগো বীণা
অভিষেক সুখ-গীতি
পরিহরি ভয় ভীতি,
শ্বেত কৃষ্ণ ভেদ রীতি আর রবে না।
নিত্য শান্তি নিত্য প্রীতি নিত্য বর্দ্ধনা ॥১৪
নব যুগে রামরাজ্য করি কামনা,
জয় জয় ধ্বনি আজি ঘোষরে বীণা ॥১৫

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

হেমন্ত উৎসব।

নব হেমন্তের শিশির-স্নিগ্ধ প্রকৃতি-বক্ষ।
নব হেমন্তের জোছনা-সিক্ত, গগন-কক্ষ ॥
নব হেমন্তের প্রভাত সমীর শীতল মন্দ,
নব হেমন্তের সৌরভ-পূরিত কুসুম-গন্ধ।
আবার গাহিল নূতন হরষে নবীন ছন্দ ॥
বিমল হর্ষে ডাকিল সঘনে, জীমূতমন্ত্রে,
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় এসহে এসহে সোদর বৃন্দে।
আশার আলোক শুভ বরদান সাজায়ে অর্ঘ্য
মধুর আহ্বানে ডাকিছে ভগিনী সোদর বর্গ।
ভ্রাতা ভগিনী আনন্দ হর্ষ হৃদয়-নেত্রে।
মাগিছে কল্যাণ হৃদয় ভরিয়ে একাগ্রচিত্তে।
দুঃখহরণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আশীষ বিন্দু
উথলে হৃদয়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়, প্রীতি সিন্ধু ॥
একতা বর্দ্ধনা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় পূত সৌহৃদ্য।
স্নেহ কবচ অটুট অচ্ছিন্ন চির অভেদ্য ॥
সুখ সম্পদ ধনৈশ্বর্য্য, বিভবালোকে।
দুঃখ বিপদে দীন দরিদ্রে, অন্ধ বিপাকে ॥
স্নিগ্ধ বসন্তে তপ্ত আতপ শৈত্য তুষারে।
এ শুভ সম্ভার উজল দীপ্ত প্রাণ আধারে ॥
নব হেমন্তের শুক্ল দ্বিতীয়া জগত-ধন্য,
ভ্রাতা ভগিনী, থাক উভয়ে চিরপ্রসন্ন।

শ্রীন দেবী।

Registered No. C. 134

No. 472. December, 1902.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ। ৪৭২ সংখ্যা। অগ্রহায়ণ, ১৩০৯। ডিসেম্বর, ১৯০২। ৭ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৯নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ১নং আর্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০, অগ্রিম যাণ্মাসিক ১৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 472. December, 1902.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ। ৪৭২ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩০৯। ডিসেম্বর, ১৯০২। | ৭ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ-সংবাদ—(১) গত ৯ই নবেম্বর আমাদের প্রিয় সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ড ৬১ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ৬২ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে চিরায়ু করুন।

(২) ছোট লাট সার জন উডবরণ গত ৬ই নবেম্বর "গাইড" নামক জাহাজে স্ত্রী কন্যা সহিত সাগর-দ্বীপে যাত্রা করিয়াছেন। সমুদায় বঙ্গবাসী তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করিতেছেন।

(৩) বড় লাট সস্ত্রীক ও সদলে ধার-রাজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া কোটা গমন করিয়াছেন।

(৪) নবেম্বরের শেষে চেম্বার্লেন সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকা দর্শনে যাত্রা করিবেন।

স্ত্রী বক্তা—কুমারী অলিবার মালবরী-নাম্নী ভারত-রমণী ইংলণ্ডে সুরাপানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেছেন। তাঁহার এক বক্তৃতাস্থলে কাণ্টারবরীর প্রধান ধর্ম্মযাজক সভাপতি ছিলেন। এক বৃদ্ধা বিবি তাঁহার বক্তৃতার পর তাঁহার হস্তমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "বড় আনন্দ, আপনি হিদেন ছিলেন, খৃষ্টান হইয়াছেন।" মহিলা তদুত্তরে বলিলেন "আমার বলিতে ভয় হয়, আমি এখনও অমুক্ত বর্ব্বর আছি।" বিবি অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেলেন।

দুই হস্তে লেখা—উড়িষ্যা বিভাগের ইনস্পেক্টর তাঁহার অধীনস্থ সকল বিদ্যালয়ে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, ছাত্রদিগকে দক্ষিণ ও বাম দুই হস্তে লেখা অভ্যাস করিতে

হইবে। বালিকাবিদ্যালয়ে সেলাই কার্য্যে বালিকাদের বাম হস্ত ব্যবহারের উৎসাহ দিতে বলিয়াছেন। ইহার ফল কি হইবে দেখিবার বিষয়।

জাপান সাম্রাজ্ঞীর সহৃদয়তা - কয়েক বৎসর হইল চিন-জাপান যুদ্ধে যে সকল জাপানী সৈন্য পদহীন হয়, সম্রাট্ নিজ ব্যয়ে তাহাদিগকে কৃত্রিম পদে সজ্জিত করিয়া দেন। এখন যাহাদিগের সেই পদ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, সাম্রাজ্ঞী তাহাদিগের অভাব দূর করিবার জন্য ৩ দল সৈন্যকে অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

দান—(১) বেগুসরাইতে জয়ন্তী কুমারী-নাম্নী এক বিহারী হিন্দুরমণী লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। (২) বোম্বাইয়ের বিখ্যাত বণিক বোমান্‌জী দীনসা পেটিট লণ্ডনের এক চিকিৎসালয়ে ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

নূতন কয়লাখনি—কাশ্মীরের জম্মু প্রদেশে উৎকৃষ্ট কয়লার এক খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গিলক্রাইষ্ট ছাত্রীবৃত্তি—গিলক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তি ভারতের ছাত্রদের অনেক উপকার সাধন করিয়াছে। সম্প্রতি ফণ্ডের ট্রষ্টীরা ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের হস্তে ৩০০ পাউণ্ড দিয়াছেন, তাহা হইতে ভারতমহিলাদিগকে ছাত্রীবৃত্তি দেওয়া হইবে এবং তাঁহারা শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

ওঁকার দ্বীপ।

জি, আই, পি রেলওয়ে লাইনের যে অংশ মধ্যপ্রদেশ (Central Province) অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ অতীব মনোহর। রেলপথে যতই দূরে যাওয়া যায়, পথিকের দৃষ্টিশক্তি যতই দূর হইতে প্রয়োজিত হয়, পার্শ্বস্থ দৃশ্যগুলি ততই অধিক সুন্দর এবং অধিক কৌতুকাবহ বলিয়া মনে হয়। এই সুবিস্তৃত লাইনের উপরিস্থিত খাণ্ডোয়া-নামক সুবৃহৎ রেলওয়ে ষ্টেশন একটি প্রধান জংশন। এই জংশন হইতে টিকিট লইয়া ওঁকার দ্বীপে যাইতে হয়। ওঁকার দ্বীপ হিন্দু জাতির একটী প্রধান তীর্থ, এখানে ওঁকারনাথ মহাদেবের মন্দির আছে। খাণ্ডোয়া ষ্টেশনে মর্ত্তকা-নামক স্থানের টিকিট লইয়া ঐ লাইনের মর্ত্তকা ষ্টেশনে পথিকগণকে অবতরণ করিতে হয়। মর্ত্তকা হইতে ওঁকার দ্বীপ প্রায় সার্দ্ধ তিন ক্রোশ অথবা ইংরাজি ৮ মাইল, ইহা "নিমার" জেলার অন্তর্গত। মর্ত্তকা ষ্টেশনে বলদ-শকট, সকল ঋতুতেই পাওয়া যায়। এই গাড়ীতে চড়িয়া পথিককে মান্ধাতা নামক গ্রাম পর্য্যন্ত যাইতে হয়। পথের অবস্থা অতীব জঘন্য, বহুকাল

পর্য্যন্ত এই রাস্তার মেরামত ছিল না এবং হইলেও তাহা ঠিক্ থাকে না। বর্ষাকাল ব্যতীত সকল ঋতুতেই এত প্রচুর পরিমাণে ধূলি উড়িতে দেখা যায় যে, আরোহিগণ অনেক সময়ে শ্বাসশূন্য হইয়া পড়েন। পদব্রজে গমন করিলে ধূলির উপদ্রব অধিকতর ভয়ানক হইয়া উঠে। মর্ত্তকা হইতে মান্ধাতা পর্য্যন্ত একটি মাত্র পথ। পথের দুই পার্শ্বে দেখিবার কিছুই নাই, লোক বা লোকালয় মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না। একে পথ জঘন্য, তাহাতে পথের দুই পার্শ্বে নীরস অনুর্ব্বর পতিত ভূমি এবং নিরবচ্ছিন্ন কাঁটা-বন। মান্ধাতায় পৌছিয়া ভ্রমণকারীরা বলদ-শকট হইতে অবতরণ করেন। মান্ধাতায় বৃটীষ গবর্ণমেন্টের ডাকঘর, ছোট স্কুল এবং পুলিশ ষ্টেশন আছে। মান্ধাতা গ্রাম খুব বড় নহে, কিন্তু অতি প্রাচীন; প্রবাদ আছে, ইহা মান্ধাতার আমলের সহর। এই গ্রাম হইতে তিন শত হস্ত দূরে গেলে নর্ম্মদা-তটে পৌছিতে পারা যায়। মান্ধাতা নদীতট হইতে উচ্চতর। নর্ম্মদা নদীর আকৃতি এখানে তত বড় নহে, দেখিতে খুব ছোট বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু সেই ছোট নদীর শোভার সীমা নাই!! বসন্তে বা নিদাঘে মান্ধাতার নর্ম্মদাসুন্দরীকে দেখিলে নিতান্ত শোভাময়ী বলিয়া বোধ হয়। প্রাবৃটের মধ্যভাগে নর্ম্মদার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নদীর আর একটি ভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তখন নর্ম্মদার বন্যা ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া বহুদূর স্থান প্লাবিত করিয়া ফেলে। বসন্তে নর্ম্মদা-সুন্দরী 'কুসুমাদপি কোমলা', এবং প্রাবৃটে ইনি "বজ্রাদপি কঠোরা।" মান্ধাতায় নর্ম্মদা-তটে দাঁড়াইলে একটা নৌ-সেতু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা নৌকা দ্বারা নির্ম্মিত। এই নৌসেতুর সহায়তায় অথবা ক্ষুদ্র পান্সীর সহায়তায় নর্ম্মদা পার হইয়া পথিকগণ অপর পারে ওঁকার দ্বীপে পৌছিয়া থাকেন। বর্ষাকাল ভিন্ন সকল ঋতুতেই নর্ম্মদার জল কাকের চক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল, সেই জল অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ, শীতল, সুপাচক এবং সুস্বাদু। যতদূর দৃষ্টি চলে, ওঁকার-দ্বীপতলবাহিনী নর্ম্মদার কিনারা সুন্দর ও সুদৃঢ় প্রস্তরমালায় সুচারুরূপে বাঁধান দেখা যায়। নর্ম্মদা-সুন্দরী ঘুরিয়া ঘুরিয়া এরূপ ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে যে, ওঁকার পুরীকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে, এই জন্য ইহা ওঁকার দ্বীপ নামে প্রখ্যাত। হিন্দুস্থানীরা ইহাকে মান্ধাতা-ওঁকারজী বলিয়া সম্বোধন করে।

ওঁকার দ্বীপ অল্পকাল পূর্ব্বে হিন্দু রাজার (মহারাষ্ট্র নরপতির) অধিকারভুক্ত ছিল, এক্ষণে ইহা বৃটিষশাসনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে যিনি ওঁকার দ্বীপের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি একজন জমিদার মাত্র। যিনি জমিদার, তিনি তারকেশ্বরের মোহান্তের ন্যায় এক প্রকার সন্ন্যাসী এবং শৈব সম্প্রদায়ের উপাসক। বাঙ্গালা দেশে প্রকৃত শৈব নাই বলিলেই

হয়, এ দেশে অধিকাংশই শাক্ত। ভারতের সর্ব্বত্রই শৈবেরা নিরামিষাশী, কেবল বাঙ্গালা দেশে কতকগুলি লোক শৈব বলিয়া পরিচয় দিয়া মৎস্য মাংসের ধ্বংস করেন। ওঁকার দ্বীপের শৈবেরা সম্পূর্ণ নিরামিষাশী। এখানে মৎস্য মাংস কেবল অভোজ্য তাহা নহে, বাজারে কেহ আমিষ দ্রব্য বিক্রয় করিতেও সমর্থ নহে। নদীতে কেহ মৎস্য ধরিলে দণ্ডিত হইয়া থাকে। নদীর মাছগুলিকে ব্রাহ্মণ বালকেরা প্রতিদিন সায়াহ্নকালে ময়দার ছোট ছোট গুলি (বটিকা) করিয়া খাইতে দেয় অথবা মুড়ী মুড়কী খাইতে দিয়া থাকে। নর্ম্মদায় এত মাছ যে, স্নান করিতে গিয়া জলে দাঁড়াইয়া থাকা একটা উপদ্রব বলিয়া বোধ হয়। নদীর নির্ম্মল জলের স্রোতে যখন রজতবর্ণের মৎস্যকুল ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায় অথবা নাচিয়া নাচিয়া খেলিতে থাকে, সে সময়ের নর্ম্মদার সলিলে এক সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়।

ওঁকার দ্বীপ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। পাহাড়ের অপর অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং বড় বড় বন দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বীপে সর্ব্বপ্রধান দর্শনীয় পদার্থের নাম ওঁকারনাথের মূর্ত্তি এবং ওঁকারনাথের মন্দির। এই মূর্ত্তি ও মন্দির দেখিতে হইলে, পাহাড়ের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। মন্দির খুব বড় এবং সুদৃঢ় প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া নীচের দৃশ্য দেখিতে অতীব মনোহর। এখানকার জলবায়ুও খুব স্বাস্থ্যকর। অধিবাসীদিগের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা শত করা ৯০ জন; মুসলমান এবং অন্যান্য জাতির সংখ্যা শত করা ১০ জন। প্রত্যেক ৯০ জন হিন্দুর মধ্যে প্রায় ৮০ জন ব্রাহ্মণ এবং প্রত্যেক ৮০ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রায় ৭০ জন "পাণ্ডা।" ওঁকার দ্বীপের পাণ্ডারা লোভী, স্বার্থপর এবং উদ্ধত প্রকৃতির পুরুষ বটে, কিন্তু যাত্রী-দিগকে ঘরে লইয়া গিয়া খুব যত্নের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রী-লোকগণ বলবতী, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং কোমল-হৃদয়া। বাজারে নিরামিষাশীর ব্যবহার্য্য প্রায় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন কাগজ, কলম, কাপড় প্রভৃতিরও ছোট ছোট দোকান আছে। ওঁকার দ্বীপে একজন অনরেরি মাজিষ্ট্রেট আছেন, ইনিও মোহান্ত বা সন্ন্যাসী। ওঁকার দ্বীপের চারি ধারে পাহাড়ের উপরে গড় আছে, এই গড়ে বহুসংখ্যক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

এ দেশের সর্ব্বত্র ব্যবসায়ী ডাকাইত-দিগের সম্প্রদায় বিচরণ করে এবং ডাকাইতির কথা প্রায়ই শুনা যায়। দস্যুতা ও রাহাজানী এখানকার সাধারণ লোকের জীবিকা। নরহত্যার অপরাধ আদালতে প্রায়ই রুজু থাকে। পথিক-দিগের একটু সাবধানতার সহিত থাকা আবশ্যক। গাঁটকাটা (Pick-pocket) এবং গুণ্ডার আড্ডা প্রায় প্রতি গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায়; জুয়ারী (Gamblers) দিগের সংখ্যা কম নহে। রোহিলা-

দিগের আমল হইতে এ দেশে ডাকাইতির সূত্রপাত হইয়াছে। রেলপথ তীর্থস্থান পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইলে এ দস্যুবৃত্তির নিশ্চয়ই বিলোপ হইবে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

তীর্থযাত্রা।

(৪৭১ সংখ্যা—২০৭ পৃষ্ঠার পর।)

নবম অধ্যায়।

চুড়িওয়ালী বিদায় হইলে জমীদার-স্ত্রী চিত্রগুলি লইয়া নিজ কক্ষের প্রাচীরে সাজাইয়া দিলেন। তখনও তাঁহার কানে বন্দিনীর করুণাময়ী রাগিণী বাজিতেছিল। তিনি সেই সুরটুকুতে এমন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিবার অদম্য ইচ্ছা তাঁহার মনে জন্মিয়াছিল। আজ আর তিনি তাহা গোপন করিতে না পারিয়া বৃদ্ধা ধাত্রীর নিকটে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। ধাত্রী সলজ্জে কহিল "সে আর কি বড় কথা, আজ এখনি এখানে আনিব, কিন্তু বাহিরের দ্বার সকল রুদ্ধ কর।" এই বলিয়া ধাত্রী বন্দিনীর নিকট গিয়া কহিল "বিবিজী! আপনাকে বেগম সাহেবা স্মরণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আজ অনেকগুলি নূতন নূতন হিন্দু দেবদেবীর চিত্র আসিয়াছে, উহা আপনার চিত্তাকর্ষক হইবে, তাই ডাকিতেছেন।" বন্দিনী মণিমালা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সবল হইয়াছেন, বিনা সাহায্যে উঠিতে হাঁটিতে পারেন। ধাত্রীর কথায় মনে করিলেন 'যাই যদি কোন পথ দেখিতে পাই,' এবং ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সেখানে আর কে আছে?" ধাত্রী কহিল "কেবল বেগম সাহেব, আর এ সময় ত হুজুর মফঃস্বলে গিয়াছেন, আগামী কাল আসিবেন।" ইহা শুনিয়া মণিমালা তাহার ক্ষীণ দেহখানি অতি অলস ভাবে তুলিলেন, ধীর পদবিক্ষেপে ধাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া দ্বিতলের একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। দরিদ্রা ব্রাহ্মণকন্যা, ধনীর ঐশ্বর্য্যময় গৃহের চাকচিক্য দেখিয়া যেন প্রথমেই উঁহার ধাঁধা লাগিল। পরে বেগমের সাজ সজ্জা সকলি তাঁহার চক্ষে নূতন, কিন্তু সেই মর্ম্মাহতা বালা নীরবে বিষণ্ণ বদনখানি লইয়া এক পার্শ্বে দীন ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জমিদার-গৃহিণী মণিমালার আনত মুখখানির প্রতি অনিমেষনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন যেন শৈবাল-আচ্ছাদিত সরোজিনী তীক্ষ্ণ রবি-তাপে মুসড়াইয়া গিয়াছে, তবু সেই ম্লান সৌন্দর্য্যের পানে পথিক না চাহিয়া থাকিতে পারিতেছে না। সেই শুষ্ক কমলের সৌরভে আজ বেগম সাহেবার

গৃহ ভরপুর হইয়া উঠিল। কিন্তু রমণী-হৃদয় তাঁহারও, তাই আজ স্বজাতির প্রেমে, স্বজাতির অগৌরবে, স্বজাতির দুঃখে কষ্টে একেবারে বিগলিত হইয়া গেল। তিনি সপত্নী-বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া একেবারে তাহার কোমল হস্ত দুই খানি ধরিয়া স্বীয় পালঙ্কে বসাইলেন। মণিমালা অতি বিনীত ভাবে করপুটে কহিলেন "শরণাগত জনে ক্ষমা করিবেন, আমার ব্রত এখনও উদ্যাপন হয় নাই, আমি কুশাসন ভিন্ন অন্য আসনের যোগ্যা নহি।" বেগম সাহেবা যবনী হইয়াও সেই পার্ব্বতী-তুল্যা ব্রাহ্মণ-তনয়ার তপস্যায় বিঘ্ন দিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন মণিমালা কহিলেন "এ দুর্ভাগিনী আজ আপনার স্মরণ-পথের পথিক হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে, কি আজ্ঞা হয়?" বেগম সাহেবের কর্ণে সুধা বরিষণ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন "অয়ি ভগিনি! তোমার বীণাধ্বনিবৎ গীতধ্বনি আমাকে এমত চঞ্চল করিয়াছিল যে, আমি তোমাকে না দেখিয়া স্থির হইতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু সকল বুঝিতে পার, তোমার শরীর অসুস্থ এবং জমীদার সাহেবের হুকুম নহে বলিয়া, বিশেষ তোমার ব্রত যে পর্য্যন্ত না উদ্যাপন হয়, তাবৎ কোন প্রকার বিঘ্ন দেওয়া উচিত নহে ভাবিয়াই এত দিন সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই।" মণিমালা কহিল "আমার ব্রতের বিঘ্ন আপনার দ্বারা হইবে না, তবে পুরুষের মুখ দর্শন নিষেধ বটে।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। তিনি উর্দ্ধে আকাশ পানে দৃষ্টি করিবেন বলিয়া চাহিলেন, কিন্তু গৃহের রঙ্গিন ছাদ ভিন্ন কিছু দেখা গেল না। তখন তাহার প্রত্যাগত দৃষ্টি ফিরিয়া ঘুরিয়া প্রাচীর-সংলগ্ন চিত্রগুলির উপর গিয়া পড়িল। যবন-গৃহে হিন্দু দেবদেবীর চিত্র দেখিয়া তাঁহার নেত্র বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, ক্রমে ক্রমে একটির পর আর একটির উপর তাঁহার দৃষ্টি চালিত হইল। কিন্তু এবার কি দেখিলেন আর যে দাঁড়াইতে পারেন না, পদদ্বয় কম্পিত হইয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল, চক্ষে আর কিছুই দেখিতে পান না,—এ যে সেই হরিদ্বারের গঙ্গাতীরবর্ত্তী দৃশ্য, যেখানে বসিয়া মণিমালা শ্বশ্রূর মৃত দেহের সৎকার করিয়াছিলেন। সেই অচল অটল সৌ-বালিক পর্ব্বত, সেই স্বচ্ছসলিলা জাহ্নবী, সেই চিতাবহ্নি-ধূম উদ্গিরণ করিতেছে, কেবল নাই সেখানে একটি সৌম্য মূর্ত্তি—যাহাকে মণিমালা এই এক মাস ধরিয়া ধ্যান করিয়া আসিতেছেন। মণিমালার ক্ষীণ দেহভার আর সামলাইতে পারিল না, এবার তিনি পড়িয়া গেলেন ও তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত প্রায় হইয়া আসিল। গৃহিণী তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মহা ভয় পাইলেন। অনেক প্রকার সুগন্ধ বারি ও শীতল জল-সেক করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু তাঁহার ত উঠিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং নিজ-খট্টোপরি

শোয়াইয়া স্বহস্তে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ—উদ্বেগ।

ত্রিযামা যামিনী অতীতপ্রায়। চন্দ্রের আলো নিভ নিভ, শুকতারা দেখা দিয়াছে, নিশীথিনী বিদায়োন্মুখ। সরোজিনী শশধর-বিরহে ম্লানবদনে শিশিরবিন্দুবৎ অশ্রুকণা দ্বারা মৃণালদাম সিক্ত করিতেছে। পল্লবিত তরু-শাখে বিহগ বিহগিনী উষা-দেবীর আগমনী গান করিবার উপক্রম করিতেছে। প্রভাতি সমীরণ আগত-প্রায়। এইবার নবীনবেশে তরুণ অরুণ পূর্ব্বদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবেন, আবার প্রকৃতির বক্ষে অন্ধকারের পর আলো প্রকাশিত হইবে। এই বুঝি দিবসের শিশু কাল—রজনীর প্রভাত। এইরূপ সংসারে মানবজীবনেও প্রভাত বড় সুখের। অতি মধুময় প্রথম উদ্দামপূর্ণ উৎসাহ প্রাণকে সমুজ্জ্বল করে। নবোদিত কিরণের ন্যায় পরম চাকৃচিক্যশালী কত আশা, কত অভিলাষ! নিত্য নব কল্পনা মানব-হৃদয়াকাশ নানা বর্ণের মেঘের ন্যায় রঞ্জিত করিয়া দেয়। অবশেষে .কাল তিমির যখন আসিয়া ঘিরে, তখন সেই শূন্য, সেই অন্ধকার! জীবনের এই স্বল্প বেলার মধ্যে যতটুকু পারা যায়, কাজ সারিয়া লইতে হয়। জমীদার মীর মহম্মদ মণিমালার রূপ-শিখায় পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইতেছে। প্রাণের আসক্তিই প্রাণকে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতেছে। তাহার হৃদয়ের সকল সুখ শান্তি তিরো-হিত এত চেষ্টা, শ্রম, যত্ন, অসাধ্য দুঃসাধ্য কার্য্য, পাপ পুণ্যের মান অপ-মানের বিচার না করিয়া একমাত্র প্রলোভনের বশে এই অনর্থময়ী ঘটনায় লিপ্ত হইয়াছেন। তথাপি সে আশা অপূর্ণিত! অধর্ম্মকে জয়ী করিতে কে সক্ষম? জমীদার মীর মহম্মদ প্রায় আহার-নিদ্রা-বর্জ্জিত, মহা উদ্বেগে দিন রাত্রি কাটাইতেছেন! আর এক দিনমাত্র অবশিষ্ট মণিমালার ব্রত পূর্ণ হইবার, কিন্তু একি! এখন যে আবার সেই মোহ —জীবনসংশয় ব্যাপার উপস্থিত। যে দিবস বাসুবেগমের গৃহে চিত্র দর্শনে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, সেই অবধি এ পীড়ার সৃষ্টি। আজ কিছু বাড়াবাড়ি। অনাহারে, উৎকণ্ঠায়, স্বামি-পরিত্যাগে, ও দুরাচারের আসক্তি আগারে বন্দিনী হইয়া জীবনে কত বল থাকে? তাই আজ মুমূর্ষু মণিমালার প্রাণ লইয়া টানা-টানি। এক দিকে জমীদার টানিতেছেন, অন্য দিকে যমরাজের দূত। কিন্তু সেই রমণীর ক্ষীণ প্রাণ কোথায়ও যাইতে চাহে না, কেবল ইহলোক পরলোকে যেখানেই যেমন করিয়া হউক পতি-পদ বাঞ্ছনীয়!! জমীদারের আশা এখন ভগ্ন-প্রায়। তাহার হৃদয়ে গুরু বেদনা, মুখে নৈরাশ্যের ছায়া লইয়া নির্ব্বল নিস্তেজ শিরা-ধমনীযুক্ত প্রাণভার বহিয়া একদৃষ্টে মণিমালার পার্শ্বদেশে অদূরে বসিয়া কেবল সেই বাসি ফুলের মত মুখখানি দেখিতে-ছেন। আর বিষম হতাশার মাঝে একটী

দীর্ঘশ্বাস তাহার বুকের ভার নামাইবার চেষ্টা করিতেছে। বৃদ্ধ হাকিম সায়েব মুহুর্মুহু যথাসাধ্য ঔষধ দিয়া সেই কনক-বল্লরী সজীব করিতে চেষ্টিত। বিশ্বস্ত ধাত্রীগণ চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া বসিয়া আছে, সকলেই সেই একটি অদৃষ্ট অজ্ঞাত মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছে। ক্রমাগত তিন মাস কাল কারাগারস্বরূপ নির্জ্জন মহলের বন্দিনীর সহিত বাস করিয়া তাহারাও ক্লান্ত এখন যেরূপ হউক একটা হইলেই নিষ্কৃতি! কিন্তু মণিমালার কোমল পবিত্র কমলসদৃশ মুখখানি দেখিলে কাহার প্রাণে না দয়ার সঞ্চার হয়? তাই আজি নৃশংস যমদূত শিয়রে দাঁড়াইয়া অকালে এই কুসুমকলি বৃন্তচ্যুত করিতে অনিচ্ছু। অপেক্ষা ও প্রতীক্ষাতেই সকল নয়ন ও মন সমুৎসুক, পলে পলে চেতনা হইবার আশায় উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি আকাঙ্ক্ষিত ও ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে। রজনীও আর থাকে না। জমীদারের কাতর অন্তঃ-করণের বিনতি আজ আরও কিয়ৎক্ষণ মণিমালার চেতনার নিমিত্ত অপেক্ষা করুক, পাছে তাহার সহিত উহার চির-সাধের খেলার অবসান হইয়া যায়। তাই আজ এই বিষম সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, দিন রাত্রির কর্ত্তাকে মনে পড়িয়াছে। একবার প্রাণের গুঢ়তম প্রদেশ হইতে ধ্বনি উত্থিত হইল, "রক্ষা কর দেব। সব যে যায়।" এই বলিতে বলিতে একটী গভীর শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। পাপময় হৃদয় লইয়া পার্শ্বস্থিত তাকিয়ায় হেলিয়া পড়িয়া গেলেন। অমনি নফর সত্রস্তে বাহিরে শব্দ লক্ষ্য করিবার জন্য দেখিতে গেল। হাকিমজি জমীদারকে ধরিয়া তুলিতে চাহিলেন। এই সময়ের মধ্যে দাসদাসী ও বেগম সায়েবের ভীতি-কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জ্বলন্ত মশালধারী সশস্ত্র প্রহরিগণে সেই মহল ভরিয়া গেল। হাকিমজি জমীদারকে সজোরে ধাক্কা দিয়া কহিলেন "আর সময় নাই, এখন পরিত্রাণের উপায়!!" জমীদার আসন্ন বিপদ দেখিয়া হাকিমজিকে লইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণে মদিরার মোহ অপসারিত হইল এবং দক্ষিণ হস্তের হীরক অঙ্গুরী লইয়া বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পুলিশ প্রথমে নফর দাস—পরে হাকিমজিকে গ্রেপ্তার করিয়া একেবারে চারিজন বাহক দ্বারা মণিমালার মূর্চ্ছিত দেহখানি সহিত চারপায়া খানি বাহির করিয়া আনিল। জমীদারের জীবনলীলা সাঙ্গপ্রায় দেখিয়া আর তাহার দিকে এ সময় কেহ গেল না। এই সকল পুলিশ সৈন্যের মধ্যে রঘুনাথের বন্ধু গিরিভূষণ একজন ছদ্মবেশী ছিলেন। তাঁহারই ইঙ্গিতে সকলে চালিত হইতেছিল। সত্বরপদে বাহকগণ ও পুলিশ গ্রেপ্তারী ব্যক্তিদ্বয়কে সরকারী থানায় আনিল ও একটি বৃহৎ দ্বিতল গৃহের উপর খাটখানি লইয়া গিয়া নামাইল। অনতিবিলম্বে আসিষ্টাণ্ট সরজন্ রায় নেহাল সিং আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এখনও

স্ত্রীলোকটির জীবন-বায়ু নিঃশেষ হয় নাই, ইহাকে অতি সতর্কভাবে যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।"　　(ক্রমশঃ)

শীতল সামন্ত।

শীতল সামন্ত জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয় (আগুরী), রাঢ় দেশে ইহার নিবাস শীতলের পিতার কিছু অর্থ ও ভূসম্পত্তি ছিল; কিন্তু অনেকের নিকট অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া পিতা পরলোক গমন করিলে, শীতল নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়ে। জমি, বাগান, পুকুর ইত্যাদি যাহা কিছু ছিল, তাহা ডিক্রিদারদিগের নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। ঘরে অশিক্ষিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী, দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শীতলের সহধর্ম্মিণী ভিন্ন আর কেহ ছিল না। ইহাদিগকে ঘরের অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া শীতল সামন্ত বিদেশে চাকুরী করিতে গেল। এক বৎসর মাত্র হইল শীতলের বিবাহ হইয়াছে, স্ত্রীর বয়স একাদশ বর্ষের অধিক নহে। শ্বশুর, শাশুড়ী বা শ্যালা কেহই নাই; দরিদ্র শ্বশুরালয়ে কেবল অতি দূর সম্পর্কীয়া এক বৃদ্ধা পিসি ছিল, শীতলের স্ত্রী তাহার দ্বারাই প্রতিপালিতা। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে ছিল না এবং পোষ্টাফিসের ভাল বন্দোবস্তও ছিল না, তদ্ভিন্ন দেশের সর্ব্বত্রই প্রায় দস্যুভয় ছিল। নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে শীতল সামন্ত ছোটনাগপুর অঞ্চলে উপস্থিত হইল, সেখানে এক জন ভদ্র লোকের অনুগ্রহে সরকার বাহাদুরের নিমকের (লবণের) কারখানায় একটি চাকুরী পাইল, বেতন ভিন্ন তাহাতে প্রতি মাসে বেশ অর্থোপায় হইতে লাগিল। ক্রমে শীতল সামন্ত "নিমকীর দারোগা" পদে উন্নীত হইলেন। সাহেবেরা নানা কারণে শীতলকে খুব ভাল বাসিত এবং শীতলও খুব পরিশ্রমী এবং সাবধান পুরুষ ছিল। সেকালে "ঘুষ, দালালী, বাঁটা" প্রভৃতি নানা প্রকারে নিমকীর দারোগারা খুব টাকা উপার্জ্জন করিত। দেখিতে দেখিতে শীতল সামন্ত খুব ধনুবান্ ও প্রসিদ্ধ পুরুষ হইয়া উঠিল। প্রথম দুই বৎসর যত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহা প্রতি তিন মাস অন্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট পাঠাইয়া দিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সে সকল টাকা কুকর্ম্মে অপব্যয় করিত। গ্রামের দুই এক জন লোকের পত্রে বড় ভাইয়ের অসৎ ব্যবহারের কথা অবগত হইয়া, শীতল আর ঘরে টাকা পাঠাইলেন না এবং সেইজন্য তাঁহার ভাই তাঁহাকে আর পত্র লিখিতেন না;

শীতলও সেই কারণে পত্র লেখা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিছু দিন গত হইলে কে এক জন মিথ্যা পত্র দ্বারা শীতলকে জানাইয়াছিল যে, তাহার সহধর্ম্মিণীর কলেরা রোগে মৃত্যু হইয়াছে। শীতল তাহাই বিশ্বাস করিয়া গৃহের সহিত একেবারে সম্পর্ক রহিত করিয়া দিলেন। এইরূপে বিদেশে চাকুরী করিতে করিতে ৮ বৎসর কাল অতিবাহিত হইল; ধনে, মানে, প্রভুত্বে শীতল সামন্ত খুব বড় লোক বলিয়া পরিচিত হইলেন। নবম বর্ষে লবণের কারখানা উঠিয়া গেল, শীতলের চাকুরী গেল, শীতল সামন্ত দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ছোটনাগপুর হইতে দেশে পৌঁছিতে অনেক দিবস লাগিত, বিশেষতঃ রাস্তা খারাপ এবং পথে খুব দস্যুভয়, এজন্য চারি জন বলবান্ লাঠিয়াল, একজন বলবান্ চাকর, এবং এক জন বিখ্যাত তীরন্দাজকে সঙ্গে লইলেন। ইহা ব্যতীত ৮ জন পাল্কী বেহারা ছিল; শীতল পাল্কীতে চড়িয়া আসিতেছিলেন। [illegible] অনেক টাকা, নোট, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি ছিল। লাঠিয়ালদের সঙ্গে দুইটা বন্দুক এবং এক খানা তলোয়ারও ছিল। আসিতে আসিতে পঞ্চম দিবসে একটা ভয়ানক বিস্তৃত মাঠে পাল্কী উপনীত হইল। এই মাঠ দিয়া তাহাদিগকে যাইতে হইবে। গ্রীষ্মকাল, অনেক দিন বৃষ্টি হয় নাই, এজন্য মধ্যাহ্নকালে মাঠের চারি দিকে ধূ ধূ করিতেছিল। নিকটে কোনও লোক বা লোকালয় ছিল না। অপরাহ্ন সময় আগত হইলে ইহাঁরা ঐ মাঠের পার্শ্ববর্ত্তী একখানি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই ক্লান্ত হইয়াছিল, সুতরাং বিশ্রামলাভ ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। গ্রামটী অতি ক্ষুদ্র, সমগ্র গ্রামে ২৪ ঘর লোকের অধিক বসতি নাই, গ্রামের অধিবাসীরা দস্যুতা, ডাকাইতি ও রাহাজানী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। শীতল সামন্ত এবং তাহার লোকেরা যাহাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারাও ব্যবসায়ী ডাকাইত। যাহা হউক, সেই বাটীতে অন্নাদি পাক করিবার সময়ে একটী সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক তাহাদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেছিলেন। সেই বুদ্ধিমতী ও দয়াবতী স্ত্রীলোক অতীব গোপনে শীতল বাবুকে বলিয়া দিল, "মহাশয়! ভোজনান্তে আপনারা এস্থান হইতে পলায়ন করুন। এ গ্রামের সকলেই ডাকাত, অদ্য রাত্রিতে আপনাদিগকে ইহারা মারিয়া ফেলিবে এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়াছে। যাহাদের বাটীতে আপনারা অতিথি হইয়াছেন, ইহারা ডাকাতের সর্দ্দার। এই বাটীর কর্ত্তা কয়েকজন প্রসিদ্ধ লাঠিয়ালকে এখানে আনিবার জন্য একটু দূরে গমন করিয়াছে, তাহারা আসিলে তাহাদের সাহায্যে ইহারা আপনাদিগের প্রাণ হত্যা করিবে।" কথা শুনিয়া শীতল বাবু অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কয়েক মিনিট

পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? দেবীর ন্যায় এই মহা বিপদের সময়ে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছ, সুতরাং তোমার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করি।" যুবতী কহিল, "আমার পরিচয় দিবার সময় নাই, আপনি অনুরোধ করিবেন না, অতি শীঘ্র ভোজন সমাপন করিয়া পলাইয়া যাউন।" এই বলিয়া স্ত্রীলোক চলিয়া গেল। শীতল বাবু অতি বিমর্ষ বদনে বেহারা ও লাঠিয়াল এবং ভৃত্যকে একথা জানাইলেন। তাহারা তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া পাল্কী উঠাইয়া দিল। বাবু সে গ্রাম হইতে রওনা হইলেন। মাঠে উপস্থিত হইয়া লাঠিয়ালেরা কহিল, "হুজুর! আপনি অণুমাত্রও ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আমরা আপনার সঙ্গে আছি, ছয় শত দস্যু আসিলেও আপনার মাথার একটি কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না।" বেহারাগণ অতি দ্রুতপদে পাল্কী কাঁধে লইয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু অল্প দূর না যাইতে যাইতে সেই গ্রামের প্রধান ডাকাইত অপরাপর ডাকাইতগণকে সঙ্গে লইয়া বিকট চীৎকার করতঃ পাল্কীর অভিমুখে ধাবিত হইল। দেখিতে দেখিতে তাহারা বাঁশের বড় বড় লাঠি হাতে লইয়া পাল্কীর নিকটবর্ত্তী হইল। শীতল বাবু পাল্কী থামাইতে বলিয়া সেই মাঠে দাঁড়াইলেন; তাঁহার লাঠিয়ালেরা লাঠি ও তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। শীতল স্বহস্তে একটা বন্দুক লইয়া এবং তাঁহার প্রধান লাঠিয়ালকে আর একটা বন্দুক দিয়া দস্যুদিগের দিকে গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন। গুলির আঘাতে অনেক দস্যু ধরাশায়ী হইল এবং প্রধান দস্যু পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। প্রধান দস্যুকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া, অপরাপর দস্যুগণ পলাইতে লাগিল, এ দিকে শীতল বাবুর লোকেরা লাঠি ও তলোয়ার লইয়া অনেকের কোমর ভাঙ্গিতে, গলা কাটিতে এবং মাথা ফাটাইতে প্রবৃত্ত হইল।

ক্রমে নিরাপদ অবস্থা উপস্থিত হইল, আবার পাল্কী উঠাইয়া শীতল বাবু এবং তাঁহার সঙ্গীরা মাঠ অতিক্রম করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাত্রি নয়টার সময় একটা বৃহৎ গ্রাম দেখিয়া সেই গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাটীর কর্ত্তাকে শীতল বাবু পথের ঘটনা শুনাইয়াছিলেন। কর্ত্তা কহিলেন "আপনি দুই তিন দিন এখানে বিশ্রাম করুন, তাহার পরে দেশে যাইবেন।" বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন। পরদিন প্রভাতে বেলা আট ঘটিকার সময়, শীতল বাবু স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ সেই বাটীর দ্বারদেশে এক জন স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন "ডাকাইতদের গ্রাম হইতে এই স্ত্রীলোক চলিয়া আসিয়াছে।" তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে কেন এবং কেমনে আসিলে?" স্ত্রীলোক বলিল "আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত,

আমাকে প্রথমে কিছু ভোজ্য দ্রব্য খাইতে দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন।” বাবু তাহাকে কিছু খাবার খাইতে দিলেন। বেলা অধিক হইতেছে দেখিয়া শীতল কহিলেন “তোমার কথা আমি অপরাহ্ণকালে নির্জ্জনে শ্রবণ করিব।” তাহার পরে বাটীর কর্ত্তাকে সামন্ত মহাশয় কহিলেন “কর্ত্তা ম’শয়! আমি আপনাকে যে স্ত্রীলোকের কথা বলিয়াছিলাম, ইনি সেই স্ত্রীলোক, ইনিই ডাকাইতদিগের হস্ত হইতে আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।” বাটীর কর্ত্তা খুব স্নেহের সহিত সেই স্ত্রীলোককে অন্দর মহলে লইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)।

গৃহকর্ম্ম।

পূর্ব্বে গৃহিণীরা নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ থাকায় সহজে স্বল্প ব্যয়ে অনেক দ্রব্য নিজেই প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইতেন। আজি কালি অধিকাংশ গৃহিণী নিজে কোনও কার্য্যই করিতে ইচ্ছা করেন না, করিতেও জানেন না। যে ইংরাজদিগের অনুকরণে আমাদিগের দেশের নরনারীগণ বিলাসিতা শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহারাও গৃহ-নির্ম্মিত দ্রব্যের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। স্বহস্ত-প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহারে নিজের যেরূপ আনন্দ হয়, পতি, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনীগণেরও তদনুরূপ আনন্দ হইয়া থাকে। আমরা যে সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণের প্রকরণ নিম্নে সংগ্রহ করিয়া দিলাম, পাঠিকা ভগিনীগণের মধ্যে যদি একজনও তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইব।

১। ম্যাচেস (matches) বা বিলাতী দিয়াশালাই প্রস্তুতের উপায়।

ফস্ফরস ৯ ভাগ, সোরা ১৪ ভাগ, (Bin oxide of manganese) বিন অক্সাইড অফ্ ম্যানগানিজ ১৪ ভাগ, শিরিশ ১৬ ভাগ। প্রথম একটি পাত্রে শিরিস দিয়া ঐ পাত্রটীর নিম্নে উত্তাপ দিবে। পরে ক্রমে ক্রমে ফস্ফরাস নিক্ষেপ করিয়া যখন উত্তাপ প্রভাবে উভয় পদার্থ দ্রব হইয়া মিলিত হইবে, তৎকালে অন্যান্য দ্রব্যগুলি তাহাতে প্রদান করিবে। সমস্ত পদার্থ মিলিত হইলে উহা একটী বিস্তৃত লৌহপাত্রে ঢালিতে হইবে। ঐ লৌহ পাত্রটী উষ্ণ জলপূর্ণ কোন পাত্রের উপর স্থাপন করা আবশ্যক, কেন না তাহা না হইলে লৌহপাত্রস্থ তরল পদার্থ তাপ বিকীর্ণ করিয়া একেবারেই জমিয়া যাইবে। নারিকেলের কাঁচা পাতার শিরা বা কাটী পূর্ব্বে (যাহাতে ঝাঁটা হয়) সংগ্রহ করিয়া বেশ শুষ্ক করিয়া বিলাতি দিয়াশালাইয়ের কাটীর ন্যায় ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রাখিবে। ঐ কাটী এক একটী

লইয়া উহার এক এক প্রান্ত লৌহ পাত্রস্থ তরল পদার্থে অল্প অল্প ডুবাইয়া লইলে দিয়াশালাই প্রস্তুত হইবে। ঐ কাটীর যে প্রান্তে ঐ মিশ্রিত পদার্থ লিপ্ত হইয়াছে, সেই প্রান্ত কোন বিলাতী দেশালাইয়ের বাক্সের পার্শ্বস্থিত বারুদ লেপ দেওয় কাগজের উপর ঘসিলে জ্বলিয়া উঠিবে।

২। বরফের কুল্পী—কলিকাতার অধিবাসিনীরা সহজেই ইহা প্রস্তুত করিতে পারেন। বাজারে যে কুল্পী বিক্রয় হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট কুল্পী অনেক অল্প মূল্যেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যেরূপ চুঙ্গিতে কুল্পী প্রস্তুত হয়, তাহা পূর্ব্বে সংগ্রহ করিতে হইবে। ঘন দুগ্ধ, লেবুর রস, চিনি মিশ্রিত আনারসের রস অথবা অন্য যে দ্রব্যের কুল্পী প্রস্তুতির ইচ্ছা হইবে তাহা দিয়া উক্ত চুঙ্গি পূর্ণ করতঃ উহা ঢাকা দিয়া বেশ করিয়া বন্ধ করিবে। পাছে কোনখানে ফাঁক থাকে, এই জন্য ময়দার আটা দিয়া ঢাকনির চতুর্দ্দিক্ বেশ আবৃত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। একটী হাঁড়ীতে অগ্রে কিছু বরফের টুকরা সাজাইয়া ঐ চুঙ্গী তাহার উপর স্থাপন করতঃ উহার উপরে আবার বরফের টুক্‌রা সাজাইয়া দিয়া হাঁড়ী পূর্ণ করিতে হইবে। হাঁড়ী বরফের টুকরায় পূর্ণ হইলে তাহার উপর লবণ ছড়াইয়া দিয়া উহা ঢাকিয়া কোন শীতল স্থানে কিয়ৎক্ষণ রাখিলে চুঙ্গীর মধ্যস্থিত তরল পদার্থ জমিয়া যাইবে। ইহাই কুল্পী বরফ। চারি আনা ব্যয়ে ২৫।৩০টী কুল্পী প্রস্তুত করা যাইতে পারে, সুতরাং ফেরিওয়ালার নিকট হইতে ক্রয় করা অপেক্ষা নিজে সামান্য পরিশ্রমে ঘরে প্রস্তুত করিলে কত সুলভ হয়, তাহা পাঠিকা ভগিনীগণ একবার বিবেচনা করিবেন।

৩। পাঁপর তৈয়ারী—মুগ, মটর বা কলাই ডাল প্রথমে জলে ভিজাইয়া ভাল করিয়া বাটিয়া লইবে, পরে উহার সহিত বেশন মিশাইয়া ময়দা টানার ন্যায় উত্তমরূপে টানিবে। টানিবার সময় মৌরী, গোল মরিচের গুড়া, কালজিরা প্রভৃতি দিলে পাঁপর বেশ সুস্বাদু হয়। বেশ টানা হইলে লেচি কাটিয়া বেশন দিয়া রুটির ন্যায় বেলিবে। এই রুটির আকৃতি চক্রগুলি শুষ্ক করিয়া লইলেই পাঁপর প্রস্তুত হয়।

৪। বেলের মোরব্বা—উদরাময় রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে বেলের মোরব্বা বিশেষ উপকারী খাদ্য। প্রত্যহ জলযোগের সময় দুই এক খানি বেলের মোরব্বা খাইলে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না অথচ ইহা খাইতে বিলক্ষণ সুস্বাদু। পল্লীগ্রামবাসিনী গৃহিণীরা সকল সময় ভাল খাদ্য ক্রয় করিতে পারেন না; তাঁহারা যদি এই মোরব্বা প্রস্তুত করেন, তবে অল্প ব্যয়েই ভাল খাদ্য পাইতে পারেন। পল্লীগ্রামে কাঁচা বেল ক্রয় করিতে হয় না, সহজেই অনেক অপক্ব বেল সংগ্রহ করা যাইতে পারে, ঐ সকল বেলের উপরের আবরণ বা খোলা ছাড়াইয়া উহা চাকা করিয়া কাটিতে হয়।

ঐ কর্ত্তিত চাকাগুলির ভিতর হইতে বীজ বাহির করিয়া শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরে ঐ চাকাগুলি জল হইতে তুলিয়া বেশ ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিবে। পরে চিনির রসের সহিত উহা পাক করিলে মোরব্বা প্রস্তুত হইবে।

৫। ছোলার বরফী—ভাল ছোলার ডাউল অর্দ্ধ সের, চিনি এক সের, ঘৃত এক পোয়া, ক্ষীর অর্দ্ধ পোয়া। প্রথমে ছোলার ডাউলগুলি ভাল করিয়া ঝাড়িয়া শীতল জলে ভিজাইতে হইবে। ডাউল-গুলি বেশ ভিজিলে জল হইতে তুলিয়া একটী প্রশস্ত পাত্রে বিছাইয়া রাখিয়া দিবে। অর্দ্ধ পোয়া ঘৃত দিয়া ঐ ভিজা ডাউলগুলি বেশ ভাজিয়া লইবে। ডাল-গুলি চুড়িয়া না যায় বা ভাজা কম না থাকে, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ঐ ভাজা ডালগুলি পরে বেশ মিহি গুঁড়া করিয়া এক সের চিনির রসে পাক করিবে। পাক করিবার সময় ক্ষীর, বাদাম ও পেস্তার কুচি ইহার সহিত দিবে। কড়াতে কাটি দিয়া নাড়িতে নাড়িতে যখন দেখিবে বেশ মণ্ডের মত হইয়াছে, তখন উহা নামাইয়া অর্দ্ধ পোয়া পরিমাণ সুগন্ধ ঘৃত মাখাইয়া পাথর বা কাঁসার থালার উপরে এক ইঞ্চি পুরু করিয়া ঢালিবে। পরে বরফীর ন্যায় কাটিয়া লইতে হয়। ইহা খাইতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি পুষ্টিকর। ম, না, চৌ।

অদ্ভুত বৃষ্টি।

১। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে (Antura) আন্‌টিউরার কৃষকেরা গমের শিষ সকল রক্তের মত লালবর্ণ দেখিয়াছিল।

২। ১৬৩৪ সালে জর্ম্মণীর ওয়ার্টেম্‌-বর্গে পাংশু বৃষ্টি হয়।

৩। ১৫৬৮ সালে জর্ম্মণীর মিরেলবর্গ নগরে উনান হইতে রুটি তুলিয়া দেখা গেল, তাহাতে রক্তের মত ঘাম হইয়াছে।

৪। ১৩০৯ সালে বারগণ্ডিতে রক্ত বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি যাহা কিছু স্পর্শ করিল, তাহাই রক্তবর্ণ হইল।

৫। অনেক প্রাচীন লেখকেরা বর্ণনা করিয়াছেন, ১২৩৬ সালে রোডস্ দ্বীপে এবং সমুদয় দক্ষিণ ইটালীতে তিন দিন ধরিয়া রক্তবৃষ্টি হইয়াছিল।

৬। ১২২৬ সালে সিরিয়াতে বরফপাত হয়, তাহা গলিয়া রক্তের নালা বহিয়া যায়।

৭। ১২২২ সালে রোম নগরে তিন দিন ধরিয়া রক্তমিশ্রিত ধূলা বৃষ্টি হয়। আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, যখন মেঘ সকল চলিয়া গেল, তখন বোধ হইল সূর্য্যদেব অগ্নিসমুদ্রে ভাসিতেছেন।

৮। ১৩৪৮ সালে অষ্ট্রিয়ার ভিলাচ গ্রামের কতকগুলি গহ্বর হইতে লাল কালীর মত বিষস্রোত বহির্গত হয়। এই বৎসরেই জর্ম্মণীতে শিলাবৃষ্টি হয়, এক একটী শিলা ওজনে দশ সের হইতে পনর সের।

৯। ১৬৯৫ সালে আয়র্লণ্ডের টিপারারী ও লিমারিক নগরে মাখনের মত তৈলাক্ত পদার্থের বৃষ্টি হয়, ইহা গাঢ় পীত বর্ণ এবং রাত্রিতে পড়িত, লোকে ইহা সংগ্রহ করিয়া গায়ে মাখিয়াছে এবং তাহাতে অনেক পীড়ার আরোগ্য হইয়াছে।

১০। ১৩৪৮ সালে আসিয়ার ক্যানারী নামক স্থানে ভূমি হইতে এক প্রকার গন্ধকাগ্নি বহির্গত হয়, তাহাতে মানুষ, জন্তু, ঘরবাড়ী এবং বৃক্ষসকল দগ্ধ হইয়া যায়। বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হওয়াতে একটী মহামারী উপস্থিত হয়। মেঘ হইতে ছোট সাপ এবং অসংখ্য বিষাক্ত কীট বর্ষিত হয়। (ওয়াসিংটন ক্যাপিটাল।)

গৃহচিকিৎসা।

বাত রোগ।

১। রসুন ছেঁচিয়া মাখনের সহিত খাইলে বাতরোগের উপশম হয়।

২। এক পোয়া এরণ্ড তৈল (Castor oil) ১ ছটাক ত্রিশিরা মনসার অভ্যন্তরস্থ রস একত্রে মৃদু আলে পাক করিবে। উক্ত রস তৈলে নিঃশেষ হইলে অগ্নি হইতে নামাইয়া আবৃত পাত্রে শীতল স্থানে রাখিবে। পরে শীতল হইলে তাহাতে অর্দ্ধ ছটাক টারপিন তৈল ও ১ কাঁচ্চা কর্পূর দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া বোতলে রাখিবে। এক সপ্তাহ পরে ব্যবহার করিবে। ইহাতে গেঁটে বাত, চৌরঙ্গি বাত—এমন কি দীর্ঘকালের হইলেও শীঘ্র আরোগ্য হইবে।

৩। টারপিন তৈল ২ ছটাক, ক্যাষ্টর অইল ১ ছটাক, মেটে তৈল ১ ছটাক, পিপারমেণ্ট ৪০ ফোঁটা, সৈন্ধব লবণ ২॥০ ভরি, কর্পূর ১০ ভরি।

সৈন্ধব লবণ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া উক্ত দ্রব্য সমস্ত মিশাইয়া শিশিতে রাখিবে। পরে বেদনা স্থানে উত্তমরূপে নাড়িয়া দিনে ২।৩ বার মালিশ করিলে প্রবল বাত ব্যাধিও শীঘ্র আরোগ্য হয়।

৪। প্রতি দিন ভোর ৫টার সময় মৎস্য বিক্রয় স্থানে বেড়াইবে। এইরূপ ৮।১০ দিন বেড়াইলে বাত একেবারে আরোগ্য হয়। মৎস্য বিক্রয় হইয়া গেলে মৎস্যের জল পড়িয়া তথা হইতে এক প্রকার গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস বাত রোগের পরম উপকারী।

বিবিধ।

হিক্কা রোগে—১। একটী পাতি ধা

কাগজি লেবুকে সূচ দ্বারা ছিদ্র করিয়া মিশ্রি প্রবেশ করাইয়া লেবুটী রোগীকে চুষিতে দিলে হিক্কা ভাল হয়।

২। ময়ূরের পুচ্ছ ভষ্ম করিয়া গলায় দিবে ও নারিকেল জলে মুড়ি ভিজাইয়া ঐ জল খাইলে হিক্কা ভাল হয়।

৩। বয়ড়ার মজ্জা ও শুঠি ৪ মাষা মধুর সহিত খাইলে হিক্কা নিবারণ হয়।

৪। শুঁঠ, পিপুল ও আমলকী প্রত্যেক চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কার শান্তি হয়।

বহুমূত্র—(১) আমলকীর রস ৪ তোলা, মধু ১ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বহুমূত্র ভাল হয়।

(২) এক্‌ষ্ট্রাক্ট ওপিয়াম, পল্‌ভ ইপিকাক, পটাশ নাইট্রাস প্রত্যেকটী ২ গ্রেণ লইয়া মোট ৬ গ্রেণ দ্রব্য একত্র গ্লিসিরিন দ্বারা মিশ্রিত করিয়া দুইটী পিল প্রস্তুত করিবে। প্রত্যেক সন্ধ্যাকালে একটী করিয়া এই পীল সেবন করিলে বহুমূত্র রোগের উপশম হয়।

নেবা—রঙ্গন ফুলের শিকড় জলে হাত ডুবাইয়া হাতে ঘসিলে নেবা আরোগ্য হয়।

পাঁচড়া—(১) কাল জিরে ভাজিয়া দুধের সরের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাঁচড়ায় দিলে আরোগ্য হয়।

(২) শ্বেত চন্দনের সহিত অল্প পরিমাণে কর্পূর মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মাখিলে চুলকনা আরোগ্য হয়।

(৩) এক পোয়া সরিষার তৈল অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে ১ তোলা মুদ্রাশঙ্খের গুঁড়া দিয়া উত্তম রূপে পাক করিবে, পরে নামাইয়া ঠাণ্ডা হইলে গাত্রে লাগাইলে চুলকনা আরোগ্য হয়।

(৪) পাঁচড়া ধুইয়া চর্ব্বির বাতি গলাইয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঘা'র উপর ফেলিলে তাহা শুকাইয়া যায়।

উকুন—(১) ললিতা শাকের বীজ কাঁজির সহিত বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে উকুন মরিয়া যায়।

২। আতা বিচি বাটিয়া মাথায় মাখিলে একেবার উকুন বিনষ্ট হয়।

বাখরগঞ্জ বরিশাল।

বাখরগঞ্জ খুন জখম ও উৎকৃষ্ট চাউলের জন্যই বিখ্যাত। বাখরগঞ্জ জেলার বরিশাল সহরে প্রাকৃতিক শোভা অতি রমণীয়। বিশেষতঃ কীর্ত্তন খোলা নদীর উপর হইতে বরিশালের বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিতে অতি মধুর। সুগভীরা নদী কীর্ত্তনখোলা বরিশালের অঙ্গদেশ বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বরিশালে এখনও ট্রেণ হয় নাই। ষ্টীমার ও নৌকাযোগে কীর্ত্তনখোলা নদীর উপর

দিয়া দেশ বিদেশে যাতায়াত করিতে হয়। বরিশালে অনেক প্রশংসনীয় ব্যক্তি ও অনেক উৎকৃষ্ট বস্তু আছে। সুবিখ্যাত চাঁদশীর ডাক্তার এই বরিশালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এখন নাই, তাঁহার বংশধরগণই তাঁহার প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কথিত আছে যিনি আদি ডাক্তার ছিলেন, তাঁহার গৃহে ৺ মা মনসা প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন এবং তিনি অদ্যাবধিও আছেন। এই মনসা দেবীই তাঁহাকে স্বপ্নযোগে ঘা'র ঔষধ শিখাইয়া দিয়া জগতে মনসা পূজার প্রচার করিতে আদেশ করেন। তদবধি তিনি বিখ্যাত চাঁদশীর ডাক্তার হইয়া জগতের প্রভূত হিতসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বাখরগঞ্জ বরিশালে শাস্ত্রদর্শী মহৎ ব্যক্তির অভাব নাই। এই বাখরগঞ্জ বরিশালে যত পণ্ডিত আছেন, বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ কথা, ভারতবর্ষের অন্য কোনও স্থানেও এত পণ্ডিত দেখা যায় না। এতদ্ব্যতীত পরোপকারসাধন বরিশাল-বাসীদের যেন জীবনের একটি দৃঢ় ব্রত। দেশী হউক, বিদেশী হউক, ইহাঁরা সকলেরই বিপদের সময়ে উপস্থিত হইয়া সহানুভূতি ও সাহায্য করিয়া থাকেন—সকলের আনন্দেই যোগদান করেন। অপর বরিশালের ব্রাহ্ম ও সাধু সম্প্রদায়গণ যে একটি মহৎ কার্য্য করেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয় এবং জনহিতকর। এ কার্য্যটী শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান করা। অমুকের স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে—স্বামিশোকাতুরা স্ত্রী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয্যাশায়িনী হইয়াছেন; অমুকের পুত্র কন্যা বা আত্মীয়-বিয়োগ হইয়াছে—এই কথা শুনিবামাত্র সেই সাধু সম্প্রদায় অনাহূত সেই পরিবারে প্রবেশ করেন এবং যে পর্য্যন্ত না শোকাতুরা শান্তি প্রাপ্ত হন, সে পর্য্যন্ত সেই গৃহে সন্ধ্যার পর মধুর গীতবাদ্যে গৃহটি শান্তিনিকেতন করিয়া রাখেন। কি মধুর প্রবোধ উক্তি! কি পবিত্র গান! ধারাবাহিকরূপে শুনিলে শোক নিবারণ হইবেই হইবে—মনে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হইবেই হইবে। আজ একবৎসর হইল আমি নিজেই একদিন বিষম পুত্র-শোকানলে দগ্ধীভূত হইতেছিলাম, তৎকালে এই সাধুদিগের সঙ্গীতাবলীই আমাকে রক্ষা করিয়াছে। এ জীবনে অনেক গান শুনিয়াছি—ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, সঙ্গীত মুক্তাবলী, গীত গান ইত্যাদি পুস্তকে অনেক গান পাঠ করিয়াছি, অনেকানেক ভাবুক ভক্তদের মুখেও কত গান শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু বরিশালী লোকের মুখে যেরূপ ভাবোদ্দীপক গান শুনিলাম, বোধ হয় এরূপ পবিত্রভাবের গান আর কখনও শুনি নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি উদ্ধৃত করিলাম :—

বঁধুয়ারে,—
ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুটলি তুই মোর।
তোরে বুকে করি আমি পাগলিনী তোর।
বুকে রাখি, যাই আমি যথায় তথায়,
টলে না পাগল মন (আর) কোন ভাবনায় রে।
শ্রান্ত হ'লে নদীতীর, তরুতল পাই,
তোর বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমাই রে॥

পথে ঘাটে লোকে বলে পাগলিনী যায়,
কেহ হাসে, কেহ মোর ধূলা দেয় গায় রে।
এত দিন হ'ল নাহি হলি পুরাতন ;
কেমনে ভুলায়ে রাখিস্ পাগলীর মন রে ?
(তারে) কেড়ে নিতে চায় কেহ ফেলে দিতে বলে,
(ওরে) পাগলী বাঁচিবে কেন এ ধন না হ'লে রে।

এইরূপ সব ভাবোদ্দীপক নূতন নূতন সঙ্গীতাবলীতে বরিশাল পূর্ণ। এরূপ ভাবের গানে প্রাণের ভিতর নূতন ভক্তি ভাবের রাজত্ব স্থাপন করে, নব আকাঙ্ক্ষা লইয়া হৃদয় যেন আবার নূতন হইয়া উঠে।

সে যাহা হউক্ বরিশালে গুবাক নারিকেল ও খেজুর বৃক্ষ এত অধিক যে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। মস্তকোপরি অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে অসংখ্য বৃক্ষাবলীর বিস্তৃত হরিৎ শোভা। নীলাভ সরু সরু হরিৎপত্রগুচ্ছের উপর সবুজবর্ণের টীয়া পাখীগুলির কলনাদ ও মধুর ক্রীড়া অতীব হৃদয়গ্রাহী। বরিশালে অনেক টীয়া পাখী দেখা যায়, বর্ষাকালে আবার এই পাখী দলে দলে শূন্য পথে দিবা দিবালোকে উড়িয়া বেড়ায়। কথন কথন কলহ করিতে করিতে রোয়াক বা ছাদের উপর আসিয়া পড়ে।

বরিশালে জাতাভিমানটা একটু বেশী বলিয়া যেন বোধ হয়। উড়িষ্যাবাসীদের মত বরিশালবাসী গোঁড়া হিন্দু। এখানে অনেক ব্রাহ্মণ মৎস্য মাংস স্পর্শ করেন না এবং অন্য জাতির ছোঁয়া লুচি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু। আজ কাল হিন্দু ধর্ম্মের অধিক আধিপত্য নাই বাবু-দিগকে পিছনে রাখিয়া যজ্ঞোপবীতধারী সুরুচিসম্পন্ন বৃদ্ধ কর্ত্তারাই কুক্কু পাখী ভক্ষণে অধিক তৎপর। এই ভাব প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের যদি কেহকিছু মাত্র গৌরব রক্ষা করিয়া থাকে, তবে শ্রীক্ষেত্র ও বাখরগঞ্জ বরিশাল।

বরিশালবাসী চাষা লোকের দোষে বরিশাল লোকসমাজে ঘৃণিত এবং ধর্ম্ম-জগতে পতিত রহিয়াছে। বরিশালে খুন জখমের মোকদ্দমাতেই হাকিম মহাশয়েরা সতত অস্থির। নিরক্ষর চাষাদের রাগই এই মোকদ্দমার প্রধান কারণ। এই সব খুনী লোকদের ভয়ে সামান্য পাহারাওয়ালা হইতে পুলিসের ইনস্পেক্টরকে—এমন কি সময়২ সময় হাকিমদিগকেও তটস্থ হইয়া থাকিতে হয়। এ স্থলে বরিশালের খুন খারাবীর বিষয় কিছু লিখিব না। পরে কখনও গল্প, উপন্যাস বা প্রবন্ধাকারে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

বারমেসে পেটের অসুখ এবং কলেরা বরিশালে একরূপ অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পানীয় জলের পঙ্কিলতাই এই সব প্রাণঘাতক ব্যাধির মূল কারণ। সহরে দুই একটা রীজার্ভ ট্যাঙ্কও আছে। রীজার্ভ ট্যাঙ্কের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য পাহারাওয়ালা পাহারা দিয়া থাকে। কিন্তু মানব-চরিত্র সর্ব্বত্রই সমান, পাহারাওয়ালাদের চক্ষে ধূলি দিয়া স্ব স্ব পানীয় জলের মধ্যে দূষিত পদার্থ নিক্ষেপ করিতে কাহারও মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব হয় না। এতদ্ব্যতীত বরিশালে ছোট বড়

পুষ্করিণীর অভাব নাই। পাতকুয়া ও ইন্দারার অভাবেই এই পুষ্করিণী বাহুল্যের কারণ। টাউনের ভাল জলের অভাব দূর করিবার জন্য কীর্ত্তনখোলা নদী কাটিয়া নালার মত করিয়া টাউনের মধ্যে কতক দূর জল আনা হইয়াছে। এই সব পুকুরের মধ্যে নদ নদীর জল বা এক পুকুর হইতে অন্য পুকুরের জল পড়িবার কোনও পথ নাই। টাউন হইতে বৃষ্টির জল নিকাশের কোনও ড্রেণের বন্দোবস্ত নাই। টাউনের উপর বনে জঙ্গলে, বন্ধুরে বা সমভূমিতে যে সব বৃষ্টির জল পড়ে, সেই জলই এই সব পুকুরের আয়তন ও গভীরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বৃষ্টির সময় বা বৃষ্টির পরে এই সব পুকুরের নিকটবর্ত্তী হইলে জলপ্রপাতের মধুর শব্দে মন পুলকিত হইয়া উঠে। বন, জঙ্গল, উচ্চ, নীচ বা সমভূমি হইতে কল্‌কল্‌ শব্দে জল আসিয়া পুকুরে পতিত হয়। এই সব প্রপাতকে বরিশালের নির্ঝরিণী নামে অভিহিত করিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অপূর্ব্ব নির্ঝরিণী মাটীর নীচে দিয়াও প্রবাহিত হইতে দেখা যায়।

বরিশালে তরিতরকারী ও শাকসব্জির অভাব নাই। মাছ দুধও অপর্য্যাপ্ত। বর্ষাকালে অমাবস্যা পূর্ণিমার যোগে ইলিশ মাছের বড় আমদানী হয়। এই সময় নির্ধন চাষালোকের বড় আমোদ। কলেরা হইবারও এই উপযুক্ত অবসর।

বরিশালে বাসা বড় দুর্ম্মূল্য। বাসার অভাবে সময় সময় অবস্থাপন্ন লোকদিগকেও কষ্ট পাইতে হয়। এখানে পাল্কী নাই। ঘোড়ার গাড়ীর আমদানীও বেশী বোধ হয় না। বরিশালের বৃহদাকার নদী কীর্ত্তনখোলা বড় বড় কুম্ভীরে পরিপূর্ণ। তাহারা গো মহিষ—এমন কি সময় সময় মানুষকেও গ্রাস করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। ডাঙ্গায় ব্যাঘ্রও আছে। সময় সময় তাহাদেরও উপদ্রব বাড়িয়া উঠে।

অল্প দিন হইল বরিশালের অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ মোকামে সেটেল্‌মেণ্ট আফিষ খোলা হইয়াছে। এই আফিশে বহু লোক খাটিতেছে। এই উপলক্ষে অনেকানেক দরিদ্র ব্যক্তির গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হইয়াছে। বরিশালের অন্তর্গত ঝালোকাঠি ও নলছিটির হাট গ্রামে অত্যন্ত চাউলের আমদানী হয়। সাহেবগঞ্জ সেটেলমেণ্ট আফিশে যে সব পেয়াদা কাজ করে, তাহাদিগকে অর্দ্ধেক দিনই মফঃস্বলে থাকিতে হয়। নিশিন্দা, ফরিদপুর, গোবিন্দপুর, কাল্লাহাটী, চরামদ্দি ইত্যাদি মফঃস্বল স্থানের দুর্দ্দশার কথা সেই সব পেয়াদাদের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হওয়া যায়। জলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুম্ভীর, ডাঙ্গায় নিরতিশয় ব্যাঘ্রভয়। এইরূপ অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দা লোকদের যে কি সুখ শান্তি, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

বরিশালের নদীতে পূর্ব্বে একটি অদ্ভুতপূর্ব্ব শব্দ হইত। সাহেব লোক এই শব্দকে "Barisal gun" "বরিশালের

তোপ" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন এবং এই শব্দ কি জন্য, কোথা হইতে উত্থিত হয় জানিবার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন ; কিন্তু তৎকালে সে সমুদায়ই ব্যর্থ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় প্রকৃতির কণ্ঠ-নিঃসৃত সেই "বরিশালের তোপ" উপস্থিত কয়েক বৎসর নীরব হইয়াছে। বরিশালে শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় ৺ জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর পূজা হয়। শ্রীক্ষেত্রে যখন রথযাত্রা হয়, এখানেও তখন রথযাত্রা হয়। ৺ জগন্নাথের প্রতিনিধি ৺মদনমোহনও আছেন। তাঁহাকেও স্বতন্ত্র রথে আরোহণ করান হয়। রথগুলির বাহ্য সৌন্দর্য্য এত সুন্দর যে, দেখিলে মন মুগ্ধ হয়।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস

পাপীর অনুতাপ।

আমার আরাধ্য দেব! এত দিন কেন
পাইনি তোমার দেখা? অনুক্ষণ যেন
খুঁজিতাম কারে? কিন্তু হায়! সকাতরে
কাঁদিয়াছি পথহারা, ব্যথিত অন্তরে!
প্রেম-ক্রোড় দে'ছিলে পাতিয়া, অবহেলি
গে'ছিলাম, কাচ খণ্ডে লোভে রত্ন ফেলি
অজ্ঞান অন্ধের মত! সুধু তাই নয়,
করেছি জীবন মন নরক-নিলয়।
হৃদয় নিভৃত স্থল এ কি চমৎকার!
আলোকিত দেখি আজি আলোকে
তোমার।
প্রেমলীলা হেরিতেছি এবে। বিরাজিছ
হৃদে তুমি "শান্তিময়!" সুধা বরষিছ
হাসিয়া অমিয় হাসি। লও নমস্কার,
বিরাজ হে চিরদিন হৃদয়ে আমার।

প্রমথনাথ চৌধুরী।

ঈশ্বরস্তোস্ত্র।*

(পরিবারস্থ সকলে সমস্বরে পাঠ্য)।

নম সত্য সনাতন জগৎকারণ,
নম চিদানন্দময় বিশ্ব-বিধারণ।
নম এক অদ্বিতীয় মুক্তির নিদান,
নম ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী শাশ্বত পুরাণ।
তুমি এক শরণ্য—বরেণ্য অবিনাশ,
তুমি এক জগৎপালক স্বপ্রকাশ।
জগতের হর্ত্তাকর্ত্তা পাতা চিরদিন,
পরম নিশ্চল তুমি বিকল্প-বিহীন।
সকল ভয়ের ভয়, ভীষণ-ভীষণ,
প্রাণীদের গতি তুমি পাবন-পাবন।
মহোচ্চপদ সবার তুমি নিয়ামক,
পরাৎপর রক্ষকগণের সুরক্ষক।
আমরা তোমায় স্মরি, ভজি হে তোমার,
জগতের সাক্ষী তুমি, নমি তব পায়।
এক সত্য বিশ্বাধার ঈশ নিরাধার,
ভবসিন্ধু তরি, লহ শরণ তোমার।

* মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের "নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়" স্তোত্র অবলম্বনে রচিত।

ধূমকেতু।
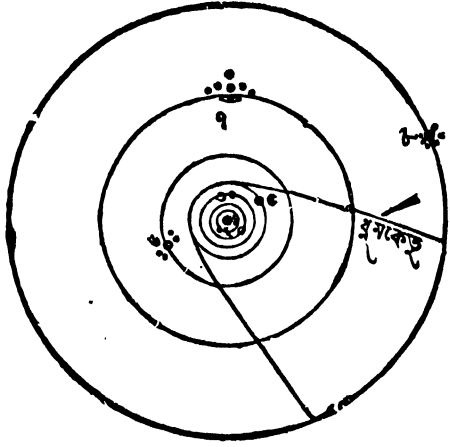
(এই সৌর জগতের ছবিতে সূর্য্য, গ্রহগণ ও ধূমকেতুর স্থান দ্রষ্টব্য।)

বিগত সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইউরোপের নানা স্থানে জ্যোতির্ব্বিদগণ একটী ধূমকেতু দেখিতেছেন। প্রথমে উহা লিক্ মান-মন্দিরে পেরিস নামক জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি ১লা হইতে ৩রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ধূমকেতুটীকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা বিশেষরূপে দর্শন করিয়া গণনা করিয়াছেন যে, ২৪শে নবেম্বর দিবসে উহা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইবে এবং তৎকালে চক্ষু দ্বারা তাহাকে দেখা যাইবে। তদনন্তর দক্ষিণাভি-মুখে ধূমকেতুটীর গতি আরম্ভ হইবে এবং আমাদের দেশেও হয় ত দৃষ্ট হইবে। কিন্তু এ সমস্তই এখন অনুমান-সিদ্ধান্ত মাত্র। ধূমকেতুদের গতি, আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি এখনও সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায় নাই। গ্রহ ও নক্ষত্রগণের প্রকৃতি ও গতি এখন গণনার আয়ত্ত হইয়াছে, কিন্তু ধূমকেতুসম্বন্ধে সেরূপ বলা যায় না। কেবল দুই চারিটীর গতি জ্যোতির্ব্বেত্তারা নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন। সেই জন্য ধূমকেতু সম্বন্ধে অনেক কুসংস্কার পৃথিবীর সকল দেশেই প্রচলিত আছে। ইউরোপে অশিক্ষিত লোকেরা মনে করে যে, ধূম-কেতু উদিত হইলে যুদ্ধ, মারীভয়, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। যখন ১০০৬ খ্রীঃ-অব্দে ইউরোপে প্রকাণ্ড পুচ্ছযুক্ত একটী ধূমকেতু উঠিয়াছিল, রোমের লোক অমঙ্গল

নিবারণার্থ নূতন একটী প্রার্থনা প্রণয়ন করিয়া সকল গির্জ্জাতে তাহা পাঠ করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে আমরা তিন বার ধূমকেতুর উদয় হইতে দেখিয়াছি। প্রথম ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে, দ্বিতীয় বার ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে এবং তৃতীয় বার বোধ হয় ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে। ১৮৫৭ সালে যে ধূমকেতু উঠিয়াছিল, উহার পুচ্ছটী প্রকাণ্ড ঝাঁটার ন্যায় এবং পশ্চিম দিকে সূর্য্যাস্তের পর দৃষ্ট হইত। সিপাহীবিদ্রোহের বৎসরে উদিত হওয়ায় লোকে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। যখন ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে দ্বিতীয় ধূমকেতু উদিত হইয়াছিল, তখন অজ্ঞ লোকেরা বলিয়াছিলেন যে, বোধ হয় পুনর্ব্বার কোনও বিদ্রোহ হইবে। এই ধূমকেতু উত্তর পশ্চিম দিকে সূর্য্যাস্তের পর দৃষ্ট হইত। তৃতীয় বার যে ধূমকেতু উদিত হয়, উহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দৃষ্ট হইত। ধূমকেতু দৃষ্টে স্বভাবতঃই মনে ভীতির সঞ্চার হয়। উহার আকার ভীষণ, গতির বেগ ভয়ঙ্কর; উহা অকস্মাৎ উদিত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই অদৃশ্য হয়। গ্রহদিগের গতি প্রবল হইলেও ধূমকেতুর ন্যায় নহে। পৃথিবী ৩৬৫ দিনে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, বুধ ৮৮ দিনে, শুক্র ২২৫ দিনে, দূরস্থ গ্রহের মধ্যে ইউরেনাস্ ৩০৭৮৭ দিনে অর্থাৎ প্রায় ৮৪ বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী এক সেকেণ্ডকাল মধ্যে ১,০১,১৭৩ ফুট স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করে, বুধ গ্রহ ১,৬২,৬১১ ফুট, শুক্র ১,১৮,৯৬০ ফুট, বৃহস্পতি ৪৪,৩৬২ ফুট, শনৈশ্চর ৩২৭৫৭ ফুট এবং ইউরেনাস্ ২৩০৯৩ ফুট স্ব স্ব কক্ষপথে ভ্রমণ করে। যে গ্রহ সূর্য্যের যত দূরে, তাহার কক্ষগতি তত মন্দ এবং পক্ষান্তরে যে গ্রহ সূর্য্যের যত নিকট, তাহার গতি তত বেগবিশিষ্ট। ধূমকেতু ইহাদের অপেক্ষা অধিক বেগবান্। যে ধূমকেতুটী সম্প্রতি দৃষ্ট হইয়াছে, জ্যোতির্ব্বেত্তারা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, সে এক সেকেণ্ডে ৪০ মাইল ভ্রমণ করিতেছে। আমাদের পৃথিবী এক দিনে ৯০০ মাইল ভ্রমণ করে। সূর্য্য হইতে ধূমকেতুদিগের দূরত্বও একটী বিস্ময়জনক ব্যাপার। কোন কোন ধূমকেতু সূর্য্য হইতে ৩৮০ কোটি মাইল দূরে গমন করে। আবিষ্কৃত কোন গ্রহের দূরত্ব এত অধিক নহে। আমাদের পৃথিবী কেবল নয় কোটি মাইল সূর্য্য হইতে দূরে। এই সকল কারণে ধূমকেতুকে লোকে এরূপ ভয় করে।

সার আইজাক নিউটন্ যখন 'মাধ্যাকর্ষণ' নিয়ম আবিষ্কার করিলেন, তখন তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে, ধূমকেতুগণ কি এই নিয়মের অধীন নহে? সেই সময়ে অর্থাৎ ১৬৮০ খ্রীঃ অব্দে অকস্মাৎ একটী ধূমকেতু দেখা দিল। তাহার উজ্জ্বলতা ও বেগ দৃষ্টে সকলের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। উহা এমনি দ্রুতবেগে সূর্য্যাভিমুখে ধাবিত [illegible], যেন সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া লয়প্রাপ্ত হইবে বোধ

হইতে লাগিল। সূর্য্যের যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার বেগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উহার পুচ্ছ দশ কোটি মাইল দীর্ঘ। উহা নিমেষমাত্রে অনন্ত আকাশপথে অদৃশ্য হইল। নিউটন গণনা দ্বারা দেখিলেন যে, ঐ ধূমকেতুর কক্ষ গ্রহদিগের ন্যায় বৃত্তাকার নহে, কিন্তু বহু বিস্তারিত এবং ছয় শত বৎসরে কক্ষ-ভ্রমণ শেষ হইবে। তিনি তৎকাল-প্রসিদ্ধ হেলি নামক জ্যোতির্ব্বিৎকে এই বিষয় অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে আর একটী ধূমকেতু দৃষ্ট হইল। হেলি উৎসাহিত হইয়া গণনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিউটনের পরামর্শে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত জ্যোতির্ব্বিদ্-গণের লিপি অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ঐ ধূমকেতু ৭৬ বৎসর ব্যব-ধানে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের লিপিতে দেখিলেন যে, একই ধূমকেতু খ্রীঃ অব্দের ২৪৮,৩২৪ ও ৩৯৯ সালে পুনঃ পুনঃ দেখা দিয়াছিল। হেলির গণনার সহিত ইহার ঐক্য হইল এবং তাঁহার মন উৎসাহিত হইতে লাগিল। ১০০৬ অব্দে একটী ভীষণাকার কেতুর উদয় হইয়াছিল, উহার পুচ্ছ সুদীর্ঘ কাস্তিয়ার ন্যায় বক্র। গণনা করিয়া দেখা গেল ঐ ধূমকেতুটীও হেলির ধূমকেতুর নির্দ্দিষ্ট সময়ে দৃষ্ট হইয়াছিল। আবার ১৪৫৬ অব্দে, ১৫৩১ অব্দে, ১৬০৭ অব্দে উহা দৃষ্ট হইয়াছিল। এই ধূমকেতুগুলি ৭৬ বৎসর ব্যবধানে উদিত হওয়ায় হেলির মনে আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, উহারা একই ধূমকেতু। হেলির আনন্দের সীমা রহিল না। জ্যোতির্ব্বেত্তারা যখন আপনাদের গণনা ভ্রমশূন্য দেখেন, তখন তাঁহারা এইরূপই উল্লসিত হয়েন। হেলি এখন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সমক্ষে প্রচার করিলেন যে, ১৬০৭ খ্রীঃ অব্দে যে ধূমকেতু উদিত হইয়াছিল, উহা ১৭৫৮ অব্দের শেষে অথবা ১৭৫৯ অব্দের প্রথমে পুনর্ব্বার দৃষ্ট হইবে। কিন্তু সেই সময় পর্য্যন্ত তাঁহার জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া বলিয়া গেলেন যে, ভাবী জ্যোতি-র্ব্বেত্তারা যেন স্বীকার করেন যে, একজন ইংরেজ জ্যোতির্ব্বিৎ এই ধূমকেতুর বিষয়ে পূর্ব্বাভাস দিয়া গিয়াছেন। হেলির সময়ে জ্যোতিষ গণনার পরিপক্কতা লাভ হয় নাই এবং তিনি ব্যতীত ধূমকেতুর গতি আর কেহ গণনা করিতে জানিতেন না। তৎকালে ইউরেনস্ ও নেপচুন গ্রহদ্বয় আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার ধূম-কেতুর উদয়কাল বিষয়ে তাঁহার গণনা যে দুই এক সপ্তাহ অগ্র পশ্চাৎ হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। ছয় মাসকাল ক্লেরট নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ লেলাণ্ড নামক অন্য এক জ্যোতির্ব্বেত্তার সহিত প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত গণনা করিয়া ১৫০ বৎসরের মধ্যে ঐ ধূমকেতু কোন্ কোন্ প্রধান গ্রহের আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়াছিল, নির্ণয় করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া লেলাণ্ডের এমন পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা তাঁহার

শরীর চিরকালের জন্য অসুস্থ হইয়া গিয়াছিল। মাডাম লাপুটনাম্নী জনৈকা জ্যোতির্ব্বেত্রী রমণী এই কার্য্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য না করিলে তাঁহারা গণনা সমাপ্ত করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকে ১৫০ বৎসর বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর হইতে ঐ ধূমকেতুর দূরত্ব গণনা করিতে হইয়াছিল। এই দুরূহ গণনাতে যে লেলাণ্ড পীড়িত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। গণনা করিতে করিতে ধূমকেতুর আগমনকাল নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল, সেই জন্য অন্যান্য ক্ষুদ্র বিষয় গণনা করিবার সময় পান নাই। অবশেষে ক্লেরট ঘোষণা করিলেন যে, শনৈশ্চরের আকর্ষণে এক শত দিবস এবং বৃহস্পতির আকর্ষণে ৫১৮ দিবস এই ধূমকেতুটীর পশ্চাদ্গতি হইবে, এবং এই গণনানুসারে হেলির ধূমকেতু ১৫ই এপ্রিল তারিখে দৃষ্ট হইবে; তবে ৩০ দিনের অগ্র পশ্চাৎ হইতে পারে, যে হেতু তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় গণনা করিবার সময় পান নাই। ২৫শে ডিসেম্বর দিবসে একজন কৃষক জ্যোতির্ব্বেত্তা হেলির ধূমকেতুকে দেখিতে পাইলেন, এবং ১৮ই মার্চ্চ দিবসে উহা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। উভয়েরই জয় হইল। হেলি ডিসেম্বরের শেষ অথবা জানুয়ারীর প্রথম গণনা করিয়াছিলেন, তাহাই হইল; এবং ফরাসিস জ্যোতির্ব্বেত্তারা যে এপ্রেল গণনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কেবল ১৯ দিন মাত্র প্রভেদ হইয়াছিল। হেলির ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ায় জ্যোতির্ব্বিদ্‌জগতে মহা আনন্দধ্বনি উঠিল।

(ক্রমশঃ)।

সন্দেহে বিভ্রাট।

(৪৭১ সংখ্যা—২১৭ পৃষ্ঠার পর)।

সুধীরচন্দ্র যখন গৃহে আসিলেন, তখন চারুকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন চারু শয্যায় মুখ লুকাইয়া শুইয়া আছে। তিনি কিছু না বলিয়া দীপের নিকটেই যে একখানি আরাম-চেয়ার ছিল, তাহাতে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ রহিলেন। অবশেষে অতিশয় অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে সুধীর বাবু বলিলেন "চারু! তোমার কি কিছু বলিবার নাই?"

চারু শয্যা হইতে মুখ তুলিয়া, স্বামীর সেই ভ্রূকুটি-কুটিল গম্ভীর মুখ দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল। লজ্জায় তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল। সে অতি মৃদু

কণ্ঠে বলিল "কি আর বলিব? তোমার ব্যবহারে তোমার প্রতি সন্দেহ হইয়াছিল, তাই আমি নিজে গিয়াছিলাম।"

"তোমায় লেখা পড়া না শেখানই উচিত ছিল, তাহ'লে কথায় কথায় এত সন্দেহ হইত না বা এত সাহসও বাড়িত না। পরের বাড়ীতে যেতে একটুও ভয় হইল না?"

"তোমার ভালবাসায় বঞ্চিত হ'য়েছি, এটা যখন স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল, তখন আর ভয় বা কি, লজ্জা বা কি?"

"কিসে এত সন্দেহ হইল?"

"দুদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওকি তোমার পরিচিত?' তুমি কিছু বলিলে না। তাহার পর তোমার এই পরিবর্ত্তন, তুমি না বুঝিলেও অন্যের বুঝিতে বাকি নাই। তাহাতে কাহার না সন্দেহ হয়? তুমি কি প্রত্যহ সেখানে যাইতে না? অন্য লোকের বাড়ীতে গেলে কি আর ভাবিব? তখন ত জানিতাম না তোমার বোন। তোমার যে আবার বোন ছিল, তাহাও ত কখন শুনি নাই।"

"আর অত ঠাট্টাতে কাজ নাই। আজ দশ বৎসর হইতে দেখিতেছ, কবে অবিশ্বাসী দেখিলে? আমাকে অবিশ্বাস করিতে একটু ইতস্ততঃ করিলে না?"

"আমি একে কুরূপা, তাতে সন্তান-হীনা, আমায় কি তুমি চির দিন ভাল-বাসিতে পারিবে?"

"চারু!"

চারুর আর কথা বলা হইল না। ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর কণ্ঠলগ্না হইয়া কাঁদিতে লাগিল। উভয়ের অশ্রুজলে উভয়ের অশ্রুজল মিলিত হইল। তখন আর উভয়ের বিবাদ মিটিতে বেশী সময় লাগিল না। কাঁদিয়া কাঁদাইয়া আবার উভয়ে হাসিলেন, তখন চারু ভাবিল,

"আমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
উনি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্‌গে এ বসুমতী যার খুসী তার।"

কিয়ৎক্ষণ পরে সুস্থির হইয়া চারু বলিল, "নিজেরত কথায় কথায় রাগ করা হয়, আমায় এত দিন লুকান কেন? আমি রাগ করিতে জানি না। এ কয় দিন আমায় কি কষ্ট না দিয়াছ?"

"সে জন্য আমায় ক্ষমা কর, আমার দোষ নয়। আমায় কমলা শপথ দিয়াছিল, কিছু দিন ভাবিয়া পরে এ কথা তোমায় বলিতে বলিয়াছিল। তোমায় বলিতে না পারিয়া কি আমি সুখী ছিলাম? তবে তোমার সন্দেহ যে এত দূর গড়াইবে, আমি তাহা স্বপ্নেও মনে করিতে পারি নাই, এটা আমারই ভুল।"

"যাক্ সে কথা। আমার হারানিধি তোমাকে যে ফিরাইয়া পাইয়াছি, সে জন্য ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ। একটা কেন দশটা বোন আসিলেও ত আর অংশ পাবে না। এখন তোমার বোনের সব গল্প বল শুনি।"

"সে অনেক বড় গল্প, আচ্ছা শোন। এ কথা গোপনীয়, গোপনে রাখিও।"

"আমায় আর তা শিখাইতে হবে না।"

"কমলা আমার সহোদরা ছোট বোন। আমার চেয়ে দুই বৎসরের ছোট। অতি শৈশবেই তাহার বিবাহ হয়। জানত আমার বাবা কিরূপ ঘোরতর হিন্দু ছিলেন। কমলার স্বামী অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। আশৈশব আমাদের বাটীতে পালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অতিশয় কুলীনের সন্তান, দেখিতেও সুন্দর ছিলেন সেই জন্য পিতা গৃহে রাখিয়া সন্তান-স্নেহে পালন করিয়া এক মাত্র কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। সদরে এণ্ট্রান্স পাস করিয়াই সুবোধকুমার কলিকাতায় যান। সেখানে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। তিনি গোপনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাহার পর ছুটীতে গৃহে আসেন। সেই সময় বাবাকে কলিকাতা হইতে কে এক বেনামী পত্রে সুবোধ কুমারের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সংবাদ জানায়। বাবা সে পত্র পাইয়াই সুবোধ কুমারকে ডাকিয়া অতিশয় তিরস্কার করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলেন। সুবোধকুমার বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেলেন। কিন্তু সে রাত্রি হইতে আর কমলাকে পাওয়া গেল না। বালিকা কমলা বার বৎসর বয়সেই আপন ধর্ম্ম চিনিয়া স্বামীর আশ্রয়ে গেল। তখন সুবোধ দ্বাবিংশ বর্ষের যুবক মাত্র। সেই চপলস্বভাবের বশীভূত হইয়া সুবোধ কুমার বালিকা স্ত্রী লইয়া একাকী সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। আমাদের মা ছিলেন না, কাজেই বাবার আর রাগ পড়িল না। কমলা যদি না যাইত, তাহা হইলে কন্যার মুখ দেখিয়া জামাতার প্রতি ক্রোধ দূর হইত, কিন্তু কমলা তাঁহাকে না বলিয়া যাওয়ায় তিনি অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। সে কষ্ট তিনি জীবিতাবস্থায় বিস্মৃত হন নাই। তিনি পূর্ব্বে যখন অন্দরে প্রবেশ করিতেন, 'মা কমলা' বলিয়া ডাকিয়া আসিতেন। তাহার চলিয়া যাওয়ার পর বাটীতে কেহ তাহার নাম মুখে আনিতে পারিবে না এই আজ্ঞা দিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় আর কখনও কেহ তাহার নাম শুনে নাই। মৃত্যুকালীন প্রলাপের সময় কেবল তাহারই নাম করিয়াছিলেন 'মা এলিরে' 'কমলা মা আমার' এই সব প্রলাপ বকিতেন। যখন কমলা চলিয়া যায়, আমার বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। বাবাকে দু এক বার তাহাকে ক্ষমা করিতে বলায় বাবা এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে আমি আর সে কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। সেই কমলাকে এই স্থানে ষোল বৎসর পরে দেখিয়া আমি যে কতদূর বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পার। কমলার মুখের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহাকে দেখিলে এখনও তাহার বেশী বয়স হইয়াছে মনে হয় না। তাই আমি পীর পাহাড়ে অমন অন্যমনস্কভাবে চাহিয়াছিলাম। কমলাও আমার পরে বলিয়াছে হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তাহার পিতাকে স্মরণ হইয়াছিল। সকলেই ত বলে জান আমি শৈশব

হইতেই তাঁহার মতন হইয়াছি। তাহার পর কষ্টহারিণী ঘাট হইতে ফিরিবার সময় পুনরায় তাহাকে দেখি, তাহাতে আমার বিস্ময় ও কৌতুহল এত দূর উদ্দীপ্ত হয় যে আমি সেই রাত্রেই তাহার বাটীতে না গিয়া থাকিতে পারি নাই। মনে আছে কোন্ দিন? সেই যে দিন তুমি খুব রাগ ক'রেছিলে। প্রথমে আমি যাইবামাত্র ভৃত্য নাম জিজ্ঞাসা করিল, আমি কিছু না বলিয়াই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম 'কমলা'। 'কমলা' বলিবামাত্র সে ব্যস্ত হইয়া আকুলভাবে কহিল, "আপনি কে?"

'আমি সুধীর, কমলা তুমি আমায় কি একেবারে ভুলে গেছ?"

"আমাদের সুধীর, আমার বাবার বংশধর, আমার দাদা সুধীর" আর কিছু না বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। যখন সে সুস্থির হইল, তখন সে আপনার সব কথা বলিল। কি করিয়া তাহার স্বামী তাহাকে লইয়া দেশে দেশে ফিরিয়াছিলেন, তাহাকে প্রচারকদিগের বাটীতে রাখিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। অনেক দিন পরে মাষ্টারি করিতে জামালপুরে আসিয়াছিলেন। সেখানে কমলার দুইটি সন্তান অকালে মরিয়া যায়। পরে তাহার স্বামী মুঙ্গেরে বদলী হয়। সে এখানে একটিমাত্র শিশু সন্তান লইয়া আসে। এখানে আসিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় দুই বৎসর কঠিন পীড়াক্রান্ত হইয়া স্বামীর অকালে মৃত্যু হয়। শিশু সন্তানটির সে সময় যত্ন না হওয়ায় পীড়া হয়, সেও আর নাই সে আজ কয়েক মাসের কথা। দুঃখিনীর আর দুঃখের সীমা নাই। তাহার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। তাহাতে মনের যে অবস্থা হয় বুঝিতে পার। আমি তাহাকে প্রথমেই আমার এখানে আসিতে বলি, তাহাতে সে কোন মতে স্বীকৃত হইল না। সে বলে যখন সে পিতার অমতে স্বামীর সহিত পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিল ও অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তখন আর আমাদের গৃহে তাহার স্থান নাই। পিতার অভিশাপ মস্তকে বহন করিয়া চিরজীবন দুঃখেই কাটিতেছে, সে আর সে বোঝা লইয়া আমার গৃহ দুঃখপূর্ণ করিতে চাহে না। তাহার বিশ্বাস বাবা যখন তাহার প্রতি এত বিরক্ত ছিলেন যে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে ক্ষমা করেন নাই, তখন আর পৈতৃক সম্পর্ক তুলিয়া কি কাজ? সে প্রথম সন্তানের ছবি ও চিঠি বাবাকে পাঠাইয়াছিল তাহার উত্তর পায় নাই সেই অবধি সে আর কখনও পত্রাদি লিখে নাই বা আমাদের কোনও সংবাদ লয় নাই। তোমাকেও বলিতে মানা করিতেছিল, বলে "বউও ঘৃণা করিবে"। আমিত ভাবিয়াছি, যাই হোক্ আমি তাহাকে আমার গৃহে আনিবই, কি বল?

চারু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অঞ্চলে অশ্রুজল মুছিয়া কহিল—"আশ্চর্য্য, তোমার বোন আছে বা কখনো যে ছিল, আমি এক দিনও তাহা জানিতাম না।"

"সে কথাত আমাদের বাড়ীতে কখনো উত্থাপন করা হয় নাই। আমরাই জানিতাম না যে, কমলা বাঁচিয়া আছে।"

"নলিনীরা জানে তুমি প্রত্যহ ওবাড়ীতে যাও, তার কি হবে?"

"কে বলিয়াছে? তুমিইত?"

"না সে আপনি সন্ধান নেয়?"

"তাহাদের স্বার্থ কি?"

"আমার জন্য তাহারা ভাবিয়াছে আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

"চারু।"

"আবার ওই প্রকারে ডাকিবে? আমি আর সহিতে পারিব না। এঁকে লজ্জায় কষ্টে আমি তোমার দিকে চাহিতে পারিতেছি না।"

"তাহলে তুমি কমলাকে যা বল্‌ছিলে তাই হবে, তাকে কোথাও পাঠিয়ে দেব, কেমন? যাতে আর আমাদের মুখ না দেখ্‌তে পায়।"

"আচ্ছা।"

তাঁহাদের সে দিনের মত সে কথা সমাপ্ত হইল। (ক্রমশঃ)।

ঈশ্বরের নামাবলী

(৪৭১ সংখ্যা—২২৭ পৃষ্ঠার পর)।

দণ্ডক, দণ্ডদাতা, দগ্ধহৃদিচন্দন, দক্ষ, দম্ভবিনাশন, দয়াময়, দয়ার্ণব, দয়াসিন্ধু, দয়ার সাগর, দয়াল, দয়ালু, দয়াবান্, দয়ানিধি, দয়াঘন, দর্পহারী, দরিদ্রের দুঃখভঞ্জন, দর্শন-দুর্লভ, দরিদ্রবন্ধু, দর্শনাতীত, দশভুজা, দশদিগ্ব্যাপী, দহন-নিবারণ, দাক্ষিণ্য-রত্নাকর, দাতা, দানবদলন, দানী, দামোদর, দারিদ্র্যভঞ্জন, দিক্‌পতি, দিগম্বর, দিগ্বাস, দিব্যজ্যোতিঃ, দিব্যগুণধর, দীক্ষক, দীক্ষাগুরু, দীনজনসখা, দীননাথ, দীনতারণ, দীনবন্ধু, দীনশরণ, দীনসখা, দীনহীনের গতি, দীপ্তিমান্, দুঃখহারী, দুঃখবারি, দুঃখমোচন, দুঃসময়বন্ধু, দুঃসহ-যাতনাহারী, দুঃসাধ্যসাধক, দুঃস্থজনত্রাতা, দুনিয়ার মালিক, দুরদৃষ্টহরণ, দুরন্ত রিপুশাসন, দুরিতনিবারণ, দুরূহসমস্যাপূরণ, দুর্গতিহরণ, দুর্গতিনাশন, দুর্গমপথতারণ, দুর্ঘটঘটক, দুর্জ্জন-দমন, দুর্জ্জয়, দুর্দ্দর্শ, দুর্দ্দশাহরণ, দুর্দ্দিননিবারণ, দুর্নীতিনাশন, দুর্ব্বলবল, দুর্ব্বল-বলদাতা, দুর্বুদ্ধিহরণ, দুর্ভগাভরণ, দুর্ভাগ্যনাশন, দুর্ভাবনা-নিবারণ. দুর্ম্মতিবিনাশন, দুর্লভ, দুর্লভদরশন, দুর্লভরত্ন, দুষ্কৃতিহরণ, দুষ্টদমন, দুষ্প্রাপ্য, দুস্তর-সাগরতরণী, দূরদর্শী, দূরাৎ সুদূরং, দৃঢ়সংকল্প, দৃষ্টিবান্, দেবদেব, দেব, দেবতা, দেশকালাতীত, দেহবিহীন, দৈত্যদলন, দৈবত, দৈবশক্তিবিধাতা, দোষহীন, দোষহরণ, দ্যুতিমান্, দ্রোহহীন, দ্বন্দ্ববিহীন, দ্বিজত্ববিধাতা, দ্বিতীয়হীন, দ্বেষহিংসাবিহীন, দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিতম্।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, বঙ্গের ছোট লাট সার জন উডবরণ গত ২১এ নবেম্বর প্রাতে মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার সৌজন্য, সহৃদয়তা ও প্রজারঞ্জকতা গুণে তিনি সকল শ্রেণীর বঙ্গবাসীর অতিশয় শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় হইয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার আলেকজেণ্ডার ম্যাকেঞ্জি অল্প দিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। জগদীশ্বর ইহাঁদের আত্মার শান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন।

২। আগামী ৬ই ডিসেম্বর বড় লাট কলিকাতায় আসিবেন, ১৫ই 'লেভি' দরবার করিবেন।

৩। বরদার মহারাজা কলিকাতার ভিক্টোরিয়া স্ত্রীশিক্ষালয়ের সাহায্যার্থ ২০০ দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

৪। বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কুমারী চন্দ্রমুখী বসু গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহে ৮০৲ টাকার স্থলে ১২০৲ টাকা মাসিক পেনসন পাইয়াছেন।

৫। গত সেন্‌সস্ গণনায় বাঙ্গালায় লোকসংখ্যা মোটে ৭,৮৪,৯০,৪১০। স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। বালিকাদের বিবাহের গড় বয়স ১১ বৎসর। লেখা পড়া জানা পুরুষের সংখ্যা প্রতি হাজারে ১৪৬ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৭ জন মাত্র।

৬। এলাহাবাদে কুমারী চট্টোপাধ্যায় বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৭। বড় লাট লর্ড কুর্জ্জন অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে সোনার গিল্টি করা এক সুন্দর ঘড়ি উপহার দিয়াছেন। মন্দিরের অধ্যক্ষেরাও তাঁহাকে একখানি শাল ও শিরোপাসহ ভোগপ্রসাদ প্রদান করিয়াছেন।

বামা রচনা।

জন্মভূমির প্রতি।

জননী জনমভূমি! এই ত এসেছি আমি,
　　লহ মা যতনে।
হাসিয়া গেছিনু ছেড়ে, কাঁদিয়া আসিনু ফিরে,
　　বিধির বিধানে।

তুমি অতি পুণ্যবতী, ত্রিদিবের প্রতিকৃতি,
　　এ দীন সন্তান।
তোমার চরণতলে, এসেছি জুড়াব ব'লে,
　　কর দৃষ্টি দান।

স্তবক—শরৎ।

(গত প্রকাশিতের পর)

গিরিতটে শরতের সুষমা হেরিয়া
কহিলা কোদণ্ডধারী লক্ষ্মণে চাহিয়া—
"আসিল বরষা অন্তে শরত বিমল,
কান্তিরূপ-বাসে ধরা কেমন উজ্জ্বল!

স্থবিরা বরষাশিরে জটাজূটপ্রায়,
শুভ্র কাশ-ফুল কিবা নদীচরে ভায়!
অগস্ত্য তারকা দৃষ্টে সলিল শুকায়, (১)
সন্তোষ আগমে যথা লোভ দূরে যায়।

দুঃসহ হইল অতি দীনেশ-কিরণ,
গুণি-যশ খলপাশে দুঃসহ যেমন।
নদনদী সরোবর নিরমল অতি,
মোহ-অন্তে মানবের যথা স্বচ্ছ মতি।

কমিল ক্রমেতে নদী-সরসী-জীবন,
মায়াপাশে ধীরে মুক্ত সাধক যেমন।
আসিল বিমল ঋতু নেহারি খঞ্জন,
সুকৃতি ফলেতে যেন উদিল সুক্ষণ।

কি রঙ্গে সারিকা আহা! মধুতান তোলে!
পল্লব-শ্যামল দূর পর্ব্বতের কোলে।
দেবর্ষি-বীণার প্রায় মুমূর্ষুর প্রাণ,
অমৃতে ভরিয়া দেয় সে মধুর তান।

পঙ্করেণু-মুক্ত মহী উপজয়ে প্রীতি,
লোকে যথা নীতিপটু নৃপতির কৃতি।
সলিল সঙ্কোচে মীন হইল বিকল,
বহুপকুটুম্বী যথা বিহনে সম্বল।

মেঘ-অন্তে নিরমল হইল আকাশ,
ভকত ছেদিয়া যথা মমতার পাশ।
মাঝে মাঝে মৃদু বৃষ্টি কোথাও বা হয়,
লক্ষলোক-ভক্তি যথা একেতে উদয়।

বণিক্ ভিখারী আর নৃপতি তাপসে (২)
বাহিরিলা বাস ত্যজি পরম হরষে,
সুকৃতি ফলেতে হ'লে ভকতি-উদয়,
সাধকের মায়াপাশ ছিন্ন যথা হয়।

নিরাতঙ্ক মীন যথা সলিল অগাধ,
হরি-আশ্রিতের তথা নাহিক প্রমাদ।
কমল ফুটিয়া হ্রদ শোভিছে তেমন,
গুণাতীত ব্রহ্ম হ'লে সগুণ যেমন।

ধবল কুমুদকুলে সরঃ সুশোভিত,
সত্ত্বগুণ কিবা তমঃ হৃদে উজলিত!
পদ্মবনে 'গুণ গুণ' অলির ঝঙ্কার,
ব্রহ্মসাধকের কণ্ঠে পবিত্র ওঙ্কার।

অদৃষ্টেতে সোম পুষ্প বিতরিছে বাস,
নাহি থাকে সাত্ত্বিকের বশেতে প্রয়াস।
স্থলকমলেতে শুধু রূপ আড়ম্বর,
আড়ম্বরে রত যথা গুণহীন নর।

শোভিতেছে স্থানে স্থানে শ্যামল অটবী,
সপ্তপর্ণকুলে চিত্রবিচিত্রিত ছবি।
আনি দেয় শিরঃশূল যাহার আঘ্রাণ,
দাম্ভিক জনের আত্মশ্লাঘার সমান।

(১) দক্ষিণাকাশে শরৎকালে অগস্ত্য তারার উদয় হয়। অগস্ত্য উদয়ে পঙ্কিলমার্গ শুষ্ক এবং নদী ও পুষ্করিণী নির্ম্মল হইবার কথা প্রসিদ্ধ আছে।

(২) শারদারম্ভে গড়জাতের বণিককুল বাণিজ্যার্থে বাহির হয়। প্রাচীনকালে রাজগণ শরৎকালে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন। তাপসবর্গ চাতুর্ম্মাস্য অন্তে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন।

অবনত ধান্তবৃক্ষ মাঠের মাঝারে
মনোরম পক্ক শালী ধান্যরাশিভারে।
হেথা আসি এই শিক্ষা লভয়ে হৃদয়—
প্রকৃত জ্ঞানের ফল অমূল্য বিনয়।

নির্ম্মল তামসহীন মধুর শরদে
শোভিছে প্রকৃতি কিবা সুষমাসম্পদে।
হৃদি হ'তে রজোভাব হইলে নিঃশেষ
দেখায় প্রস্ফুট যথা আধ্যাত্মিক দেশ।

নেহারিয়া মনোরম সুনীল গগন
হৃদয় আপন সত্তা হয় বিস্মরণ।
না পাইয়া আদি অন্ত হয় সে স্তবধ,
জীবন্তে লভয়ে সে কি নির্ব্বাণ সম্পদ!

প্রদোষেতে কাদম্বিনী পশ্চিম গগনে
প্রকটিছে কত ছবি কুঙ্কুমবরণে!
চকিতে সে চারু শোভা হয় অবসান,
বাসনার স্তূপ যথা হয় খান খান।

চক্রবাক নিশীথিনী নেহারি বিরস,
পরের সম্পদে যথা খলের মানস।
নিশার শিশির হরে দিবসের তাপ,
সাধুজন সঙ্গে যথা দূরে যায় পাপ।

ঢলঢল জ্যোছনায় প্লাবিত আকাশ,
নেহারি উপজে মনে কি মহা-উল্লাস!
মজি সেই পূতভাবে সাধক হৃদয়,
ভাবিতেছে জড় বিশ্ব হ'ল কি চিন্ময়!
চকোর শশাঙ্কে হেরি বিহ্বলজীবন,
ইষ্টদেব ধ্যানে মজি ভকত যেমন।
লুকাইল শীতভয়ে মশক ও দংশ (৩),
সদ্‌গুরু যোগেতে যথা অবিদ্যার ধ্বংস।

সমুজ্জ্বল ছায়াপথ জন-মন রমে,
ধরমের পথ একি পাপের কর্দ্দমে!
যেমন উজ্জ্বল মরি তারকার মালা,
ওরা কিগো পূত জ্যোতির্ধামের জানালা?

ধরণী উজলা দিবা আলোকমালিনী
নিন্দিয়া মুকুতাদাম নীহার-শালিনী।
কি সুন্দর শরতের উষা আহা মরি!
কি সুন্দর শরতের কৃশা গোদাবরী।

প্রভাতী তারকা উদি ওই গিরিশিরে
দেখিতেছে স্বচ্ছমুখ গোদাবরীনীরে।
ভগবৎ-জ্যোতি যথা ভকত-মানসে,
তেমতি এ চারুশোভা স্রোতেতে বিলসে।

পুলিনের কুহেলিকা হইয়া প্রকট,
আবরিছে ধীরে শ্যাম গিরিবর-তট।
তরুণ তপনকর দহে তার কায়া,
জ্ঞানের আলোকে যথা সংসারের মায়া।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী, কলিকাতা

(৩) ডাঁস।

রাজ্যাভিষেক।*

কি আনন্দ-বার্ত্তা আজ শুনিলাম কাণে,
জ্বলিল আশার দীপ সকলের প্রাণে।
দূরে গেল যত দুখ,
পরাণে জাগিল সুখ,
বসিবেন মহারাজা সিংহাসনোপরে,
উঠিল আনন্দ-রোল ভারত ভিতরে।১
শুন যত রাজভক্ত!
হ'য়েছেন রোগমুক্ত

* সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে।

আমাদের মহারাজা দেবতার বরে,
বসিবেন তাই আজ সিংহাসনোপরে।
তাইরে আনন্দ রোল,
তাই এত গণ্ডগোল,
উঠেছে ভারত আজ উল্লাসে মাতিয়ে,
সকলের প্রাণে সুখ উঠেছে জাগিয়ে।২
উল্লাস উদাম-ভরা,
আজিগো সমগ্র ধরা,
উৎসাহ আনন্দ আজ প্রতি ঘরে ঘরে,
বসিবেন রাজা রাণী সিংহাসনোপরে।

সুখের সাগরে ভাসি
মাত যত বঙ্গবাসী,
গাহরে মঙ্গল-গীতি বল জয় জয়,
কৃতজ্ঞ অন্তরে বল জয় দয়াময়। ৩
যাঁহার দয়ায় হয়
সুখ শান্তি সমুদয়,
গাহ। তাঁহারি জয় গাহ সমস্বরে,
ডাক সেই পরাৎপরে কৃতজ্ঞ অন্তরে।
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে
বসিবেন সিংহাসনে
আমাদের মহারাজা বিভুর কৃপায়,
গাহরে ভারতবাসী সম্রাটের জয়। ৪
আনন্দে মাতরে আজ,
পর সবে নব সাজ,
আন তুলে মনোহর যত আছে ফুল,
কামিনী রজনীগন্ধা গোলাপ বকুল,
আন তুলে যুঁই বেলা,
পর সবে ফুলবালা,
দোলাও রে ফুলমালা গৃহে বাতায়নে,
গাহরে মঙ্গলগীতি গাহ একতানে। ৫
সম্রাট সুধীর অতি,
সদাশয় মহামতি,
প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী উদার হৃদয়,
গাহরে ভারতবাসী গাহ তাঁর জয়।
প্রার্থনা কর রে আজ
আমাদের মহারাজ
সুখী হৌন চিরতরে মহারাণী সনে,
বসিবেন রাজা রাণী রাজ-সিংহাসনে। ৬
কোন ভয় নাহি আর,
অত্যাচার অবিচার,
কিছু নাহি রবে আর বৃটিষ শাসনে,
চিরসুখী হৌন রাজা প্রজার পালনে।
উৎসব আনন্দে মেতে
একমনে যোড় হাতে
বিভুর চরণে আজ মাগ এই বর,
সম্রাট সাম্রাজ্ঞী সুখী হৌন নিরন্তর।৭
মাতা ভিক্টোরিয়া সতী
মহাপ্রাণা দয়াবতী,
ছিলেন আদর্শ নারী আদর্শ জীবন,
অবশ্য হবেন পুত্র মায়ের মতন।
কর তুমি আশীর্ব্বাদ
কি আর বলিব নাথ!
সকলি ত হয় বিভো! তোমার ইচ্ছায়,
আজি এ আনন্দ, সেতো তোমারি কৃপায়।৮
তোমার কৃপায় রাজা
পালন করুন প্রজা,
বসিবেন রাজা রাণী আজি সিংহাসনে,
তাই এ প্রার্থনা প্রভু তোমার চরণে ৯

শ্রী—

Registered No. C. 134

No. 473-74. January & February, 1903.

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ। ৪৭৩-৭৪ সংখ্যা। পৌষ ও মাঘ, ১৩০৯। ৭ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵০, পশ্চাদ্দের বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 873-74. Jany. & Feby, 1903.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ।	পৌষ ও মাঘ, ১৩০৯।	৭ম কল্প।
৪৭৩-৭৪ সংখ্যা।		৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গের মহা শোকের ঘটনা—বঙ্গেশ্বর উডবরণ গত ২১এ নবেম্বর শুক্রবার প্রাতে বেলভিডিয়ার রাজভবনে প্রাণত্যাগ করেন। সেই দিন ইটলীস্থ গবর্ণমেণ্ট সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত হয়। রাজপ্রতিনিধির ব্যবস্থানুসারে সামরিক সম্মানের সহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বেলভিডিয়ার হইতে সমাধি-স্থান পর্য্যন্ত লোকের ভিড়, সৈন্যসজ্জা ও শোকসূচক বাদ্য হইয়াছিল। কলিকাতায় এরূপ ব্যাপার আর হয় নাই। আফিস বিদ্যালয়াদি বন্ধ হইয়াছিল। দেশের সর্ব্বস্থান হইতে লেডী উডবরণ ও তাঁহার কন্যাদ্বয়ের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ শোক-লিপি অসংখ্য আসিতেছে। তাঁহারা ইতি-মধ্যে স্বদেশে যাত্রা করিয়াছেন। জগদীশ্বর তাঁহাদিগের প্রাণে শান্তি দান করুন্।

দিল্লী শিল্পপ্রদর্শনী—আগামী ৩০এ ডিসেম্বর ইহা খোলা হইবে। এ দেশের লোক ইহার উপকারিতা কি গ্রহণ করিতে পারিবেন?

বিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্কলর্সিপ ফণ্ড—লেডী কর্জ্জনের যত্নে এই ফণ্ডে ৬লক্ষ ৬২ হাজার টাকা হইয়াছে। ইহা গবর্ণমেণ্টে গচ্ছিত, ইহার বার্ষিক সুদ (২৩,০৯০ টাকা) হইতে বৃত্তি দিয়া ৮৩ জন দেশীয় রমণীকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, আরও ৭৫ জনকে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

জাপানের জাতীয় ভাব—জাপানের কোনও ব্যক্তি নিজের ঘরে অর্থ রাখে না, সব টাকা জাতীয় ব্যাঙ্কে রাখে ও সুদ পায়। ইহাতেই তাহার জাতীয় অর্থোন্নতি এত!

উডবরণ পার্ক—কাসিয়াবাগানে ২৫ বিঘা জমী বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা মিউনিসিপালিটীকে সম্প্রতি দান করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ সার জন উডবরণের স্মরণার্থ এক উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিবেন, সর্ব্বসম্মতিতে স্থির করিয়াছেন।

নূতন প্রধান সেনাপতি—জেনারল ভাইকাউণ্ট কিচেনার অব খার্টুম জি সি বি, জি সি এম জি ভারত সৈন্যের প্রধান সেনাপতির পদ-গ্রহণ-দিনাবধি গবর্ণর জেনারলের কৌন্সিলের অতিরিক্ত সভ্য হইয়াছেন।

হাইদ্রাবাদে বিক্টোরিয়া স্মৃতি—এখানে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ ১০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ৬ লক্ষ টাকায় "বিক্টোরিয়া খাল" নামে খাল খনন হইবে। তাহার বার্ষিক আনুমানিক আয় (এক লক্ষ টাকা) অনাথাশ্রম ও শিল্প-বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয়িত হইবে। অবশিষ্ট ৩ লক্ষ টাকায় অনাথাশ্রম ও শিল্প-বিদ্যালয়ের জন্য এক বৃহৎ বাটী নির্ম্মিত হইবে। সর্ব্বস্থানে এইরূপ অনুষ্ঠান হইলে স্বর্গগতা মহারাণীর সম্মাননার সহিত অর্থের সদ্ব্যবহার হয়।

নূতন মহারাণীর জন্মদিন—গত ১লা ডিসেম্বর মহারাণী আলেকজান্দ্রার জন্মদিন উপলক্ষে ভারতের প্রত্যেক সদর কেল্লায় ৩১টী তোপধ্বনি হইয়াছে। মহারাণী দীর্ঘজীবিনী হউন্।

ত্রিপুরার উত্তরাধিকার—এতদিন রাজার মৃত্যু হইলে ত্রিপুরার রাজ-সহোদর রাজ্য পাইতেন। বর্ত্তমান মহারাজা জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার স্থাপনার্থ চেষ্টা করেন, বঙ্গ ও ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অনুকূলে মত দিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়াবলী কমিসন—গত ১লা ও ২রা ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহে বঙ্গদেশের শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের এক প্রতিনিধি সভা হয়। তাঁহারা কমিসনের অধিকাংশ মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

কাবুলে গোলযোগ—রুষ সৈন্য কাবুল-প্রান্তে ঘনীভূত হইতেছে। আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনা।

সাংবৎসরিক আয়—একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ কয়েকটী দেশের অবস্থা তুলনায় আয় সম্বন্ধে গণনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—

প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসী ইংরাজের বাৎসরিক আয় ন্যূনাধিক ৪০৲ পাউণ্ড অর্থাৎ ৬০০৲ টাকা; প্রত্যেক রুসীয়ের আয় ৮৲ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৫০৲ টাকা; প্রত্যেক ভারতবাসীর আয় ২০৲ টাকা মাত্র। (সর্ এভলিন্ বেরিংএর মতে ২৭৲ টাকা।) স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষের অধুনা কি শোচনীয় অবস্থা!

সংবাদপত্র—১৮০১ খৃষ্টাব্দে গ্রেট-ব্রিটন ও আয়র্লণ্ডে ৬০,০০০ খণ্ড সংবাদ-পত্র মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল; ১৮৫০ অব্দে ৭ লক্ষ খণ্ড এবং ১৯০১ অব্দে ৮৫ লক্ষ খণ্ড সংবাদপত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমাদের সমগ্র বঙ্গ-দেশে কেবল ২৩০ খানি বাঙ্গালা (ইংরাজী পত্রিকা ছাড়া) পত্রিকা আছে, তন্মধ্যে দুই খানি মাত্র দৈনিক।

পাদুকা-সংগ্রহ—আমাদের বর্ত্তমান মহারাণী আলেকজান্ড্রা সকল কালের ব্যবহৃত জুতা সংগ্রহ করিতেছেন। স্কট-লণ্ডের রাজ্ঞী মেরীও তৎসময়ের অনেক জুতা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সংগৃহীত জুতাগুলি বোধ হয় কোন মেলাতে প্রদর্শিত হইবে।

কয়েদীর সংখ্যা—ইংলণ্ডে প্রত্যেক লক্ষ জনের মধ্যে ৯০ জন কারাদণ্ড ভোগ করিয়া থাকে; আয়র্লণ্ডে ৬৬ জন এবং স্কটলণ্ডে ৫২ জন মাত্র। স্কটলণ্ড বাসীরা নিয়মের অধীন, সুতরাং তাহাদের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা অনেক কম।

শীতল সামন্ত।

(৪৭২ সংখ্যা—২৪৩ পৃষ্ঠার পর)।

অপরাহ্নকাল উপস্থিত হইলে যুবতীকে ডাকাইয়া শীতল বাবু সস্নেহে কহিলেন "তুমি এক্ষণে সকল কথা খুলিয়া বল, আমি মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।" স্ত্রীলোকটী কহিল "আমি জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়, শৈশবাবস্থায় আমার পিতা মাতার মৃত্যু হয়; সহোদরও কেহ ছিল না। একটি সম্পর্কীয়া পিসী আমাকে প্রতিপালন করেন। আমার একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে বিবাহ হইয়াছিল। স্বামীর নামের প্রথম অক্ষর "শী"। বিবাহের অল্প কাল পরেই আমার দরিদ্র স্বামী চাকুরী উপলক্ষে ছোট নাগপুর অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সমাচার পাইয়াছিলাম, তাহার পরে আট বৎসরকাল আর তাঁহার সংবাদ পাই নাই। আমার স্বামীর কেহ অনুসন্ধানও লয় নাই। স্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদর এমন নিষ্ঠুর এবং দুষ্টস্বভাব যে, যতদিন আমার পতি টাকা পাঠাইয়া-ছিলেন, ততদিন আমাকে তিনি অনিচ্ছা সত্বেও খাইতে পরিতে দিতেন, কিন্তু স্বামীর নিকট হইতে পত্র বা টাকা না আসায় তিনি আমাকে খাইতে দিতেন না, পরিতে দিতেন না, গালি দিতেন, প্রহার করিতেন। আমাকে অবশেষে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমি পিত্রালয়ে যাইতেছিলাম, সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও ছিল, পথিমধ্যে ঐ গ্রামের দস্যুদল আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে এবং আমাদের সঙ্গের স্ত্রীলোককে মারিয়া ফেলিয়া তাহার মৃতদেহ এক দীঘির জলে

পুঁতিয়া রাখে। কি কারণ বশতঃ বলিতে পারি না, আমাকে তাহারা প্রাণে বধ করে নাই, কন্যার ন্যায় আমাকে লালন পালন করিয়াছে। যে ডাকাইতের বাটীতে আপনি অতিথি হইয়াছিলেন, সেই ডাকাইত আমাকে তাহার বাটীতে আনিয়াছিল। গত রাত্রে আপনি চলিয়া আসিলে পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি শুনিয়াছি,—অনেক দস্যু আপনাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছে। ডাকাইতেরা স্থির করিয়াছে, আমিই আপনাকে তাহাদের দুশ্চরিত্রের কথা গোপনে জানাইয়াছিলাম। আমাকে বধ করিবে, তাহারা এইরূপ ভয় প্রদর্শন করায় নিশীথ রাত্রে তাহাদের নিদ্রাবস্থায় আমি সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিতে চলিতে ঘটনাচক্রে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আপনি এখানে আছেন, তাহা জানিতাম না। যাহা হউক, আমি এক্ষণে কোথায় যাইব, কি করিব, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনি কৃপা করিয়া আমার একটা উপায় করিয়া দিউন।" শীতল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কখন কোথাও আমাকে দেখিয়াছ কি?" স্ত্রীলোকটী বলিল "তাহা আমি ঠিক্ বলিতে পারি না, কিন্তু যখন আপনাকে সেই গ্রামে সর্ব্বপ্রথম দেখিয়াছিলাম, তখন আপনার মুখ এবং চোখ আমার স্বামীর মুখ ও চোখের মত ঠিক্ বোধ হইয়াছিল। এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছাও ছিল; কিন্তু স্ত্রীজাতির স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতা বশতঃ আপনাকে তাহা বলি নাই।" শীতল বাবু ইহার নাম, পিতার নাম, শ্বশুরালয়ের পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলেন যে, এই উনবিংশবর্ষীয়া যুবতী তাঁহারই সহধর্ম্মিণী। যে বাটীতে তিনি বিশ্রাম লাভ করিতেছিলেন, সেই বাটীর কর্ত্তাকেও এই স্ত্রীলোকের সমুদয় কথা শুনাইলেন। কর্ত্তা আরও স্নেহের সহিত স্ত্রীলোককে দেখিতে লাগিলেন।

ইহার তিন দিন পরে শীতল বাবু তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে লইয়া স্বগ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের ধারে কৃষকেরা কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছিল, তাহারা শীতল বাবুর পরিচয় পাইয়া ভয়ে পলাইতে লাগিল। একজন লোকের হাত ধরিয়া বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গের লোকেরা পলাইতেছে কেন?" সে ব্যক্তি বলিল "শীতল বাবু মরিয়া গিয়াছে, তাহার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার স্ত্রীরও মৃত্যু হইয়াছে, তবে এই শীতল বাবু কে? ইহার স্ত্রীই বা কোথা হইতে আসিল? পাল্কীর শীতল বাবু কি প্রকার শীতল বাবু? আমাদের গ্রামে ম্যালেরিয়ার সময় যখন শত শত লোক মরিয়া গিয়াছিল, তখন অনেক মরা মানুষ ভূত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, ইহারা কি তবে ভূত?" শীতল সামন্ত হাসিলেন, হাসিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

বৈঠকখানায় শীতলের জ্যেষ্ঠ সহোদর তামাকুর ধূম পান করিতেছিল। অকস্মাৎ

পাল্কী হইতে শীতলকে নামিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু তাহার পরিবারকে ঘর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইল। দেখিতে দেখিতে আর একখানি পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল, শীতল বাবু ভাইকে বলিলেন "দাদা! ইনিই আমার সহধর্ম্মিণী।" জ্যেষ্ঠ ভাই তাহাকেও চিনিতে পারিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে কেবল মাত্র একখানি ছিন্ন ও পুরাতন গামোছা লইয়া, শীতলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোথায় চলিয়া গেল, এ পর্য্যন্ত তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। জনপ্রবাদ এই যে, শীতলের জ্যেষ্ঠ সহোদরের হৃদয়ে লজ্জা, ঘৃণা এবং দুঃখবশতঃ এমন আঘাত লাগিয়াছিল যে, সে ব্যক্তি কনিষ্ঠ সহোদরকে আর মুখ দেখাইতে না পারিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে।

শীতল সামন্ত অনেক টাকা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই টাকা খরচ করিয়া আবার প্রচুর ভূসম্পত্তি খরিদ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি তালুকদারী ও জমিদারী ক্রয় করিয়া বসিলেন, সহধর্ম্মিণীকে অনেক টাকার অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন এবং এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া খুব সভ্য, শিক্ষিত, বদান্য ও ধার্ম্মিক জমিদারের মত, সহধর্ম্মিণী-সহ পরম শান্তি ও সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ধূমকেতু।

(গত প্রকাশিতের শেষ)।

১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে পুনর্ব্বার হেলির ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছিল। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে উহার পুনরাবির্ভাব-কালের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। যাঁহারা গণনা করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইবে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করিলেন। বেরণ ডামইস্কান্ এবং অন্য একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা ঐ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গণনানুসারে ৫ই আগষ্ট দিনে রোমীয় বিদ্যালয়ের মানমন্দিরের অধ্যক্ষ গণনাকারী জ্যোতির্ব্বিদগণের নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে যেমন দূরবীক্ষণ স্থাপন করিলেন, অমনি হেলির ধূমকেতু নয়নপথে পতিত হইল। বিজ্ঞানের জয় দেখিয়া পুনর্ব্বার জ্যোতির্ব্বিদ্গণের মধ্যে জয়ধ্বনি উঠিল। হেলির ধূমকেতুর ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল। রাত্রির পর রাত্রি উহার যে সকল পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, তাহা লিপিবদ্ধ হইল; কখন উহার চতুষ্পার্শ্বে ছায়াপথের ন্যায় ক্ষীণ আলোক দৃষ্ট হইতে লাগিল, কখন একটী —কখন দুইটী পুচ্ছ দৃষ্ট হইল—কখন

অর্দ্ধ-বৃত্তাকার আলোকের ছটা তাহার চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্ট হইল। চার্শেল নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে উহার একটী সুন্দর ফটোগ্রাফ লইয়াছিলেন।

হেলির ধূমকেতুর বিষয় আমরা যথেষ্ট আলোচনা করিলাম। এখন আর কয়েকটী ধূমকেতুর উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব শেষ করিব।

১৭৭৪খ্রীঃ অব্দে একটী ষট্-পুচ্ছযুক্ত ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহা আর এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই।

১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে একটী বৃহৎ ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছিল। পন্স নামক এক ব্যক্তি উহা আবিষ্কার করেন। এঙ্কি উহার গতি নির্ণয় ও গণনা করেন বলিয়া উহার নাম এঙ্কির ধূমকেতু হইয়াছে। উহা ৩ বৎসর ব্যবধানে উদয় হয়। ইহার ৩৩ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গণনা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে, এই ধূমকেতুর ভ্রমণকাল ক্রমে হ্রাস হইতেছে এবং ইহা ক্রমশঃ সূর্য্যের নিকটতর হইতেছে।

অধ্যাপক গস ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে একটী ধূমকেতু আবিষ্কার করেন, উহার ভ্রমণকাল ৬ বৎসরে পূর্ণ হয়। কিছু দিন আর হয় নাই, অবশেষে ১৮২৬ খ্রীঃ বায়েলা উহাকে দেখেন, সেই জন্ত উহাকে বায়েলার ধূমকেতুও বলে।

১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গণনা করিলেন যে, বায়েলার ধূমকেতুর পৃথিবীর কক্ষের সহিত সংঘাত হইবে। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেও ত্রাসের সঞ্চার হইল। ফরাসীস দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এরাগো নামক জ্যোতির্ব্বেত্তাকে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত করিলেন। যখন এরাগো গণনা করিয়া বলিলেন যে, ধূমকেতু যখন পৃথিবীর কক্ষপথে পতিত হইবে, তখন পৃথিবী ৫ কোটি ৫০ লক্ষ মাইল দূরে থাকিবে, সুতরাং সংঘাতজনিত কিছুমাত্র ভয় নাই, তখন সকলে আশ্বস্ত হইলেন। বিশ্ববিধাতার আশ্চর্য্য বিধানে আমাদের সৌরজগতে এ পর্য্যন্ত কোন গ্রহ নক্ষত্রাদির সংঘাত হয় নাই। তাঁহার নিয়ম অভ্রান্ত। গ্রহে গ্রহে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে, অথবা গ্রহ নক্ষত্রের পরস্পরে এ পর্য্যন্ত কোনও প্রলয়কারী সংঘাত উপস্থিত হয় নাই। ধূমকেতুগণও গ্রহ নক্ষত্রের সমকালিক, এ পর্য্যন্ত তাহাদের সহিতও কোনও গ্রহ নক্ষত্রের সংঘাত হয় নাই।

এরাগো এবং সার জন হার্সেল আরও বলিয়াছেন যে, ঐ ধূমকেতু এরূপ তরল পদার্থে গঠিত যে, তাহার মধ্য দিয়া অত্যন্ত ক্ষুদ্র নক্ষত্রও দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই জন্ত তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যদিই পৃথিবীর সহিত তাহার সংঘাত হইত, তথাপি তজ্জনিত কোন দুর্দ্দৈব ঘটিত না; বাষ্পাচ্ছন্ন হইলে যেরূপ উত্তাপাদির কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়, তাহাই মাত্র হইত। যাহা হউক সে বিষয়ে আর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে যখন বায়েলার ধূমকেতু পুনর্ব্বার উদিত হইয়াছিল, তখন একটী

আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌মণ্ডলী বিস্মিত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক সান্টিনি যে স্থানে ও যে সময়ে ধূমকেতু আকাশে দৃষ্ট হইবে গণনা করিয়াছিলেন, রোম-নগরের মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ডি বাইকো সর্ব্বপ্রথমে ঠিক্ সেই স্থানে উহাকে দর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহার কোন অস্বাভাবিকতা দেখেন নাই। কিছুদিন পরে একজন দর্শক ঐ ধূমকেতুর একটী অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে পান। ধূম-কেতুর পুচ্ছ সচরাচর সূর্য্যের বিপরীত দিকেই থাকে, কিন্তু এই ধূমকেতুর পুচ্ছ তদ্বিপরীতধর্ম্মী বোধ হইল ও ঐ পুচ্ছে একটী উজ্জ্বল গ্রন্থির চিহ্ন দৃষ্ট হইল। উহা পুচ্ছের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল। কেহই এই অনৈসর্গিক ঘটনার কারণ নিরূপণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে আমেরিকার ওয়াসিংটন মানমন্দিরের অধ্যক্ষ লেফ্‌টেনেন্ট মরি ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারী রাত্রিতে আবিষ্কার করিলেন যে, যাহা এ পর্য্যন্ত একটী ধূমকেতু বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, উহা বস্তুতঃ দুইটী ধূমকেতু ও উহাদের দুইটী পুচ্ছ। এই ধূমকেতুদ্বয় ক্রমে পরস্পর হইতে দূরবর্ত্তী হইল এবং তাহাদের পুচ্ছ পরস্পর সমান্ত-রাল হইয়া প্রথমটী পরবর্ত্তী অপেক্ষা উজ্জ্বল বোধ হইল। কিছু দিনের মধ্যে পরবর্ত্তী ধূমকেতু অধিক উজ্জ্বল বোধ হইতে লাগিল, এবং ধূমকেতুদ্বয় পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। এই অদ্ভুত দৃশ্য অনেক জ্যোতির্ব্বেত্তাই প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন, সেই জন্য তাহাদের পুনরাগমন প্রতীক্ষায় সকলে উৎসুক হইয়া আছেন।

ধূমকেতুদিগের সূর্য্য হইতে দূরত্ব, তাহাদের ভ্রমণকাল প্রভৃতি এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে স্থির হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হেলির ধূমকেতুর ৭৫ বৎসরে কক্ষভ্রমণ সম্পূর্ণ হয়, এঙ্কির ধূমকেতুর আবর্ত্তনকাল ৩ বৎসর এবং তাহা ক্রমে হ্রাস হইতেছে। বায়েলার ধূমকেতুর ৭ বৎসর। ১৮০৭ সালের একটী ধূমকেতু ১৫৪৩ বৎসরে ১৮১১ সালের ধূমকেতু ২৮৮৮ বৎসরে, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্য হইতে শেষোক্ত ধূমকেতুর দূরত্ব ১৬০০০ কোটি মাইলের ন্যূন নহে।

সম্প্রতি যে ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছে, পৃথিবী হইতে উহার বর্ত্তমান দূরত্ব চারি কোটি সত্তর লক্ষ মাইল অপেক্ষা কখনও ন্যূন হইবে না এবং উহার পুচ্ছ ৩ লক্ষ মাইল। এ সমস্ত এখনও অনুমান মাত্র।

তীর্থযাত্রা।

দশম অধ্যায়—মুক্তি।

গিরিভূষণ আপন বাসা বাটীতে লইয়া গিয়া স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া অবিশ্রান্ত সেবা শুশ্রূষা দ্বারা সেই ক্ষীণ মুমূর্ষু প্রাণকে সজীব করিয়া তুলিলেন। দুই দিবসের পর যখন মণিমালা সম্পূর্ণ চেতনা প্রাপ্ত

হইয়া চক্ষু মেলিলেন—দেখেন সম্মুখে একটি সরলমূর্ত্তি স্নেহময়ী ভগিনী অবিরাম তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতেছে—মুখে ঔষধ পথ্য দিতেছে এবং মাঝে মাঝে তাঁহার কানে শিশুর কোমল আধ আধ স্বর প্রবেশ করিতেছে। সকলি যেন নূতন দৃশ্য। এ আবার কোথায় আসিলাম! ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া গিরিভূষণের স্ত্রীকে কহিলেন "আমার এ অন্তিমের দিনে কোন্ দেবী আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত? কেন আর এ কলঙ্কিত জীবনকে ফিরাইয়া আনিতেছেন, আপনার কি উদ্দেশ্য?" গিরিভূষণের স্ত্রী তদুত্তরে কহিলেন "ভগিনি, আর তোমার কোনও ভয় নাই, তুমি রাহুর কবল হইতে মুক্ত হইয়াছ। এ তোমার আপনার ঘর বাড়ী, আমি তোমার বোন। তুমি একটু সবল হও, তখন তোমার স্বপ্ন কথা শুনিব।" দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, এই অকপট বন্ধুর সাহায্যে মণিমালার জীবন রক্ষা পাইল। মণিমালা এখন উঠিতে বসিতে পারেন, কথা বার্ত্তাও আবশ্যক মত কহেন। কিন্তু এ প্রকার উদ্বেগ লইয়া কি তাহার প্রাণে নিশ্চিন্ততা আছে? অবশ্য ইহা গিরিভূষণ ও তাহার স্ত্রী জানিতেন, কিন্তু ডাক্তারের অনুমতির অপেক্ষা ছিল। এখন উহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া গিরিভূষণ একদিন চিকিৎসকের অনুমতি লইয়া মণিমালার স্বামীকে আনিতে গেলেন ও স্ত্রীকে বলিয়া গেলেন "মণিমালাকে সংক্ষেপে তাহার জীবনের দুর্ঘটনা শুনাইয়া রাখিবে।" গিরিভূষণের স্ত্রী মণিমালার শিয়রে বসিয়া অপরিচ্ছন্ন কেশরাশি লইয়া অতি কোমল হস্তে আঁচড়াইয়া দিতে লাগিলেন ও অতীতের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। হাঁ দিদি! তোমার আজ আর মাথা ধরেনিত, চুলে লাগ্‌ছে কি? মণিমালা কহিল "না, কিন্তু কেন আর এত কষ্ট করিয়া জটা ছাড়াচ্ছ, এক খানি কাঁচি দিয়া কাটিয়া দাও, চুলে আর কি হবে?" গিরিভূষণের স্ত্রীর নাম "মনোময়ী।" ইহার সরল সহাস্য বদন দেখিলে ও কৌতুকময় বাক্যগুলি শুনিলে ঘুমন্ত প্রাণ জাগিয়া উঠে। সে কহিল "ছি বোন্! অমন কথা কি বল্‌তে আছে, সধবা স্ত্রীলোকের চুল কাটবো বল্‌তে আছে।" মণিমালা কহিল "দিদি সধবা কাকে লইয়া? আমার দুঃখের কথা বলিয়া ফুরায় না। জনকনন্দিনী সীতা দুর্বৃত্ত রাক্ষসের কবলে পতিত হইয়াও অশোকবনে রামচন্দ্রের জীবনবার্ত্তা বানর-মুখে পাইয়া প্রাণ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু আমি এ কয়েকমাস দিবানিশি তদ্গতচিত্তে ঊর্দ্ধমুখে এই দুর্ব্বহ জীবনভার বহিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু আমার আর সে দিন আসিবে না। আমি নৈরাশ্য আঁধারে অন্ধের মত হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিয়াছি —পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না।" এই বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মনোময়ী সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন "না ভাই, তুমি আর কেন কাঁদিতেছ? আমি তোমার এ দুঃখের প্রতীকার করির

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

নির্জ্জন গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণ-যুবক রঘুনাথ গৈরিক-বস্ত্রধারী হইয়া, নয়ন মুদ্রিত করিয়া বিশ্বপতির ধ্যানে মগ্ন। হৃদয়ে আর কোনও চিন্তা নাই, অবিরাম হৃৎপিণ্ডে সেই ওঁকার শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। সংসারের সুখ, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, সেখানে আর যাইতে পারে না। সেই মধুময় শব্দে দশদিক্ পূর্ণ; হৃদয় মন, প্রাণময় কেবল ব্রহ্মপদ বিরাজিত। সত্যপ্রেমে চিত্ত মগ্ন; আর পরম স্নেহময়ী জননীর অভাব ও সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রেমরূপিণী ভার্য্যার বিরহানল তাহাকে স্পর্শ করিতে সাহসী নয়। রঘুনাথ একান্তচিত্তে সেই মানব-কোলাহল-শূন্য ভূমিতে শান্তির আশ্রয় লাভের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আর তাপিত প্রাণে জন মানবের করুণার মুখাপেক্ষী নহেন। তবে তাঁহার অকপট বন্ধু গিরিভূষণের স্নেহের ত্রুটি নাই। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে আসিয়া রঘুনাথের আহার যোগান ও নানাবিধ সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। আজও সেই জন্য উপস্থিত, কিন্তু ডাকিতে সাহস করিলেন না। নীরবে অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন; আজ আর তিনি রঘুনাথের জন্য আহার্য্য লইয়া আসেন নাই।

বন্ধুর পদশব্দে রঘুনাথ চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন সম্মুখে গিরিবর। কুশল প্রশ্ন করিয়া কহিলেন "আজ যে সকাল সকাল?" "আজ মনোময়ী তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, এই পূর্ণিমা বাসরে কোনও উৎসব পূর্ণ করিবেন।" রঘুনাথ বন্ধুর অভিপ্রায় ইঙ্গিতেই বুঝিতে পারিলেন। তাহার বিশাল চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া গেল, মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন "ক্ষমা কর, আর ফিরাইও না, আর বন্ধন আঁটিও না, আমি তোমার নিকট চিরবিক্রীত।" গিরিবর রঘুনাথের কথায় অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তখন রঘুনাথ আবার বলিতে লাগিলেন "যাহার যবন-গৃহে ত্রিরাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে, সে কি আর কুল-স্ত্রী মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে? কে জানে মণিমালা যবনের অস্পৃষ্টা? যদিও জানি মণিমালার হৃদয় চির-পবিত্র, কাঞ্চন তুল্য, কখনও দূষিত হইবার নহে; কিন্তু ধর্ম্ম লোকের নিকট লৌকিক। লোক-সমাজে যাহা নিন্দনীয়, তাহা অনৃত না হইলেও চলিত হয় না। মহারাজা রামচন্দ্র শুদ্ধ জনাপবাদে প্রাণাধিকা প্রেয়সী পত্নীকে পূর্ণগর্ভাবস্থায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আমি সামান্য মনুষ্য, কি প্রকারে লোকাচার এড়াই?"

রঘুনাথের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে গিরিবর অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবনা যে, এত কষ্টে সেই হতভাগিনীকে উদ্ধার করিয়া এখন তাহার শেষ রক্ষা কি প্রকারে করিব? ইহার প্রতিজ্ঞা যেন অটল দেখিতেছি; আচ্ছা আরও কিছু দিন অপেক্ষা করি।

হইয়া চক্ষু মেলিলেন—দেখেন সম্মুখে একটি সরলমূর্ত্তি স্নেহময়ী ভগিনী অবিরাম তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতেছে—মুখে ঔষধ পথ্য দিতেছে এবং মাঝে মাঝে তাঁহার কানে শিশুর কোমল আধ আধ স্বর প্রবেশ করিতেছে। সকলি যেন নূতন দৃশ্য! এ আবার কোথায় আসিলাম! ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া গিরিভূষণের স্ত্রীকে কহিলেন "আমার এ অন্তিমের দিনে কোন্ দেবী আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত? কেন আর এ কলঙ্কিত জীবনকে ফিরাইয়া আনিতেছেন, আপনার কি উদ্দেশ্য?" গিরিভূষণের স্ত্রী উত্তরে কহিলেন "ভগিনি, আর তোমার কোনও ভয় নাই, তুমি রাহুর কবল হইতে মুক্ত হইয়াছ। এ তোমার আপনার ঘর বাড়ী, আমি তোমার বোন। তুমি একটু সবল হও, তখন তোমার স্বপ্ন কথা শুনিব।" দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, এই অকপট বন্ধুর সাহায্যে মণিমালার জীবন রক্ষা পাইল। মণিমালা এখন উঠিতে বসিতে পারেন, কথা বার্ত্তাও আবশ্যক মত কহেন। কিন্তু এ প্রকার উদ্বেগ লইয়া কি তাহার প্রাণে নিশ্চিন্ততা আছে? অবশ্য ইহা গিরিভূষণ ও তাহার স্ত্রী জানিতেন, কিন্তু ডাক্তারের অনুমতির অপেক্ষা ছিল। এখন উহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া গিরিভূষণ একদিন চিকিৎসকের অনুমতি লইয়া মণিমালার স্বামীকে আনিতে গেলেন ও স্ত্রীকে বলিয়া গেলেন "মণিমালাকে সংক্ষেপে তাহার জীবনের দুর্ঘটনা শুনাইয়া রাখিবে।" গিরিভূষণের স্ত্রী মণিমালার শিয়রে বসিয়া অপরিচ্ছন্ন কেশরাশি লইয়া অতি কোমল হস্তে আঁচড়াইয়া দিতে লাগিলেন ও অতীতের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। হাঁা দিদি! তোমার আজ আর মাথা ধরেনিত, চুলে লাগ্‌ছে কি? মণিমালা কহিল "না, কিন্তু কেন আর এত কষ্ট করিয়া জটা ছাড়াচ্ছ, এক খানি কাঁচি দিয়া কাটিয়া দাও, চুলে আর কি হবে?" গিরিভূষণের স্ত্রীর নাম "মনোময়ী।" ইহার সরল সহাস্য বদন দেখিলে ও কৌতুকময় বাক্যগুলি শুনিলে ঘুমন্ত প্রাণ জাগিয়া উঠে। সে কহিল "ছি বোন্! অমন কথা কি বল্‌তে আছে, সধবা স্ত্রীলোকের কি চুল কাটবো বল্‌তে আছে।" মণিমালা কহিল "দিদি সধবা কাকে লইয়া? আমার দুঃখের কথা বলিয়া ফুরায় না। জনকনন্দিনী সীতা দুর্বৃত্ত রাক্ষসের কবলে পতিত হইয়াও অশোকবনে রামচন্দ্রের জীবনবার্ত্তা বানর-মুখে পাইয়া প্রাণ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু আমি এ কয়েকমাস দিবানিশি তদ্গতচিত্তে উদ্ধমুখে এই দুর্ব্বহ জীবনভার বহিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু আমার আর সে দিন আসিবে না। আমি নৈরাশ্য আঁধারে অন্ধের মত হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিয়াছি —পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না।" এই বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মনোময়ী সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন "না ভাই, তুমি আর কেন কাঁদিতেছ? আমি তোমার এ দুঃখের প্রতীকার করিব

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

নির্জ্জন গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণ-যুবক রঘুনাথ গৈরিক-বস্ত্রধারী হইয়া, নয়ন মুদ্রিত করিয়া বিশ্বপতির ধ্যানে মগ্ন। হৃদয়ে আর কোনও চিন্তা নাই, অবিরাম হৃৎপিণ্ডে সেই ওঁকার শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। সংসারের সুখ, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, সেখানে আর যাইতে পারে না। সেই মধুময় শব্দে দশদিক্ পূর্ণ; হৃদয় মন, প্রাণময় কেবল ব্রহ্মপদ বিরাজিত। সত্যপ্রেমে চিত্ত মগ্ন; আর পরম স্নেহময়ী জননীর অভাব ও সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রেমরূপিণী ভার্য্যার বিরহানল তাহাকে স্পর্শ করিতে সাহসী নয়। রঘুনাথ একান্তচিত্তে সেই মানব-কোলাহল-শূন্য ভূমিতে শান্তির আশ্রয় লাভের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আর তাপিত প্রাণে জন মানবের করুণার মুখাপেক্ষী নহেন। তবে তাঁহার অকপট বন্ধু গিরিভূষণের স্নেহের ত্রুটি নাই। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে আসিয়া রঘুনাথের আহার যোগান ও নানাবিধ সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। আজও সেই জন্য উপস্থিত, কিন্তু ডাকিতে সাহস করিলেন না। নীরবে অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন; আজ আর তিনি রঘুনাথের জন্য আহার্য্য লইয়া আসেন নাই।

বন্ধুর পদশব্দে রঘুনাথ চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন সম্মুখে গিরিবর। কুশল প্রশ্ন করিয়া কহিলেন "আজ যে সকাল সকাল?" "আজ মনোময়ী তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, এই পূর্ণিমা বাসরে কোনও উৎসব পূর্ণ করিবেন।" রঘুনাথ বন্ধুর অভিপ্রায় ইঙ্গিতেই বুঝিতে পারিলেন। তাহার বিশাল চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া গেল, মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন "ক্ষমা কর, আর ফিরাইও না, আর বন্ধন আঁটিও না, আমি তোমার নিকট চিরবিক্রীত।" গিরিবর রঘুনাথের কথায় অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তখন রঘুনাথ আবার বলিতে লাগিলেন "যাহার যবন-গৃহে ত্রিরাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে, সে কি আর কুল-স্ত্রী মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে? কে জানে মণিমালা যবনের অস্পৃষ্টা? যদিও জানি মণিমালার হৃদয় চির-পবিত্র, কাঞ্চন তুল্য, কখনও দূষিত হইবার নহে; কিন্তু ধর্ম্ম লোকের নিকট লৌকিক। লোক-সমাজে যাহা নিন্দনীয়, তাহা অনৃত না হইলেও চলিত হয় না। মহারাজা রামচন্দ্র শুদ্ধ জনাপবাদে প্রাণাধিকা প্রেয়সী পত্নীকে পূর্ণগর্ভাবস্থায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আমি সামান্য মনুষ্য, কি প্রকারে লোকাচার এড়াই?"

রঘুনাথের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে গিরিবর অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবনা যে, এত কষ্টে সেই হতভাগিনীকে উদ্ধার করিয়া এখন তাহার শেষ রক্ষা কি প্রকারে করিব? ইহার প্রতিজ্ঞা যেন অটল দেখিতেছি, আচ্ছা আরও কিছু দিন অপেক্ষা করি

সময়ের পরিবর্ত্তনে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তন ঘটে, অবশ্য মানবের অদৃষ্টও উক্ত নিয়মের বহির্ভূত নহে। ইহা ভাবিয়া নীরবে প্রস্থানের জন্য উঠিলেন। রঘুনাথ বন্ধুর নীরব বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া আবার বলিলেন "ভাই! আমি জানি না ভগবানের কি ইচ্ছা ও মণিমালার ভাগ্যে কি আছে? বোধ হয় সেই রত্ন এ ভিখারী ব্রাহ্মণের যোগ্য নহে, তাই এত অভাবনীয় দুর্ঘটনার সৃষ্টি!" গিরিবর উহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "আচ্ছা, একবার তুমি তাঁহার সহিত কেবল সাক্ষাৎ করিয়া আইস।" রঘুনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিয়া বলিলেন "আচ্ছা, আমাকে দুই দিন ভাবিবার অবসর দেও।" গিরিবর সম্মত হইলেন ও রাত্রি প্রায় প্রহরেক অতীত হইয়াছে দেখিয়া বিদায় চাহিলেন। রঘুনাথ বন্ধুকে বিদায় দিয়া বড়ই অশান্তিতে পড়িলেন, আর কিছুতেই তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন হইতেছে না।

গিরিবর অভিলষিত কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়া হতাশায় আক্রান্ত হইয়া নানা যুক্তি উপায় ভাবিতে ভাবিতে গৃহে পৌঁছিলেন। মনোময়ী উৎকর্ণ হইয়া প্রতিপদে স্বামীর অপেক্ষা করিতেছেন। নানা প্রকার আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া আশার মধুরালোকে সকলি সুখময় দেখিতেছেন। ইতিমধ্যে দ্বারে কে আঘাত করিল। রাধা দাসী উত্তর করিল যাইগো, এবং প্রাঙ্গণ পার হইয়া দরজা খুলিয়া দিল। গিরিবর ভিতরে নিজ শয়নকক্ষে গেলেন। মনোময়ী স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র মণিমালার নিকট হইতে বাহির হইলেন। অন্তরাল হইতে তাঁহাকে একাই আসিতে দেখিয়া অতি আশ্চর্য্যভাবে স্বামীর নিকটে গিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন "একি তুমি যে একা?" "সব বল্‌ছি; বড় কঠিন ব্যাপার, সাবধান! এখন যেন প্রকাশ না হয়।" পত্নীর নিকট অতি সতর্কভাবে সব কথা কহিলেন। ইঁহারা স্বামী স্ত্রীতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন মণিমালা ইহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলে বিপদ্ ঘটিবে, কিন্তু মণিমালা আজ মনোময়ীকে অপেক্ষাকৃত কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত দেখিয়া ও তাহার কেশরচনা, পরিচ্ছদ-সংস্কার ইত্যাদি নানা কাজে নিযুক্ত দেখিয়া সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু কি বলিয়া প্রশ্ন করিবেন মনে মনে তাহাই পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। এক্ষণে হঠাৎ কক্ষান্তরে যে কথোপকথন হইল, তাহা মণিমালার কাণে পৌঁছিল, অতএব আরও শুনিবার জন্য উৎসুক ভাবে রহিলেন। পাশের ঘরে গিরিবর মনোময়ীর নিকট অদ্যকার বিবরণ যথাযথ বলিলেন। তখন পত্নী মনোময়ী কহিলেন "আচ্ছা, আমরা একদিন গঙ্গাস্নানে যাব, দেখা যাবে মুখ খানি দেখ্‌লে যতীর ব্রত ভঙ্গ হয় কি না?" গিরিভূষণ কহিলেন "আমার ভয় পাছে কোথায় চ'লে যায়। তাহার বিষম আপত্তি দেখিয়া আমি চুপ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। প্রাতঃকালে আবার

গিয়া ধরিব এই ভেবেছি।” পতি পত্নী উভয়ে অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া রহিলেন। গিরিবর আর আহারাদি করিলেন না। মনে মনে যুক্তি ঠাওরাইতে ঠাওরাইতে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নে মগ্ন হইলেন। মনোময়ী স্বামীর নিকট হইতে আসিয়া যথারীতি মণিমালাকে কহিলেন “দিদি! খাবে এস।” মণিমালার হৃদয়ে শত বৃশ্চিকের জ্বালা জ্বলিতেছিল, কহিলেন “না ভাই, অনেক দিন পরে তুমি আমার চুলের জট ছাড়াইয়া আঁচড়াইয়াছ, তাই বড় বেদনা হইয়াছে, আহারে ইচ্ছা নাই।” মনোময়ী ভাবিলেন বাস্তবিকই হইতে পারে। তাঁহার অন্তঃকরণে কোনও সন্দেহের উদয় হইল না, কেন না তিনি জানিতেন এ পর্য্যন্ত রঘুনাথের কোন সংবাদই মণিমালা রাখেন না; অথচ নিদারুণ দুঃখের দীর্ঘ দিবা রাত্রি ঠেলিয়া তুলিয়া কাটাইতেছিলেন। মনোময়ীও নিঃশব্দে নিজ শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার আবেগে নিদ্রা আসিল না। ভাবিতে লাগিলেন হায়! পুরুষের হৃদয় কি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালেই সমান কঠিন। ভগবান্ উহাদিগকে কেবল কর্ত্তব্যের কঠোর শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছেন, আর কোনও দায়িত্ব কি গুরুতর নহে? প্রেমের গরলে কি রমণী-জীবনের অবসান? তাহা এত কোমল যে পুরুষের হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী হইতে সাহস করে না। হায়! এই হতভাগিনী মণিমালার যে স্বামীর জন্য কণ্ঠাগত প্রাণ, তাহার প্রতিদান কি সুন্দর!! পুরুষ! তুমি ঘোর সংসারী। রমণী! তুমি কুসুমিতা লতা, তুমি দেবতা-চরণে উৎসর্গিতা হইবে, নির্ম্মাল্য জীবন লইয়া জাহ্নবী-সলিলে ভাসিয়া তোমার অবসান!! এই আলোচনা করিতে করিতে তাহার নয়নদ্বয় ঘুমে আকৃষ্ট হইল।

মণিমালার কক্ষে একটি প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া জ্বলিতেছিল যেন ইহার জীবন প্রদীপও এইরূপ। তাঁহার পালঙ্কের পার্শ্বে রাধা দাসী শায়িত। সে বৃদ্ধা, সমস্ত দিন পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ছিন্ন কন্থায় পড়িতে না পড়িতে সকল কষ্ট ভুলিয়া শান্তিময়ী নিদ্রার কোলে আরাম লভিতেছিল। তাহার গভীর নাসিকা-ধ্বনি গৃহ-আকাশে মেঘমন্দ্রবৎ বোধ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। দেখিতে দেখিতে প্রদীপের তৈল ফুরাইল, প্রদীপ জীবনহীন নিস্তেজ হইয়া পড়িল, আলোটুকু কোথায় মিশাইয়া গেল, আর নাই। অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার সর্ব্বত্র—গৃহ, প্রাঙ্গণ, বাতায়ন সকল ছাইয়া ফেলিল। মণিমালার হৃদয়ে আজ আর আঁধার নাই, শত শত অগ্নিশিখা লোল জিহ্বা বাহির করিয়া জ্বলিতেছে। সেই আগুনে আজ তাহার বাসনা, কামনা, আশা, ভরসা, বল, শক্তি সকল দগ্ধ হইতেছে—কেবল প্রাণ বড় কঠিন, উহা দুঃখের আগুনে পুড়িয়াও বিনষ্ট হয় না। তাই মণিমালার শয্যা কণ্টক হইয়াছে, একবার উঠিতেছেন একবার বসিতেছেন, কি করিবেন,

কিছুতেই শান্তি নাই। আর কাহার অপেক্ষায় এ ছার জীবন রাখিবেন? সংসারে কোথায় জুড়াইবার স্থান আছে? এই মায়া-ছত্রের উপর যে আরও কোন স্থানে শান্তির শীতল ছায়া আছে, তাহাত প্রাণে জাগে না। বালিকা-জীবন হইতে স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে অশেষ উপচারে জীবন সর্ব্বস্ব দিয়া পূজা করিয়াও যখন তাহার ফল অবিশ্বাস ও অস্নেহের পরাকাষ্ঠা, তখন জগৎ সংসারে কি প্রেমময় পরমেশ্বরের না শয়তানের রাজত্ব? হে ভগবান্! বুঝাইয়া দেও, এত নিবিড় সৌন্দর্য্যময়ী ধরার মধ্যে প্রেমও কি অন্তঃসার-শূন্য!! ইত্যাদি দুশ্চিন্তায় মণিমালার দুর্ব্বল মস্তিষ্কের ঘোর বিপ্লব ঘটিল, কিছুতেই ধৈর্য্য আর তাহার প্রাণে আসিল না। অবশেষে স্থির করিল এ পাপ জীবন গঙ্গার পুণ্যময়বক্ষে ঢালিয়া শান্তি লাভ করি। আর ত কোনও স্থান এমন দেখি না যেখানে এই প্রাণের জ্বালা নির্ব্বাণ হয়। তখন নিঃশব্দে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অতি সন্তর্পণে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন ও যাইবার কালে দুই ফোঁটা অশ্রু মনোময়ীর জন্য কৃতজ্ঞতার উপহার স্বরূপ পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

বিবিধতত্ত্ব সংগ্রহ।

১। অদৃষ্ট পরীক্ষা।

জাপানে একখানি অপূর্ব্ব পুস্তকের কথা শ্রুত হয়। ইহাতে আত্মার অদৃষ্ট পরীক্ষার উপায় লিখিত আছে। মৃত্যুকালে শরীরের লক্ষণ দৃষ্টে আত্মার পারলৌকিক অবস্থা নির্ণীত হইয়া থাকে। যথা,—যদি দেহ মৃত্যুকালে কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে মৃতের আত্মা নরকে বাস করে; যদি হরিৎ-বর্ণ কিম্বা পীতবর্ণ হয়, তাহা হইলে প্রেতাত্মা পর জন্মে পশুযোনি প্রাপ্ত হয় অথবা বুভুক্ষু প্রেত হইয়া জঠরানলে দগ্ধ হইতে থাকে। যদি মৃত্যুকালে মুখশ্রী বিবর্ণ না হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার মনুষ্য হইয়াই জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মুখশ্রী গোলাপীবর্ণ ধারণ করিলে প্রেতাত্মা দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। এরূপ মুখশ্রী দেখিলে আত্মীয় স্বজনের আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না—তাহারা মহা সমারোহে অন্ত্যেষ্টি উৎসব করিয়া থাকে।

কোনও সাধু ও ধার্ম্মিক লোকের মৃত্যুসময়ে যদি তাহার পাদদেশ শীতল হইয়া ক্রমে সমস্ত শরীর হিমাঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহাকে পুনর্ব্বার নরলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে; আর যদি তাহার মস্তক ও কর্পর উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে তাহার আত্মা স্বর্গবাসী হইবে। অসাধু ও অধার্ম্মিকের মৃত্যুকালে দৈহিক তাপ

প্রথমতঃ মস্তকচ্যুত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরচ্যুত হইলে তাহার আত্মা বুভুক্ষু প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইবে; যদি পাদদেশের নিম্নাঙ্গ শীতল হইবার পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহাকে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে; আর যদি তাহার পদতল ব্যতীত সমস্ত শরীর শীতল হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে নরকবাসী হইতে হইবে। ধার্ম্মিক ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও শরীরের তাপ অনুভূত হইয়া থাকে।

মৃত ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জন্ম পরীক্ষারও একটী অদ্ভুত কৌশলের উল্লেখ আছে। মৃত্যুকালে কোনও লোকের হাতের তালুতে (চেটোতে) কেহ অঙ্গুলি দ্বারা তাহার নাম, ধাম ও সমাধি-স্থানের (যথায় কবর দেওয়া হইয়াছে) বিবরণ লিখিয়া দিলে তাহা বিলুপ্ত হয় না, পর জন্মে হস্ত-তালু পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্ব জন্মের সেই সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। এই সকল চিহ্ন অর্থাৎ অঙ্গুলি-লিখিত বর্ণ সকল কিছুতেই বিলুপ্ত হয় না, তবে যদি সমাধিস্থ মৃত্তিকা দ্বারা সমাধিস্থল মার্জ্জনা করা যায়, তাহা হইলে আর কোনও চিহ্ন থাকে না।

২। বিজ্ঞান রহস্য।

১। উদ্ভাবক রিচার্ড হেলান বহু অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া একপ্রকার দীপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহার নাম "বাক্য দীপ" (Speaking Lamp)। ইহার সহিত মাইক্রোফণ সংযুক্ত থাকাতে ইহা শত শত ক্রোশ বাক্যধ্বনি বহন করিতে পারে। বাক্যগুলি এত স্পষ্ট রূপে শ্রুত হয়, যেন এক স্থানে বসিয়া পরস্পরে কথোপকথন করিতেছে। টেলিফোঁ যন্ত্রে সেরূপ হয় না। তিনি টেলিফোঁরও উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তিনি বলেন "বিদ্যুদালোকে আলোকিত যে কোন গৃহ হইতে টেলিফোঁ সংযুক্ত করিয়া স্বাভাবিক স্বরে কথা কহিলেও দূরস্থ কোনও গৃহ বা বৃহৎ হল তদ্দ্বারা প্রতিধ্বনিত হইতে পারে এবং তত্রত্য সকলেই তাঁহার কথা সুস্পষ্ট শ্রবণ করিতে পারে।

২। সম্প্রতি স্পেক্ট্রোগ্রাফ (Spectrograph) নামক আরও একটী অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহা দ্বারা কেবল দূরস্থ বন্ধু বান্ধবের সহিত বাক্যালাপ ও পরস্পর সন্দর্শন করা যায় এমত নহে, কিন্তু আরও তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে যে সকল বস্তু আছে, তাহাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ধন্য বিজ্ঞানের মহিমা! টেলিফোঁ, মাইক্রোফোঁ ফণোগ্রাফ, ফোটোগ্রাফ, স্পেক্ট্রোগ্রাফ প্রভৃতি তাড়িৎ যন্ত্র সকল বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের চূড়ান্ত উদ্ভাবন।

৩। তাড়িৎ প্রভাবে মৃত্তিকারও উর্ব্বরতা সংসাধিত হইবার উপায় হইতেছে। বিজ্ঞানবিদ্ তেসলার প্রক্ষিপ্ত তাড়িত-শক্তি দ্বারা দূর দেশের ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্য ফলাইবার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সম্প্রতি দুইজন রুষীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

* জাপানস্থ আসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্য-বিবরণ হইতে সংগৃহীত। (থিওজফিষ্ট—জুন ১৯০২)।

করিয়াছেন যে, তাড়িত-প্রবাহে ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। যেকোন ক্ষেত্রে তাড়িত-উদ্ভাবক যন্ত্র (Electric Battery) প্রোথিত করিয়া সমস্ত ক্ষেত্রে তাড়িত প্রবাহ আরোপিত হইলে ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর হইয়া থাকে। গোল আলু, বিট্‌পালঙ্গ, যব ও গোধূম প্রভৃতি মূল, শস্য ও অন্যান্য নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ স্বল্পায়াসে ও স্বল্পব্যয়ে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারিবে। তাহাদিগের এই আবিষ্কারের ফল শীঘ্রই জনসমাজে প্রকাশিত হইবে।

৪। সূর্য্যের উত্তাপ অর্থাৎ রৌদ্রতাপ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা পাক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। সম্প্রতি এই সংগৃহীত উত্তাপের তেজে গতিক্রিয়া সম্পাদনের চেষ্টা হইতেছে। রৌদ্রতাপ যোগে ট্রামগাড়ী, রেলগাড়ী প্রভৃতি শকট সকল পরিচালিত হইবে। এক্ষণে বাষ্প ও বিদ্যুৎ শক্তি প্রভাবে যেরূপ গতিক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, রৌদ্রতাপেও তদ্রূপ হইবে। আমেরিকার অন্তঃপাতী সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে এই অভিনব উদ্ভাবনের পরীক্ষা চলিতেছে। ক্রমে ক্রমে মৃদঙ্গার ও ইন্ধন (কয়লা ও কাঠ) যেরূপ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, তাহাতে রৌদ্র-তাপের এরূপ ব্যবহার ঐশ্বরিক বিধান বলিতে হইবে।

৩। * ছায়া ঘড়ি ও ঘটিকা যন্ত্র।

পূর্ব্বে ছায়া ঘড়ির দ্বারাই সময় নিরূপিত হইত। ছায়া ঘড়ির আদর্শেই ঘটিকা-যন্ত্র নির্ম্মিত। কিন্তু ছায়া ঘড়ির দ্বারা যেরূপ সময় নির্ণীত হয়, ঘটিকাযন্ত্রের দ্বারা সেরূপ হয় না। এই জন্য ছায়া ঘড়ির ব্যবহার অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। সূর্য্যের অয়নানুসারেও ছায়ার অবস্থাক্রমে ছায়াঘড়ীর সময় নির্ণীত হইয়া থাকে, আর দোলক (Pendulum) কিম্বা শলাকার গতি দ্বারা ঘটিকাযন্ত্রে সময়ের পরিমাণ হয়। সুতরাং ঘটিকা-নির্দ্দিষ্ট সময় কখনও সূর্য্যাস্তের বা সূর্য্যোদয়ের অগ্রবর্ত্তী বা পরবর্ত্তী হয়, অত্যল্প সময়ই সমকালবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই জন্য ঘটিকা নির্ণীত সময় ছায়ার সহিত সর্ব্বদা ঐক্য হয় না। ঘটিকাযন্ত্রের এই ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্যই প্রতি চারি বৎসরে এক দিবস অতি-রিক্ত ধরিবার রীতি য়ুরোপে প্রচলিত হইয়াছে। রোমীয় প্রথম সম্রাট জুলিয়স্ সীজরের সময় (খ্রীঃ পূর্ব্ব ৪৭ বৎসর) পর্য্যন্ত গণনা দ্বারা সময় ঠিক্ করিয়া দুই মাস অতিরিক্ত ধরা হইয়াছিল। তৎপরে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পোপ গ্রেগরী (ত্রয়োদশ) দশদিন বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। অধুনা প্রতি চারি বৎসরে ফেব্রুয়ারি মাসে অতিরিক্ত একদিন ধরা হয়। পৃথিবী সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিলে এক বৎসর হয়; কিন্তু এই প্রদক্ষিণ কাল বা বৎসর ৩৬০ বা ৩৬৫ দিনে সম্পন্ন হয় না, আরও ৫।৬ ঘণ্টা অধিক লাগে, ইহা সূক্ষ্মরূপে গণনার প্রয়োজন।

গীতাসার ব্যাখ্যা।

(৪৬৬-৬৭ সংখ্যা—৮২ পৃষ্ঠার পর)।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫

আত্মপ্রসাদ লাভ হইলে সকল দুঃখের অবসান হয়। যাঁহার চিত্ত প্রসন্ন, তাঁহার বুদ্ধি অতি শীঘ্র আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জীবের পক্ষে ভৌতিক, শারীরিক, মানসিক প্রভৃতি দুঃখ স্বাভাবিক। জাত ব্যক্তির মরণ যেমন নিশ্চয়, এই সকল দুঃখও সেইরূপ অনিবার্য্য। কেহ কেহ অস্বাভাবিক উপায়ে—কঠোর যোগ বৈরাগ্যাদি দ্বারা এই সকল দুঃখ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করেন—যেমন পঞ্চতপার শীতাতপ প্রভৃতি সহ্য করা অভ্যাস হওয়াতে তাহাতে ক্লেশ হয় না, মলবাহীদের মলে দুর্গন্ধ অনুভব হয় না; কিন্তু এরূপ উপায়ে দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি ভিন্ন চিরশান্তি হইতে পারে না। দুঃখ দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। আলোক দ্বারা যেমন অন্ধকারের নিবৃত্তি হয়, প্রকৃত সুখ দ্বারা সেইরূপ দুঃখের চিরনিবৃত্তি হয়। কিন্তু এই সুখ সংসারের হর্ষোল্লাস নহে, কারণ তাহার পরিণাম বিষাদ ও দুঃখ। প্রকৃত সুখ—স্থায়ী সুখ—অক্ষয় শান্তি যাহা, তাহা আত্মপ্রসাদ-সম্ভূত এবং তাহার উদয়ে "তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা" সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন, তেমনি দুঃখের অবসান হয়। আত্মপ্রসাদ লাভ হইলে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সকল দুঃখ দূর হয়।

আত্মপ্রসাদ দুই প্রকার যথা—(১) বহির্বিষয়লভ্য; (২) অন্তর্লভ্য। আত্মা সংযত হইয়া বিধিপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে যে সুখ গ্রহণ করে, তাহা বহির্লভ্য। মিতাহারী মিতাচারী হইয়া যে সুখ লাভ করা যায়, তাহা বৈধ সুখ, তাহাতে স্বাভাবিক দুঃখের কতক পরিমাণে নিবৃত্তি হয়। কিন্তু যাহা কিছু বাহ্য, তাহা অস্থায়ী এবং আত্মার চির-সহায় হইতে পারে না। অন্তর্লভ্য আত্মপ্রসাদই চির-সুখকারী ও সর্ব্বদুঃখ-হারী। পুণ্য কার্য্য করিয়া—অন্যের সুখ বর্দ্ধন ও দুঃখ হরণ করিয়া আত্মার তৃপ্তি-জনিত আত্মপ্রসাদ লাভ হয়; তাহাতে মনকে প্রশস্ত করিয়া দুঃখ হইতে নির্মুক্ত করে। মনুষ্যের মন আত্মসুখ দুঃখ লইয়া যত থাকে, ততই সঙ্কীর্ণ ও বিষণ্ণ হইয়া থাকে। অন্যের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইতে পারিলে সেই উদারচিত্তে দুঃখের স্থান হয় না। কিন্তু আত্মপ্রসাদের উৎস পূর্ণানন্দ পরমেশ্বর। তাঁহার সহিত আধ্যাত্মযোগে যে আত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ

হয়, তাহাতেই আত্মপ্রসাদের পূর্ণতা। ইহা আত্মার মধ্যে প্রসাদ বা দেব-প্রসাদ। এই প্রসাদের উচ্চতা, গভীরতা ও পরিমাণ কে স্থির করিবে? ইহার প্রভাবে জীব "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া আর কোথা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন" আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া কোন কালেও ভয়প্রাপ্ত হন না। দেব-প্রসাদে চিত্ত প্রসন্ন হইলে বুদ্ধির চঞ্চলতা দূর হয় এবং তাহা অচিরে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মধুমক্ষিকা যেমন যতক্ষণ মধু না পায়, এখানে সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু মধু পাইলেই স্থির হইয়া বসিয়া তাহা নিঃশব্দে পান করিতে নিযুক্ত হয়, প্রসাদভোগী আত্মার সেই অবস্থা। ইহা ব্রহ্মপাদপদ্মের মধুপানে মগ্ন। চঞ্চল বুদ্ধি শতধা, সহস্রধা হইয়া স্বচ্ছ আত্মাকে নানা রঙ্গে রঞ্জিত দেখে এবং এক এক রঙ্গের অনুসরণ করে। কিন্তু একচিত্ত হইয়া আত্মা স্বচ্ছ হয় এবং পরমাত্মাকে শুভ্রস্বরূপ দেখিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আত্মাতে আত্মার অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া আত্মতৃপ্ত হইয়া আত্মা সুস্থির ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা।
নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখং॥ ১১

অসমাহিত-চিত্ত ব্যক্তির আত্মস্বরূপ বিষয়ক বুদ্ধি নাই। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে আত্মস্বরূপ বিষয়ে ভাবনা বা অভিনিবেশ অসম্ভব। আত্মস্বরূপ বিষয়ে অভিনিবেশ না হইলে হৃদয়ে চিত্তোপরম-জনিত শান্তির উদয় হয় না। শান্তি না হইলে পরমানন্দ ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের সম্ভাবনা কোথায়?

বুদ্ধি দুই প্রকার—বিষয়-বুদ্ধি ও আত্ম-বুদ্ধি। বিষয়-বুদ্ধি মনের কার্য্য। এই মন চঞ্চল-স্বভাব এবং বিষয়-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া রূপরস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এই ইন্দ্রিয়-গ্রামে বিচরণ করে। এই চঞ্চলতা বা মনের বিক্ষেপ শান্তি না হইলে আত্মবোধক বুদ্ধির উদয় হয় না। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি আত্মরাজ্যে নিস্তেজ ও অন্ধ। এই জন্য পরমার্থ-রসজ্ঞ কবি গাহিয়াছেন "প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে, তিনি হে অকিঞ্চন গুরু।" আত্মতত্ত্ববিদ্ মহর্ষি ঈশা এক স্থানে বলিয়াছেন "দিগ্‌গজ পণ্ডিতদিগের নিকট যে জ্ঞান লুক্কায়িত, সরল শিশুর নিকট তাহা প্রকাশিত হয় এবং তাহা দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্তম্ভিত হইয়া থাকেন।" আত্ম-সমাধান-হীন ব্যক্তি এই জন্য মহা পণ্ডিত হইলেও মূর্খ, মহা বুদ্ধিমান্ হইলেও নির্ব্বুদ্ধি। আত্মযোগ দ্বারা আত্ম-বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পায়। আত্মযোগযুক্ত ব্যক্তিই সূক্ষ্ম বুদ্ধি লাভ করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত অধ্যাত্ম-রাজ্যে প্রবেশ লাভপূর্ব্বক তাহার গভীর তত্ত্ব গ্রহণ করেন। অযুক্ত ব্যক্তির সেখানে প্রবেশাধিকার নাই, সেখানে তাহার অভিনিবেশ এককালে অসম্ভব। অযুক্ত ব্যক্তি ধ্যানে বসিয়া অন্ধকার

দেখিবে আশ্চর্য্য নহে। অযুক্ত ব্যক্তি বাহিরে বাহিরে বিষয়ের কামনা, চিন্তা বা কল্পনা লইয়া পাকচক্রে ঘুরিতে থাকে, বস্তুতত্ত্বের মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে না। তাহার নিকট অধ্যাত্মরাজ্য বাস্তবিক অন্ধকারময়; সে তাহার মধ্যে যে মহারত্ন আছে, তাহা কিরূপে দেখিবে? দিব্যালোকের সংবাদ কিরূপে পাইবে? —সুতরাং তত্ত্বচিন্তাপথে অগ্রসর হইয়া সে সর্ব্বসংশয় ছিন্ন করিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।

যোগ চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তি। আত্মস্বরূপ বিষয়ে অভিনিবেশ না হইলে এই চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তিতে যে পরম শান্তি, তাহার উপভোগও হয় না। সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় বিষয়-ভাবনার অন্ত নাই, বিরাম নাই এবং তাহাতে নিরন্তর চিত্তবিক্ষোভ ও অস্থিরতা। কিন্তু অধ্যাত্মযোগে পরমাত্ম-চিন্তায় রত হইলে সকল ভাবনার শেষ হয় এবং আত্মা নিশ্চিন্ত, নির্ভয় ও নিরাপদ হয়; সুতরাং শান্তি তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সরোবরের গভীর হইতে গভীরতর জলে ডুবিলে যেমন বাহিরের কোলাহল শ্রুত হয় না, অভিনিবেশ সহকারে তত্ত্বচিন্তায় যত মগ্ন হওয়া যায়, ততই স্থিরতা, ততই শান্তি, বিষয় কোলাহল আর সেখানে উত্ত্যক্ত করিতে পারে না। আত্মযোগেই শান্তি। শান্তি ভিন্ন প্রকৃত সুখ হয় না। বিষয়াসক্তি-ঘূর্ণায়মান অশান্ত চিত্তের নিকট আশা নিরাশা, উৎসাহ অবসাদ, সাহস ভয়, হর্ষ বিষাদের দ্বন্দ্বভাব। ইহাদের ঘাত প্রতিঘাতে আত্মাকে নিয়ত অস্থির ও অসুখী করিয়া রাখে। অধ্যাত্মযোগে প্রাণ যখন গভীর শান্তিতে ডুবিয়া প্রাণারামকে আলিঙ্গন করে, তখন তাঁহাকে "পরিপূর্ণমানন্দং" রূপে পাইয়া প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করে। জগতে যত ভোগ্য বস্তু আছে, সকলি পরিমিত ও নিকৃষ্ট। কি ইন্দ্রিয়-সেবীর ভোগ্য—রূপ রস গন্ধাদি, কি বুদ্ধিমানের ভোগ্য মানসিক সুখ—সকলি এইরূপ। কিন্তু জীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভোগ্য শান্তিস্বরূপ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর —তাঁহার অন্ত নাই, পরিমাণ নাই, তিনি সুন্দর অপেক্ষা সুন্দরতর, মধুর অপেক্ষা মধুরতর। তাঁহাকে সম্ভোগ করিয়া জীব পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। তখন তাহার অন্য আশা কামনা থাকে না, সে আপ্তকাম হইয়া নিত্যানন্দে নিত্য শান্তি ভোগ করে। তাহার জীবন চিরধন্য হয়।

মহদ্বাক্য।

১। জীবনে শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বিষয় প্রকৃতরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা।

২। ঝটিকা ও ভূমিকম্প অপেক্ষা মানুষের হস্ত দ্বারাই অধিকসংখ্যক নগর ও অট্টালিকা বিনষ্ট হইয়াছে; তদ্রূপ

অপরের অপেক্ষা স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা অধিক-সংখ্যক মনুষ্য আপনাদের চরিত্রের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

৩। মানুষ যতটুকু সুখ উপভোগ করে, তদপেক্ষা অনেক অধিক সুখ অবহেলাপূর্ব্বক ত্যাগ করে।

৪। "হায়! যদি এই অপকর্ম্ম না করিতাম," মানুষের মুখে এই কাতরোক্তি অপেক্ষা কাতরতর উক্তি আর শুনি নাই।

৫। অনেক অমঙ্গল কেবল মঙ্গলের আতিশয্য মাত্র! সাহসের আতিশয্য অসমসাহসিকতা, প্রেমের আতিশয্য মোহ, পরিমিতব্যয়িতার আতিশয্য কৃপণতা।

৬। আমরা প্রকৃতির অনেক নিয়মের প্রতি বিরক্ত হই, কিন্তু আমাদের মধ্যে কখন কি কেহ তত্তৎ নিয়মের সংশোধন করিয়া তাহাদিগের পরিবর্ত্তে উৎকৃষ্টতর কি নিয়ম হইতে পারে, তাহার উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন?

৭। পুরুষ পুরুষ এবং স্বীয় পৌরুষের কর্ত্তা—অবস্থা বা ঘটনার দাস নহে।

৮। যাহা তুমি ইচ্ছা কর, তাহা তুমি হইতে পার, কেননা মানুষের ইচ্ছার শক্তি প্রভূত।

৯। প্রকৃতরূপে এবং হৃদয়ের সহিত, দৃঢ়তাপূর্ব্বক যাহার সাধনা করিবে, তাহা লাভ করিতে পারিবেই পারিবে।

১০। লোকে সচরাচর যাহাকে আমোদ বা সুখ বলে, আজ যদি তাহার অন্য নামকরণ করা যায়, তাহা হইলে কল্য অনেকে সে সুখ বা আমোদ ঘৃণার্হ মনে করিয়া পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবে।

১১। পশুগণ সংস্কারবলে আপনাদের যেরূপ সুখ বিধান করে, অনেক মনুষ্য বুদ্ধির সাহায্যে তদ্রূপ সুখ লাভ করিতে পারে না, ইহা কি মানুষের পক্ষে অতি নিন্দনীয় কথা নহে?

১২। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে রহস্য ব্যূহ—তাহা ভেদ করিবার জন্য অধীর হইবার প্রয়োজন কি?

১৩। যেখানে আমাদের ভ্রমে পতিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, সেখানেও বিশেষ সতর্কতার সহিত চলা উচিত।

১৪। প্রত্যেক শিশুই পবিত্রতার আধার। এ কথা যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা অন্ততঃ ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, একটী বালক বা যুবা সহজে অপবিত্রতার পথে গমন করে না।

১৫। স্বর্গ অহঙ্কারের সাধনায় প্রাপ্য নহে, উহা নম্রতার সাধনার অধীন।

১৬। পাপে নিরত থাকা, পাপ হইতে কখন বিরত না হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক পাপ।

১৭। যদি ক্রোধে অধীর হও, তথাপিও বাক্যে কখনও ক্রোধ প্রকাশ করিও না।

১৮। অপরের সহিত কথোপকথনে কখনও নিজের শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিও না। আমি যদি তোমাকে আমার অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রমাণ করিতে

চেষ্টা করি, আমার সহবাস কি কখনও তোমার ভাল লাগিবে?

১৯। বিশ্বাস সম্পূর্ণ হউক, কিন্তু যেন অন্ধ না হয়।

২০। যদি কোনও ব্যক্তিকে সন্দেহ কর, তবে তাহার সহিত বন্ধুতা করিও না; যদি কোনও ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা কর, তাহাকে সন্দেহ করিও না।

২১। বিশ্বাসী অপেক্ষা অবিশ্বাসীরাই অধিক ভ্রমে পতিত হয়।

২২। উন্নতির অর্থ জ্ঞানের বৃদ্ধি, সৎ-কার্য্য সাধনের শক্তির বৃদ্ধি এবং সাধুতার ক্রম-পুষ্টি।

২৩। যাহা ভাল, কেবল তাহারই চিন্তা কর, তাহা হইলে তুমি কখনও মন্দ করিবে না।

২৪। ন্যায় ও সত্যের জ্ঞান অপেক্ষা ন্যায় ও সত্য পালন মহত্তর।

২৫। সুন্দর কার্য্যই জীবনকে সুন্দর করে। সৎকার্য্য সাধনই সৎকার্য্যের পুরস্কার।

২৬। যে ব্যক্তি মানবীয় পূর্ণতা লাভের জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করে, সে মহৎ লোক; কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ণতা লাভ করিবার সময় সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দানুভব করে, সে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী।

২৭। নূতন সত্য স্থাপন করা অপেক্ষা পুরাতন ভ্রম দূর করা অধিক কঠিন কার্য্য।

২৮। মহাপুরুষের একটী লক্ষণ এই দেখা যায় যে, তিনি জীবনে প্রধানতঃ একটীমাত্র মহৎ কার্য্য সম্পাদনের প্রতি স্বীয় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেন।

২৯। উন্নত আত্মার সমক্ষে রাজ-শক্তির কোনও মনোহারিত্ব নাই।

৩০। মানুষের মত ও বিশ্বাসই তাহার স্বদেশ এবং স্বীয় মত ও বিশ্বাসের প্রতি অনুরাগই প্রকৃত স্বদেশানুরাগ।

৩১। অতি সামান্য কার্য্যের মূলে সুমহৎ উদ্দেশ্য রোপণ করিতে ভুলিও না, তাহা হইলে তোমার ক্ষুদ্র কার্য্যগুলিও সুমহৎ ফল প্রসব করিবে।

৩২। দরিদ্রের দুঃখ মোচন কর, তোমার আত্মা ধনী হইবে। রুগ্নকে উদ্ধার কর, তোমার আত্মার স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হইবে।

৩৩। বৃষ্টিপাতে যেমন পুষ্পের প্রস্ফুটন, দুঃখ শোকের আঘাতেও তেমনি হৃদয়ের মধুর ভাবনিচয়ের বিকাশ হইয়া থাকে

৩৪। অদৃশ্য পরমেশ্বরের সত্তা সর্ব্ব-স্থানে ও সর্ব্ববিষয়ে দর্শন করা আত্মার উন্নতি সাধনের একটী প্রধান উপায়। এরূপ দর্শনশক্তি সুমতি ও বহু অভ্যাস-সাপেক্ষ।

৩৫। প্রেমকে কার্য্যে বিকশিত করার নামই ধর্ম্ম।

৩৬। বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মের কঠোরতার পশ্চাতে দয়া ও প্রেমের স্নিগ্ধ ও শান্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

৩৭। মত অপেক্ষা কার্য্যে যে নিরীশ্বরতা দেখিতে পাই, তাহাই ভয়াবহ।

৩৮। সহিষ্ণুতা, ধীরতা, কোমলতা,

নম্রতা, প্রশান্ততা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গুণ-নিচয়ের অনুশীলনের প্রভাবে আমরা গভীর হইতে গভীরতর আধ্যাত্মিক সত্য সকল উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, তজ্জন্য বুদ্ধি ও অধ্যয়নের প্রয়োজন করে না।

৩৯। মৎস্য যেমন জলে থাকিতে ভালবাসে, বিকারশূন্য আত্মা তেমনি প্রেম ও সহানুভূতি-পূর্ণ কার্য্য-তৎপরতা রূপ বিমল সলিলে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিয়া সুখী হয়।

৪০। মৃত্যু আমাদিগের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করিবে কেন? মৃত্যু আমাদিগকে আমাদিগের প্রকৃত গৃহে লইয়া যায়—গৃহে গমন করিতে ভয় কি?

৪১। যত পার দান কর। তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাকে আরও দান করিবার শক্তি দিবেন। সে শক্তি মহৎ শক্তি—কেননা উহা ঐশ্বরিক শক্তি। ঈশ্বরের জীবন দানের জীবন। তিনি অজস্র ভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সকলই দান করিতেছেন। দানেই তাঁহার আনন্দ।

৪২। অকপট ভাবে সকলকে ভাল বাসিবে; পবিত্র উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়াই কার্য্য করিবে; পরিষ্কাররূপে চিন্তা করিতে শিখিবে, এবং দৃঢ়ভাবে ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস রক্ষা করিবে, তাহা হইলে তোমার মানবজন্ম ব্যর্থ হইবে না।

৪৩। ধার্ম্মিকের সৌন্দর্য্য ও মনোহারিত্ব কি? না, তাহার স্বার্থশূন্যতা।

মক্কা-যাত্রী।

মক্কা মহম্মদের জন্মস্থান এবং তজ্জন্য মুসলমানদিগের পরম তীর্থস্থান। জীবনে অন্ততঃ একবার মক্কা দর্শন প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মকার্য্য। পৃথিবীর যে যে দেশে মুসলমান বাস করে, তৎসমস্ত দেশ হইতেই প্রতি বৎসরে এখানে বহুসংখ্যক মুসলমান একত্রিত হয়। তুরস্ক, মিসর, ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য, আরব, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, মরক্কো, আল্জেরিয়া, টিউনিস্ ও এসিয়ার অন্তঃ-পাতী রুষ সাম্রাজ্য, এই সকল দেশ হইতে যাত্রীর সমাগম হয়। প্রতি বৎসরে কোন্ দিন মক্কা তীর্থ দর্শনের পক্ষে প্রশস্ত, তাহা মুসলমান ধর্ম্মযাজকগণ তিথি অনুসারে গণনা করিয়া স্থির করিয়া দেন। ১৯০০ সালে ২০শে এপ্রিল তারিখে মক্কা তীর্থ দর্শনের দিন স্থির হইয়াছিল, আবার গত বৎসরে ৮ই এপ্রিল দিবস উহার পক্ষে প্রশস্ত ছিল।

মক্কা-যাত্রিগণ নানা দেশ হইতে জলপথ ও স্থলপথ দিয়া মক্কা তীর্থে উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহারা জলপথে আইসে, তাহাদিগকে জেড্ডা নামক বন্দরে অবতরণ করিতে হয়। জেড্ডা হইতে মক্কা পঁচিশ

ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তুরস্ক হইতে যে সকল মুসলমান যাত্রী আইসে, তাহারা সকলে একটী বৃহৎ দল বাঁধিয়া আগমন করে। এই দলকে ইংরাজীতে "কারাভান্" কহে। এই দলে বহুসংখ্যক মনুষ্য, উষ্ট্র ও শকট থাকে। আরবের বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্য দিয়া যখন শত শত মক্কা-যাত্রী গমন করে, তখন পথকষ্টে ক্লিষ্ট হইয়া অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু এরূপ মৃত্যুতে কোনও মুসলমানই ভয় করে না, কেন না তাহার বিশ্বাস যে, মক্কা-যাত্রীর পক্ষে পথে মৃত্যু মুক্তির পথ। মক্কায় মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রবেশ নিষেধ। বর্ষন্ নামক একজন তুরস্ক-ভাষাবিজ্ঞ ইংরাজ পরিব্রাজক ছদ্মবেশে মক্কা দর্শন করিয়া আইসেন। সে বহু দিনের কথা। আমরা আজ মক্কার যে বৃত্তান্ত প্রকটিত করিতেছি, তাহা রবার্ট মেক্রে নামক এক ইংরাজের মক্কা-দর্শন-বৃত্তান্ত। ইনি সম্প্রতি ছদ্মবেশে মক্কা দর্শন করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

প্রতি বৎসরে জেড্ডায় কত মক্কাযাত্রী আসিয়া থাকে, তাহার এক তালিকা প্রস্তুত হয়। ঐ তালিকায় দেখা যায় যে, প্রতিবৎসর চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত যাত্রীর সমাগম হয়। কোন কোন বৎসরে এতদপেক্ষা অধিক যাত্রী হয়। গত ১৮৯৩ সালে ৯২ হাজার যাত্রী উপস্থিত হইয়াছিল। তুরস্ক হইতে যে সকল যাত্রী স্থলপথে আইসে, তাহারা সকলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দামাস্কস্ নগরে সম্মিলিত হয়, পরে তথা হইতে একত্র যাত্রা করে। সহস্র সহস্র লোকে শত শত উষ্ট্রসহ বিবিধ বর্ণের পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া যখন গমন করে, তাহা এক অভিনব দৃশ্যে পরিণত হয়। মক্কার মস্‌জিদে "কাবা" নামক যে সর্ব্ব-মুসলমান-পূজ্য প্রস্তর আছে, তাহার সুশোভনার্থ তুরস্কের সুলতান ও মিসরের খেদিব প্রতিবৎসর এক এক খানি সুন্দর গালিচা উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন।

তুরস্কদেশবাসী যাত্রিগণ যেমন দামাস্কস্ নগরে সম্মিলিত হইয়া পরে একত্রে মক্কা যাত্রা করে, সেইরূপ মিসর, সুদান ও দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী যাত্রীরাও কেরো নগরে একত্রিত হইয়া তৎপরে এক দিনে এককালে মক্কাভিমুখে যাত্রা করে। মহাসমারোহে এই যাত্রা আরম্ভ হয়। সর্ব্বাগ্রে পবিত্র "কাবা" প্রস্তরের সুশোভনার্থ উৎসর্গিত গালিচাখানি একটী চন্দ্রাতপ-বেষ্টিত হইয়া কয়েকটী মন্ত্রী কর্ত্তৃক নীত হয়। এই গালিচার মূল্য প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। প্রত্যেক খেদিব সিংহাসনারূঢ় হইবার পর এইরূপ একটী গালিচা উৎসর্গ করেন, তদ্ব্যতীত মিসর গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বৎসর খেদিবের নামে একখানি নূতন গালিচা উৎসর্গ করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর মক্কার উৎসব শেষ হইলে, পূর্ব্ব বৎসরে উৎসর্গিত গালিচাখানি বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পীর বা মুসলমান সাধুদিগের কবরে রক্ষার্থ

চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয় এবং যাত্রিগণের মধ্যেও বিতরিত হয়।

কেরো হইতে যাত্রিগণ আবাসিনামক গ্রামে যাত্রাপূর্ব্বক তথায় রাত্রি যাপন করে। সভাসদ্‌গণ সহ খেদিব এবং বহু-সংখ্যক নগরবাসী বাদ্যভাণ্ডসহকারে ও পতাকা উড্ডীন করিয়া আবাসি গ্রাম যাত্রিগণকে পৌঁছাইয়া দিয়া আইসে। পরদিন বাষ্পীয় যানে যাত্রীরা সুয়েজ নগরাভিমুখে যাত্রা করে। যাত্রি-গণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ট্রেণ খানি পুষ্পপত্রে সুন্দররূপে সুশোভিত করা হয়। সুয়েজ পৌঁছিবার পর যাত্রীদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হয়। এখানে এক দিন মাত্র অবস্থিতি করিয়া যাত্রীরা বাষ্পীয় অর্ণবপোতে আরোহণ করেন। সমস্ত যাত্রীর জন্য কয়েক খানি অর্ণবপোত আবশ্যক হয়। যাত্রিগণকে ইহার ভাড়া দিতে হয় না। মিসর গবর্ণ-মেণ্ট বিনা ব্যয়ে মক্কাযাত্রীদিগকে সুয়েজ হইতে জেড্ডানামক স্থানে পৌঁছাইয়া দেন। জেড্ডায় উপস্থিত হইয়া ইহাঁরা দেখিতে পান যে, সহস্র সহস্র যাত্রী তথায় ইতিপূর্ব্বেই সমাগত হইয়াছে! ইহাঁদিগের সহিত মিলিত হইয়া সকলে মক্কা যাত্রা করেন।

জেড্ডা হইতে মক্কা পঁচিশ ক্রোশের অধিক নহে। এই পথের দুই পার্শ্বে কেবল পর্ব্বত ও মরুভূমি দেখা যায়। জলাভাবে ও সূর্য্যকিরণের প্রাখর্য্যে যাত্রিগণ এই পথে বড়ই কষ্ট পায়। কিন্তু শীঘ্রই তাহাদিগের পরম তীর্থ মক্কায় উপ-স্থিত হইতে পারিবে এই আশায় আশান্বিত হইয়া সে কষ্টকে তাহারা কষ্ট বলিয়াই বোধ করে না। অতি দরিদ্র যাত্রীরা জেড্ডা হইতে পদব্রজেই গমন করে, কিন্তু অধিকাংশ যাত্রী উষ্ট্র বা গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিয়া থাকে। মক্কা দর্শন করিয়া জীবনলীলা সাঙ্গ করিব, প্রত্যেক যাত্রীর হৃদয়ে একমাত্র এই ভাবটী উজ্জ্বলরূপে জাগরূক দেখা যায়।

মক্কা নগর চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত একটী উপত্যকার উপর অবস্থিত। এই তীর্থস্থানের একটী প্রধান অসুবিধা জলাভাব। মক্কা তীর্থ দর্শনের প্রধান দিবসে এ স্থানে প্রতি বৎসর আড়াই লক্ষ লোকের সমাগম হয়। কখন কখন তদপেক্ষা অধিকও হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে বিশুদ্ধ জলাভাবে যাত্রিগণের মধ্যে মারীভয় উপস্থিত হইত। কত লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইত, কিন্তু এক্ষণে তুরস্কের সুলতান যথাসময়ে বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ-পূর্ব্বক যাত্রিগণের জলাভাব দূর করিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

মক্কার প্রধান মস্‌জিদের নাম বে-ইতুল্লা অর্থাৎ "ঈশ্বর-নিবাস"। ইহার আর একটী নাম "এল্‌-হারাম"। এই মস্‌জিদের মধ্যেই "কাবা" রক্ষিত আছে। "কাবা"ই যাত্রীদিগের প্রধান দ্রষ্টব্য পদার্থ।

ভারতবর্ষে প্রত্যেক হিন্দু তীর্থ-স্থানের ন্যায় মক্কা তীর্থেরও পাণ্ডা আছে। এই

মুসলমান পাণ্ডাকে "মেতওয়াফ্" বলিয়া থাকে। যাত্রিগণ স্ব স্ব "মেতওয়াফ" বাছিয়া লয়। মক্কায় পৌঁছিবার পরে বিশ্রামানন্তর প্রত্যেক যাত্রী স্বীয় "মেতওয়াফ" সহ মস্‌জিদে গমন করে। মসজিদের প্রাঙ্গণ অতি সুবিস্তৃত। এই প্রাঙ্গণে প্রায় চারি লক্ষ লোক একত্রিত হইতে পারে। এই প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে "কাবা" নামক পবিত্র প্রস্তরাগার। তাহা প্রায় সর্ব্বদাই কৃষ্ণবর্ণ রেসম বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। মেতওয়াফ্ যাত্রীকে এই প্রস্তরাগার সাত-বার প্রদক্ষিণ করিতে বলে। প্রদক্ষিণ করার পর তাহাকে এই আগারের মধ্যে লইয়া যায়। উহার মধ্যে একখণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তর দেখা যায়। ইংরাজ পরিব্রাজকগণ বলেন উহা একটী উল্কাপিণ্ডের কিয়দংশ মাত্র, কিন্তু মুসলমানগণ উহা পরম পবিত্র বস্তু মনে করেন। প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাস, ঐ প্রস্তরখণ্ড চুম্বন করিতে পারিলে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়। প্রত্যেক যাত্রীই এই প্রস্তরখণ্ড চুম্বন করে ; তৎপরে মসজিদের প্রাঙ্গণস্থিত জেম্‌জেম্ নামক পবিত্র তীর্থে স্নান করিয়া আহারাদির জন্য বাসায় গমন করে। বৈকালবেলা মসজিদে কোরাণ গীত হইতে থাকে। সেই গীতধ্বনি শুনিবার জন্য যাত্রিগণ পুনরায় তথায় সমাগত হয়। মসজিদে যাত্রিগণ একত্রিত হইয়া বৈকালিক নমাজ করে। নমাজের পর বাসায় গমন করে। প্রথম দিনের কর্ত্তব্যকার্য্য এইরূপে সম্পন্ন হয়।

মক্কার অনতিদূরে আরাফাট্ নামক একটী পর্ব্বত আছে। মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে, এই পর্ব্বতে ঈশ্বর-সৃষ্ট প্রথম মানব ও মানবী স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া মিলিত হয় এবং এইখানেই তাহাদের প্রথম সন্তান জন্মে। এই স্থানটী নির্দ্দেশ করিবার জন্য একটী প্রস্তর-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে, এই স্থান দর্শন করিলে সর্ব্ব-পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। এই পবিত্র স্থান দর্শনের পর যাত্রিগণ মুনা-নামক স্থানে গমন করে। কোরাণে বর্ণিত হইয়াছে, এই স্থানে ইব্রাহিম স্বীয় পুত্র ইস্মেল্‌কে ঈশ্বরের নিকট বলিদান করেন। যাত্রিগণ এই স্থানে আসিয়া প্রত্যেকে এক একটী মেষ বা ছাগ বলিদান করে। তখন এই মুনা উপত্যকা একটী বিশাল কসাইখানায় পরিণত হয়। এই মুনাতে আর একটী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয় ; উহার নাম "শয়তান-শাসন।" শয়তানের একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় এবং প্রত্যেক যাত্রী ঐ মূর্ত্তির উপরে সাতটী প্রস্তর বা উপলখণ্ড নিক্ষেপ করে। এই অনুষ্ঠান দ্বারা মক্কা তীর্থ-যাত্রীর যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয়।

মক্কা-যাত্রিগণের মধ্যে অনেকে মদিনা নগরে গমন করিয়া থাকে। মদিনাও মুসলমানদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান। মদিনা নগরে মহম্মদের কবর আছে। যে স্থানে মহম্মদের মৃত্যু হয়, তাহারই উপরিভাগে একটী মসজিদ্ নির্ম্মিত

হইয়াছে। এই মসজিদেই যাত্রিগণ উপস্থিত হইয়া নমাজ করে। মসজিদের নিকটেই মহম্মদের কবর। কবরের উপর বহুস্তম্ভ-বিশিষ্ট একটী ছাদ নির্ম্মিত করা হইয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য চতুর্দ্দিকেই ৫০ ফিট। কবরের চারি দিকে বহুমূল্য সুন্দর বস্ত্রনির্ম্মিত পর্দ্দা বিলম্বিত আছে। প্রত্যেক সুলতান সিংহাসনারোহণের সময় এই কবরের জন্ত একটী পর্দ্দা দান করেন।

যাত্রিগণ মদিনা তীর্থ দর্শনানন্তর পুনরায় মক্কায় গমন করে এবং তথা হইতে জেড্ডা এবং জেড্ডা হইতে স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কেহ কেহ বা শেষ জীবন পুণ্য-সাধনে অবসানার্থ তীর্থস্থানে বাস করে।

বারমুখী।

চৈতন্ত মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "লবামাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বপাপ হরে।" সাধু সঙ্গের গুণে পাপীর জীবনগতি পরিবর্ত্তিত হয়, ভক্ত-মালে বর্ণিত বারমুখীর চরিত্র পাঠ করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বারমুখী একটী কলুষিত-চরিত্রা বারাঙ্গনা মাত্র। রূপ ও যৌবন তাহার উভয়ই ছিল। পতঙ্গ যেমন প্রজ্বলিত পাবকে জীবনাহুতি দিয়া প্রাণ হারায়—তাহার রূপ ও যৌবনে মজিয়া শত শত ব্যক্তি তদ্রূপ আত্মঘাতী হইয়াছিল। যৌবনাবস্থায় সে পাপের পঙ্কিল প্রবাহে গা ভাসাইয়া, কলঙ্কিনী হইয়া নিরয়ের মার্গ উন্মুক্ত করিয়াছিল; পরে ভগবানের কৃপায় ও সাধুসঙ্গের প্রভাবে তাহার অবস্থা পরি-বর্ত্তিত হইল।

বারমুখী অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। গণিকাবৃত্তি অবলম্বনে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। বিবিধ কারুকার্য্যে তাহার বাটী অলঙ্কৃত ছিল। বহুমূল্য অলঙ্কারা-দিতে তাহার অঙ্গ বিভূষিত থাকিত। আজ্ঞাবহ দাসদাসীগণ নিয়ত তাহার পরিচর্য্যা করিত। নৃত্যগীত, আমোদ প্রমোদ, ক্রীড়াকৌতুকে পরম সুখে তাহার দিন কাটিত।

তাহার বাড়ীর কাছে একটী বাগান ছিল। বাগানটী বিবিধ বৃক্ষে পূর্ণ। বৃক্ষ-গুলি পুষ্পিত ও ফলভরে অবনত হইয়া সকলের মন হরণ করিত। নানাজাতীয় বিচিত্রবর্ণের পক্ষিকুল বৃক্ষের শাখা প্র-শাখায় বসিয়া মধুর স্বরে গান করিত। ভৃঙ্গগণ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিয়া মধু সঞ্চয় করিত। এই বাগানটী বার-মুখীর বিলাস-কানন।

একদিন কয়েকটী বৈরাগী ভাবাবেশে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে বারমুখীর বিলাসকাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটী বড় গাছের তলায় বসিয়া তাঁহারা গোপীযন্ত্রসহকারে মধুর স্বরে হরিনাম গান করিতে লাগিলেন—

"সংসারের যত সুখ, সকলই প'ড়ে রবে,
জীবন জলবিম্ব প্রায়, জলে জল মিশাইবে।
তালার উপরে তালা তেতালায় আর কেবা শোবে,
যখন শমন ধর্‌বে চুলে, ধরণী লুটিয়া রবে॥"

বারমুখী তেতালায় পর্য্যঙ্কে সুখে শয়ন করিয়াছিল। বৈরাগীদিগের গান তাহার কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া প্রাণ আকুল করিল। সে সংসারের অনিত্যতা ও জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। কলঙ্কিত জীবনের জন্য তাহার হৃদয়ে তীব্র অনুতাপের উদয় হইল। সুকোমল শয্যা কণ্টকসম বোধ হইতে লাগিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গবাক্ষ-পথে বৈরাগিগণের অনিন্দ্য মুখকান্তি দর্শন ও তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহাদিগের গান থামিল; গোপীযন্ত্র নীরব হইল। কিন্তু বারমুখীর দেহ-গোপীযন্ত্র হইতে গুব্‌গুবাগুব্‌ গুব্‌গুবাগুব্‌ শব্দে রাধাকৃষ্ণ নাম উঠিতে লাগিল। তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া কে যেন বলিল,—

রাধাকৃষ্ণ বাজাও স্পষ্ট, সকল কষ্ট যাক্ দূরে,
(ওরে) চামের ছাওয়া গোপীযন্ত্র, ভাঙ্গবেরে দুদিন পরে।
এই বেলা তুই জ্ঞান কাটিতে, বাজিয়ে নে যতন করে;
অবহেলে তরবি যদি, এ জলধি দুস্তরে।

মানব-হৃদয়ে সাধুসঙ্গের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য! স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহ যেমন কাঞ্চনে পরিণত হয়, সাধুসঙ্গের প্রভাবে মানবহৃদয়ের গতি তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। বৈরাগীদিগের পবিত্র রূপ দর্শনে বারমুখীর কলুষিত হৃদয় পবিত্র হইল। সে উন্মাদিনীর ন্যায় গৃহ হইতে ছুটিয়া তাঁহাদিগের কাছে আসিল। সাধুগণের সহবাসে নব-জীবন লাভ করিল—আজন্মাভ্যস্ত পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়া সাধুগণ-প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইল।

অনন্তর বারমুখী এক থাল স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া বৈরাগিগণের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "ঠাকুর! আমি অতি পাপীয়সী। কৃপা করিয়া আমায় আপনাদের চরণে স্থান দিন। যে পাপ করিয়াছি, তাহা হইতে কি করিয়া পরিত্রাণ পাইব, কি করিয়া যমভয় এড়াইব? এই বলিয়া সে তাঁহাদের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার কাতরতা দেখিয়া সাধুগণের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল।

"বড়ই পাপিষ্ঠ মুই নরকের কীট।
যদি দয়া নাহি কর যাব পিট্টু পিট॥
দাসীরে বলিয়া দেহ কিসে ত্রাণ পাব।
মরণান্তে যমভয় কিরূপে এড়াব॥

বৈরাগীরা কামকাঞ্চন ত্যাগী। হরি-নামই তাঁহাদিগের একমাত্র সম্বল। বার-মুখী-প্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রা তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না। তাহা নিকটবর্ত্তী ঠাকুর রঙ্গনাথের চরণে নিবেদন করিতে এবং সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিনাম লইতে আজ্ঞা দিয়া তাঁহারা সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থালাসহ বারমুখী রঙ্গনাথের মন্দিরে গমন করিল। ঠাকুরের সেবকেরা তাহার নিবেদিত স্বর্ণমুদ্রা দেব-সেবার অযোগ্য জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অনন্তর সে বিষণ্ণ বদনে গৃহে আসিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইল। একটী গানে আছে,—

ভক্তিভাবে ডাক্‌লে আমি রৈতে পারি কৈ ?
যে ডাকে আমারে আমি তারি হ'য়ে রৈ ॥

বারমুখীর ব্যাকুলতা দেখিয়া কাঙ্গালের ঠাকুর আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। কথিত আছে, রাত্রিতে রঙ্গনাথ স্বপ্নযোগে সেবককে বলিলেন, "বারমুখীকে অবিলম্বে এখানে আনয়ন কর। সে স্বয়ং আমার অঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত করিবে।" তাহাই হইল। বারমুখী আসিয়া রঙ্গনাথের অঙ্গে অলঙ্কার পরাইল।

পঞ্চবটীর তলায় বসিয়া পরমহংসদেব ভাবাবেশে অনেক সময়ে এই মর্ম্মের একটী গান গাহিতেন, "আমি জগচ্চন্দ্রের হার পরেছি, আমার ভূষণের কি বাকী আছে রে !!!" যিনি সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, যিনি সকল মণির শ্রেষ্ঠ মণি, তাঁহাকে যখন বারমুখী হৃদয়ে ধারণ করিল, গলার হার ও নয়নের মণি করিল, তখন পৃথিবীর ধনরত্নাদি তাহার কাছে তুচ্ছ বোধ হইল। গৃহের যাবতীয় দ্রব্যাদি দীনদুঃখীদিগকে বিলাইয়া সে হরিনাম সার করিল। সে একটী তুলসীকানন প্রস্তুত করিল এবং দীর্ঘকেশপাশ ছেদন-পূর্ব্বক দীনহীন বেশে সেই তুলসীকাননে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রবৃত্ত হইল।

"এই পাপ দেহে আর কিবা প্রয়োজন ?
এই বলি দীর্ঘ কেশ করিলা ছেদন ॥"

বারবনিতা বারমুখীর এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে গ্রামবাসীদিগের চিত্ত বিচলিত হইল। পাপীর জীবনে হরিলীলা দেখিয়া তাহারা হরিপরায়ণ হইল এবং মানব-হৃদয়ে হরিনামের অদ্ভুত প্রভাব দর্শনে তাহারা হরিনাম গানে মগ্ন হইল।

শ্রীঅনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী।

তিব্বত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)।

তিব্বতের কোন কোন অংশে বন্য ঘোটক দেখা যায়। ইহারা বনমধ্যে দল বাঁধিয়া বিচরণ করে। ইহাদিগকে ধরিতে গেলে ভীত হইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করে এবং দৌড়িতে দৌড়িতে বহু দূরে প্রস্থান করে। তিব্বতীয় বন্য ঘোটকের গাত্রের বর্ণ রক্তাক্ত ধূসর, পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ এবং কেশর এত দীর্ঘ যে, প্রায় ভূমি স্পর্শ করে।

তিব্বতের বন্য ঘোটক ধরা বড় কঠিন, তজ্জন্য উহাদিগকে ধরিবার জন্য কেহ চেষ্টাও করে না

তিব্বতে পার্ব্বত্য টাটু ঘোড়া নামক এক জাতীয় ঘোড়া পাওয়া যায়। ইহারা পার্ব্বত্য ছাগের ন্যায় দ্রুতবেগে পর্ব্বতে উঠিতে পারে। তিব্বতীয়গণ এই টাটু ঘোড়ার পৃষ্ঠে মাল বোঝাই করিয়া, তদুপরি তাহাদিগের মধ্যে একজন উপবেশন করে এবং একজন ইহার পুচ্ছদেশ ধারণ করিয়া ঝুলিতে থাকে; ইহার এতই বল যে, এইরূপ ভারাক্রান্ত হইয়াও ইহা দ্রুতপদে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে থাকে।

তিব্বতে বন্য গর্দ্দভ দেখা যায়। ইহা দেখিতে অশ্বতরের ন্যায়। ইহার পৃষ্ঠের বর্ণ ধূসর, কিন্তু বক্ষের লোম শ্বেতাভ। ইহারাও বন্য ঘোটকের ন্যায় দল বাঁধিয়া বিচরণ করে। প্রতি দলে দশটী হইতে পঞ্চাশটী পর্য্যন্ত গর্দ্দভ দেখা যায়! ভয় পাইলে ইহারা একত্রে দৌড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু কিছু দূর গিয়া দণ্ডায়মান হয়, এবং পরে ভয়প্রদর্শকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়!!

বন্য মেষ তিব্বতের আর একটী পশু। তিব্বতীয় বন্য মেষ আকারে প্রায় গোবৎসের ন্যায়। ইহাদের প্রায় তিন হাত লম্বা শৃঙ্গ হইয়া থাকে। প্রস্থে এই শৃঙ্গ এত বড় যে, ইহার মধ্যে শৃগাল-শাবক থাকিতে পারে। মৃত বন্য মেষের শৃঙ্গ বনমধ্যে বহুদিন পড়িয়া রহিয়াছে, তৎপরে তাহার ভিতরে শৃগাল-শাবক বাস করিতেছে, এরূপ দেখা গিয়াছে। ইহাদের গাত্রের বর্ণ শ্বেতাভ, পুচ্ছদেশ অতি ক্ষুদ্র। ইহারা বিশ ত্রিশ হাত উচ্চ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া থাকে। ইহাদের দৃষ্টি, শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ। প্রতি দলে পাঁচ হইতে ত্রিশটী পর্য্যন্ত মেষ দেখা যায়। তিব্বতের গৃহপালিত মেষ দ্রব্যাদি বহন করিয়া থাকে। একটী মেষ বার চোদ্দ সের পর্য্যন্ত ওজনের দ্রব্যাদি বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। মেষগুলি যদি কখনও পথভ্রষ্ট হয়, মেষ-পালকের বংশীধ্বনি শুনিলেই তাহার নিকট পুনরাগমন করে। আবার মেষপালকের সঙ্গে যে কুকুর থাকে, তাহার সহিত মেষগুলির বিশেষ সখ্য জন্মে। কোন একটী মেষ বহুদূরে চলিয়া গেলে, মেষপালকের কুকুর তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে, অনেক সময় এরূপ দেখা গিয়াছে। তিব্বতের মেষের পশমে তিব্বতীয়গণ বস্ত্র প্রস্তুত করে এবং ঐ পশম বিদেশেও রপ্তানি করে।

তিব্বতীয় মহিলাগণ খর্ব্বকায়। তিব্বতে পাঁচ ফিটের অধিক দীর্ঘকায়া মহিলা প্রায় দেখা যায় না। পুরুষগণের মধ্যেও পাঁচ ফিট চারি ইঞ্চি অপেক্ষা দীর্ঘকায় ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তিব্বতের লোকদিগের মুখের প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহাদিগের নাসিকা চ্যাপ্‌টা, চক্ষু ক্ষুদ্র, গণ্ডদেশের অস্থি অস্বাভাবিক রূপে উচ্চ, ওষ্ঠদেশ স্থূল, কর্ণ দীর্ঘ ও স্থূল, কেশ কৃষ্ণ-

বর্ণ, এবং শরীরের গঠন প্রায় চতুষ্কোণাকৃতি এবং শ্রীবিহীন।
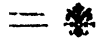
পুরুষগণ পশমের পা-জামার উপর পশমের লম্বা কোট পরিধান করে। কোমরে কোমরবন্দ এবং মস্তকোপরি টুপি ব্যবহার করিয়া থাকে। কোমরবন্দের মধ্যে একটী ছুরিকা, তামাকের থলি, ধূম্রপান করিবার জন্য নল, টাকা পয়সার থলি এবং বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় স্বরূপ মন্ত্র যন্ত্রাদি রক্ষিত হয়। কোটের পকেটে কিছু পশম থাকে, কেননা পথে বাহির হইলে তিব্বতবাসী পশম হইতে বস্ত্র প্রস্তুত কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। কেহ কেহ পকেটে কিছু আহার্য্য দ্রব্যও রাখিয়া থাকে। তিব্বতীয় পুরুষগণ চীন দেশীয় পুরুষদিগের মত মস্তকে দীর্ঘকেশ রক্ষা করে এবং তাহা বেণীর আকারে বন্ধন করিয়া থাকে।

তিব্বতীয় স্ত্রীলোকগণ পুরুষদিগের ন্যায় পাজামা পরিধান করে, কিন্তু ইহা পদ অপেক্ষা দুই হাত অধিক দীর্ঘ করিয়া প্রস্তুত করা হয় এবং এই অতিরিক্ত অংশ টুকু স্তরে স্তরে ভাঁজ করিয়া পদদেশের উপরিভাগে রক্ষা করা হয়। এরূপ পরিচ্ছদ সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক, তিব্বত মহিলাগণের ইহাই ধারণা। পাজামার উপর ইহারা কামিজ ব্যবহার করে এবং তদুপরি জ্যাকেট্‌ পরিধান করিয়া থাকে। পৃষ্ঠের উপর একখণ্ড মেষচর্ম্ম বিলম্বিত থাকে, কিন্তু কোনও উৎসবের সময় আঙ্‌রাখার ন্যায় একখানি বস্ত্র দ্বারা সমস্ত দেহ আবৃত করে। চর্ম্মনির্ম্মিত পাদুকাই ইহাদিগের অধিকতর প্রিয়। তিব্বতীয় মহিলাগণ মাসান্তে একবার মাত্র কবরী বন্ধন করে, তখন তাহার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে হয়। দশ হস্ত লম্বা একখণ্ড চর্ম্মনির্ম্মিত রজ্জুই কবরীর প্রধান উপকরণ। উহা কাচ, পিত্তল ও রৌপ্যনির্ম্মিত বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত। কেশের সহিত এই রজ্জুখণ্ড এরূপে বিনাইয়া কবরী বন্ধন করা হয় যে, অলঙ্কারগুলি কেশের সহিত মিলিত হইয়া শোভা পাইতে থাকে। সুন্দররূপে কবরী বন্ধন করা তিব্বতীয় যুবতীগণের জীবনের একটী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। বিবিধ প্রকার কর্ণাভরণ, হস্তাভরণ ও কণ্ঠাভরণ দ্বারাও ইহারা আপনাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া থাকে।

তিব্বতীয়গণ বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র গাত্র ধৌত করে। অত্যধিক শীতই ইহার কারণ। গাত্রবস্ত্র যত দিন না জীর্ণ হইয়া গলিত হয়, ততদিন এক বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অপর বস্ত্র পরিধান করে না। কিন্তু এই প্রকার শারীরিক অপরিষ্কারতার জন্য তাহাদের স্বাস্থ্যের কোনও হানি হয় না। তিব্বতীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘজীবী। স্ত্রীলোকেরা সচরাচর এরূপ বলশালিনী যে, প্রায় একমণ ওজনের দ্রব্যাদি পৃষ্ঠোপরি গ্রহণ করিয়া পর্ব্বতোপরি অনায়াসে আরোহণ করিতে পারে।

প্রস্তর ও রৌদ্রদগ্ধ ইষ্টক দ্বারা তিব্বতের

অধিকাংশ গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তিব্বত-পরিব্রাজিকা এক ইংরাজ মহিলা স্বপ্রণীত ভ্রমণবৃত্তান্তে একজন সঙ্গতিপন্ন তিব্বতী বাটীর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—"বাটীটি ত্রিতল। প্রথম তল প্রস্তরনির্ম্মিত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল রৌদ্রদগ্ধ ইষ্টকে নির্ম্মিত। প্রকোষ্ঠগুলি বাতায়ন দ্বারা সুশোভিত এবং এক একটী বাতায়নের সম্মুখে উপবেশনার্থ স্থান আছে। শীতকালে রৌদ্র সেবন জন্য সে স্থানগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। কাষ্ঠ এত দুষ্প্রাপ্য যে, লোকে তাহা কেবল মাত্র রন্ধন জন্য ব্যবহার করিতে পারে। কাষ্ঠের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু অগ্নি সেবন দ্বারা শীত নিবারণের নিয়ম এখানে দেখা যায় না। শীত নিবারণ জন্য প্রত্যেক বাটীতে রৌদ্র সেবনোপযোগী উন্মুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রকোষ্ঠগুলি বৃহৎ; পার্ব্বত্য বৃক্ষশাখা দ্বারা ছাদ এবং কর্দ্দম ও পার্ব্বত্য শ্বেত কঙ্করে গৃহের মেজে সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত। বাটীর ছাদের উপর একটী মন্দির দেখিলাম। এই মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধদেবের দুই তিনটী মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। বুদ্ধদেব উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, এইরূপ ভাবে মূর্ত্তিগুলি গঠিত হইয়াছে। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে সহস্রবাহু একটী দেবী মূর্ত্তি এবং অন্যান্য কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিলাম। মূর্ত্তিগুলির সম্মুখে একটী টেবল—তাহার উপর সাতটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। কুড়াটি পিত্তলনির্ম্মিত পাত্রে চাউল রক্ষিত হইয়াছে। ইহা দেবদেবীগণকে ভোগস্বরূপ প্রত্যহ প্রদত্ত হইয়া থাকে। যে সকল বাটীর ছাদের উপর মন্দির নাই, তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহটী মন্দিররূপে ব্যবহৃত হয়। তিব্বতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বা কৃষকদিগের বাসগৃহ প্রায় দ্বিতল; প্রথম তলস্থ প্রকোষ্ঠগুলিতে বিবিধ শস্য ও পশ্বাদি রক্ষিত হয় এবং দ্বিতীয় তলে গৃহস্বামী সপরিবারে বাস করেন। শীতকালে শীতের প্রচণ্ডতা জন্য তিব্বতীয়গণ দ্বিতলস্থ বা ত্রিতলস্থ প্রকোষ্ঠগুলিতে রাত্রে শয়ন করে না।

তিব্বতীয়গণ আহার করিতে বিশেষ পটু। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই জলযোগ করে, তৎপরে দিবাভাগে ও রাত্রে ছয় সাত বার আহার করিয়া থাকে। দুগ্ধ, মাখন, দধি, পনীর, যবের ময়দার রুটী ও চা ইহাদের প্রধান আহার্য্য দ্রব্য। তিব্বতে চাঙ্ নামক এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়; তিব্বতবাসিগণ তাহা পান করিতে বড় ভাল বাসে। মাখন পুরাতন হইলেই তিব্বতীয়দিগের নিকট অতি উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হয়। বিশ ত্রিশ বৎসরের পুরাতন মাখন সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; ষাট বৎসরের পুরাতন মাখনও দেখা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেই পুরাতন মাখন রক্ষিত হয়। বিশেষ ভোজ, উৎসব ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে বন্ধুভোজন সময়ে এ প্রকার পুরাতন মাখন ব্যবহৃত হয়।

ইহা দুর্গন্ধবিশিষ্ট; বিদেশীয়গণের পক্ষে ইহা অতি কদর্য্য পদার্থ।"

চীন দেশ হইতে ইষ্টকের আকারে চা তিব্বতে আমদানি হয়। চা তিব্বতীয়দিগের প্রধান পানীয়। সকালে চা, মধ্যাহ্নে চা, রাত্রে চা। তিন বার চা পান না করিলে তিব্বতবাসীর মস্তকে বেদনা হয়, সে অস্থির হইয়া পড়ে, কিছুতেই আরাম পায় না। তিব্বতবাসী চার সহিত মাখন ও লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করে। চার উপর যখন মাখন ভাসিতে থাকে, তখন তিব্বতবাসী মনে করে যে, চা ঠিক্ প্রস্তুত হইয়াছে। চার প্রতি তিব্বতবাসীর প্রগাঢ় অনুরাগ; তজ্জন্যই বোধ হয় ধনী তিব্বতবাসী মণি মুক্তা দ্বারা খচিত চা-পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। তিব্বতের গবর্ণমেণ্ট চার প্রসার বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী। নিয়ম আছে প্রত্যেক বিভাগের শাসনকর্ত্তাকে বৎসরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চা বিক্রয় করিতে হইবে। এই নিমিত্ত শাসনকর্ত্তারা নিয়ম করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, প্রত্যেক গৃহস্থকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে চা ক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু দরিদ্র তিব্বতবাসীদের সম্বন্ধে শাসনকর্ত্তৃগণ এরূপ কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন না, ইহা তাহাদিগের পরম ভাগ্য।

(ক্রমশঃ)।

অনুযোগ।

(ভগবানের প্রতি)

আমি শত দোষী শ্রীচরণে
তাই দেব! চরণে ঠেলিলে?—
তোমা বিনা কোথা আর, কিছু নাই এ দীনার,
সবি বোঝ—এই টুকু
বুঝিতে নারিলে?

২

বোঝ নাথ, অনন্ত জগতে
কেন সৃষ্টি কেন স্থিতি লয়;
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-হিয়া, গড়িয়াছ ইচ্ছা দিয়া,
কেবলি গড়নি হায়!
আমারি হৃদয়?

অথবা
গড়িয়াছ ভীষণ অশনি,
গড়িয়াছ কুসুম কোমল,
সকলি কাজের তরে, গড়িয়াছ চরাচরে,
আমারেই গড়িয়াছ
নিতান্ত নিষ্ফল!

৪

জগতের সকলি তোমার,
সকলের তুমি, দয়াময়!
আমি কি এতই পর, নাহি বাড়ী নাহি ঘর,
নাহি কি তোমারো কোলে
স্নেহের আশ্রয়?

উদাসীন বিদেশীর মত
চলি যাব দুই দিন পরে ;
দিলে না শরীরে শক্তি, দিলে না হৃদয়ে ভক্তি,
দিলে না অমৃত নাম
ডাকিতে আদরে !

৬

শুনিয়াছি তুমি শান্তিদাতা,
শুনিয়াছি তুমি প্রাণারাম,
আমারে যে আশীবিষ দংশিতেছে অহর্নিশ,
কেমনে রয়েছ ভুলে
লভিছ আরাম ?

৭

সত্য নাথ ! পাপমতি আমি
অধম, অক্ষম দুরাশয়,
তাই কিগো পায়ে দলে, তুমিও যাইবে চলে,
এই কি করুণাসিন্ধু,
অনাথ-আশ্রয় ?

৮

দেখিয়াছি মানব-জননী,
কুসন্তানে কোল দেন পাতি,
সে দয়া যে মহামূল্য, সে ক্ষমা ধরণী-তুল্য,
সে হৃদয়ে নাহি ক্ষোভ,
নাহি দিন রাতি !

৯

মাতৃস্নেহ তব স্নেহে গ'ড়া,
তাই যদি হয় এত দূর,
তোমার ও ভালবাসা, পূর্ণ যাহে বিশ্ব-আশা,
না জানি সে কি উদার
কত ভরপুর !

১০

তবে মোরে "নরাধম" জানি
উপেক্ষিয়া রয়েছ কেমনে ?
দাও পুণ্য, দাও আলো, শান্তি-সুধা বুকে ঢালো,
জুড়াও সকল জ্বালা
প্রেম বিতরণে।

শ্রীমা—

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

(৪৪৭ সংখ্যা—৩৯৭ পৃষ্ঠার পর)।

আবার পরমহংসদেবের কথা পড়িল।

ডাক্তার। ইনি (পরমহংস দেব) দেখছি কালীরই উপাসক।

মাষ্টার। তাঁর কালী মানে আলাদা। বেদে যাঁরে পরব্রহ্ম বলে, তিনি তাঁকে কালী বলেন। তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না, এক দেখেন। পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী যাঁকে ব্রহ্ম বলে গেছেন, যোগীরা যাঁকে আত্মা বলেন, ভক্তেরা যাঁকে ভগবান্ বলেন, পরমহংসদেব তাঁকেই কালী বলেন। তাঁর কাছে শুনেছি একজনের একটী গামলা ছিল, তাতে রঙ ছিল।

কারো কাপড় ছোপাবার দরকার হলে তার কাছে যেত। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিত "তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও?" লোকটী যদি বল্‌ত সবুজ রঙ, তা হলে কাপড়খানি গামলার রঙে ডুবয়ে ফিরয়ে দিত এবং বলিত "এই নাও তোমার সবুজ রঙে ছোপান কাপড়।" যদি কেহ বল্‌ত লাল রং, তা হলে সেই একটী গামলায় কাপড় খানি ছুবিয়ে বল্‌ত "এই নাও তোমার লালে ছোপান কাপড়।" সেই এক গামলার রঙে সবুজ, লাল, নীল, হলদে সব রংয়ের কাপড় ছোপান হ'ত। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে একজন লোক বল্‌লে, বাপু আমি কি রং চাই বল্‌ব? "তুমি নিজে যে রংয়ে ছুপেছ, আমায় সেই রং দাও।" সেইরূপ পরমহংসদেবের ভিতর সব ভাব আছে, সব ধর্ম্মের সব সম্প্রদায়ের লোক তাঁর কাছে শান্তি পায় ও আনন্দ পায়। তাঁর যে কি ভাব, কি গভীর অবস্থা, তা কে বুঝবে?

ডাক্তার। All things to all men! তাও ভাল নয়, although St. Paul says it.

মাষ্টার। পরমহংসদেবের অবস্থা কে বুঝবে? তাঁর মুখে শুনেছি, সূতার ব্যবসা না করলে ৪০ নং সূতা আর ৪১ নং সূতার প্রভেদ বুঝা যায় না। Painter না হলে painter এর art বুঝা যায় না। মহাপুরুষের গভীর ভাব। Christ এর ন্যায় না হলে Christ এর সব ভাব বুঝা যায় না। পরমহংসদেবের এই গভীর ভাব হয়তো Christ যা বলেছিলেন তাই, Be perfect as yourFather in heaven is perfect. তোমার স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ, তুমি তেমনি পূর্ণ হও।

ডাক্তার। যা'হোক, পরমহংসের সেবা শুশ্রূষা কিরূপ হয়?

মাষ্টার। প্রত্যহ এক একজন superintend করেন, যাঁদের বয়স বেশী। কোন দিন গিরিশ বাবু, কোন দিন রাম বাবু, কোন দিন বলরাম বাবু, কোন দিন সুরেশ বাবু, কোন দিন নবগোপাল, কোন দিন কালী বাবু এই রকম।

এই সকল কথা হইতে হইতে পরমহংসদেব শ্যামপুকুরে যে বাড়ীতে চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বাড়ীর সম্মুখে ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া লাগিল। তখন বেলা ১টা হইয়াছে। দোতালার ঘরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বসিয়া আছেন। অনেকগুলি ভক্ত সম্মুখে উপবিষ্ট, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, শরৎ ইত্যাদি। সকলের দৃষ্টি সেই মহাযোগী সদানন্দ মহাপুরুষের দিকে। সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় রোজার সম্মুখে বসিয়া আছে। অথবা বরকে লইয়া বরযাত্রীরা যেন আনন্দ করিতেছে। ডাক্তার ও মাষ্টার প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ডাক্তারকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন "আজ বেশ ভাল আছি।"

ক্রমে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[পণ্ডিতসঙ্গে তত্ত্ববিচারে]।

(Science ; পণ্ডিত ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু পণ্ডিতে কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে! ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা ক'র্‌লে আমার একটী অবস্থা হয়। তখন পরণের কাপড় পড়ে যায়, শিড়্ শিড়্ ক'রে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কি একটা উঠে। তখন সকলকে তৃণ জ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যদি দেখি বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, তা হ'লে তাকে খড় কুটো মনে হয়। রামনারায়ণ ডাক্তার আমার সঙ্গে তর্ক কর্‌ছিল, হঠাৎ সেই অবস্থাটা হলো। তার পর তাকে বল্লুম, 'তুমি কি বল্‌ছো, তাঁকে তর্ক করে কি বুঝবে, তাঁর সৃষ্টিই বা কি বুঝবে। তোমার ত ভারি তেঁতে বুদ্ধি।" আমার অবস্থা দেখে সে কাঁদতে লাগলো, আর আমার পা টিপ্‌তে লাগলো।

ডাক্তার। রামনারায়ণ ডাক্তার হিন্দু কি না। আবার ফুল চন্দন লয়। সত্য হিন্দু কি না!

মাষ্টার। (স্বগতঃ) ডাক্তার কিন্তু শাঁক ঘণ্টায় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) বঙ্কিমের* সহিত দেখা হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, "মানুষের কর্ত্তব্য কি?" তা বল্লে 'আহার নিদ্রা আর ইন্দ্রিয়ভোগ!' এই রকম কথাবার্ত্তা শুনে আমার ঘৃণা হলো। বল্লুম যে, তোমার এ কি রকম কথা! তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া, যা সব রাত দিন ক'র্‌ছো, আর কাজে ক'র্‌ছো, তাই মুখ দিয়ে বেরুচ্চে। মূলো খেলেই মূলোর ঢেকুর উঠে। তার পর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হলো, ঘরে সংকীর্ত্তন হলো। আমি আবার নাচলুম। তখন বল্লে, আমাদের সেখানেও ভক্ত আছে, দেখবেন? আমি হাসিতে হাসিতে বল্লুম, কি রকম ভক্ত আছে গো? 'গোপাল' 'গোপাল' 'হরি হরি' যা বলেছিল, সেই রকম ভক্ত নাকি?

ডাক্তার। 'গোপাল' 'গোপাল' সে ব্যাপারটা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ ভণ্ড সাধুবেশধারী সেকরার গল্প বলিলেন "গোপাল" "গোপাল" কথার অর্থ খরিদদারেরা গোরুর পাল এবং "হরি হরি"র অর্থ ইহাদের ধন হরণ করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেজ বাবুর সঙ্গে আর এক জায়গায় গিয়েছিলুম, অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার কর্‌তে এসেছিল। আমি তো মুখ্যু, তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে, আর আমার সঙ্গে কথা করে বল্লে, "মহাশয়! আগে যা পড়েছি, সে সব পড়া বিদ্যা, তোমার সঙ্গে কথা করে সব থু হয়ে গেল। এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান্ হয়, বোবার কথা ফুটে

* ৺, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথমাবস্থায় যেরূপ থাকুন, শেষে ধর্ম্মানুরাগী হইয়া এবং বিশেষরূপে ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া নিজে ধর্ম্মাচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বা, বো, স।

(ঈশ্বরের আবির্ভাব ও "মূর্খের" কণ্ঠে সরস্বতী)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের কি অভাব থাকে? দেখ না, আমি ত মুখ্যু, আমি ত কিছুই জানি না, তবে এসব কথা বলে কে? আবার এ জ্ঞানের ভাণ্ডার ক্ষয় হয় না। এদেশে ধান মাপে, "রামে রাম" "রামে রাম" এই সব বল্‌তে বল্‌তে। একজন মাপে, 'আর কই ফুরিয়া আসে আসে, এমন সময় আর একজন রাশ ঠেলে দেয়। তার কর্ম্মই ঐ, ফুরালেই রাশ ঠেলে।' আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়া আসে আসে হয়, মা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন। ছেলেবেলাই অবির্ভাব হয়েছিল। ১১ বছর বয়সের সময় মাঠের উপর কি দেখলুম। সবাই বলে, বেহুঁস হয়ে গিছলুম, কোন সাড় ছিল না। সে দিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর এক-জন দেখতে লাগলুম। যখন ঠাকুর পূজা করতে যেতুম, হাত টা অনেক সময়ে ঠাকুরের দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আস্‌তো, আর ফুল মাথায় দিতুম। যে ছোকরা সঙ্গে থাক্‌তো, সে আমার কাছে আস্‌তো না, বল্‌তো, তোমার মুখে কি এক জ্যোতিঃ দেখছি, তোমার বেশী কাছে যেতে ভয় হয়।

(যন্ত্রারূঢ়)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমিতো মুখ্যু, আমি কিছু জানি না, তবে এ সকল বলে কে? আমি বলি, "মা, আমি যন্ত্র—তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর—তুমি ঘরণী, আমি রথ—তুমি রথী, যেমন করাও—তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন চালাও—তেমনি চলি; নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ।" তাঁরই জয়, আমিতো কেবল যন্ত্র মাত্র। শ্রীমতী (রাধা) যখন সহস্রধারা কলসী নিয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুও পড়ে নাই, সকলে তাঁর প্রশংসা কর্‌তে লাগল, বল্লে, এমন সতী হবে না। তখন শ্রীমতী বল্লেন, "তোমরা আমার জয় কেন গাও, বল কৃষ্ণের জয়, কৃষ্ণের জয়। আমি তাঁর দাসী মাত্র।" আমি ঐ অবস্থায় বিজয়ের বুকে পা দিলুম, কিন্তু এ দিকে ত এত বিজয়কে ভক্তি করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি?

ডাক্তার। তার পর সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাত যোড় করে) আমি কি করবো, সেই অবস্থাটী এলে আমি বেহুঁস হয়ে যাই। নিজে কি করি, কিছুই জান্‌তে পারি না।

ডাক্তার। সাবধান হওয়া উচিত, হাত যোড় কর্‌লে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন কি আমি কিছু কর্‌তে পারি? তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর? যদি ঢং মনে কর, তা হইলে তোমার সায়েন্স (Science) সব ছাই পড়েছ।

ডাক্তার। মহাশয়! যদি ঢং মনে করি, তা হলে কি এত আসি? এই দেখ, সব

কাজ ফেলে এখানে আসি, কত রোগীর বাড়ী যেতে পারি না, আর এখানে এসে ছয় ঘণ্টা সাত ঘণ্টা ধরে থাকি।

("ন যোৎস্যে"—ভগবদ্গীতা)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেজ বাবুকে বলেছিলাম, তুমি মনে করো না, তুমি একটা বড় মানুষ, আমায় মানচো বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলুম। তবে তুমি মানো আর নাই মানো, একটী কথা আছে,—কিন্তু মানুষ কি করবে, তিনিই মানাবেন। ঈশ্বরের শক্তির কাছে মানুষ খড়কুটো।

ডাক্তার। মানুষের কি স্বাধীনতা নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে আর কি বলছি! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ কি করবে? অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বললেন, আমি যুদ্ধ করতে পারবো না, জ্ঞাতি বধ করা আমার কর্ম্ম নয়। কৃষ্ণ বল্লেন, অর্জ্জুন! তোমায় যুদ্ধ ক'রতেই হবে। কৃষ্ণ সব দেখিয়ে দিলেন, এই সব লোক মরে রয়েছে!

"শিখেরা ঠাকুরবাড়ীতে এসেছিল—তাদের মতে অশ্বত্থ গাছে যে পাতা নড়ছে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়—তাঁর ইচ্ছা বই একটী পাতাও নড়বার যো নাই।"

[Librety or Nectssity ; Free will or God's will.]

ডাক্তার। যদি সব ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে তুমি বকো কেন? লোকদের জ্ঞান দেবার জন্য অত কথা কও কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলাচ্ছেন, তাই বল্‌ছি। আমি যন্ত্র—তিনি যন্ত্রী।

ডাক্তার। যন্ত্রতো বল্‌চো, হয় তাই বল, নয় চুপ করে থাকো, সবই ঈশ্বর।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মশাই! যা মনে করেন, করুন; কিন্তু তিনি করান তাই করি—a single step against the Almighty will কেউ কি যেতে পারে?

[Infineuce of Motives.]

ডাক্তার। Free will তিনিই দিয়েছেন ত। আমি মনে ক'ল্লে ঈশ্বর চিন্তা করতে পারি, আর না করলে না করতে পারি।

গিরীশ। আপনার ঈশ্বর চিন্তা বা অন্য কোন সৎকাজ ভাল লাগে ব'লে করেন। আপনি করেন না, সেই ভাল-লাগাটা করায়?

ডাক্তার। কেন, আমি কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলে করি।

গিরীশ। সেও কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করতে ভাল লাগে বলে।

ডাক্তার। (গিরীশের প্রতি) মনে কর, একটী ছেলে পুড়ে যাচ্ছে, তাকে বাঁচাতে যাওয়া কর্ত্তব্যবোধ—

গিরীশ। ছেলেটী বাঁচাতে আপনার আনন্দ হয়, তাই আগুনের ভিতর যান, আনন্দ আপনাকে নিয়ে যায়। চাটের লোভে গুলি খাওয়া। (সকলের হাস্য)।

(জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কর্ম্ম করতে গেলে আগে একটী বিশ্বাস চাই,—সেই সঙ্গে জিনিষটী

মনে করে আনন্দ হয়—তবে সেই ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটীর নীচে এক ঘড়া মোহর আছে—এই জ্ঞান—এই বিশ্বাস প্রথমে চাই, ঘড়া মনে করে সেই আনন্দ হয়—তার পর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তার পর ঘড়ার কাণা দেখা যায়, তখন আরও আনন্দ বাড়ে। এই রকমে ক্রমে ক্রমে আনন্দ আরও বাড়তে থাকে। আমি নিজে ঠাকুর বাড়ীর বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখেছি—সাধু গাঁজা তয়ের কচ্ছে, আর সাজতে সাজতে আনন্দ!

ডাক্তার। কিন্তু আগুণ heat (উত্তাপ) দেয়, আর light (আলো)ও দেয়। আলোতে দেখা যায় বটে, কিন্তু উত্তাপে গা পুড়ে যায়। duty (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) কর্‌তে গেলে কেবল যে আনন্দ হয় তা নয়, কষ্টও আছে।

মাষ্টার। (গিরীশের প্রতি) পেটে খেলে পিটে সয়। কষ্টেতে আনন্দ।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মহাশয়! duty (কর্ত্তব্যকর্ম্ম) শুষ্ক।

ডাক্তার। কেন?

গিরীশ। তবে সরস (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার। বেশ dilemma, এইবার লোকে গুলি খাওয়া এসে পড়্‌লো।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) সরস—নচেৎ duty কেন করেন?

ডাক্তার। এইরূপ মনের iuclination (মনের ঐ দিকে গতি)।

মাষ্টার। (গিরীশের প্রতি) পোড়া স্বভাবে টানে। (হাস্য)। যদি inclinationই হলো, তবে free will কোথায়?

ডাক্তার। আমি free (স্বাধীন) একবারে বল্‌ছি না। গরু খুঁটোতে বাঁধা আছে, দড়ী যতদূর যায়, ততদূর free; তারপর দড়ি টান পড়লে আবার—

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও free will.)

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই উপমা যদু মল্লিকও বলেছিল। (ছোট নরেনের প্রতি) একি ইংরাজীতে আছে?

(ডাক্তারের প্রতি) দেখ, ঈশ্বর সব কর্‌ছেন, তিনি যন্ত্রী—আমি যন্ত্র। এ বিশ্বাস যদি কারো হয়, সে ত জীবন্মুক্ত। তোমার 'কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।' কি রকম জানো? বেদান্তের একটা উপমা আছে—"একটা হাঁড়ীতে ভাত চড়িয়েছে, আলু, বেগুন সব ভাতে দিয়েছে, খানিক পরে আলু, বেগুন, চাল লাফা'তে থাকে, যেন অভিমান ক'র্‌ছে, আমি নড়ছি, আমি লাফা'চ্ছি। ছোট ছেলেরা দেখলে ভাবে, আলু, বেগুন, পটল ওরা বুঝি জীয়ন্ত, তাই লাফাচ্ছে। যাদের জ্ঞান হয়েছে তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুন, পটল এরা জীয়ন্ত নয়, নিজে নিজে লাফাচ্ছে না; হাঁড়ীর নিচে আগুন জ্বল্‌ছে, তাই ওরা লাফাচ্ছে। যদি কাঠ টেনে লওয়া যায়, তা হ'লে আর নড়ে না।" জীবের আমি কর্ত্তা, এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান্; জ্বলন্ত কাট টেনে নিলে সব চুপ। পুতুল নাচের

পুতুল বাজীকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে পড়ে গেলে: আর নড়ে না চড়ে না। যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, যতক্ষণ সেই পরশমণি ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ আমি কর্ত্তা এই ভুল থাকবে; ততক্ষণ আমি সৎকাজ ক'রেছি, আমি অসৎকাজ করেছি, এই সব ভেদ থাকবেই থাকবে, এ ভেদ বোধ হয় তাঁরই মায়া —তাঁর মায়ার সংসার চালাবার জন্য বন্দোবস্ত। বিদ্যা মায়া আশ্রয় করলে, সৎপথ ধ'রলে, তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁকে যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই এই মায়া পার হয়ে যেতে পারে। তিনি একমাত্র কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, এ বিশ্বাস যার, সেই জীবন্মুক্ত। এ কথা আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) Free will কেমন ক'রে আপনি জানলেন?

ডাক্তার। Reason (বিচার) এর দ্বারা নয়—I feel it! আমি অনুভব করি।

গিরীশ। then I and others feel it to be the reverse (আমরা সকলে ঠিক উল্টো বোধ করি, আমরা বোধ করি যে আমরা পরতন্ত্র)। (সকলেরহাস্য)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার। Duty কর্ত্তব্যের ভিতর দুটো element (জিনিষ) আছে—(১) Duty বলে কর্ত্তব্য করতে যাই; (২) পরে আহ্লাদ হয়। কিন্তু initial Stage এ (গোড়াতে) আনন্দ হবে বলে যাই না।

মাষ্টার। (স্বগত) পরে আনন্দ হয়, কি সঙ্গে সঙ্গে মনে করে আনন্দ হয়, বলা বড় কঠিন আনন্দের জোরে কার্য্য হলে free will কোথায় থাকে?

(অহৈতুকী ভক্তি)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। উনি (ডাক্তার) যা বলছেন, তার নাম অহৈতুকী ভক্তি। মহেন্দ্র সরকারের কাছে আমি কিছু চাই না —কোনও প্রয়োজন নাই, তবু মহেন্দ্র সরকারকে দেখতে ভাল লাগে—এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি। একটু আনন্দ হয় তা কি করবো? অহল্যা বলেছিলেন, "হে রাম! যদি শূকরযোনিতে জন্ম হয়, তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি থাকে— আমি আর কিছুই চাই না" নারদ রাবণ বধের কথা স্মরণ করাবার জন্য অযোধ্যায় রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি সীতারাম দর্শন ক'রে স্তব করতে লাগলেন। রামচন্দ্র স্তবে তুষ্ট হয়ে বল্লেন, "নারদ! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি কিছু বর লও।" নারদ বল্লেন, "রাম, যদি একান্ত আমায় বর দেবে, তবে এই বর দাও, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।" রাম বল্লেন, "আর কিছু বর লও।" নারদ বল্লেন, "আর কিছুই আমি চাই না, কেবল চাই তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি।"

এঁর তাই। যেন ঈশ্বরকে শুধু দেখতে চায়,—আর কিছু ধন, মান, দেহ-সুখ চায় না। এর নাম শুদ্ধা ভক্তি।

আনন্দ একটু হয় বটে, কিন্তু সে বিষয়ের আনন্দ নয়; ভক্তির—প্রেমের আনন্দ। শম্ভু (মল্লিক) বলেছিল, যখন আমি তার বাড়ীতে প্রায় যেতুম, 'তুমি এখানে এস, অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে আনন্দ পাও—ঐ টুকু আনন্দ আছে।'

তবে ওর উপর আর একটা অবস্থা আছে। বালকের মত যাচ্ছে, কোন ঠিক নাই, হয়ত একটা ফড়িঙ্গ ধর্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তের প্রতি) এঁর (ডাক্তারের) মনের ভাব কি বুঝ্ছো? ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা হয়, 'হে ঈশ্বর, আমায় সৎ ইচ্ছা দাও, যেন অসৎ কাজে মতি না হয়।'

আমারও ঐ অবস্থা ছিল। একে দাস্য বলে। আমি "মা" "মা" ব'লে এমন কাঁদতুম যে, লোক দাঁড়িয়ে যেতো। আমার এই অবস্থার পর, আমাকে ভিড়াবার জন্য আর আমার 'পাগলামি' সারাবার জন্য তারা একজন বেশ্যা এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল,—দেখ্তে সুন্দর, ভাল চোক। আমি মা মা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, আর হলধারীকে ডেকে দিয়ে বল্লুম, "দাদা, দেখবে এসো, ঘরে কে এসেছে।" হলধারীকে আর সব লোককে বলে দিলাম। এই অবস্থায় মা মা বলে কাঁদতাম, কেঁদে কেঁদে বল্তুম, মা! রক্ষা কর, মা! আমায় নিষ্পাপ কর, মা যেন সৎ থেকে অসতে মন না যায়।

(ডাক্তারের প্রতি): তোমার এ ভাবত বেশ—ঠিক্ ভক্তির ভাব, দাস্য ভাব।

(জগতের উপকার না কর্ম্ম ত্যাগ?)

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি কারো শুদ্ধসত্ব (গুণ) আসে, সে কেবল ঈশ্বর চিন্তা ক'রে, তার আর কিছু ভাল লাগে না। কেউ কেউ প্রারব্ধের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধ সত্বগুণ পায়। কামনাশূন্য কর্ম্ম ক'রতে চেষ্টা ক'র্লে শেষে শুদ্ধসত্ব লাভ হয়। রজো মিশান সত্ব গুণ থাক্লে ক্রমে নানা দিকে মন যায়, তখন আমি জগতের উপকার কর্বো এই অভিমান এসে জোটে। জগতের উপকার এই সামান্য জীবের পক্ষে ক'রতে যাওয়া বড় কঠিন। তবে যদি পরোপকারের জন্য কামনাশূন্য হয়ে কর্ম্ম করে, তাতে দোষ নাই—একে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। এরূপ কর্ম্ম ক'র্তে যাওয়া খুব ভাল। সকলেরই কর্ম্ম করতে হবে; দু একটী লোক কর্ম্ম ত্যাগ ক'রতে পারে। দু একজন লোকের শুদ্ধসত্ব গুণ দেখ্তে পাওয়া যায়। এই নিষ্কাম কর্ম্ম ক'রতে ক'রতে রজো মিশান সত্বগুণ ক্রমে শুদ্ধ সত্ব হয়ে দাঁড়ায়। শুদ্ধসত্ব হলেই ঈশ্বর লাভ হয়।

সাধারণ লোকে এই শুদ্ধসত্বের অবস্থা বুঝতে পারে না। হেম আমায় বলেছিল, "কেমন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, জগতে মান লাভ করাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। কেমন?"

দিল্লী-দরবার

প্রথম স্তবক।

(১)

কি আনন্দ হেরি আজি ধরাতলে,
রাজা প্রজা সবে মিলি দলে দলে,
ধাইছে উল্লাসে দিল্লীর পানে ;
হয়েছে সম্রাট এড্বার্ড সুজন,
অভিষেক-দামা বাজিছে সঘন,
আনন্দ উচ্ছ্বাস বহে একটানে।

(২)

দিল্লীতে আজিকে বিরাট ব্যাপার !
যোজন ব্যাপিয়া যজ্ঞের আগার,
বৃটীশ গৌরব—হোমের তরে ;
হয়নি হবে না ভারতে কখন,
যজ্ঞেশ্বর হোতা লরড কর্জ্জন,
দেখিবে সকলে নয়ন ভরে।

(৩)

এস মা ভারতি ! এই যজ্ঞস্থলে,
বীণা করে শ্বেত কমলের দলে,
বীণার ঝঙ্কারে মাতাও সবে ;
আশীষ ভক্তেরে করগো জননি,
দিল্লী যজ্ঞকাণ্ড লিখিবে লেখনী,
এ সাধ দাসের পূরাতে হবে।

(৪)

কোথা লঙ্কা—কোথা অযোধ্যা নগর,
বধি রক্ষকুল জয়ী রঘুবর,
বাল্মীকি গাইয়া অমর হয় ;
সে বাসনা কভু নাহি করি মনে,
দুই চারি পংক্তি লিখিব যতনে,
গাইব আনন্দে বৃটীশ জয়।

(৫)

এস রে মার্কিন অষ্ট্রিয়া প্রুসিয়া,
ইতালী জর্ম্মণ ফরাসী রুসিয়া,
সুপ্রাচীন চীন জাপান ভাই ;
এস রে তাতার কাবুল দুর্জ্জয়,
আরব পারস তুরস্ক নির্ভয়,
এসরে সকলে দিল্লীতে যাই।

(৬)

গ্রীক ওলন্দাজ এস দিনেমার,
বীর-ধুরন্ধর সাহসী বুয়ার,
এসরে সকলে যজ্ঞের স্থলে ;
আসিয়া সার্থক কররে নয়ন,
কবে কোথা হয় হেন আয়োজন ?
অদ্ভুত ব্যাপার অবনীতলে !

(৭)

এস ভারতের রাজন্য নিচয়,
মান অভিমান ভুলি সমুদয়,
ভারত-সম্রাটে পূজরে আসি ;
আজি ভারি ভিড় দিল্লীর সহরে,
এস ঢালি দেহ উৎসাহ-লহরে,
মীন দলসম আনন্দে ভাসি।

(৮)

এস দেশী ভাই ডাকি বারংবার,
কাশ্মীর পঞ্জাব বীরত্ব আধার,
যোধ-জয়পুর চিত্তোর শূর ;
পাতিয়ালা ঝান্সী মিরট দুরন্ত,
নাছোড় নিজাম অতি বলবন্ত,
এসরে চলিয়ে উদয়পুর।

(১০)

এস মহিশূর মান্দ্রাজ বোম্বাই,
কলিঙ্গ গুর্জ্জর এসরে সবাই,
আশাম বর্‌মা এসরে চলে ;
কর্ণাট দ্রাবিড় বেহার উৎকল,
এস বঙ্গবাসী হ'য়ে কুতূহল,
দ্বীপবাসী ভাসি সাগর-জলে।

(১১)

এস এস শীঘ্র নেপাল ভুটান,
আসিবে না কিহে করি অভিমান ?
এস ত্বরা করে এ দিল্লী ধামে ;
স্বাধীনতা সূত্র নাহিক টুটিবে,
ইংরাজ আদর যতন করিবে,
দেখ রাজসূয় ইংরাজ নামে।

(১২)

এস শিখ গুর্খা মোগল পাঠান,
হিন্দু আর্য্যজাতি যবন খ্রীষ্টান,
যে যেথায় আছ এসরে চলে ;
এস ভীল কোল অসভ্য বর্ব্বর,
দূর হতে দেখ যজ্ঞ মনোহর,
কল্পনা-কিরণে যাওরে গলে।

(১৩)

এস রাজ্ঞী মাতা পূজ্যা ভিক্টোরিয়া,
সন্তান-উৎসবে আনন্দে ভাসিয়া,
স্বরগ হইতে দেখগো এসে ;
মঙ্গল কামনা ধরিয়া অন্তরে,
আশীষ করিবে তব পুত্রবরে,
পাশেতে দাঁড়াও অভয়া বেশে।

(১৪)

এস আলবার্ট, হের গো নয়নে,
তব পুত্র আজ মাতৃ-সিংহাসনে,
সসাগরা ধরা করের তলে ;
সুখের পয়োধি উঠে উছলিয়া,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসা ত্রিলোক ভরিয়া,
তোমার সঞ্চিত পুণ্যের বলে।

(১৫)

জজ ম্যাজিষ্ট্রর ব্যারিষ্টর যত,
উকিল মোক্তার কূট তর্কে রত,
দোকানী পশারি এসরে চলে ;
নিরীহ কেরাণী শিক্ষক বেচারা,
দৈনিক মজুর আত্মসুখে হারা,
বিদ্যালয় হতে পাঠক দলে।

(১৬)

এস ধন্বন্তরী আপদ-বারণ,
চৌদিকে সহস্র ভয়ের কারণ,
এস শীঘ্র করে যজ্ঞের স্থলে ;
বিকট বদন পীড়া অগণন,
চারি দিকে সবে করে আক্রমণ,
বাঁচাও সবায় ভেষজ বলে।

(১৭)

এস লবে তাঁর যত অনুচর,
আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্বে দর্শন প্রখর,
য়ুনানী মতের পণ্ডিত দলে,
আসুরিক যত চিকিৎসকগণ,
ঝাঁজাল ঔষধ শমন-দমন,
দাওরে ঢালিয়া রোগীর গলে।

(১৮)

হিন্দু দেশে যজ্ঞ হইছে যখন,
হিন্দু দেবে কবি করে আবাহন—
এস গণপতি বিপদ-হর ;
এস গো মা দুর্গে দুর্গতি-হারিণী,

সদলে সাজিয়ে অসুর-নাশিনী,
যজ্ঞের মঙ্গল বিধান কর। ১৮

এস সাহিত্যিক বাণীর নন্দন,
প্রতিভার পুত্র স্বভাব-ভূষণ,
এস চিত্রকর তুলিকা করে;
দেখ মহাযজ্ঞ বিরাট ব্যাপার,
আঁক চিত্র তার চারু চমৎকার,
মোহিত হইবে যতেক নরে।১৯

এস ইতিবৃত্ত-লেখক নিচয়,
খোল পুস্তকের পত্র সমুদয়,
লেখ যজ্ঞকাণ্ড যতন ক'রে;
সময় তরঙ্গে যাবে না ভাসিয়া,
দিল্লী যজ্ঞ-স্মৃতি রহিবে জাগিয়া,
কর্জনের কীর্ত্তি বসুধা পরে।২০

রাজভক্ত মোরা ভারত-নন্দন,
চল সবে যাই যজ্ঞের ভবন,
রাজভক্তি সবে দেখাই গিয়ে;
কি আছে মোদের দিব উপহার,
গরিব আমরা নাহি কিছু আর,
ভকতি কুসুম অঞ্জলি নিয়ে। ২১

এস হরিপ্রিয়া কমলবাসিনি,
পেচক বাহনে এস গো জননি,
ভারত ডাকিছে কাতর হয়ে;
বহুদিন হ'তে সাগরের পারে,
গিয়াছ চলিয়া ছাড়িয়া তাঁহারে,
ধন ধান্য তব সঙ্গেতে লয়ে।২২

অনাহারে সব সন্তান তাঁহার,
অস্থি-চর্ম্ম-সার, করে হাহাকার,
অন্ন দানে সবে বাঁচাও প্রাণে;
এস যদি হেথা দেখো একবার,
কেমন হইছে বিরাট ব্যাপার,
দিল্লীর সহরে যজ্ঞের স্থানে।২৩

দ্বিতীয় স্তবক।

দুন্দুভি বাজিল—বাজে জয় ঢাক,
গুড়ুম গুড়ুম কামানের ডাক,
কাঁপিল মেদিনী, সিহরে নর;
দিগঙ্গনাগণ দিল করতালি,
চারি দিকে শোভে সৌন্দর্য্যের ডালি,
ইন্দ্রপুরী সম যজ্ঞের ঘর।২৪

চারি দিকে উড়ে বিজয় কেতন,
ইংরাজের গর্ব্ব অখণ্ড শাসন,
গগণে থাকিয়া প্রচার করে;
আসিল মাতঙ্গ তুরঙ্গ নিচয়,
হ্রেষা বৃংহিধ্বনি করে সমুদয়,
বুঝি বা বসুধা যায় বিদরে।২৫

দাঁড়াইল সৈন্য কাতারে কাতার,
রবি-করে করে অপূর্ব্ব বাহার,
ঝক্ মক্ করে অসির গায়;
সমরের খেলা কৌতুক-দর্শন,
সপক্ষের মহা আনন্দ-কারণ,
বিপক্ষে দেখিয়া দমিয়া যায়।২৬

শকটে শকটে আসিছে মানব,
হেরিতে উৎসুক দিল্লীর উৎসব,
নবীন উদ্যম হৃদয়ে জাগে;
এ উহারে বেশে হারাইতে চায়,
চারু পরিচ্ছদ পরিয়াছে গায়,
সবে চায় যায় সম্মুখ ভাগে।২৭

আবার কামান করিল হুঙ্কার,
দিল্লীর সহর ধূমে ধূমাকার,

হয় হস্তিপদে উঠিল ধূলি ;
গগন ছাইল, আঁধার হইল,
গাড়ীর ঘর্ঘরে চৌদিক্ পূরিল,
মানুষ যাইল বিশ্রাম ভুলি ।২৮

শত শত তাম্বু চারু পট্টবাস,
শিবির সহর পায় পরকাশ,
দেখিতে সুন্দর মানস হরে ;
মাঝে মাঝে পথ—ফুলের বাগান,
নন্দন কাননসম হয় জ্ঞান,
বিহরে পবন সৌরভ ভরে ।২৯

চারিদিকে রেল ছুটেছে বিস্তর,
যাত্রী দলে দলে পশিছে ভিতর,
টেলিগ্রাফ তার সদাই চলে ;
নাচ গান বাদ্য কতই হইছে,
আমোদ তরঙ্গ উথলি উঠিছে,
জীবন্ত দিল্লীর মত্ততা বলে ৩০

কেলনার আদি পেলিটীর দল,
খুলেছে দোকান—মুখে আসে জল,
জনম সার্থক বাবুরা করে ;
করে হুড়াহুড়ি ব্যগ্রতা বিস্তর,
ছোটে যেন শ্রাদ্ধ-বাড়ীর ভিতর,
অর্থ নাশে ব্যস্ত বাঙ্গালী মরে ৩১

চারিদিকে ফিরে প্রহরী নিচয়,
নিয়ম ভঙ্গেতে পলকে প্রলয়,
হুঁসিয়ার ভারি কার্য্যের বশে ;
সঙ্গীন রাখিয়া কাঁধের উপর,
ধীর পদক্ষেপে যজ্ঞের চত্বর,
ঘুরিছে ফিরিছে দেখিছে দশে ।৩২

মূর্ত্তিমান কাল শোভিছে কামান,
গোলা রাশি রাশি পর্ব্বত প্রমাণ,
দেখিলে আতঙ্কে হৃদয় কাঁপে ;
কোন্ জাতি হেন আছেরে ভূতলে,
বাধা দিতে পারে ইংরাজের বলে ?
সবাই ত্রাসিত বৃটীশ দাপে ।৩৩

শিল্প-প্রদর্শনী হয়েছে হেথায়,
ভারতের শিল্প দেখায় সবায়,
মেডেল ডিপ্লোমা অনেকে পাবে ;
উন্নতির পথ হবে পরিষ্কার,
ভারত উদ্ধার হইবে এবার,
কর্জন মহিমা সকলে গাবে ।৩৪

কর্জন-কামিনি ! ধন্য গো তোমায়,
যজ্ঞ সুসম্পন্ন তোমারি কৃপায়,
সকলি তোমার যতন তরে ;
পতিসহ নাম রহিবে তোমার,
দিল্লী যজ্ঞ কথা স্মরণে সবার,
চির-কীর্ত্তিস্তম্ভ অবনী পরে ।৩৫

ক্রিষ্ট্যাল প্যালেশে ব্রফ বাজিকর,
দেখিল স্বপন অতি মনোহর,
কুবের তাহাকে দিবেন ধন ;
তাই তারে আজি করি নিমন্ত্রণ,
ভারতের কর্ত্তা ডাকেন কর্জন,
আতশে সবার হরিতে মন ।৩৬

মাষ্টার মেকেঞ্জী শ্বেত চিত্রকর,
আঁকিতে দিল্লীর চিত্র মনোহর,
উপনীত হল প্রফুল্ল মনে ;
বিলিয়ার্ড বীর রবার্টস্ জন,
দর্শকের মন করিতে হরণ,
খেলায় ডাকিছে মানবগণে ।৩৭

এই কিরে সেই ইন্দ্রপ্রস্থ ধাম,
মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ নাম,

ষ্টির যজ্ঞ যথায় করে ?
পঞ্চনদ যাঁর ধর্ম্মের প্রভায়,
মোহিত ভারত পুলকিত-কায়,
গেয়েছিল জয় আনন্দ ভরে ?৩৮

এই কিরে সেই পুরী মনোহর,
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশী বাজিত ঝাঁজর,
চূতের পল্লব শোভিত দ্বারে ;
শুভ পূর্ণকুম্ভ মঙ্গল লক্ষণ,
রম্ভাতরুসহ শোভিত তখন,
সে সব এখন দেখাই কারে ?৩৯

এখন শোভার ব্যবস্থা নূতন,
দেবদারু পত্র শোভে অগণন,
ক্রকেট ক্রোটেন মানস হরে ;
দেশীয় পদ্ধতি গিয়াছে রে চলে,
লাল শালু আর বিলাতী কম্বলে,
মিটাইছে ক্ষোভ ভারত নরে !!৪০

সদাব্রত হেথা খুলেছে কর্জন,
উপাধি বিলান মনের মতন,
বাঙ্গালী কাঙ্গালী নাচিছে তায় ;
ভারত-রাজন্য বৃথা গর্ব্বে রত,
চাহিয়া রয়েছে চাতকের মত,
কখন বাঞ্ছিত উপাধি পায়। ৪১

ভারত-সন্তান ! কি আছে তোমার ?
কাক-দেহে বৃথা পুচ্ছের বাহার,
বৃথা অভিমানে জনম গেল !
সার্থক জনম, সার্থক জীবন,
উপাধি রতন পাইলে যখন,
স্বর্গ যেন সদা হাতেতে এল !৪২

ভা'য়ে ভা'য়ে দ্বন্দ্ব করিছ যখন,
কি হবে উপাধি পাইলে তখন,
বড় হবে তুমি ছোটর কাছে ?
ঘরে মরে ভাই—খেতে নাহি পায়,
তার প্রতি তব দয়া নাহি ধায়,
কিসের গুমর তোমার আছে ?৪৩

এই কিরে সেই দিল্লীর সহর,
নাদির তৈমুর যাহার উপর,
বিজয় বাসনা অন্তরে লয়ে,
সজোরে দুয়ারে আঘাত করিল,
ভীষণ হুঙ্কারে গগন ফাটিল,
পুরবাসিগণ ত্রাসিত ভয়ে।৪৪

এই কিরে সেই দিল্লীর ভবন ?
কোথা গেল আজি ময়ূর-আসন,
অতীত মোগল যশোগৌরব ?
কোথা হুমাউন, কোথায় বাবর,
কোথা সহৃদয় ধীর আকবর,
কালের আবর্ত্তে ডুবেছে সব !!৪৫

সেই দিল্লী এই প্রাচীন নগরে,
কত রাজবংশ রাজধানী ক'রে
জগতে প্রসিদ্ধি লভিল ভাই ;
তাইত ইংরাজ হেথায় এমন
করিয়াছে মহাযজ্ঞ আয়োজন,
চলরে সকলে দেখিতে যাই।৪৬

একবার হেথা দিল্লীর সহরে,
মহাত্মা লিটন রাজসূয় করে,
সমবেত হ'ল রাজার দল ;
ভিক্টোরিয়া রাণী 'সাম্রাজ্ঞী' হইল,
ভীষণ কামান গর্জন করিল,
স্থাবর জঙ্গম কাঁপিল জল।৪৭

সার্ব্বভৌম রাজা ইংরাজ হইল,
বশ্যতা স্বীকার সকলে করিল,

বহুরত্নরাজি নজর দিয়া ;
জয় ইংরাজের—ইংরাজের জয়,
বাজিল দুন্দুভি কি ভয় কি ভয় ?
পুলকে পূরিল সবার হিয়া।৪৮

রাজ-প্রোসেসন্ দেখ চক্ষু ভরে,
বাহিরিল পথে ধুমধাম করে,
কনট কর্জন শোভিছে তায় ;
সজ্জিত মাতঙ্গ সার দিয়া চলে,
রত্ন আভরণ গায় সব জ্বলে,
ভূপতি নিচয় পশ্চাতে ধায়।৪৯

কি বাহার আজ দিল্লীর সহরে,
দেখিতে তামাসা ছাদের উপরে,
নর নারী সব আসিল ছুটে ;
ভারতের প্রজা রাজ-দরশন
করিছে আগ্রহে পুণ্যের কারণ,
হৃদয়ে আনন্দ ফোয়ারা ফুটে ৫০

কেহ ছুটে আসে মুখের আহার
ফেলিয়া পশ্চাতে নামেতে রাস্তার,
কেহ শিশু কোলে উন্মত্তপ্রায় ;
অর্দ্ধপরিহিত পরিচ্ছদ কার,
মহা শশব্যস্ত হাজারে হাজার,
দিল্লীর ব্যাপার কহিব কায় ?৫১

সকলি দুর্ম্মূল্য যজ্ঞের হ্যাপায়,
গাড়ী রোজ হাঁকে চল্লিশ টাকায়,
গাড়োয়ান মনে মুর্ম্ম ভাবে ;
এঁদো বাড়ী কোণা কোণে পড়ে ছিল,
মেরামত গুণে নূতন হইল,
শতেক টাকায় হাজার পাবে।৫২

নাদিল কামান দুন্দুভি বাজিল,
জ্যাক ইউনীন পবনে খেলিল,
"হিপ্ হিপ্ হুরো" আকাশে ধায় ;
জয় ইংরাজের—ইংরাজের জয়,
জয় কর্জনের—কর্জনের জয়,
সম্রাটের জয় সবাই গায়।৫৩

গ্যাসের আলোকে তাড়িত প্রভায়,
পরাজিত দিবা কোথায় লুকায়,
চিনের লণ্ঠন চৌদিকে জ্বলে ;
আলোকে অক্ষর কিবা মনোহর,
মনোগ্রাম লেখা তাহার ভিতর,
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অবনীতলে।৫৪

তৃতীয় স্তবক।

আগেতে ভারত ছিল রাজরাণী,
স্থবিরা এখন মুখে নাহি বাণী,
কাঙ্গালিনী বেশে মৃতের প্রায় ;
দেখ গো তাঁহারে সম্রাট ধীমান,
বিমাতারে যেন ক'রনাক জ্ঞান,
তোমার সুযশ সকলে গায়।৫৫

খোল খোল নৃপ অতীতের দ্বার,
দেখিতে পাইবে সমস্ত ব্যাপার,
সময়ে ভারত কেমন ছিল ;
ছিল তাঁর ধন রত্ন আভরণ,
শত শত পুত্র হৃদয়-ভূষণ,
বিধাতা হায় গো কাড়িয়া নিল।৫৬

রাজ-প্রতিনিধি ধীমান কর্জন,
তোমারি যতনে যজ্ঞের সৃজন,
তোমারি সুনাম সবাই গায় ;
ভারত ছাড়িয়া যাইবে যখন,
রেখে যেও কীর্ত্তি চির-স্থায়ী ধন,
জীবন চঞ্চল তড়িতপ্রায়।৫৭

সম্রাট এড্বার্ড ধীর মহামতি,

আলেক্‌জ্যান্ড্রিনা মহা পুণ্যবতী,
দয়াল দম্পতী ভারত-রাজ ;
সসাগরা ধরা সাম্রাজ্য বিশাল,
রবি না গুড়ায় কিরণের জাল,
তারি অধীশ্বর তোমরা আজ ।৫৮

কি ছার অসার রত্ন সিংহাসন,
প্রজার হৃদয়ে পাত গো আসন,
বিমল আনন্দ ভুঞ্জিবে মনে ;
সে আনন্দে নাই বিভাগ কখন,
তস্করে না পারে করিতে হরণ,
পুণ্যের লক্ষণ সবাই গণে ।৫৯

সুসম্পন্ন হ'ল যজ্ঞ অভিনয়,
জয় ইংরাজের—ইংরাজের জয়,
কৃতার্থ হলেন কর্জন ভবে ;
গর্জ্জিল কামান উড়িল নিশান,
সৈন্য কোলাহলে উঠিল তুফান,
জয় সম্রাটের গাইল সবে । ৬০

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ

সাক্ষীগোপাল

বেঙ্গল নাগপুর লৌহবর্ত্মের যে শাখা খুর্দা হইতে পুরী গিয়াছে, তাহাতে সাক্ষী-গোপাল নামে একটি ষ্টেশন আছে। সাক্ষীগোপাল নামে স্বনাম-খ্যাত গ্রামে শ্রীকৃষ্ণের একটি সুন্দর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত মুরলীধারী দণ্ডায়মান বিগ্রহ আছে। এরূপ বড় ও সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি না কি ভারতবর্ষের আর কোনও স্থানে—এমন কি মথুরা বৃন্দাবনেও নাই। ষ্টেশন হইতে গ্রাম নিকট, এক মাইলের মধ্যে ; পদব্রজে যাইতে হয়। গাড়ী পাল্কী প্রভৃতি কোনও প্রকার যান নাই। ষ্টেশনের ধারে অর্থগৃধ্নু পাণ্ডার দৌরাত্ম্য নাই, গ্রামে অবশ্য আছে। অন্যান্য তীর্থস্থানের মত ভিখারীও এখানে আছে ; কিন্তু পুরীতে ইহারা একটি পাই পয়সার জন্যও যে পরিমাণ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া থাকে, এখানে তাহা করে না।

আমরা অতি প্রত্যুষে কলিকাতা হইতে পুরীর যাত্রীর গাড়ীতে সাক্ষীগোপাল ষ্টেশনে পৌছিলাম। তথায় কুলী নাই, সুতরাং যেমন ফরসা হইল, অমনি দ্রব্যাদি বহিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিলাম। যাইতে যাইতে একমাত্র পণ্য দ্রব্য—গোঁড়া পোড়া চূণের একটি ক্ষুদ্র কারখানা ও অবগুণ্ঠনাবৃতা কতকগুলি বাঙ্গালী অন্তঃ-পুরিকা যাত্রী দেখিলাম। প্রতিদিন লোক প্রতি ৵০ আনা হিসাবে একটি ঘর ভাঁড়া করিয়া দ্রব্যাদি রাখিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া মন্দির ও বিগ্রহ দর্শনে বহির্গত হইলাম। সাক্ষীগোপালের নামে যে বৃহৎ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত, তাহার নাম চন্দন পুষ্করিণী ; ইহাতে বিস্তর মৎস্য আছে। পথ অতি পরিষ্কৃত। এক ধারে জমি-দারের—পুরীর রাজার—পাকা কাছারী বাড়ী। উহার চারি দিকে ও রাস্তার দুই পার্শ্বে নারিকেল প্রভৃতি বিটপীরাজি

স্তম্ভসদৃশ দণ্ডায়মান থাকিয়া বিস্তৃত শাখা-রূপ চন্দ্রাতপ ধারণ করিয়া রবি-রশ্মিকে দূরপরাহত করিয়া রাখিয়াছে; ফাঁকে ফাঁকে স্থানে স্থানে দুই একটি নিস্তেজ বাণ পতিত হইতেছে মাত্র। রাস্তার দুই ধারে আহার্য্য এবং পূজার প্রসাদ ও পুষ্পের দোকান। পুরীর মত এখানেও উৎকৃষ্ট ও সুলভ সুপক্ব মর্ত্তমান রম্ভা পাওয়া যায়। একটি বৃহৎ তোরণ ও নহবৎখানা দিয়া পাকা প্রাঙ্গণে নাতি উচ্চ সাক্ষীগোপালের মন্দির অবস্থিত। উহা জগন্নাথের মন্দিরের আদর্শে নির্ম্মিত। উহার মত অবরোহণ ও অধিরোহণের জন্য চূড়া হইতে অপেক্ষা-কৃত জীর্ণ শৃঙ্খল লম্বমান রহিয়াছে। তথাকার মত মন্দিরাভ্যন্তর তমসাচ্ছন্ন; দিনমানে প্রদীপ জ্বালিয়া মূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। কিন্তু এখানে অন্ন ব্যঞ্জন প্রসাদের প্রথা আদৌ নাই। তৎপরিবর্ত্তে পুরী, মালপো, ঘৃত ও সুজিতে উপাদেয় লাড্ডুর ভোগের ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের চারিদিকে অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির ও ভোগঘর আছে। একটি কুণ্ডে পুষ্পাদি সমেত চরণামৃত আসিয়া পড়িতেছে। যাত্রিগণ তথা হইতে চরণামৃত গ্রহণ করিয়া থাকে। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন মন্দিরের জীর্ণসংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। পুরী জেলার সর্ব্বত্র যেরূপ, এখানেও সেইরূপ প্রাচীনকালের কলঙ্ক, এখানেও মন্দিরের গাত্রে অশ্লীল মূর্ত্তি সকল দেখিয়া লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। এখানকার পাণ্ডাগণ দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, সুতরাং কিছু শান্তস্বভাব। ইহাঁরা বলেন যে, যাত্রী ধরিতে যাওয়া নিষিদ্ধ। আমার বিবেচনায় বড় বেশী লোকে সাক্ষীগোপাল দেখিতে যায় না বলিয়াই তাঁহারা এই কথা রাষ্ট্র করিয়াছেন এবং আপনারাও যাত্রী ধরিতে ষ্টেশনে যান না।

আমাদিগের বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে আঁস্তাকুড়ের দুর্গন্ধে ভূত পলায়, অথচ দ্বারদেশে কেহ একটু জল ফেলিয়াছিল বলিয়া বৃদ্ধা খড়্গহস্ত হইয়াছিল ঘাটে পথে চারি ধারে ময়লা। ইহাতেই এখানকার লোকের স্বাস্থ্যের দিকে কিরূপ দৃষ্টি, তাহা বুঝা যায়। এ সকলের সংস্কার পক্ষে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিপাত আবশ্যক।

শ্রীন—

ঈশ্বরের নামাবলী।

(৪৭২ সংখ্যা—২৬০ পৃষ্ঠার পর)।

ধ।

ধন, ধনাধিপ, ধনদাতা, ধনাধ্যক্ষ, ধনিক, ধনী, ধন্য, ধন্যদেব, ধন্যবাদার্হ, ধন্বন্তরি, ধরণীধর, ধরণীশ্বর, ধরাধরধর, ধর্ত্তা, ধর্ম্ম, ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মময়, ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মপথ-প্রদর্শক, ধর্ম্মবলদাতা, ধর্ম্মবিধাতা, ধর্ম্ম-

সংস্থাপক, ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মাধর্ম্মাতীত, ধর্ম্মাধিকরণ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাবহ, ধর্ম্মোৎসাহদাতা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, ধব, ধবলযশঃ, ধাতা, ধাত্রী, ধারক, ধারয়িতা, ধাবনশীল, ধাম, ধিষণাধীশ, ধীমান্, ধীস্বরূপ, ধীপ্রদাতা, ধীর, ধুনক, ধুরন্ধর, ধুরীয়, ধৃতিমান, ধৃতিবিধাতা, ধৈর্য্যশীল, ধৌতকারী, ধ্যাত, ধ্যানলভ্য, ধ্যানাতীত, ধ্যেয়, ধ্রুব, ধ্রুবজ্যোতি, ধ্রুবলক্ষ্য, ধ্রুবসত্য, ধ্বজ, ধ্বান্তারি।

ন।

নক্ষত্রেশ, নগেন্দ্রাধিপ, নটবর, নটেশ্বর, নতবন্ধু, নতোন্নততম, নদী-লহরী-বিহারী, নদীনেশ, নধর, নধাম, নন্দন, নব, নবধাভক্তিলভ্য, নব, নবরূপধর, নবরসবিধাতা, নবীন, নভোব্যাপী, নভোঽতীত, নমস্য, নভোধীশ, নয়ন জ্যোতি, নয়নের নয়ন, নয়নরঞ্জন, নরকারি, নরকবারণ, নরকোদ্ধারণ, নরেশবল্লভ, নরনাথ, নরাধমতারণ, নরোত্তম, নাকনাথ, নাগরচূড়ামণি, নাট্যাচার্য্য, নাট্যশালাধিপ, নাথ, নাথনাথ, নাভিস্থল, নামদাতা, নায়ক, নারায়ণ, নাবিক, নাশক, নাস্তিক-দমন, নাস্তিকনিরাশ, নিকট, নিকটতম, নিকর, নিকাম, নিকায়, নিগম, নিগূঢ়, নিটুট, নিত্য, নিত্যকাম, নিত্যধাম, নিত্যনব, নিত্যসত্য, নিত্যানন্দ, নিত্যোঽনিত্যানাং, নিদান, নিদিধ্যাসনলভ্য, নিদেষ্টা, নিদ্রারূপিণী, নিদ্রাহীন, নিধান, নিধি, নিপুণ, নিয়তি-বন্ধু, নিয়তি-বিধাতা, নিয়ন্তা, নিয়ামক, নিযুঞ্জান, নিযোক্তা, নিয়োজক, নিরংশ, নিরংশী, নিরঞ্জন, নিরতিশয়, নিরতিশয়মহান্, নিরব্যয়, নিরপায়, নিরপেক্ষ, নিরয়ত্রাতা, নিরব, নিরবচ্ছিন্ন, নিরবদ্য, নিরবধি, নিরবয়ব, নিরবলম্বন, নিরবশেষ, নিরশন, নিরাকার, নিরাকাঙ্ক্ষ, নিরাকৃতি, নিরাতঙ্ক, নিরাপদ, নিরাবাধ, নিরাময়, নিরালম্ব, নিরাশী, নিরাশ্রয়, নিরাহার, নিরিন্দ্রিয়, নিশি-দিবা-প্রহরী, নিরীক্ষক, নিরুক্ত, নিরুপম, নিরুপাখ্য, নিরুপাধি, নিরূপক, নির্গুণ, নির্গুণগুণী, নির্জ্জর, নির্ঝর, নির্দ্দেশক, নির্দ্দোষ, নির্দ্দ্বন্দ্ব, নির্দ্ধারক, নির্নিমেষ, নির্ব্বাণদাতা, নির্ভয়, নির্ভীক, নির্ভরস্থল, নির্ভুল, নির্মদ, নির্মম, নির্ম্মল, নির্ম্মাতা, নির্ম্মাল্যপূজিত, নির্ম্মৎসর, নির্মুক্ত, নির্লিপ্ত, নির্বর্ত্তক, নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশঙ্ক, নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বাহক, নির্ব্বিষয়, নির্বৃত, নির্বৃতিকারণ, নিলয়ন, নিবিড়, নিশাবেদী, নিশ্চয়, নিশ্চল, নিশ্চিত, নিশ্চিন্ত, নিশ্চেষ্ট, নিষ্কল, নিষ্কাম, নিষ্কৃতিদাতা, নিষ্ক্রিয়, নিষ্ঠ, নিষ্পত্তিকারক, নিষ্পাদক, নিষ্পাপ, নিসর্গাতীত, নিঃস্ব-বন্ধু, নিঃস্বার্থ, নিস্তারণ, নিস্তারকর্ত্তা, নিস্তল, নিস্তারিণী, নিস্ত্রৈগুণ্য, নিস্পৃহ, নিহিত, নীতিবান্, নীতিবিদ্, নীরজঃ, নীরব, নীরুক্, নুতিপাত্র, নূতন, নূতনবিধিদাতা, নৃত্ন, নৃপ, নেতা, নেতিনেতি, নেত্রবিহীন, নেত্রাঞ্জন, নৈকট্যবন্ধন, নৈধানী, নৈমিত্তিক, নৈসর্গিকবিধানকর্ত্তা, নোদক, নৌকা, ন্যস্তধনরক্ষক, ন্যায়ী, ন্যায্যফলদাতা, ন্যায়কারী, ন্যায়সিন্ধু, ন্যায়ান্যায়বিচারক, ন্যূনাতিরেকরহিত।

কুমারী কবের অভিনন্দন।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ মনস্বিনী কুমারী ফ্রান্সিস কব অশীতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, তদুপলক্ষে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য ও ধর্ম্ম-পরায়ণ মহোদয় ও মহিলা তাঁহার সম্মানার্থ এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে অল্প কয়েকটীর নাম মাত্র উল্লিখিত হইল। পাশ্চাত্য সভ্য জাতিরা যে এত মহৎ হইয়াছেন, তাহার কারণ এই যে তাঁহারা জানেন কেমন করিয়া গুণীর গুণ গ্রহণ ও মহতের সম্মাননা করিতে হয়। বিশেষতঃ দেশহিতকর কার্য্যে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়া নরনারীর সেবা করিতে করিতে জরাজীর্ণ হইয়াছেন, কেমন করিয়া হৃদয়ের সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের অবসন্ন প্রাণকে বলীয়ান ও সুখী করিতে হয়, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন। এই সহানুভূতি-প্রভাবে ক্ষীণপ্রাণ ব্যক্তিও আবার নববল নবোৎসাহে উত্তেজিত হইয়া সাধ্যাতীত কার্য্য সাধনে সমর্থ হইয়া থাকেন।

কুমারী কব একজন অতি সুপণ্ডিতা ইংরাজ রমণী। তিনি সাধারণ লেখিকা-দিগের মত নাটক নবন্যাস লিখিয়া আপনার বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেন নাই, কিন্তু দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মনীতি এবং ব্রহ্মবিদ্যার অতি গভীর তত্ত্ব সকল আলোচনা করিয়া সারগর্ভ পুস্তক সকল লিখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ সকল পণ্ডিতদিগেরও আলোচ্য ও শিক্ষার স্থল। বস্তুতঃ তিনি আর্য্যা গার্গী মৈত্রেরী প্রভৃতির ন্যায় একজন ব্রহ্মবাদিনী রমণী। তিনি "Alone to the alone" ব্রহ্মযোগ পুস্তক লিখিয়া তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তির প্রমাণ দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় বৈজ্ঞানিক যুগ এবং ধর্ম্মতত্ত্ব অগ্রাহ্য করিয়া অতিরিক্ত বিজ্ঞানালোচনায় মত্ত হইয়া আধুনিক শিক্ষিত লোকগণ জড়বাদী ও পরমার্থপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন, ইহা তিনি বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পুরুষ-জাতির সহিত নারীজাতির সমাধিকার, দরিদ্র দুঃস্থদিগের উন্নতিসাধন জনসমাজের প্রধান কর্ত্তব্য, সমাজের সকল প্রকার কুসংস্কার দূর করিয়া সত্য, ন্যায় ও বিশ্ব-প্রেম প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, অতি উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে এই সকল বিষয়ের আন্দোলন করিয়া তিনি যেমন তাঁহার অসীম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ সহৃদয়তাগুণে সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কুমারী কব ভারতের ব্রহ্মো-পাসক দলের পরম বন্ধু এবং তিনি ভারতবাসীদিগের শুভানুধ্যায়িনী। আমরা তাঁহার বর্ষবৃদ্ধি উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ

করিতেছি এবং তিনি আরও দীর্ঘজীবিনী হইয়া আদর্শ রমণীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে থাকুন ও হৃদয়ের পরম শান্তি উপভোগ করুন, ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

অভিনন্দন-পত্র।

শ্রীমতী ফ্রান্সিস পাওয়ার কব

(৪ঠা ডিসেম্বর—১৯০২)।

আজ আপনার অশীতি বার্ষিক জন্মদিন। আপনার সুদীর্ঘ জীবনের প্রবল বিশ্বহিতৈষণা এবং উচ্চ নৈতিক আকাঙ্ক্ষা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি, সেই জন্য আমাদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এই অভিনন্দন-পত্র আপনাকে প্রদান করিতেছি।

স্ত্রীলোকদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভের অধিকার প্রদানার্থ প্রকাশ্য ভাবে যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম আন্দোলন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আপনি একজন অগ্রণী।

কি শিক্ষা কি অন্যান্য বিষয়ে পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের সমান অধিকার স্থাপন বর্ত্তমান সময়ের একটি বিশেষ লক্ষণ। ইহার সপক্ষে আপনার সতেজ-লেখনী চালিত হইয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছে।

দরিদ্রদিগের জন্য বিদ্যালয় সকল স্থাপন, (ওয়ার্ক হাউস রিফরম) দরিদ্রদিগের কার্য্যালয় সংস্কার ইত্যাদি সামাজিক উন্নতি সাধন কার্য্যেও আপনি একজন অগ্রণী।

ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মনীতি বিষয়ে আপনি বিশদ ভাষায় যে সকল চিন্তাপূর্ণ পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানকালীন সকল ধর্ম্মবাদী এবং দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মত উদার ও সদ্ভাবান্বিত করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু আপনার প্রধান খ্যাতির বিষয় এই যে, মূক বধিরদিগের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আবিষ্করণে আপনি কার্য্যতঃ সর্ব্বপ্রথম। তাহাদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ আপনি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহাদিগের স্বত্বাধিকার ও তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য নৈতিক নিয়মের অমোঘ ভিত্তির উপরে সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহারা আপনাকে ধন্যবাদ করিতে পারে না, কিন্তু আমরা পারি।

আপনার সাধু ভাবে যাপিত জীবনের সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। এ সময় আমাদের এই ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আপনার জীবনে একটু আলোক ও উত্তাপ দান করিতে পারে এবং মৃত্যুর অতীত স্বরকালেও আমরা আপনার সাথী এই জ্ঞান আপনার প্রাণ একটু সবল করিতে পারে, এই আমাদিগের আশা।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল।
বিবি জোসেফাইন বাটলার।
বিবি জেকব ব্রাইট।
প্রিন্সেস ক্রপটকিন।
সাদারল্যাণ্ডের ডচেস্।
এবারডিনের কাউনটেস।
বিবি ফসেট।
হ্যারিফোর্ড ও ম্যাঞ্চেষ্টারের বিসপ।

লর্ড কার্লাইল, লর্ড হবহাউস্। অধ্যাপক জর্জ এডামস্ স্মিথ। গ্রভার ক্লীবল্যাণ্ড (এমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট) ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইলিয়াড।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

প্রথম সর্গ।

এতেক কহিয়া যবে মনোদুখে ডুবি
নীরব হইলা বলী, থেটিস সুন্দরী
উত্তরিলা কাঁদি তবে সম্বোধি বীরেশে—
"হায়রে! যতনে কেন পেলেছিনু তোরে,
অভিশপ্ত যদি হারাতে অকালে বৎস!
তোমা পুত্র ধনে। বুঝিনু এখন সত্য
কুক্ষণেরে বাছা আমি প্রসবিনু তোরে,
তা না হলে হেন ভোগ ঘটিত কি কভু
ভাগ্যফলে তোর? যদিও স্বল্পায়ু বাছা!
ভাগ্য-লিপি তোর, তথাপি যশস্বী যদি
হতিস্ ভূতলে, সহিতাম শোক তোর
প্রবোধি হৃদয়। কিন্তু রে এখন আমি
সুঘন তুষারাবৃত অলিম্পি-শিখরে
বসেন সতত যথা সুরদল-পতি
যোভদেব, নিবেদিতে সমীপে তাঁহার
(জীমূত-ঘটায় চির আনন্দ যাঁহার)
যতেক আহ্লাদ তোর, যাইব আপনি
তোর তরে, তিনি পূরাবেন অবিলম্বে
অভিলাষ তোর। কিন্তু কিছুদিন বাছা!
থাকো অপেক্ষায়, কারণ জিয়াস* দেব
সহ সুরদল গেছেন সম্প্রতি চলি
দূর আর্কিনোসে (ইথিয়োপিয়ানদের
মহা মহোৎসব ক্ষেত্রে হ'তে অধিষ্ঠান।)
দ্বাদশ দিবস অন্তে ফিরিবেন যবে
অলিম্পি-শিখরে দেব, গিয়া আমি তবে
ত্রিদিব-প্রাসাদে তাঁর কাতর বচনে
নিবেদিব সব কথা, নিঃসন্দেহ তিনি
পূরাবেন অবিলম্বে প্রার্থনা মোদের।
এতেক কহিয়া দেবী পশিলা সত্বর
অতল জলধি-জলে। হেথা বীরবর
রহিলা বিমনা শোকে বন্দিনীর তরে।

লজ্জাবতী বসু।

* জিয়াস—যোভদেবের অপর নাম।

শুদ্ধোধন রাজপুত্ররূপে অবতরি,
জুড়াতে পাপের জ্বালা নাশি পাপভার,
নবীন বয়সে গেহ করি পরিহার,
বনে বনে ভ্রমিতেন যতি-বেশ ধরি;
যুগব্যাপী যোগমগ্ন বিটপীর তলে
কঠোর কর্ত্তব্য ব্রতে দেহ করি পাত,
অহিংসা পরমধর্ম্ম করিয়া প্রকাশ,
শান্তির পবিত্র পথ দেখান সকলে;

ভিক্ষু-বেশে দেশে দেশে করিয়া ভ্রমণ
অতি পূত বৌদ্ধধর্ম্ম করিলা প্রচার,
অনার্য্য-সেবিত ধর্ম্মে করিয়া সংহার
সনাতন আর্য্যধর্ম্মে দিতে সিংহাসন ;
প্রবুদ্ধ সে বুদ্ধদেব পরম মহান্
যোগবলে লভেছেন শান্তি নিরবাণ ॥

ফ্রাকৃস্ সোসাইটী।

জাতীয় মহাসমিতি।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহাম্মাদাবাদ* নগরে গত ২৩এ ডিসেম্বর হইতে ৩ দিবস অষ্টাদশ জাতীয় কনগ্রেস মহাসমিতির মহোৎসব হয়। এ বৎসর দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞ প্রায় এক সময়ে ঘটাতে ইহার কার্য্যের ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা ছিল ; কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় তাহা বড় অনুভূত হয় নাই। আহাম্মাদাবাদ এবং দাক্ষিণাত্য-বাসীদিগকে ধন্যবাদ, তাঁহারা অশেষ বিঘ্ন বাধার মধ্যে যথেষ্ট যত্ন, উদ্যম ও অর্থ-ব্যয় করিয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। কনগ্রেসের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান শিল্প-প্রদর্শনী, সামাজিক সভা, এবং ব্রাহ্ম-সম্মিলনী সভার কার্য্যও সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

১। শিল্পপ্রদর্শনী—১৫ই ডিসেম্বর হইতে শিল্পপ্রদর্শনীর কার্য্য আরম্ভ হয়। বরদার গুইকুমার যে বক্তৃতা করিয়া প্রদর্শনী খুলিয়া দেন, তাহা যেমন ওজস্বিনী ও দেশহিতোৎসাহোদ্দীপনী, সেইরূপ সুবিবেচিত ও সারগর্ভ। কয়েক দিন ধরিয়া বহুলোক প্রদর্শনী দর্শন করেন। জয়পুরের বাসন ও কারুকার্য্য, কচ্ছ ও ভোজের স্বর্ণ ও রৌপ্যের খোদাই জিনিষ, আহাম্মদাবাদ, বোম্বাই ও নাগপুরের কলের কাপড়, মান্দ্রাজ ও আহাম্মদাবাদে প্রস্তুত বাতি, সাবান, লাহোরের ক্রিকেট খেলার উপকরণ, ভবনগরের সুন্দর খোদাই কার্য্য ও চিত্র, কলিকাতা হইতে আনীত তৈল-চিত্র, এতদ্ভিন্ন নানা স্থানের আমদানী কার্পেট, বাসন, অলঙ্কার এবং কাষ্ঠ ও প্রস্তরময় দ্রব্য সকল এই প্রদর্শনীর প্রধান দ্রষ্টব্য ছিল।

২। সামাজিক সমিতি—২৪এ ও ২৫এ ডিসেম্বর ইহার অধিবেশনে ৫০টী মহিলা ও প্রায় ১০০০ প্রতিনিধি উপস্থিত হন। পণ্ডিতবর ডাক্তার ভাণ্ডারকার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সুবিজ্ঞতা-পূর্ণ বক্তৃতা করেন। নিম্নলিখিত বিষয় সকল সম্বন্ধে প্রস্তাব ধার্য্য হয় :—

(১) বিধবা বিবাহ, (২) একজাতীয় বিবিধ বর্ণে বিবাহ, (৩) বিবাহ-যোগ্য বয়সের বৃদ্ধি, (৪) বহুবিবাহ নিবারণ, (৫) জষ্টিস রাণাডের স্মৃতি স্থাপন, (৬) বিবাহের ব্যয় হ্রাস, (৭) সমুদ্রযাত্রা,

* এই নগর বহুপূর্ব্বে ভীল দলপতি আশার নগর আশাওয়াল নামে খ্যাত ছিল। ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান আহাম্মদ ইহা জয় করিয়া স্বনামে ইহাকে অভিহিত করেন।

(৮) বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রবর্ত্তন, (৯) নিম্নজাতির অবস্থোন্নতি, (১০) স্ত্রীশিক্ষা, (১১) মাদকতা নিবারণ ও সামাজিক পবিত্রতা সংরক্ষণ, (১২) স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দু সন্তানদিগকে সমাজে পুনর্গ্রহণ, (১৩) প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে স্থানীয় সমাজ-সংস্কার সভা স্থাপন।

দেশহিতোৎসাহী জষ্টিস চন্দ্রাবাকর সামাজিক সমিতির সম্পাদক থাকিয়া কার্য্য সুনির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত কার্য্য সকল সম্পাদনেরও তিনি সুব্যবস্থা করিবেন আমরা সম্পূর্ণ আশা করিতে পারি।

৩। ব্রহ্মোপাসক সম্মিলন—ইহার কার্য্যও দুইদিবস হয় এবং একদিন ডাক্তার ভাণ্ডারকার ও অপর দিন রাও বাহাদুর লাল সঙ্কর উমিয়াসঙ্কর সভাপতির কার্য্য করেন। সভাতে দুইটী বিষয় আলোচিত হয়—(১) বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম কি হিন্দু ধর্ম্মের বিকাশ? (২) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিশিষ্ট উপায়। পরে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল ধার্য্য হয়:—

(১) সম্রাট এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকে আনন্দ প্রকাশ।

(২) রাজা রামমোহন রায়ের (১৯০১ সালে স্থাপিত) স্মৃতি-কমিটীর সহিত ভারতীয় সকল ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মের সহকারিতা।

(৩) পুনার ভি এ সুকৃতাঙ্কর স্থাপিত ডাক যোগে ধর্ম্মপুস্তক প্রচার ব্যবস্থার সহকারিতা।

(৪) ডাক মিসন, ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজের ছাত্রবৃত্তি এবং অন্যান্য উপায়ে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সাহায্য বিধানের জন্য ব্রিটিষ ও ফরেণ ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েসন সভাকে ধন্যবাদ।

(৫) বিলাতের রেবরেণ্ড চার্লস ভয়সীর সাপ্তাহিক ব্যাখ্যান বিতরণের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।

(৬) আহাম্মদাবাদের নানালাল ডাল পাত্রাম কবি এম এ কে ব্রাহ্মবার্ষিকী (Theistic Annual) পুস্তক সঙ্কলনের ভার প্রদান।

(৭) ব্রহ্মোপাসকগণ আপনাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত দেশবাসীদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন, এ জন্য অনুরোধ।

(৮) ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকল বিস্তৃতরূপে প্রচারার্থ ব্রহ্মোপাসকগণ পুস্তক পুস্তিকা প্রভৃতি বহুলরূপে মুদ্রিত করেন, তজ্জন্য অনুরোধ।

এবারকার কন্‌গ্রেস সভায় দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রায় পাঁচ সহস্র প্রতিনিধি সভাস্থল বিভূষিত করেন, তন্মধ্যে মহিলাগণও ছিলেন এবং তাঁহারা কার্য্যের সহকারিতা করিয়াছিলেন। সভারম্ভে প্রথমে অতি সুমিষ্ট মোহন স্বরে জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। পরে অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর অম্বালাল সাকেরলাল দশাই এম এ, এল এল বি সুন্দর বক্তৃতা করিয়া প্রতিনিধি সকলকে সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। পরে সভাপতির স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা সকলকে উদ্দীপিত করে। তিনি শিক্ষা কমিসন, দুর্ভিক্ষ, পুলিস কমিসন, ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহার মতামত প্রকাশ করেন। কনগ্রেসে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছে:—

(১) সম্রাটের রাজ্যাভিষেকে অভিনন্দন, (২)

রহিমতুল্লা সিয়ানী ও রঙ্গিয়া নাইডুর মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ, (৩) দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি-কল্পে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা প্রার্থনা, (৪) বিলাতের দুর্ভিক্ষ কমিসনের পোষকতা, (৫) দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতবাসীদের প্রতি অত্যাচার নিবারণ প্রার্থনা, (৬) ভারতবাসীদের উপর অতিরিক্ত কর স্থাপন প্রস্তাবের প্রতিবাদ, (৭) বিশ্ববিদ্যালয়াবলী কমিসনের উপর মন্তব্য, (৮) তাতার প্রস্তাবিত বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের বিস্তার, (৯) পুলিস কমিসনে সুযোগ্য দেশীয় লোক নিয়োগ, (১০) বিচার ও শাসন বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ, এতদ্ভিন্ন আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তাব হয়।

আগামী বর্ষে মান্দ্রাজ নগরে পুনরায় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে।

উদাসীনের চিন্তা।

বিদেশিনী একজন নবশিক্ষিতা বঙ্গ-বালা। তাহার পিতা কার্য্যোপলক্ষে প্রায়ই বিদেশে বাস করিতেন এবং বিদেশেই তাহার জন্ম বলিয়া পিতা সাধ করিয়া তাহার নাম 'বিদেশিনী' রাখিয়াছিলেন। বিদেশিনী বয়স্কা হইয়াও নামের সার্থকতাই প্রতিপাদন করিয়াছিল, স্বদেশের কোন বস্তুতেই তাহার রুচি ছিল না। স্বদেশের বেশ ভূষা, স্বদেশের চাল চলন, স্বদেশের ধর্ম্ম-নীতি কিছুই তাহার ভাল লাগিত না। সে বিদেশীয় আচার ব্যবহার এবং পরিচ্ছদাদির পক্ষপাতিনী হইয়া সেই ভাবে চলিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত। এই বিষয় লইয়া প্রতিবেশিনী সমবয়স্কা এবং বাল্যসঙ্গিনী রাধারাণীর সহিত প্রায়ই তাহার বাগ্‌বিতণ্ডা হইত। রাধারাণীও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া কোনও বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। তাঁহার রুচি স্বতন্ত্র ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল বলিয়া তিনি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি ভাল রূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন ঋষিকন্যাদের পবিত্র চরিত্র ও ব্যবহারাদি অবগত হইয়া তাহাই বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। যদিও কার্য্যোপলক্ষে বিদেশীয় ভাবে কতকটা চলিতে হইত, তথাপি সে দিকে তাঁহার মনের ঝোঁক ছিল না; বস্তুতঃ সরকারী কাজের অনুরোধে যতটুকু না করিলে নয়, ততটুকু করিয়াই বিদেশীয় রীতি নীতি সমাধা করিতেন। এক দিবস দুই জনে বসিয়া কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় বিদেশিনী বলিল দেখ ভাই, পিসি মা কেমন "ফুল" (নির্ব্বোধ)। একে ত তীর্থে যাওয়াটাই কেমন কেমন মনে হয়, তার পর শুনতে পেলেম এবার কাশী গিয়ে বিশ্বেশ্বরকে আমলকীটা দিয়ে এসেছেন / বিশ্বেশ্বর কি না একটা আমলকীর কাঙ্গাল ! তিনি তাঁকে সেটি দিয়ে কৃতার্থ করেছেন, ভাই এর চেয়ে কি বোকামি আর আছে !!!

রাধারাণী—তোমার সঙ্গে ভাই, কথা কওয়াই মুস্কিল, তোমার মতের বিরোধী কথা হ'লেই ত চটে যাও। তুমি ত স্বদেশী কিছুই ভাল দেখবে না। এর মধ্যে যে কি শিক্ষা রয়েছে, তা কথাটা একটু তলিয়ে না দেখলে বুঝা যায় না।

বিদেশিনী—ভাই, তল্‌য়ে কি বুঝবো? এর ভিতর কি পারল (রত্ন) লুকান রয়েছে?

রাধারাণী—তোমার ভাবগতিক দেখেই ত বোধ হয় তুমি কি ভাবে কথাটা নেবে। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং" শ্রদ্ধাবান্ লোকেরাই জ্ঞান লাভের অধিকারী। তোমার আদবে শ্রদ্ধাই নাই, তোমার কাছে কথা বলা না বলা সমান।

বিদেশিনী—আমি নেহাত্ মন্দ মানুষ হলেও ত তোমার প্রচারটা করা কর্ত্তব্য। দেখ কেরি মার্সমান সাহেব কত কষ্ট সয়ে ধর্ম্ম প্রচার করেছেন, আর তুমি কি আমার মত পাষণ্ডটাকেও তরাতে পার না? একটা নূতন তত্ত্ব কাহাকে শিখাতে হলে না হয় একটু নাকাল হ'লে, তাতে ক্ষতি কি?

রাধারাণী হাওয়া বুঝিয়া নিবৃত্ত হইলেন। চলিয়া যাইতে উদ্যতা হইলে বিদেশিনী বাধা দিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিল এবং আপনার ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বলিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল।

রাধারাণী অনুরোধে বাধ্য হইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন—"ভাই! তোমার পিসি মা ঠিক্ কাজ করুন্ না করুন্, তাঁর নিয়মটার একটা বিশেষ মানে আছে।"

বিদেশিনী—নিয়মটা কি, তাই ভাল করে বল না?

রাধারাণী—নিয়ম হচ্ছে যে যা ভাল বাসে, বিশ্বেশ্বরকে তা দিয়ে আস্‌বে। ফল দেওয়াই সাধারণ নিয়ম, কেহ অন্য কোন জিনিষও দিয়ে আসতে পারে। ইহার ফল আত্মসংযম ও ইষ্ট দেবতার প্রতি ভালবাসার অভ্যাস।

বিদেশিনী—ভাল, বিশ্বেশ্বর কি না তোমার আমার মত মানুষ যে, তাঁর এ জিনিষ সে জিনিষের দরকার হবে। যিনি বিশ্বের ঈশ্বর, তাঁর আবার কিসের অভাব আছে?

রাধারাণী—তোমার বাবার ত এত আছে, তবে তাঁকে জন্মদিনে একখানি করে ভাল কাপড় পাঠাও কেন? তাঁর কি কাপড়ের অভাব আছে? অভাব আছে ভেবে দান করে লোক দয়া থেকে; আর দান-গ্রহীতার কি আছে কি নাই, তার বিচার না করে কেবল যে ভালবাসা থেকে দান, সে স্বতন্ত্র।

বিদেশিনী—ভাল বেসে কি কেহ কাহাকে একটা ইট পাটকেল দিয়ে থাকে? অবশ্য কোনও না কোন দরকারী জিনিষ দেয়, যা ভালবাসার জন ব্যবহার কর্ত্তে পারে এবং ক'রে সুখী হয়। মানুষের নিকট যেমন ইট পাটকেল অকাজের জিনিষ, সুতরাং দানের উপযুক্ত নয়, সেই-রূপ বিশ্বেশ্বরের নিকটও জগতের সকল

জিনিষই, সুতরাং তা দান করে কি বিশ্বেশ্বরকে mock (ঠাট্টা) করা হচ্ছে না ?

রাধারাণী—আমার ছোট বোনটি এক দিন বাবাকে কতকগুলি ছাই দিয়ে বলেছিল “বাবা এই নাও তোমার জন্য ভাত রেঁধে এনেছি।” বাবাও সহাস্য মুখে তাহা গ্রহণ করিলেন। সে বাবাকে ভালবেসেই ঐ জিনিষ দিয়েছিল—ঠাট্টা করে নয়। তবে একজন বড় মেয়ে দুষ্টমি ক’রে যদি ওরূপ কর্ত্ত, তবে তার দোষের হইত।

বিদেশিনী—এখন স্বীকার কর পিসিমায়ের ওকাজ অজ্ঞানীর কাজ, তবে তাঁকে “ফুল” বলে কি অন্যায় করেছি ?

রাধারাণী—অজ্ঞানীত নিশ্চয়ই। বিশ্বেশ্বরের স্বরূপ কি ? সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা ত শক্ত কথা, তবে তাঁর স্বরূপ যাই হ’ক, তোমার পিসি মা যে ভালবেসে জিনিষটা দিয়ে এলেন, তাকি কিছুই নয় ? আমার ছোট বোনটি ভালবেসে ছাই দিয়েছিল বলে কি তার ভালবাসা তোমার বাবাকে কাপড় দেওয়ার ভালবাসা থেকে নিকৃষ্ট ? ভালবাসা জিনিষটা একই, তবে জ্ঞান অজ্ঞানতানুসারে ভালবাসা দেখাবার প্রণালীর তারতম্য হয়ে থাকে মাত্র।

বিদেশিনী—আমার পিসি মা যে ভালবেসে আমলকীটি দিয়েছেন তার প্রমাণ কি ? ভালবেসে দিলে হয় ত সংসারের একটা ভাল ফল, আম কি লিচু দিয়ে আসতেন। তিনি হয় ত একটা ফল দিতে হয় তাই দিয়ে এসেছেন, এটা একটা নিয়ম রাখা বই আর কিছুই নয়।

রাধারাণী—তোমার পিসি মা ভাল বেসে দেন নাই কে জানে ? হয় ত এ ফলটী তাঁর প্রিয়। আর তিনি ভাল বেসে দিয়েছেন কি নিয়মের অনুরোধে দিয়েছেন সেটা দেখবার কথা নয়, এরূপ দেওয়ার মূলে ভক্তি আছে কি না তাই দেখা চাই।

বিদেশিনী—হাঁ, ভক্তি থাকলে ত ভাল কথা, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একটু জ্ঞান থাকলে ভাল হয় না ? না হলে অন্ধ ভক্তি অনেক সময় লোকপীড়ার কারণ হয়। গঙ্গাসাগরে পুত্র কন্যা ভাসাইয়া দিবার নিয়মটা, চড়কপূজার সময় পিঠ ফুঁড়িয়ে ঘুরাবার রীতিটা অন্ধ ভক্তিরই বিকাশ, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তা তুলে দিয়ে ভালই করেছেন।

রাধারাণী—হাঁ জ্ঞানমিশ্র ভক্তিই সব চেয়ে ভাল, কিন্তু অবিশ্বাস নাস্তিকতার চেয়ে অন্ধ ভক্তিও মন্দ নয়। তার পর ফল দানের আর একটা দিক্ আছে। সে দিক্‌টা দিয়ে বিচার কল্লে বিশ্বেশ্বরের স্বরূপের দিকে আদবেই লক্ষ্য রাখবার দরকার নেই।

বিদেশিনী—সে কি !

রাধারাণী—অনিত্য জিনিষের প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা থাকে বলে আমরা বিশ্বেশ্বরকে ভাল বাসতে পারি না। যার যে জিনিষের প্রতি বেশী ভালবাসা, তার সে জিনিষটিকেই ত্যাগ কর্ত্তে হয়। এজন্য যাত্রীদের যে যে ফলটিকে ভাল বাসে, বিশ্বেশ্বরের কাছে সে ফলটি আর

খাবে না, এরূপ সংকল্প করে আসে। এরূপে ক্রমে ক্রমে যদি ভাল বাসার সকল পদার্থ এবং ব্যক্তি থেকে মনকে তুলে নিয়ে ভগবানে ভালবাসা দেওয়া যায়, তবেই কাজ হ'ল।

বিদেশিনী—বেশ বুঝলুম, তা আর হয় কই? যাত্রী সকল ত বাড়ী ফিরে এসে আরও সংসারে লিপ্ত হয়, কেবল মাত্র যে ফলটি ছেড়ে আসে, তাই খায় না। তাতেই বা কি হল? মনে মনে যে খাবার ইচ্ছা হয় না, তাই বা কে দেখে? তবে যারা অকেজো ফল ছেড়ে আসে, যেমন আমার পিসি মা করেছেন, তাদের মনে আর বাসনা না উঠতে পার, কিন্তু যারা কাজের ফল আম কি লিচু ছেড়ে আসে, তাদের কি আর খাবার ইচ্ছা হয় না?

রাধারাণী—সে কথা মানি, মন হ'তে বাসনা সহজে দূর হয় না, তবে বাহিরে নিবৃত্ত থাকতে থাকতে ক্রমে মন হ'তেও বাসনা সরে যেতে পারে। "মিঠাই খাব না" সংকল্প করে ছাড়লে দুই দিন দশ দিন না খেতে খেতে মন হতে মিঠাই খাবার ইচ্ছা চলে যেতে পারে; আর যদি খেতেই থাক, তা হ'লে কখনও বাসনা চলে যাবে না। মনু বলেছেন,—

"ন জাতু কামঃকামানামুপভোগেন
শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

কাম্য বস্তুর ভোগে কামনার কখন উপশম হয় না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন বৃদ্ধি পায়—তেমনি বৃদ্ধিই পাইতে থাকে।

বিদেশিনী—বুঝলুম, তবে নিয়মটা নেহাত মন্দ নয়। কিন্তু অনেক লোকই নিয়মের spirit (মূলটা) দেখে না, কেবল form (আকারটা) দেখিয়াই মানিয়া যায়। এ জন্যই হিন্দুদের অনেক রীতি নীতি Lifeless Form (জীবনশূন্য আকারে) পরিণত হ'য়েছে। আমার মনে হয়, কালে সব ধর্ম্মেরই এই দুর্গতি ঘটে। যাহা প্রথমে spiritual (আধ্যাত্মিক) থাকে, কালের গতিকে শিথিলতার সুবিধা পেয়ে তাহাই lifeless (জীবনশূন্য) আকারে পরিণত হয়। এ জন্য বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার।

রাধারাণী—তুমি যা বলেছ ঠিক, যদি সকল ধর্ম্মেরই এ দুর্দ্দশা ঘটে, তা হ'লে কেবল হিন্দুদের দোষ কেন? বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্ম বহুদিনের, এর ত এরূপ হবারই কথা, কিন্তু তাই বলে কি সব উড়িয়ে দিতে হবে? বিচার করে দেখা ভাল। হিন্দুর যা ভাল, তা নিলে ক্ষতি কি? কেবল বিদেশীটাই ভাল, এ বুদ্ধিটা কি ভ্রমাত্মক নয়?

বিদেশিনী—আমারটা যেমন ভ্রমাত্মক, তোমারটাও তেমনি, তুমি বিদেশী সকলই নিন্দা কর, ভাল, তাদের কি কিছু ভাল নাই?

উভয়ে উভয়ের শেষ কথা শুনিয়া নিজ নিজ ভ্রান্ত মত সংশোধন করিয়া লইলেন। তৎপর হইতে উভয়েই উদার ভাবে সকল সম্প্রদায়ের ভাল বিষয় গ্রহণ জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন। চ, কি, কুশারি।

রামায়ণ কথা।

বড় মা।

কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনায় এবং দশরথের অঙ্গীকার-পালনে লক্ষ্মণ-বনবাসের কোন সম্পর্ক ছিল না। জ্যেষ্ঠগতপ্রাণ লক্ষ্মণ সীতা-রামের সেবার জন্যই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বত্যাগী বনবাসী হইতে চলিলেন। রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে না লইলে, লক্ষ্মণ প্রাণ-ত্যাগে কৃতসংকল্প। অগত্যা রামকে পিতার আদেশ লইয়া লক্ষ্মণের প্রার্থনায় সম্মত হইতে হইল। তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন,—"ভাই! তুমি মাতা সুমিত্রা দেবীর আদেশ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক এবং ধন, রত্ন, বেশ ভূষা প্রভৃতি যাহা তোমার নিজস্ব আছে, সে সকলি দীন, দরিদ্রগণকে দান করিয়া আমার অনুগমনে প্রস্তুত হও।" লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন। বিদায়কালে সুমিত্রা হর্ষোৎ-ফুল্ল বদনে লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে লইয়া এই মাত্র বলিলেন ;—

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত! যথাসুখম্॥"

"বৎস! তুমি রামকে তোমার পিতা দশরথ বলিয়া জানিও, জানকীকে তোমার জননী জানিও এবং সেই মহারণ্যকে অযোধ্যা বলিয়া জানিও (অর্থাৎ সুবিশাল দণ্ডকারণ্যের মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা প্রভৃতি সমস্ত পদার্থকে তোমার প্রাণপ্রতিম অযোধ্যার পরিবার-বর্গ বলিয়া জ্ঞান করিও), যাও বাছ, পরমানন্দে গমন কর।" এত বড় মা না হইলে কি এমন সন্তান হয়? (১)

রাজ্ঞী কৌশল্যা অতি বৃদ্ধ বয়সে প্রিয়তম পুত্র বিরহে অতিমাত্র কাতরা হইয়া যখন হাহাকার করত বারংবার মূর্চ্ছিতা হইতে লাগিলেন, তখন সুমিত্রা তাঁহাকে বক্ষে লইয়া প্রেম-গদগদ স্বরে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন,—"হে আর্য্যে! তোমার পুত্র পুরুষোত্তম রাম দিব্য গুণগ্রামে ভূষিত; যাঁহার সন্তানের এত গুণ, তাঁহার আবার বিলাপ বা পরিতাপের কারণ কি? সন্তানের পরম গুরু পিতা যাহাতে সাধু-সেবিত সনাতন সত্য-পথ হইতে ভ্রষ্ট না হন, সেই মহান্ ধর্ম্ম পালন করিতেই রাম বনে গিয়াছেন। যে পুত্র ঐহিক ও

(১) এ জগতে যাঁহারা বড় হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনচরিত অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, তাঁহারা সকলেই বড় মায়ের সন্তান। এ জন্য সমাজে সুসন্তান দেখিতে হইলে, অগ্রে স্ত্রী-চরিত্র গঠন দ্বারা সুমাতা প্রস্তুত করা নিতান্ত আবশ্যক। ইংলণ্ডে একদা প্রধান মন্ত্রীর পদ শূন্য হওয়ায়, অনেকে স্ব স্ব প্রশংসাপত্রসহ সেই পদের প্রার্থনায় আবেদন করেন। যে দিন প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইবেন, সে দিন রাশি রাশি প্রশংসাপত্রসহ আবেদন স্তরে স্তরে স্তূপাকারে রাজ-সমীপে স্থাপিত হইল। রাজা তাহা দেখিয়া আজ্ঞা করিলেন ;—এ সকল প্রশংসাপত্রের স্তূপ দূরে নিক্ষেপ কর। প্রার্থীদিগের মধ্যে যাঁহার মা সর্ব্বাপেক্ষা বড়, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদ আজি তাঁহারি। রাজাজ্ঞায় তাহাই হইল।

পারত্রিক মঙ্গলকর ধর্ম্মপালনে নিযুক্ত হয়, সে পুত্র পিতা মাতার কদাচ শোচনীয় নহে। হে দেবি! যাহারা দিব্য-স্বভাব-সম্পন্ন নহে, যাহারা অবিজ্ঞ ও অল্পদর্শী এবং যাহারা হতভাগ্য, তাহারাই পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয় না। হে আর্য্যে! সাম্রাজ্য ও সুখসম্ভোগ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্র রাম যে বনগমন করিয়াছে, ইহাতে তাহার সুমহৎ কল্যাণ লাভ হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যে পুত্র কর্ত্তব্যপথে অবিচলিত, ধর্ম্মপ্রাণ, সর্ব্বভূতহিতে দীক্ষিত, সর্ব্বলোকের প্রিয়, তাদৃশ কুলতিলক সন্তান কি মায়ের শোচনীয়? আমার পুত্র লক্ষ্মণও নিষ্পাপ এবং সর্ব্বভূতে দয়াবান্; সে সদাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য ভক্তি ও সেবা করিয়া থাকে, সে মঙ্গলময় রাম-চরিত্রের অনুগামী, ইহাই ত আমার পরম লাভ ও পরম সৌভাগ্য! সেই ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণেরও জন্য কি আমাদের শোক করিতে আছে? যে জানকী চিরকাল সুখসম্ভোগে বর্দ্ধিতা হইয়াও এবং পতির নিকট বনবাসের দুঃখ জানিয়াশুনিয়াও, গৃহবাস ও সর্ব্বসুখ-ভোগ বিসর্জ্জন করিয়া ছায়ার ন্যায় পতির অনুগমন করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মপরায়ণা যশস্বিনী বধূর জন্যও শোক প্রকাশ করা আপনার উচিত নয়। দেবি! আপনার পুত্রের কীর্ত্তিময়ী বিজয়পতাকা আজি ত্রৈলোক্যে বিঘোষিত; দম-সত্য-ব্রত-পরায়ণ সাক্ষাৎ ধর্ম্ম সেই রামের পক্ষে দুর্লভ কি আছে? সূর্য্যদেব জগন্মঙ্গল রামের অলৌকিক মহত্ত্ব ও পবিত্রতার পরিচয় পাইয়া কিরণ দ্বারা তাঁহার অঙ্গ সন্তাপিত করিবেন না, বিশ্বজীবন পবন-দেব কাননশ্রেণী হইতে সুমধুর কুসুম-পরিমল হরণ করিয়া মৃদু মধুর ভাবে, আপনার পুত্রকে বনমধ্যে বীজন করিবেন। রাম ও সীতা শয়ন করিলে চন্দ্রমা পিতার ন্যায় অমৃতময় কিরণ রূপ করতল-স্পর্শে রামকে পুলকিত করিবেন। তরুলতারা সুশীতল ছায়াদানে ও বিহঙ্গকুল কলকূজনে রামের আনন্দ বিধান করিবে। বিমলা কীর্ত্তি, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী পুণ্যময়ী সতী ভার্য্যা, জ্যেষ্ঠগতপ্রাণ অনুজ লক্ষ্মণ, এবং পিতা-মাতার ও সমস্ত ঋষিমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ যাহার সর্ব্বত্রই অনুগামী, সেই রাম গহন কাননেও স্বর্গের সুখ ভোগ করিবেন। দেবি! আমি রামচন্দ্রের যে অলৌকিকী মহাপ্রাণতা দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় বলিতে পারি, রাম যথাকালে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জগতের সিংহাসন পদে অধিরূঢ় হইয়া এই ধরাতলে অক্ষয় ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপন করিবে। সর্ব্বমঙ্গলাধার রাম বনেই থাকুক আর নগরেই থাকুক, তাহার অকল্যাণ কোথায়? অহো! আজি আমাদের কি শুভ দিন! আমরা পুত্রকামনায় যে কঠোর সাধনা করিয়া-ছিলাম, করুণাময় বিধাতা আমাদের সে সাধনা সফল করিয়াছেন। তোমার পুত্র আজি পিতৃ-ভক্তি ব্রত পালনে এবং আমার পুত্র জ্যেষ্ঠভক্তি-ব্রত পালনে নিযুক্ত। ঈদৃশ সুসন্তান লাভ অপেক্ষা

জননীগণের অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? হে ভগি! এ সৌভাগ্যের দিন আমাদের প্রতি সেই করুণাময় বিশ্বনাথের অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া ভক্তি-গদ্গদ প্রাণে আনন্দাশ্রু মোচন করুন। আমি না বলিতেই লক্ষ্মণ যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জ্যেষ্ঠের অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, এ আনন্দ আমার হৃদয়ে ধরিতেছে না। দিদি! আমি আমার জন্য নয়, কেবল আপনার শোকেই ব্যথা পাইতেছি। আশ্বস্ত হউন, আশ্বস্ত হউন, এ মঙ্গলঘটনায় শোকাশ্রুপাত করিবেন না, করিবেন না। দেবি! দেখুন আজি রাম-বিরহে সমস্ত রাজ্য হাহাকার-ময়, রাজ্যেশ্বর আমাদিগের পতিদেব অচেতন ও মুমূর্ষু, এ সময় আপনি আমাদের সকলের গতি; এক্ষণে এই শোকমগ্ন লোকমণ্ডলীকে আপনি সান্ত্বনা দান করুন। রাম যাহার পুত্র, তাঁহাকেও কি শোক করিতে হয়!

নিদাঘ-সন্তাপিতা ধরণী যেরূপ নব-মেঘের বারি-ধারায় সুশীতল হয়, লক্ষ্মণ-জননীর সেই সকল অমৃতায়মান প্রবোধ-বাক্যে কৌশল্যার প্রজ্বলিত শোকানল নির্ব্বাণ হইল।

হে ভারতের মহিলাগণ! এই বসুন্ধরা একদা সেই সুমিত্রা দেবীর চরণ-রেণু-স্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল, ইহা স্মরণ করিয়া তোমরা সসম্ভ্রমে এই বসুন্ধরায় মস্তক বিলুণ্ঠিত কর। পার্থিব শোক ও হর্ষ, অনিত্য লাভালাভ যেন তোমাদিগকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে না পারে। সংসারের সমস্ত ঘটনার মধ্যেই সেই "সত্যং শিবং সুন্দরং" পরব্রহ্মের মাঙ্গল্য হস্ত জাজ্বল্যমান দেখিয়া পুলকিতহৃদয়ে জীবনের কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হও। সপত্নী ও সপত্নী-তনয়ের প্রতি সুমিত্রার কিরূপ প্রেম দেখিলে? তোমরা সেই প্রেমময়ী সুমিত্রার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে ভারতের ঘরে ঘরে প্রেমের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রেমের গুণেই আবার এ জগতে রাম-রাজ্য দেখিতে পাইবে।

নূতন সংবাদ

১। ১লা জানুয়ারি অভূতপূর্ব্ব সমারোহে দিল্লীর দরবার ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে।

২। বিজনির রাণী শ্রীমতী অভয়েশ্বরী দেবী আসাম গোয়ালপাড়ার বালিকা বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। খ্যাতনামা ভূতপূর্ব্ব জজ পেনেল সাহেব ব্রহ্ম দেশের প্রধান আদালতের ব্যারিষ্টারি করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

৪। মধ্য ভারতবর্ষের চিফ কমিসনার এ, এচ, এল, ফ্রেজার সি, এস, আই, বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু পুলিস কমিসনের সভা-পতিত্ব করিবার জন্য আগামী মে মাস

পর্য্যন্ত তাঁহাকে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। পরে বিলাত যাইবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে জে, এ বোর্ডিলন ছোটলাটের কার্য্য করিতে থাকিবেন।

৫। বেথুন কলেজ ও ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রেণী খোলা হইবে, তাহাতে এক বৎসরের জন্য ২ জন অধ্যাপিকা ৬০ টাকা বেতনে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং ছাত্রীবৃত্তিও কয়েকটী প্রদত্ত হইবে।

৬। ভারত গবর্ণমেণ্ট ৩ জন স্ত্রীলোককে ৪ মাস কাল গোয়ালার কাজ শিখাইয়া প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাঁহারা বঙ্গদেশের কোনও কোনও আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য পাইবেন। তাঁহাদের বেতন ৬০ হইতে ১০০ টাকা হইবে।

৭। আগামী ৯ই হইতে ১২ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান মহারাজার অভিষেকোৎসব কার্য্যের ধুমধাম চলিবে। প্রতিনিধি ছোট লাট অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

৮। নেটীব ডাক্তারদিগের সর্ব্ব নিম্ন বেতন ২০৲ স্থানে ২৫৲ এবং সর্ব্বোচ্চ বেতন ৫৫৲ স্থানে ৭০৲ টাকা হইয়াছে।

৯। বঙ্গের প্রতিনিধি ছোট লাট বোর্ডিলন মহীশূরের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ফ্রেজার সাহেব পদস্থ হইলে তিনি বঙ্গদেশ হইতে অবসর লইবেন।

১০। মাননীয় র‍্যালি সাহেব পুনরায় ২ বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যানসেলার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১১। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মাঘ মাসে ব্রাহ্মসমাজ সকলের মহোৎসব পক্ষাধিক কাল ব্যাপিয়া সমারোহে সম্পন্ন হইতেছে।

১২। ২৬।২৭।২৮শে জানুয়ারী ভারত সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে কলিকাতায় দরিদ্রভোজন, ছাত্রভোজন, আতসবাজী ও আলোক-প্রদর্শনী হইয়াছে।

১৩। দিল্লী দরবার উপলক্ষে যে সকল বঙ্গীয় জমীদার একত্র হন, তাঁহারা জমীদার-সন্তানদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন স্থির করিয়াছেন।

১৪। বার্লিন নগর নিবাসী প্রাচ্য বিদ্যাবিৎ সুবিখ্যাত ডাক্তার বুলার সম্প্রতি গতাসু হইয়াছেন।

১৫। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু দিল্লী দরবারে সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৬। সোমালিল্যাণ্ডে ভারতীয় সৈন্যগণ নির্ব্বিঘ্নে পৌছিয়াছে, পাগলা মোল্লার সহিত এই বার ভীষণ সংগ্রাম হইবে।

১৭। রুশিয়ার আন্দিজান সহরে ভূমিকম্পে ৭০০০ হাজার লোক মৃত এবং দেড় কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

১৮। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, আলবার্ট ভিক্টার মেডিকেল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার লালমাধব মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর গত ২৫শে পৌষ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

গ্রন্থাদি প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। The Illustrated Catalogue of S. K. Das & Co বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ-দাসের সচিত্র তালিকা প্রাপ্ত হইলাম। ইহাতে অনেক মূল্যবান্ সুন্দর সুন্দর গহনা, ঘড়ী ও মণি মুক্তাদির ছবি ও মূল্য নির্দ্দেশ আছে। কলিকাতা ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ১৭৯ নং ভবনে জিনিষ সকলের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য বিবরণ ঐ স্থানে জ্ঞাতব্য।

২। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—দিল্লী দরবার উপলক্ষে এই পত্রের জানুয়ারি সংখ্যা ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী ও উর্দ্দু এই চারি ভাষায় সচিত্র সুন্দরাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা দেশবাসী সাধারণের নিকট উৎসাহ লাভের যোগ্য।

৩-৪। ব্রজগাথা ও যোগপ্রভা নামে দুই খানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। পশ্চাৎ সমালোচ্য।

বামারচনা।

বর্ষ বিদায় ও নববর্ষ।

(খৃঃ ১৯০২ ও ১৯০৩)।

চলিয়া গেলে হে বর্ষ আঁখির আড়াল দিয়া,
জীবনের অংশটুকু আপনার সাথে নিয়া।
আগু পাছু কোন দিকে গিয়াছে এ পদ ক্ষীণ,
দিবার আলোক-জাল নিশির ছায়া মলিন।
হাসি অশ্রু দুখ সুখ যা ছিল তোমার বক্ষে।
স্নেহপ্রেম ভালবাসা মাখা ছিল যেই চক্ষে।
সকলি লইয়া সাথে আজি তব বিসর্জ্জন।
নব জন্ম লয়ে পুনঃ নবীনের আগমন।
প্রকৃতি কোমল ক্রোড়ে হইলে হে সুশোভন।
বাজিল আশার বীণ মনঃপ্রাণ-বিমোহন।
পুরাণে বিদায় দিয়া নবীনের আগমন।
জানি না ও হৃদে পূর্ণ আছে কোন রত্ন ধন।
অতীত সুখের চিত্র, বর্ত্তমান পিপাসিত।
ভবিষ্যত রুদ্ধ দ্বার, নিত্য আশা তবু ভীত।
যাও বর্ষ যাও আজি হাসিটুকু রেখে যেও,
সন্ধ্যাকালে রবি যেন আঁধারেতে বিকাশিও।
নবীন তরুণ তুমি এস হে নব উদ্যমে।
নবোৎসাহে নব রাগে নব সুখ নব প্রেমে।
তোমার মুখের দিকে জগত চাহিয়ে আজ।
এস হে নবীন বেশে সাজিয়া প্রফুল্ল সাজ।
ছদ্মবেশী হয়োনাক রেখ হে আপন লাজ।
এমনি সুখের স্রোতে সাধিবে কি নিজ কাজ?
আজি মহা অভিষেক তোমার সুলগ্ন ধরে।
এনেছ কি শুভ দান তোমার ও নব করে!
ঢাল তবে সুখ শান্তি এই শুভ অবসরে।
রয়েছি আঁচল পেতে কত আশা প্রীতি ভরে।

সুমধুর সম্ভাষণে সাদরে এই আহ্বান।
এস হে নবীন বর্ষ লয়ে সুখ ধন মান।
বরিষ আশীষ-ধারা ধরায় অজস্র ধারে,
ভারতের গেহ পূর্ণ হোক ধন ধান্য ভারে॥

শ্রীনি—দেবী।

রাজার অভিষেক উপলক্ষে।

রাজা এড্‌ওয়ার্ড আমাদের স্বর্গীয় মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার পুত্র, আমাদের ভক্তির পাত্র। অতএব তাঁহাকে ভক্তি করা আমাদের কর্ত্তব্য। রাজা আমাদের সুবিধার জন্য কত ভাবিতেছেন এবং প্রাণপণে প্রজার হিত চেষ্টা করিতেছেন। রাজা আমাদিগের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, আমরা যদি রাজাকে ভক্তি না করি, তবে আমাদিগকে ঘোর পাপে পতিত হইতে হইবে। মহারাজা এডওয়ার্ডের অভিষেক হইবে, এই সুসংবাদে কাহার মনে আনন্দের উদয় হয় নাই? আমার বোধ হয় সকলের মনেই আনন্দের উদয় হইয়াছে। তাই সকলে মিলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে মহা আনন্দ উৎসব করিতেছেন। আইস আমরা ভক্তির সহিত উচ্চৈঃস্বরে রাজার জয় ও গুণগান করি।

কুমারী সুরুচি বালা।
(বয়স ১০ বৎসর)।

আমাদের সম্রাটের রাজ্যাভিষেক।

নিত্যানন্দং বিধাত্রী, সকল গুণযুতা, দুঃখিনী-মাতৃরূপা
সাম্রাজ্ঞী ভারতেশী পরম-সুখময়ং গচ্ছতি স্ম দ্যুলোকং।
তস্যা জ্যেষ্ঠঃ কুমারস্তদিবগুণযুতঃ সাম্প্রতং নঃ সুখায়
ক্ষৌণীশস্তস্য ভদ্রং, শিবময়-সদনং শ্রদ্ধয়া বৈ প্রযাচে।*

রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের জন্মভূমি ইংলণ্ড সহরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক কার্য্য মহা সমারোহে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। আমরা ভারতবাসী, দরিদ্র প্রজা, অতএব সে পুণ্যময় উৎসব দর্শন করা আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই। যাঁহাদের ধন আছে, জন আছে, মান সম্ভ্রম আছে, তাঁহারাই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। দয়াবান্ রাজার প্রসাদে ধনবান হিন্দু সন্তানেরাও আপন হিন্দুত্ব রক্ষা করিয়া ইংলণ্ড গমন ও রাজদর্শনে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনিবার্য্য কারণে প্রাণের ইচ্ছা হৃদয়ের ভক্তি থাকিতেও দরিদ্র প্রজাগণ অভিষেক কার্য্যে যোগদান ও রাজানুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দিল্লীতে রাজার অভিষেক উপলক্ষে মহা সমারোহের দরবার হইতেছে। সে দরবারেও উপরি-উক্ত কারণে সর্ব্বসাধারণে

* ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে দিল্লী দরবার দিনে একটি দরবার হয়, তদুপলক্ষে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়। সংস্কৃত শ্লোকটী পণ্ডিত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিত।

যোগদান করিতে পারেন নাই, এই মনের আক্ষেপ দূর করিবার জন্যই বুঝি সর্ব্বসাধারণে সহরে সহরে দরবার বসাইতেছেন। এই উপলক্ষে কত অর্থ, কত শক্তি ব্যয়িত হইতেছে। ধন্য ভারতবাসিগণ! ধন্য তোমাদের আত্মত্যাগ, ধন্য তোমাদের রাজভক্তি!

আমরা ক্ষুদ্র পল্লিবাসী দরিদ্র প্রজা, কিন্তু আমাদের এ হৃদয়ে রাজভক্তি প্রবাহিত হইতেছে কি না, তাহা ভগবান্ জানেন। অর্থহীন দরিদ্র প্রজার এ মনের ইচ্ছা ফল্গু নদীর ন্যায় চিরকালই অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইবে। হায়! দরিদ্রেরা কি সে জলস্রোতকে জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিবার কোনও উপায়ই খুঁজিয়া পাইবে না?

ইংলণ্ডে অভিষেক হইয়া গিয়াছে, দিল্লীতে মহা দরবার হইতেছে! সহরে সহরে ধনবান্ লোকেরা একত্র হইয়া দরবার উপলক্ষে রাজভক্তি প্রকাশ করিতেছেন।

আমরা দরিদ্র, তাই বলিয়া কি প্রজা হইয়া রাজপূজা করিতে পারিব না? রাজভক্তি দেখাইতে পারিব না? দরিদ্রদের ধন নাই এ কথা সত্য, কিন্তু যেখানে ইচ্ছা আছে, উৎসাহ আছে, ভক্তি ভালবাসার অভাব নাই, সেখানে আবার ভয় কি? বিঘ্ন কি? এস ক্ষুদ্র পল্লীবাসী দরিদ্র প্রজা ভ্রাতা ভগ্নীগণ, আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র বল ক্ষুদ্র ধন লইয়া রাজকার্য্যে অগ্রসর হই। আমরা প্রজা, রাজকার্য্যে প্রাণপণ করা আমাদের চিরকর্ত্তব্য কাজ, অতএব কর্ত্তব্য কাজে কেহই বিমুখ হইও না। কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন কর, ধর্ম্ম রক্ষা কর, রাজার রাজ্যে শান্তি স্রোত প্রবাহিত হইবে। প্রজার ধর্ম্মে রাজার সুখ, রাজ্যের শান্তি, কেহ তাহা বিস্মরণ হইও না।　　শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

শুভকামনা।

(ভারত সম্রাট, সপ্তম এডওয়ার্ডের শুভ রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে)।

আজি জাগ মা জননি!
আজি চাহ মা জননি!
দেখ মা বারেক আহা খুলিয়া নয়ন!
হইয়া আপনা-হারা,
কি খেলা খেলিছে তারা,
হৃদয়ে অপূর্ব্ব হর্ষ শোভিত বদন,
দেখ মা ধরণি! আজি খুলিয়া নয়ন।১
মলয় পবন সেবি,
হাস গো প্রকৃতি দেবি!
জগত হউক সুখ-স্রোতে ভাসমান।
হাস লতা ফুল ফল,
হাস রে জলধি জল,
গাহ রে বিহগকুল তুলিয়া সুতান।
হাস আজি বিশ্বপূর্ণ প্রত্যেক পরাণ।২
নীরব জগত! আজ
পরিয়া নূতন সাজ,
উঠাও আপন প্রাণে আনন্দ তুফান,
"হুররে" "হুররে" বলি

যাক মন যাক চলি
উধাও অনন্ত পথে বিহগ সমান,
এস আজি গাই সবে খুলিয়া পরাণ। ৩
প্রতি নর নারী জন
হইয়া প্রফুল্লমন,
শুন এ আনন্দ-বার্ত্তা শ্রবণ-মঙ্গল।
আজি দেখ চেয়ে সবে
(এডওয়ার্ড) রাজা হবে
গাওরে মঙ্গল-গীতি রমণী সকল। ৪
আনন্দ আলোক জ্বালি
দাও সবে করতালি,
কাঁপিবে ধমনী হবে রক্ত বহমান।
কই সব আজ কোথা ?
আজি এ সুখের কথা
হৃদয়ে আঁকিয়া রাখ পাষাণ-সমান।
সারা বিশ্ব হোক্ সুখস্রোতে ভাসমান।৫
দূরে রাখি জরাজ্বর
চাহ বিধাতার বর,
যাঁহার কৃপায় আজ এত আয়োজন,
দূরে রাখি সর্ব্বপাপ
দূরে রাখি পরিতাপ
হাস গো সকলে মিলি ভরি প্রাণ মন,
আজি স্মর যিনি সর্ব্বসুখের কারণ।৬
কোথা হে দয়াল পিতা!
শুনিছ অন্তর কথা,
ভারত সম্রাটে কর অজর অমর;
বিকচ নলিনী তুল্য
তাঁর হৃদি হোক্ ফুল্ল,
করুক সকলে তাঁর চরিত্রে আদর। ৭
শ্রী—

মাঙ্গল্য।

এস শুভে এস,
স্বর্গের সৌরভ লয়ে,
প্রীতি শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে
এ গৃহ উদ্ভাস।
প্রেম, শান্তি, সুমহত্ত্ব,
স্বার্থত্যাগ, সেবাব্রত
পুণ্যের বিকাশ।
এস তুমি এস,
নারীর হৃদয় মাঝে
ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস রাজে,
স্রোতস্বিনী সম ঢেলে
স্নিগ্ধতা প্রকাশ।
শুভে! লয়ে এস
দয়া, ধর্ম্ম, কোমলতা,
সরলতা, পবিত্রতা,
ব্রহ্মকন্যা নামে তব
হউক সুযশ।
স্বদেশ বিদেশে আর
ব'য়ে যাক যশঃ তাঁর,
করুন্ জীবন-ভরি কার্য্য হিতকর।
আজিকার শুভ দিনে
মঙ্গল কামনা মনে—
তাঁর—অক্ষয় জীবন হোক্ প্রফুল্ল অন্তর
কোথা হে পরমপাতা!
সর্ব্বজনসুখদাতা,
ভারত সম্রাটে কর অজর অমর,
প্রণমি চরণে তব সভক্তি অন্তর।

লীলাবতী মিত্র

Registered No. C. 134

No. 475. March, 1903.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ। ৪৭৫ সংখ্যা। { ফাল্গুন, ১৩০৯। মার্চ্চ, ১৯০৩। } ৭ম কল্প। ৩য় ভাগ

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵৹, পশ্চাদেয় বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 475. March, 1903.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ। ফাল্গুন, ১৩০৯। মার্চ্চ, ১৯০৩। ৭ম কল্প।

৪৭৫ সংখ্যা। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

লেডী কুর্জ্জন—গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী মহিলা-বন্ধু সভার (Women's Friendly Society) শিল্পজাত বিক্রয়ের দোকান খুলিয়াছেন।

সৎকার্য্যের পুরস্কার—লালগোলার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য জেলায় সাধারণ লোকদিগের পানীয় জলের কূপখননার্থ লক্ষ টাকা দান করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দিল্লী দরবারে তিনি "রাজা" উপাধি পাইয়াছেন।

ভ্রমণ—লর্ড কুর্জ্জন এবং লর্ড কিচনার কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশসমূহে ভ্রমণপূর্ব্বক শৈলাবাসে গমন করিবেন।

কলিকাতায় অভিষেকোৎসব—২৬এ জানুয়ারী হইতে ২৮এ জানুয়ারী পর্য্যন্ত স্কুলের বালকদিগের ভোজন, গড়ের মাঠে কাঙালী ভোজন, আলোকপ্রদর্শন ও আতসবাজী হইয়াছে। রাজপ্রতিনিধি লর্ড কুর্জন কাঙালীভোজন ও আলোকপ্রদর্শন পরিদর্শন করিয়াছেন।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী—লর্ড কুর্জন সমারোহে এই পুস্তকালয় খুলিয়াছেন। মেটকাফ হলে যে পুস্তকালয় ছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহার স্বত্ব ক্রয় করিয়া তাহাকে নূতন আকারে গঠন করিয়াছেন। ইহা কলিকাতাবাসীদের মহোপকার সাধন করিবে আশা করা যায়।

বর্দ্ধমানরাজ—মহাসমারোহে বর্দ্ধমান-

রাজ বিজয়চাঁদ মহাতপ বাহাদুরের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ছোট লাট বোর্ডিলন তাঁহাকে 'রাজাধিরাজ' উপাধি দিয়া সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন।

দান—(১) মহিষাদলের মহারাজা মেদিনীপুর কলেজের সহিত একটী ছাত্রাবাস নির্ম্মাণার্থ ৩০ হাজার টাকা দিয়াছেন। ইনি কলিকাতা ইডেন হষ্টেলের জন্যও ৩০ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ইহাঁর বিদ্যোৎসাহিতাকে ধন্যবাদ।

(২) কণিকারাজ রাজনারায়ণ সিংহ কটক হাঁসপাতালের উন্নতি সাধনার্থ ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

(৩) দাতা কার্ণাজীর কর্ম্মাধ্যক্ষ হেনরী ফিপ্স গবর্ণমেণ্টের হস্তে ২০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। লর্ড কুর্জন এই টাকা দেরাদুনে কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং দাক্ষিণাত্যে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন।

রেল কোম্পানীর পৌষমাস—দিল্লী-দরবার উপলক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর ৬ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

স্বামী অভয়ানন্দ—এই মার্কিন মহিলা বয়স্কা রমণী, ধর্ম্মপ্রচারিকা হইয়া 'স্বামী' নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি বেহারে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়া সম্প্রতি কলিকাতার নানা বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের নিকট বক্তৃতা করিতেছেন। ইনি যে প্রেমের তত্ত্ব বুঝিয়া প্রেমের বার্ত্তা-ঘোষণায় নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে আমরা পরমানন্দিত।

মৃত্যু—অধ্যাপক কাউয়েল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকতা ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা কার্য্য করিয়া বিলাতে সংস্কৃত শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। তিনি ভারতহিতৈষী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম।

ভূমিকম্প—রুসিয়ার আন্দিজানে ভূমিকম্পে ৭০০০ লোকের মৃত্যু এবং প্রায় দেড় কোটি রোবল টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। আহতের সংখ্যা স্থির হয় নাই। এখনও ভূমিকম্প চলিতেছে। বড়ই আশঙ্কার বিষয়।

লাহোরে নারী সভা—গত ৯ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে পর্দ্দানসীন মহিলাদিগের এক সভা হয়, তাহাতে প্রায় দেড় শত সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী উপস্থিত হইয়া আমোদ ও বিদ্যালোচনা করেন। মহারাজ দলীপ সিংহের কন্যারাও উপস্থিত ছিলেন।

কনটের ডিউক ও ডচেস—ইহাঁরা দিল্লী দরবার হইতে আগ্রা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। গোয়ালিয়ারে সিন্ধিয়া মহারাজ স্বর্গীয়া মহারাণী বিক্টোরিয়ার যে স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছেন, ডিউক তাহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন।

শাসন পরিবর্ত্তন—ফুলার সাহেবের স্থানে বোল্টন সাহেব আসামের চিফ কমিসনর হইয়া যাইতেছেন।

তুমি কি ?

আজ তুমি শিশু, কাল তুমি বালিকা, দুদিন পরে তুমি যুবতী। আজ তুমি পিতৃ-সংসারে চঞ্চলা কন্যা, কাল তুমি স্বামিগৃহে গম্ভীরা বধূ, দুদিন পরে পুত্র-সদনে প্রবীণা মাতা! অনন্ত কৌশলময় বিশ্বস্রষ্টার বিশাল পরিবর্ত্তনশীল বিচিত্র জগতে তুমিও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীলা। এই যে বলিলাম পিতৃগৃহে তুমি কন্যা, পতি-গৃহে তুমি পত্নী, পুত্রগৃহে তুমি মাতা; দেখ, দৈহিক ক্রম-বিকাশের সহিত, মানসিক বৃত্তির ধীর স্ফুরণের সহিত, হৃদয়ের ক্রম-বিস্তারের সহিত তোমাকে অবস্থা হইতে কেমন অবস্থান্তরে গা ঢালিয়া দিতে হইবে! কন্যাই বধূ, আবার মাতা! অবস্থার বৈষম্যের এই প্রকার তীব্র ঘাত-প্রতি-ঘাতে তোমার দুর্ব্বল হৃদয় স্থির রাখিতে হইলে অতি পূর্ব্ব হইতেই তোমাকে সাব-ধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। তোমাকে শিক্ষার অধীন হইতে হইবে। এ শিক্ষা সেলি অথবা বায়রণ, কালিদাস অথবা সেক্ষপিয়ারের উপর ততটা নির্ভর করে না। সুশিক্ষিতা হইবার আকাঙ্ক্ষাকে সংসারের নিত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে ও প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় চরিত্রের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিতে পারিলে দেখিতে পাইবে—সমগ্র সংসার তোমার শিক্ষক। তোমার শিক্ষা যেখানে সেখানে। এই 'যেখানে সেখানে ছড়ান' শিক্ষা তোমাকে আদর করিয়া কুড়াইয়া লইতে হইবে, যত্ন করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু আবার বলি এই শিক্ষার গুহ্য মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে তোমাকে সৎ গ্রন্থের সাহায্য প্রার্থনাও করিতে হইবে। তুমি যেমন সংসারের নিকট শিক্ষার ভিখারী, তেমনি তোমার শিক্ষার জন্য গ্রন্থ পরিচয়ও অত্যাবশ্যক। সুতরাং ভাল লেখা পড়া শিখিয়া সাধু গ্রন্থকারগণের সাহায্যে তোমার হৃদয় সুগঠিত করিবার যত্ন কর—তুমি পিতৃগৃহে সুকন্যা হইবে, পতিগৃহে সুবধূ হইবে, পুত্রবতী হইলে সুমাতা হইবে।

তুমি রমণীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তোমার জীবন সংসারে বড় মূল্যবান—তোমার জীবনের কর্ত্তব্য বড় ভীষণ! সুতরাং পুরুষ অপেক্ষা তোমার জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অধিক। জীবনের সুপ্রভাতেই তোমাকে শিক্ষার জন্য আকুল হইতে হইবে; শিক্ষার অনন্ত সাগরে গা ভাসাইতে হইবে। যে দিন তুমি শৈশব-সীমা অতিক্রম করিয়াছ, সেই দিনই তোমার ক্ষুদ্র জীবনে কর্ত্তব্যের প্রবল টান পড়িয়াছে! তরল বালিকা বয়সে বুদ্ধি-বৃত্তির স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে, হৃদয়াভ্যন্তরে সুশিক্ষার স্নিগ্ধরশ্মির ধীর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তুমি বুঝিবে তোমার জীবন কত গুরুত্বপূর্ণ—কত দায়িত্ব-পূর্ণ! জীবন উপকূলে দাঁড়াইয়া দেখ, তোমার এ

জীবনের অভিযাত্রা কত দীর্ঘ—কত অনন্ত! ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে তুমি রমণী-জীবন পাইয়া ধন্য হইয়াছ। তাই বাল্য-জীবনে জানিয়া রাখ, রেণু রেণু করিয়া সমগ্র জগৎ তোমার জীবনের রন্ধ্রগত। এক বিন্দু তৈল জলাশয়ের কোন এক দেশে পতিত হইলে যেমন অমনি জলময় বিস্তীর্ণ হইয়া যায়, তোমার জীবন তেমনি সমগ্র সংসারময় বিলীন হইবার জন্য ক্ষুদ্রবিন্দুরূপে পিতৃগৃহে স্থান পাইয়াছে।

পিতৃগৃহে বালিকা-বয়সেই তোমাকে বধূ ও মাতা সাজিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। এ শিক্ষার প্রারম্ভ তোমার পিতৃগৃহে—উন্নতি ও সমাপ্তি তোমার পতিপুত্রগৃহে। যে দিন ভগবৎ-প্রসাদে ক্রোড়ে সন্তান রত্ন লাভ করিবে, সেই দিন আবার তোমার জীবনে নূতন স্রোত বহিবে। তুমি সে দিন নিজে নিজের শিক্ষক, তোমার সন্তানের শিক্ষক; সুতরাং তোমার দেশের শিক্ষক।

স্ত্রী-জীবনের এই অংশ সকল দেশের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয়—ভগবৎকৃপার অমৃতময়ী ধারা। সরোজিনীর পুত্র নলিনীর পুত্র, শৈলজার পুত্র, কমলের পুত্র এই সকলের পুত্র লইয়াই ত সমাজ— এই সমাজ লইয়াই আবার দেশ। যদি সরোজিনীর সুশিক্ষার ফলে তাহার পুত্রটি রত্ন হয়, যদি নলিনীর সুশিক্ষার ফলে তাহার পুত্রটি রত্ন হয়, তবে এমনি করিয়া সমাজ রত্নময় হইবে না কেন? দেশ রত্নময় হইবে না কেন? আর দেশ এত রত্নময় হইলে তাহা উন্নত ও উজ্জ্বল হইবে না কেন? ঈশ্বরচন্দ্রের মাতা বিদ্যাসাগর প্রসব করিয়া সমাজ ধন্য করিয়াছেন— দেশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। অপরিচিত রামকান্তকে তৈয়ার করিতে মেদিনী পাটনীর যত পরিশ্রম হইয়াছিল, বিদ্যাসাগরকে তৈয়ার করিতে ভগবতী দেবী তাহার শতগুণ অধিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহাই সুশিক্ষা লাভের ফল। ইহাই সুশিক্ষা প্রদানের ফল। এমনি পুণ্যশ্লোকা মাতা পাইতে সমাজের একান্ত বাসনা। যাঁহারা সমাজকে বিদ্যাসাগর, ওয়াসিংটন ও গ্রেকাইয়ের মত পুত্র উপহার দিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সুযোগ্যা জননী। এই শ্রেণীর মাতার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য সমাজের সুমাতার অভাব হইয়াছে, তাই আজ আমাদের সমাজ পতিত—আমরা পতিত।

তোমাকে সুমাতা হইতে হইবে। তজ্জন্য কচি বয়স হইতেই বিশাল আয়োজন কর। একদিন দুই দিনের চেষ্টায় সমাজের অধিষ্ঠাত্রী জননী হইবার ইচ্ছা বিড়ম্বনা। আশৈশব পিতৃগৃহে জনক জননী, ভ্রাতা ভগ্নী, শ্বশুরগৃহে শ্বশুর শ্বশ্রূমাতা, স্বামী ও তুমি—এ সকলের ঐকান্তিক যত্নের সমবায়ে তুমি সুবধূ ও সুমাতা হইতে পার। কিন্তু এ সকলের মধ্যে তোমার যত্নই অগ্রগণ্য হইবে। অপর সকলের যত্ন অবলম্বনমাত্র করিয়া তোমার যত্ন ধীরে ধীরে সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইবে।

তাই পিতৃগৃহে এ মহাযজ্ঞের আয়োজন কর—পতিগৃহে ইহার উদ্যাপন করিও। পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী—ইহাঁদের সাহায্য লও। শৈশবের খেলা শীঘ্র শীঘ্র ভুলিয়া যাও, বাল্যের চাঞ্চল্য পরিহার কর। সংসারে যোগিনী সাজ, কর্ত্তব্যের অনুরাগিণী হও। যাহা সাধু, তাহা হৃদয়ের আভরণ কর; যাহা সদ্‌গুণ, তাহা প্রাণের সহচর কর। নিজে পবিত্রচারিণী হইয়া ভগবৎ-পদে চরিত্রবান্ সন্তানের প্রার্থনা কর। শ্রীভগবান্ নিজে পুরোহিত হইয়া তোমার এ মহাযজ্ঞের সমাপ্তি করিবেন। তোমার জীবন ধন্য হইবে—তোমার সমাজ ধন্য হইবে—তোমার দেশ ধন্য হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

পঞ্চপাণ্ডব-গুহা

ভারতবর্ষের হিন্দু তীর্থগুলির মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব-গুহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এই তীর্থ স্থান মধ্যভারতবর্ষে অবস্থিত। এলাহাবাদ হইতে 'বম্বে মেলে' যাও, ১০।১১ ঘণ্টার মধ্যে পৌছিবে। তৎপরে টাঙ্গায় যাইলে এই স্থানে পৌঁছিতে পারা যাইবে। পাহাড়ের বিশাল দেহ কাটিয়া, সমতল জমীর উপর দিয়া, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ ক্ষুদ্র অরণ্যানীর পার্শ্ব অথবা মধ্য দিয়া, নীলগগনস্পর্শী সুশ্যামল পর্ব্বতশ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া মেলখানি যাইবে। প্রকৃতির অনবগুণ্ঠিত মুক্ত সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মনে যেমন বিস্ময় ও পুলক উদিত হইবে, তেমনি ভক্তি ও ভয় আসিয়া হৃদয়খানি প্রণত করিয়া দিবে। তার পর 'মেল' 'পিপরিয়া' ষ্টেশনে পৌছিবে—সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া রাত্রি ২টার সময় ডাক টাঙ্গায় যাত্রা করিলে প্রাতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিতে পারা যায়।

পচমড়ি একটী ক্ষুদ্র শৈল, স্বাস্থ্যনিবাসের জন্য অনেক ইংরাজ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী এখানে আসিয়া থাকেন। শৈলই বা বলি কেন? অধিত্যকা বটে; তিন দিকে প্রাচীর স্বরূপ পর্ব্বতস্তূপ সগর্ব্বে উন্নত-মস্তকে দণ্ডায়মান আছে। স্থানটী উচ্চভূমিতে অবস্থিত—শীত গ্রীষ্মের সমতা হেতু স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; অনেক সাহেব সুবা বৎসরের অধিকাংশ সময়ই এখানে অতিবাহিত করেন। রুগ্ন গোরাদিগের ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনঃ সংস্কার জন্য এখানে একটী গোরানিবাস আছে। এখানকার লাল প্রস্তরের পাহাড় বৈজ্ঞানিকদিগের একটী আলোচ্য বিষয়।

প্রধান দেশের আরণ্য দৃশ্যের পূর্ণতা যদি কেহ দেখিতে চাহেন, তবে এখানে আসিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে! যাহা হউক এই ক্ষুদ্র শৈলাধিত্যকার বর্ণনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং সে বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম।

পচমঢ়ির প্রধান দেখিবার ও ভাবিবার বিষয় "পাণ্ডবগুহা"। পর্ব্বতের দুধারে দুসারি গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োবিংশতিটী গুহা দেখা যায়। বেলা ৩টার সময় আমরা কয়েকটী যাত্রী এই তীর্থ দর্শনার্থ গিরিআরোহণ করিলাম। বৈশাখ মাস—আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। খুব দূরে ক্ষুদ্র শৈলশৃঙ্গের মত একখণ্ড মেঘ দৃষ্ট হইল। কাল বৈশাখীর ভয় করিয়া আমরা প্রথমে গমনে ক্ষান্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু সঙ্গী পাণ্ডা আমাদিগকে নির্ভয় করিয়া গমনে আরও উৎসাহিত করিল। কাজে কাজেই আমরা গিরি-আরোহণ করিতে লাগিলাম। আধ মাইল পর্য্যন্ত উঠিয়া আমরা কতিপয় বৃহৎ গহ্বরে প্রবেশ করিলাম। এক প্রান্ত হইতে পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলাম। চারি দিকে অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য প্রস্তর-ভিত্তি! পার্শ্বে চাহিলাম, কি চমৎকার দৃশ্য! সম্মুখে—বহুদূরে কেমন শ্যামল তৃণক্ষেত্র! পার্শ্বে এক একটী গিরিশৃঙ্গ, অনন্ত গম্ভীর ভাবে নীলাকাশকে ভ্রূকুটী করিতেছে! অস্তগামী ভানুকিরণে কে যেন সুবর্ণরাশি গলাইয়া সেই সকল শৃঙ্গের মস্তকে ঢালিয়া দিয়াছে। পর্ব্বতের গাত্র দিয়া রজত সূত্রবৎ তটিনী খুব সূক্ষ্ম দেখাইতেছিল,—শ্যামবর্ণের বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া রাজপথ এক সূক্ষ্ম সরল রেখার মত চলিয়া গিয়াছে। বন্দীর পক্ষে মুক্তি কতদূর বাঞ্ছনীয়, এই অচ্ছেদ্য প্রস্তরমণ্ডিত কারাগারে দাঁড়াইয়া বাহিরের প্রকৃতির লীলাময় মধুর মুক্তদৃশ্য দেখিলেই সহজে অনুমিত হইবে। প্রথম গহ্বর ছাড়িয়া দ্বিতীয় গহ্বরে প্রবেশ করিলাম। এই গহ্বরটী প্রথমটী অপেক্ষা আরও অবরুদ্ধ। গহ্বরের প্রবেশ-পথে এক প্রকার টপ্ টপ্ শব্দ শুনিতে পাইলাম; বুঝিলাম পর্ব্বতের উপর হইতে জল পড়ার শব্দ হইতেছে। গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইলাম যেন কোথায় দূরস্থিত মেঘগর্জ্জনবৎ ভীষণ অশ্রান্ত রব হইতেছে। পাণ্ডা বলিল "বাহিরে ঝড় উঠিয়াছে।" প্রথম ও দ্বিতীয় গহ্বরে দর্শনীয় তেমন কিছুই নাই। তৎপরে তৃতীয় গহ্বরে প্রবেশ করিলাম। এই গহ্বরটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ—শান্ত—নির্জ্জন। নির্জ্জনোপাসকের পক্ষে আরাধনার প্রশস্ত নিকেতন। ইহার মধ্যে কথা কহিলে ২।৩ মিনিট পর্য্যন্ত তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। প্রাণের দেবতাকে প্রাণের আগ্রহে ডাকিতে হইলে, স্থান এই। গুহা স্বভাবজ নহে, পর্ব্বতাঙ্গ কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। গুহাটী সমচতুষ্কোণ, আয়তনে ১৬০০ বর্গ ফিট হইবে। ইহার মেজে খটখটে—তিন পার্শ্বে প্রায় ১০টী ঘর, সম্মুখে সুবৃহৎ দালান। গহ্বরে একটী দেবীমূর্ত্তি আছে, লোকে তাহাকে সর্ব্বমঙ্গলার মূর্ত্তি বলিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি বৌদ্ধ ও জৈন দেবমূর্ত্তি অযত্ন-রক্ষিত অবস্থায় কালের করে পতিত। মূর্ত্তির অনেক স্থল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম,

নবম গুহাগুলি সামান্য—বর্ণনার যোগ্য নহে। দশম গুহাটী তৃতীয় গুহার ন্যায়। তার পরের গুলি অতি সামান্য। ষোড়শ গহ্বরটী অনেক উর্দ্ধে স্থিত—লৌহ সোপান সাহায্যে তথায় উঠিতে হয়—গহ্বরটী জলে পূর্ণ। গুহার ভিত্তির গাত্রে একটী বৌদ্ধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। অষ্টাদশ গহ্বরটী সুবৃহৎ দালান। পূর্ব্ব দিকে একটী দশহস্ত পরিমিত গুম্বজাকৃতি স্তম্ভ—বৌদ্ধ কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া ঠিক্ অনুমিত হয় না। ২০ নং গহ্বরটীতে একটী বৃহৎ রঙ্গ করা মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তির স্থানে স্থানে রঙ্গ চটিয়া গিয়াছে। ২২ নং গহ্বর অনেক উচ্চে—এখানে উঠিবার জন্য লৌহ-সোপান আছে। এখানে অনেক গুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। পাণ্ডা, এই স্থানকে "ইন্দ্রসভা" বলিয়া বুঝাইয়া দিল। ২৩ নং গহ্বরটী সামান্য, বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য নহে।

রাত্রিতে এ সকল গুহায় কাহারও অবস্থান করিবার যো নাই; গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। শুনিলাম পূর্ব্বে কোন গুহাবাসী একজন দর্শকের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, সেই জন্যই এইরূপ নিয়ম হইয়াছে। গুহায় উঠিতে পথে নানা প্রকার লেবু, আতা ও কয়েক প্রকার সুমিষ্ট ফলের বৃক্ষ আছে।

সাধক! যদি প্রাণের দেবতাকে ডাকিতে চাও, এখানে এস; নির্জ্জন, শান্ত, পবিত্র প্রকৃতির রম্যাবাসে প্রাণের আরাধনা স্বতঃই উছলিয়া উঠিবে! প্রাণ ভরিয়া গম্ভীর স্বরে ধ্বনি উঠিবে "কোথায় তুমি! দেবতার মত দেবতা তুমি কোথায়? তোমাকে কি পাইব না? পাপতাপপূর্ণ সংসার চাহি না; মানব জীবনের উচ্চা-কাঙ্ক্ষাপূর্ণ যশোমান চাহি না। সুখ দুঃখের লীলা-তরঙ্গে আর ভাসিব না। এখানে বসিয়া তোমাকে ডাকিব। হে অনন্ত সুন্দর! হে অনন্ত ব্রহ্ম! হে শান্ত দেবতা! তোমাকে নমস্কার! তুমি মধুর! তোমার নাম মধুর, বাঙ্মন-জ্ঞানাতীত অচিন্ত্য তুমি অনন্ত সুন্দর।"

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গুহার আবিষ্কারক কাপ্তেন ফরসাইথ এখানে তাম্বু ফেলিয়াছিলেন। এই সকল গুহায় যে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে বাস করিয়াছিলেন, তৎপক্ষে পাণ্ডবগুহা নাম ব্যতীত অন্য কোন নিদর্শন নাই। পর্ব্বত গাত্র কাটিয়া প্রস্তুত এই সকল গুহা বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য এবং অর্থব্যয়ের পরিচয় দিতেছে।

পাণ্ডবগণ যেরূপ নিঃসম্বল ও দরিদ্র অবস্থায় বনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের দ্বারা এতাদৃশ বহুল ব্যয়সাধ্য দুষ্কর কার্য্য সমাহিত হওয়া কখনই সম্ভাব্য নহে। ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহারা এই স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন এই সকল গুহা চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। হইতে পারে গুহার মধ্যে বৌদ্ধ মূর্ত্তির বাহুল্য দেখিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু গুহা মধ্যে হিন্দু

দেবমূর্ত্তিরও অভাব নাই। অধিকন্তু দুই একটী হিন্দু দেবীমূর্ত্তি বৌদ্ধমূর্ত্তি অপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ।

তীর্থযাত্রা।

(৪৭৩-৭৪ সংখ্যা—২৭৬ পৃষ্ঠার পর)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—বিদায়।

রজনী ঘোরা, দ্বিপ্রহর অতীত। সমস্ত জগৎ নিদ্রিত—নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কুলবালা পথ ঘাটের সহিত নিতান্ত অপরিচিতা মণিমালা, আজ একাকিনী দুঃসহ বেদনা ও হতাশা-ভর মস্তকে লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা। তাহার রমণী-জীবনে আজ নির্ভীকতা উদ্দীপ্ত। চোর দস্যু হিংস্র জন্তু কেহই আর মণিমালার পথ রোধ করিতে ইচ্ছুক নহে। উপরে নক্ষত্রময় আকাশ, নীচে জননীসমা ধরিত্রী এখনও তাহাকে বক্ষে ধরিয়া টানিয়া বেড়াইতেছে। এই সঙ্গি-হীন নিবিড় রজনীতে মণিমালার সহায় কে? কেবল চন্দ্রমা সহস্র কিরণমালা প্রসারিত করিয়া "আয় আয়" বলিয়া ডাকিতেছেন। কিন্তু মণিমালার আর সে অবস্থা নাই, চাঁদের শোভা দেখিয়া, পাখীর গান শুনিয়া, মেঘের সহিত বিদ্যুতের খেলা দেখিয়া আর সে ভুলে না। তাহার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান সেই গঙ্গার অতল জলে। প্রশস্ত রাজপথে দুধারি বৃক্ষশ্রেণী সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া মণিমালার কাহিনী শুনিতে উদ্‌গ্রীব, কিন্তু সে কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছে, যেন তাহার পথপ্রদর্শক অগ্রে অগ্রে গিয়াছে।

গিরিবরের বাটীর কিছু দূরে স্বচ্ছ-সলিলা গঙ্গা, পথও বক্র নহে। খানিক পথ গিয়া সম্মুখেই কলনাদিনী বহিয়া বহিয়া যাইতেছেন, শুভ্র চন্দ্রালোক গঙ্গাবক্ষে সোনালি ভূষণ হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছে। মণিমালা রাজপথ অতিক্রম করিয়া কাঁচা রাস্তায় পা দিলেন, অমনি পায়ে যেন তীরস্থ শীতল বালুকা-কণা স্পর্শিয়া গেল। দুই পার্শ্বে শ্বেত বর্ণের বুরুজ, তাহার পশ্চাতে বৃহৎ দালান দুই খানি, গঙ্গাবাসীরা ঐখানে থাকিতে পারেন। বিদেশী ভিখারী সন্ন্যাসীরা আসিয়া উহাতে আশ্রয় লইয়া থাকেন। মণিমালা দ্বিপ্রহর রজনীর গাঢ় তামস ভেদ করিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন ও একবার সেই আয়ত লোচন দুটি ঘুরাইয়া চারি দিকে চাহিলেন। সমুদয় শূন্য ও নীরব, তখন ঊর্দ্ধ দিকে করযোড়ে ভগবানকে প্রণাম করিয়া দুই হস্তে বক্ষঃস্থল চাপিয়া সেই নীরব বাহিনীকে

জাগাইয়া তাহার বক্ষে ঝাঁপ দিলেন। নিস্তরঙ্গ জলরাশির উচ্ছ্বসিত শব্দে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল—গগনবাসী চাহিয়া দেখিল,সমীরণ গাইয়া ডাকিল—অদূরস্থিত বৃক্ষশাখায় বিহঙ্গম সভয়ে পাখা নাড়িল; এবং গঙ্গাতীরবাসী ভিখারী সন্ন্যাসিগণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। রঘুনাথের ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি অবিলম্বে উঠিয়া পার্শ্বের সোপান দিয়া নামিয়া দেখেন কিছু ভাসিয়া যাইতেছে—মনুষ্য-দেহের মতন, কিন্তু তাহাতে জীবনের কোনও চিহ্ন নাই। কি ব্যাপার জানিবার ইচ্ছায় তখনি জলে নামিয়া সন্তরণ দিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। কি আশ্চর্য্য! কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর মলিন ছায়া ভেদ করিয়া মণিমালার মুখ-জ্যোতি বিকীর্ণ! রঘুনাথ তখনি শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু আর ছাড়িতে পারেন না। অগাধ গঙ্গাজলে দুজনে ভাসিতেছেন। মণিমালা রঘুনাথের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কহিলেন "আবার কোন্ রাহুর কবলে পড়িলাম? এ জীবনে কি অনলে জলেও জ্বালা যাইবে না? বিভু! এত পাপও সঞ্চিত এখনও।" এই বলিয়া রঘুনাথের হাত ছাড়াইয়া ভাসিতে চেষ্টিত। সেই সুগম্ভীর নিশাতে গঙ্গাবক্ষে বহুদিনের বিযুক্ত দম্পতী মিলিত, কিন্তু এখনও সংশয় ঘোরে মগ্ন। প্রণয়িনীর মুখখানি দেখিবামাত্র রঘুনাথের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইল। কেবল মাত্র একটী বাক্য উচ্চারিত হইল—"ক্ষমা কর।" প্রাণপণে টানিয়া সাঁতার দিতে দিতে তীরে পৌঁছিলেন! মণিমালা স্বামীর কণ্ঠস্বরে তাঁহার পরিচয় পাইয়া সেই শীতল সৈকতে আর্দ্রবস্ত্রে সিক্ত কেশরাশি ছড়াইয়া রঘুনাথের পাদপ্রান্তে লুটাইয়া সজলনয়নে নৈশগগনভেদী করুণস্বরে কহিলেন "নাথ! অন্তিমে চরণে রাখিবেন; আমার জীবন ধন্য এখন। আমি জীবনে ও মরণে আর কোনও আকাঙ্ক্ষা করি না। অদ্য এই জাহ্নবী-তীরে আমার জীবনের প্রধান ব্রতের উদ্যাপন হইল। আমি মহা অপরাধিনী, পরগৃহবাসিনী। আমি কি বলিয়া ক্ষমা চাহিব?" পুষ্প আতপতাপে তাপিত হইয়া বিবর্ণ হয়, কিন্তু তাহার পূত গন্ধ কি বিকৃত হয়? সতীর পবিত্রতা কে হ্রাস করিতে পারে? বিপদ-শরণ সর্ব্বত্রই তাহার রক্ষক। নির্ম্মল গঙ্গা-জল কখনও দূষিত নহে। মণিমালা ক্ষীণ মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আজ এই পীড়িত ভারাক্রান্ত অধম জীবন তাহাতেই সঁপিতে আসিয়াছিলাম। কেন আর ফিরাইলে অভাগীকে? সংসারের শত দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা অপমান ও প্রভৃত বিপদ কাহার জন্য বহন করিয়া এই সামান্য তৃণবৎ জীবন রাখিয়াছিলাম? সে কেবলত ঐ চরণ চাহিয়া! কিন্তু জানিতে পারিলাম —বুঝিতে পারিলাম—এ হতভাগা রমণী নির্দ্দোষ হইলেও জগতে বিশ্বসনীয় নহে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সীতা দেবী যখন লোকগঞ্জনা হইতে রক্ষা পান নাই, তখন আমি কোন্ ছার! রঘুনাথ অনুতপ্ত হইয়া কেবল নীরবে চক্ষের জল ফেলিতেছিলেন,কিন্তু আত্মসংবরিতে পারিলেন না—মণিমালার মরম-বেদনা

আজ যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, "আর নয়, ক্ষমা কর। এই পূত সুরধুনীতীরে সকল ব্যথা ক্ষত ধুইয়া যাক্।" "আইস" বলিয়া পদতল হইতে তুলিয়া লইলেন। সরলা মণিমালা স্বামীর একটী মধুর আহ্বানে সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন আনন্দাশ্রু বিগলিত হইয়া মুখ বুক ভাসিয়া গেল। ক্রমে রজনীর অন্ধকার সরিয়া যাইতে লাগিল। একে একে চন্দ্র তারা বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্তরালে থাকিয়া মণিমালা ও রঘুনাথের মিলন দর্শন করিতে লাগিলেন। পদ্মমুখী উষাবালা সহর্ষে মঙ্গল-গীতি গাইয়া প্রভাতের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। প্রাতঃসমীরণ আনন্দে গঙ্গাবক্ষে নাচিয়া গেল। তীরস্থ দম্পতী-হৃদয়েও জাহ্নবী-হিল্লোলের মত প্রবল দুঃখ-বাত্যার পরে সুখ হিল্লোল বহিতে লাগিল। নবীন রবি মুক্ত জ্যোতিতে সতীর পবিত্র ছবি জগতে প্রকাশ করিল!

সমাপ্ত।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

রাজ-রাণী।

অনেক দিনের কথা—
　　অনেক দিনের শেষে,
চতুর্থীর চারু চাঁদ
　　হাসিল বিনোদ বেশে।

২

কি যেন অমিয় পিয়ে
　　পাপিয়া গাহিল গীতি,
সমীরণ ঢেলেছিল
　　কার যেন সুখস্মৃতি;

৩

ফুলে ফুলে ফুলময়ী
　　হয়েছিল বসুমতী,
তটিনী চলিল ধীরে
　　যে দেশে সাগর পতি;

কি যেন আনন্দস্রোতঃ
　　উঠেছিল উছলিয়া,
মরতের মলিনতা
　　দিয়েছিল ডুবাইয়া!

৫

সবি আলো, সবি শোভা,
　　সবি পুণ্য পবিত্রতা,
সারা ধরা ভরা যেন
　　স্বরগীয় অমরতা!

৬

তেমনি সময়ে মরি!
　　শত সাধনার নিধি,
পথের কাঙ্গালী মোরে
　　সাধিয়া দিলেন বিধি

কি যে করি কোথা রাখি
কি বা যোগ্য ব্যবহার,
কেহ নাহি বলে দিল
সেই শুভ সমাচার।

সে যে কি অতৃপ্ত সুখ—
সে যে কি পবিত্র আশা,
জগত শেখেনি আজো
সে কথা কহিতে ভাষা!

অতুল অমূল্য রত্ন
ভিখারী পাইল হাতে,
বিধাতার স্নেহামৃত
পড়িল মানব-মাথে!

১০

কি এক অমৃত ঢেউ
উছলিয়া, উচ্ছ্বসিয়া,
আমার "আমিত্ব" টুকু
দিয়াছিল ডুবাইয়া!

১১

আপনি আপনা প্রতি
সম্ভ্রমে দেখিনু চেয়ে,
শোক তাপ পাপহীনা
যেন দেবতার মেয়ে;

১২

নাহি জরা নাহি মৃত্যু
নাহি তার অবসান,
অমৃত অমৃতময়
এ হীন মলিন প্রাণ!

১৩

তুচ্ছ রাজ্য, তুচ্ছ যশঃ—
সবি তুচ্ছ তার কাছে,
জানিনা তো ত্রিভুবনে
কি আর তেমন আছে?

১৪

সেই দিন বিশ্ব মোর
হয়েছিল রাজধানী,
সেই এক দিনে শুধু
হয়েছিনু রাজরাণী!

১৫

তার পরে?—আজি আমি
পথ-ভিখারিণী মেয়ে,
তবু সে গৌরব-সুখ
উঠিছে ধমনী বেয়ে।

শ্রীমা—

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

১। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের অন্তঃপাতী ইলিয়ন নামক রাজ্যের উদ্ভিজ্জ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এরূপ একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, তন্মধ্যে সর্ব্বদাই উষ্ণপ্রধান দেশের বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বর্ত্তমান থাকিবে এবং উষ্ণ-প্রধান

দেশের সুস্বাদু ফলের বিবিধ বৃক্ষ রোপণ করিলে তুষার পতন দ্বারা ঐ সকল বৃক্ষের কোনরূপ হানি হইবে না। ঘরে বসিয়া ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, আফ্রিকার বিবিধ ফল ভক্ষণ করিতে পারিবেন, আমেরিকাবাসিগণ এই আশায় আশান্বিত হইতেছেন।

২। অন্যূন ত্রিশ হাজার স্ত্রীলোক পারিস্ নগরীতে কৃত্রিম পুষ্প প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কাগচ বা কাপড় দ্বারা এই সকল পুষ্প প্রস্তুত হয়। মস্তকাবরণ ও অন্যান্য দ্রব্যের শোভা সম্পাদনার্থ এই সকল পুষ্প ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পারিসের মহিলাগণ কৃত্রিম গোলাপ পুষ্প যেমন সুন্দর-রূপে প্রস্তুত করিতে পারেন, ইয়োরোপের অন্য কোন স্থানের মহিলারা তদ্রূপ পারেন না।

৩। আমেরিকায় চিঠির লেফাফা প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েকটী বড় কারখানা আছে। প্রতি দিবস এই সকল কারখানায় সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ লক্ষ লেফাফা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৪। অরিগন্ নামক স্থানের আদিম-নিবাসীদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, ভূমি বিক্রয় করিলে মহাপাতক-গ্রস্ত হইতে হয়। এই বিশ্বাস প্রচলিত থাকাতে ঐ দেশের অধিকাংশ লোকের মধ্যে শোচনীয় দৈন্যাবস্থা দেখা যায় না।

৫। ইংলণ্ড ক্রমে কৃষিকর্ম্মে বিশেষ অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। শস্যের জন্য ইংলণ্ডকে অপর দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতবর্ষ, আমেরিকার যুক্ত রাজ্য, রুশিয়া এবং আষ্ট্রেলিয়া হইতে ইংলণ্ডে প্রতিবৎসর বহুল পরিমাণে শস্য রপ্তানি হইয়া থাকে।

৬। বসন্ত-নিবারক টীকার সাহায্যে কতকগুলি ভিষক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "একটী স্থানে টীকা লওয়া এবং তিন চারি স্থানে টীকা লওয়ার ফল সমান", অনেকের এই যে বিশ্বাস আছে, তাহা তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতার বিরোধী। জর্ম্মণির লোকেরা হস্তের সাত আট স্থানে টীকা লইয়া থাকে, এই জন্যই নাকি জর্ম্মণিতে টীকা দিবার অপেক্ষাকৃত সুফল দেখা যায়।

৭। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন সিংহ ও ব্যাঘ্র বেশ-বিন্যাসের প্রতি বিশেষ মনোযোগী। তাহারা সম্মুখের পদযুগের থাবা দুইটী জলসিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা মস্তক, মুখমণ্ডল এবং কর্ণদ্বার ও পার্শ্বদেশ মুছিয়া থাকে। এইরূপে মুছিবার পর দেখা যায় ঐ সকল অঙ্গের কেশগুলি সুবিন্যস্ত হইয়া গিয়াছে। জিহ্বা দ্বারা সমস্ত শরীরের কেশ গুলিকে ইহারা উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময় করে। সম্মুখস্থ পদযুগের থাবাদ্বয় এবং জিহ্বা ইহাদিগের ব্রুস ও চিরুণির কার্য্য করে। ব্যাঘ্র ও সিংহের ন্যায় বিড়ালকেও ঐরূপ বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হইতে দেখা গিয়া থাকে।

৮। আফ্রিকার নদীসমূহে তিনটী অদ্ভুত বিশেষত্ব দেখা যায়। প্রথমতঃ

উহারা নিকটস্থ সমুদ্রে পতিত না হইয়া দূরতম সমুদ্রে মিলিত হয়; দ্বিতীয়তঃ, নদীগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত দেখা যায়; তৃতীয়তঃ উহাদিগের মোহানায় অসংখ্য চড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

৯। জাপানীদিগের মধ্যে প্রথা আছে যে, বয়ঃক্রম গণনা করিতে হইলে নব বর্ষের প্রথম দিন হইতে হিসাব করিতে হইবে। যে শিশু জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় দিবসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারও বয়ঃক্রম পর বৎসরের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন হইতে গণনা করা হয়।

১০। সিচেলিস্ দ্বীপে এক জাতীয় বৃক্ষ আছে, তাহা "যুগল বৃক্ষ" নামে অভিহিত। ঐ বৃক্ষ এক স্থানে দুইটী ভিন্ন কথনও একটী দেখা যায় না। দুইটী বৃক্ষের মধ্যে একটী যদি বিনষ্ট করা হয়, তাহা হইলে কিছুদিন পরে অপরটীও শুষ্ক হইয়া যায়।

১১। বাজারে যাহা জর্ম্মণ রৌপ্য বলিয়া পরিচিত, তাহার এক তৃতীয়াংশ তাম্র।

১২। একজন চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত বলেন যে, ওলাউঠা রোগের সংক্রামকতা নিবারণ করা অতি সহজ। যদি রোগীর মল কালবিলম্ব না করিয়া দগ্ধ, প্রোথিত বা এরূপ স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়, যেখানে মানব-সমাগম নাই, তাহা হইলে সংক্রমণের ভয় থাকে না। ওলাউঠা রোগের বীজাণু রোগীর মল হইতে যাহাতে বায়ুর সহিত মিলিত না হইতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করিলেই উক্ত রোগের মারীভয় নিবারণ করা যায়।

১৩। মানবের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আমেরিকা ও ইয়োরোপের শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনেক সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু ঐ বিষয়টীর সকল তথ্য এখনও জানা যায় নাই, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস। আমেরিকার কর্ণেল্ নামক স্থানের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক "মস্তিষ্ক সভা" নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য মস্তিষ্ক সম্বন্ধে অজ্ঞাত সত্য সকল নির্দ্ধারণ করা। ইতিমধ্যেই এই সভার চেষ্টায় এক শত সুশিক্ষিত তীক্ষ্মমস্তিষ্কশালী ব্যক্তি তাঁহাদিগের উইলে লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মৃত্যুর পর মস্তিষ্কতত্ত্ব নির্দ্ধারণের সাহায্যার্থ "মস্তিষ্ক সভার" সম্পাদককে যেন তাঁহাদের মস্তক দান করা হয়।

১৪। জলমগ্ন হইলে জীবন রক্ষার জন্য বিবিধ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্প্রতি একটী বিস্ময়কর যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। ঐ যন্ত্রটী দেখিতে একটী ক্ষুদ্র পুস্তকের ন্যায়। জাহাজ বা নৌকার আরোহী উহা পকেটে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে জলযাত্রা করিতে পারেন। ঐ যন্ত্রটী পকেটে করিয়া জলমগ্ন হইলে উহা জলসংস্পর্শে প্রসারিত হয় এবং তিন দিবস কাল পর্য্যন্ত জলনিমজ্জিত-ব্যক্তিকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখিতে পারে।

১৫। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সুইজারলণ্ড প্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় ঘড়ী নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তথায় প্রায় চল্লিশ হাজার লোক ঘড়ী প্রস্তুত কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত আছে।

যুগলচিত্র।

১। ভুবনেশ্বর।

অতীতের সাক্ষী তুমি পবিত্র উজ্জ্বল!
কত যুগ যুগান্তর হয়েছে বিলীন,
রয়েছে মুরতি তব অচল অটল।
তোমার মন্দির ঊর্দ্ধমাথে চির দিন
ঘোষিতেছে বিশ্বে তব মহিমা কেবল,
বাজায়ে সত্যের পূত মধুর বিষাণ।
প্রত্যেক প্রস্তরে তার করে ঢলঢল—
"সত্যমেব জয়তাম্" সঙ্গীত মহান্।
কত যুগান্তের স্মৃতি করিয়া বহন
আনিছে মানব-বক্ষে ও তুঙ্গ মন্দির—
অতীত ও শিল্পগীতি করিয়া স্মরণ—
আপন অস্তিত্ব সত্তা হারায় হৃদির।
ও পূত ছায়াতে আসি তাপদগ্ধ প্রাণ
শান্তি-স্নাত হয়ে পায় শাশ্বত নির্ব্বাণ।

২। খণ্ডগিরি।

কোথা সেই বৌদ্ধদল, সেই বৌদ্ধযুগ হায়!
কালেতে মিশায়ে গেছে জলে জলবিম্ব প্রায়।
সকলি অতীত-গর্ভে নীরবে মিশিয়া যায়,
শুধুই মুছে না কীর্ত্তি থাকে চির এধরায়।
কত যুগ যুগান্তর অতীতে গিয়াছে ভাসি,
উন্নত মস্তকে তব সেই বৌদ্ধ কীর্ত্তি রাশি
অক্ষয় অমররূপে কত স্মৃতি বিতরয়,
কত ভূত ভবিষ্যৎ পলকেতে উদয় !!
অলক্ষ্যে মানবহৃদিতন্ত্রী যেন কে বাজায়
সংসারঅনিত্য-গীতি জাগাইয়া গো-হিয়ায়!
আপনি প্রকৃতি রাণী ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে
খেলিছেন সদা হেথা সখীদলে সঙ্গে লয়ে।
তরুণ অরুণ করে বিশ্ব অনিত্যতা গান
রয়েছে খোদিত হেথা. দেখিলে অবশ প্রাণ;
সংসারসুখের সাধ অনাসে চলিয়া যায়,
বৈরাগ্যে হৃদয় ভরি আবেগে অনন্তে ধায়।

নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

গীতাসার-ব্যাখ্যা

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।৬২

অবশীভূত ইন্দ্রিয়সকলের বিষয় ভোগে চঞ্চল হইয়া যে মন তাহাদের অনুসরণ করে, বায়ু যেমন সমুদ্রে নৌকাকে জলমগ্ন করে, সেই মন সেইরূপ আপনার প্রজ্ঞাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

অসংযত ইন্দ্রিয় সকল মনকে চঞ্চল করিয়া আপন আপন বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত করে;—অসংযত চক্ষু কুদৃশ্য দেখিতে চায়, অসংযত কর্ণ কুকথা শ্রবণে ব্যগ্র, অসংযত জিহ্বা দুষ্ট প্রলাপ ভাষণে রত, অসংযত পদ কুস্থানে ধাবমান হয়, অসংযত হস্ত কুকার্য্য সাধনে ব্যস্ত। এইরূপ অবশীভূত ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব প্রিয় নিষিদ্ধ সুখ ভোগের স্রোতে যখন গা ঢালিয়া দেয়, তখন মন যদি সবল হইয়া কসিয়া হাল ধরিতে না পারে, প্রত্যুত তাহাদের আবেগস্রোতে

আপনাকেও ভাসাইয়া দেয়, তাহা হইলে 'একেতো মন আনাড়ী, তাহে ছ'জন কু-জন দাঁড়ী' দ্বারা যাহা হইবার তাহাই হয় অর্থাৎ তখন আত্মবুদ্ধি, ধর্ম্মবুদ্ধি, বিবেক-বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া সর্ব্বনাশ ঘটে। একটী ইন্দ্রিয় যদি স্বেচ্ছাচারী হইয়া অতিমাত্র প্রবল হয়, তাহাতে বিহুল অনর্থ ঘটে। এক দুষ্ট চক্ষু মনের নিকট সহস্র নরক দ্বার খুলিয়া দিতে পারে, এক দুষ্ট রসনা তাহার কালকূট বিষে সমুদায় সংসারকে দগ্ধ করিতে পারে। এক একটী ইন্দ্রিয় যখন এত অনর্থের মূল, তখন সকল ইন্দ্রিয় নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলে কোন্ মহাপ্রলয় ঘটাইতে না পারে? কেবল বহিরিন্দ্রিয় নয়, কাম ক্রোধ প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয় যাহারা বহিরিন্দ্রিয়ের পরিচালক তাহারা আরও ভয়ঙ্কর। ইন্দ্রিয়চারী মন অন্ধের মত অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয়ের দাস হইলে তাহার আর কোনও পদার্থ থাকে না, সে সকল অনিষ্ট সাধনের সহকারী হয়। প্রজ্ঞা কি না আত্মানাত্ম বোধ, নিত্যানিত্য-হিতাহিত বিবেক। এ বিবেক জিতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত ব্যক্তিতেই সুস্থির ও উজ্জ্বল দেখা যায়। কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির প্রজ্ঞাচক্ষু আবিল ও অন্ধ। ইন্দ্রিয়াসক্ত মন যখন বিবেককে চালাইতে যায়, তখন তাহাকে বিনাশের পথে লইয়া যায়। অকূল সাগরে যে বায়ু অনুকূল হইয়া নৌকাকে ধীর ভাবে চালায় ও গম্য স্থানে উপনীত করে, তাহাই আবার দুরন্ত ঘূর্ণীরূপ ধারণ করিয়া সেই নৌকাকে পাকচক্রে ঘুরাইয়া অতলগর্ভে নিমগ্ন করে। এই অকূল সংসার সাগরে প্রজ্ঞার সহায়তায় মানব নিরাপদে লক্ষ্য স্থানে উপনীত হয়। বিবেক যদি ঠিক্ থাকে, তাহা মনকে বিধিনির্দ্দিষ্ট ন্যায় ও সত্য পথে চালাইয়া পরিণামে ব্রহ্মপদে উপনীত করে। কিন্তু মন যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয় সকলের অনুগত হয় অর্থাৎ আত্মবিবেক-শূন্য হইয়া একবার এ ইন্দ্রিয়, আর বার অপর ইন্দ্রিয়ের স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়, তাহা হইলে পাঁচ দিকের পাঁচ প্রকার তরঙ্গ যেমন ঘূর্ণীরূপ ধারণ করিয়া নৌকাকে জলমগ্ন করে, পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ টানে সেইরূপ পাক চক্র উৎপাদন-করিয়া মনকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে অবশেষে নিরয়গামী করে। নিম্নলিখিত সহজ নীতি গীতারই ভাব প্রকাশ করিতেছে এবং তাহা সর্ব্বদা সকলের স্মরণ রাখিয়া জীবনপথে অত্যন্ত সাবধানে চলা বিধেয়—

"আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্॥"

ইন্দ্রিয় সকলের অসংযমই যত আপদের পথ এবং ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করাই সম্পদের পথ, এখন যে পথে ইচ্ছা সেই পথ ধরিয়া চল।

সারস্বাতোপহারঃ।

বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসু সি, আই, ই, মহোদয়ের অভ্যর্থনা।

প্রকৃত গুণের গৌরব ও সম্মান জাতীয় উন্নতির লক্ষণ। যে দেশের লোক গুণের পূজা না জানে, সে দেশের উন্নতি সুদূরে।

এ বর্ষে সারস্বত সম্মিলনের দিন ভারত-সঙ্গীতসমাজ জগদীশ বাবুর যথোচিত পূজা করিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। জগদীশ বাবু ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তিনি স্বপ্রকাশিত নব প্রচারিত বিজ্ঞানতত্ত্বে যোগদর্শী ভারতীয় ব্রহ্মর্ষিগণের সার সত্যের ঘোষণা করিয়া আমাদের হৃদয়ে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিগত ১৯শে মাঘ সোমবার ভারত-সঙ্গীত-সমাজ-গৃহে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ স্বদেশের সকল সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। বঙ্গের বাছা বাছা রাজা মহারাজা, জমিদার ও বিদ্বন্মণ্ডলী সকলেই সময়োচিত দেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। নাটোরের মহারাজা বাহাদুর, হিজ হাইনেস দি আগাখাঁ, দীঘাপতিয়া রাজা বাহাদুর, কুচবেহারের কুমারগণ, দীঘাপতিয়ার কুমারগণ, নশিপুরের রাজা বাহাদুর, এবং ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও রায় চুণী লাল রায় বাহাদুর-প্রমুখ বহু বৈজ্ঞানিক, রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বিহারী লাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রাজ নারায়ণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বহু ব্যারিষ্টার ও উকীল প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ সর্ব্বসমেত ছয়শতের অধিক লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

সমাজগৃহ পত্র পুষ্পে শোভাময় ও বিদ্যুতালোকে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল।

দ্বারে অভ্যর্থনাকারী ছিলেন পাইকপাড়ার কুমার সতীশচন্দ্র, শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী প্রভৃতি।

সাড়ে চারি ঘটিকার সময় কুচবেহারের মহারাজা বাহাদুর উপস্থিত হন। অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসু তাহার অল্পক্ষণ পরেই আসেন। উভয়েরই পরিচ্ছদ স্বজাতীয়।

প্রথমে গোবরডাঙ্গার প্রসিদ্ধ জমীদার সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন-বিরচিত সরস্বতীবন্দনা গান করেন। তৎপরে "বন্দে মাতরং" গান উচ্চৈঃস্বরে গীত হইল। অনন্তর কুচবেহারের মহারাজ বাহাদুর, অধ্যাপক বসুকে লইয়া আগমন করিলেন। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে, স্বদেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের প্রতিনিধি-রূপে পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়

উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে পরম ব্রহ্মের নাম ও স্তোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বৈদিক বিধি অনুসারে অর্ঘ্য ও মধুপর্ক প্রদানপূর্ব্বক জগদীশ বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তিনি জগদীশ বাবুকে সস্নেহে মালা ও চন্দন পরাইয়া দিলে জগদীশ বাবু অতি বিনীতভাবে কবিরত্ন মহাশয়ের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া সকলেই হর্ষভরে মুহুর্মুহুঃ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর কবিরত্ন মহাশয় স্বরচিত সারস্বতোপহার নামক শ্লোকাবলী পাঠ করিয়া সকলকে পুলকিত করিলেন। যথা ;—

(সারস্বতোপহার।)

মঙ্গলাচরণম্।

দস্যুঃ কৃপালবমুপেত্য বভূব যস্যা-
যোগীশ্বরো মুনিবরঃ প্রথমঃ কবীনাম্।
সচ্চিন্ময়েন মহসা তমসাং নিহন্ত্রী
সা ভারতী বসতু নো হৃদয়াম্বুজেষু॥ ১॥

সৌম্য!

তবোদয়াদ্‌ভারতভূমি-মাতা
মূর্দ্ধানমুচ্চৈঃ কুরুতেঽস্য ভূয়ঃ।
পায়াদপায়াজ্জগদীশ্বরস্ত্বাং
জগৎপ্রকাশং জগদীশচন্দ্র!॥ ২॥

লব্ধস্ত্বয়া যোগদৃশামৃষীণাং
দিব্যঃ প্রভাবো ভগবৎপ্রসাদাৎ।
ধন্যা প্রসূতিস্তব রত্নগর্ভা
ত্বাং রত্নমাসাদ্য বয়ং চ ধন্যাঃ॥ ৩॥

তেজস্ত্বয়া বৈদ্যুতমপ্যধৃষ্যং
বশীকৃতং স্বপ্রতিভাবলেন।
নিয়োজিতং বিশ্বহিতেষু পশ্যন্
প্রীতোঽধুনা নূনং ত্বয়ি বিশ্বধাতা॥ ৪॥

বিজ্ঞানতত্ত্বান্যবগন্তুমীশা-
ন ভারতীয়া প্রতিভাবিহীনাঃ।
কলঙ্কমেবং নিজজন্মভূমেঃ
প্রক্ষাল্য নস্ত্বং গৃহদেবতাসি॥ ৫॥

সৌজন্য-বিদ্যা-প্রতিভান-শৌচৈঃ
ত্বং শিক্ষিতানামসি শীর্ষভূতঃ।
আশ্রিত্য তে বিশ্বজনীনমার্গং
সত্বর বিদ্যাব্রতিনঃ কৃতার্থাঃ॥ ৬॥

পরাত্মনঃ প্রাণময়স্য ভাবাৎ
সপ্রাণমেবাখিলসৃষ্টিজাতম্।
প্রত্যক্ষতো দর্শয়তা ত্বয়ৈতৎ
প্রোদ্‌ঘাটিতা কাপি বিভোর্বিভূতিঃ॥৭॥

যথা সুমেরুর্জলদোপরোধান্
নির্ভিদ্য সর্ব্বান্ পথি বিঘ্নরাশীন্।
লভস্ব সাধো! চরমোন্নতিং ত্বম্
অস্ত্বীশভক্তিশ্চিরসঙ্গিনী তে॥ ৮॥

দিনে দিনে দীনদয়াময়স্য
প্রসাদতস্ত্বাদৃশরত্নসংখ্যা।
প্রবর্দ্ধতাং ভারতবর্ষমেতৎ
জগদ্‌গুরোরাসনমেতু ভূয়ঃ॥ ৯॥

বিজ্ঞানমানোন্নতমস্তকৈস্তৈঃ
পাশ্চাত্য-ধীরৈরপি পূজিতং ত্বাম্।
দৃষ্ট্বা মুদা বিহ্বলচেতসাং নো-
হর্ষাশ্রুধারা নিপতন্তি বেগাৎ॥ ১০॥

ঘনান্ধকারেষ্বিব দিব্যদীপং
ত্বাং বীক্ষ্য নো ভারতভূমি-মাতা।
আশাশতৈরুচ্ছ্বসিতান্তরাত্মা
জাতাদ্য মন্যে পুলকাচিতাঙ্গী॥ ১১॥

বিজ্ঞানাম্বুধিগর্ভতোঽতিবিষমাল্লোকোত্তরং যৎ ত্বয়া

সত্তত্ত্বাদ্ভুতবৈভবং প্রতিদিনং যত্নাৎ সমুন্নীয়তে।

তন্নূনং মণিরত্নকোটিসুষমাং নির্জিত্য বিদ্যোততে

জীয়াস্ত্বং জগদীশ! ভারতধরাসর্ব্বস্ব! লোকে চিরম্ ॥১২॥

তারা ব্রহ্মময়ী ক্ষরাক্ষরময়ী সা চিন্ময়ী যা।

পূর্ণানন্দময়ী সদাশিবময়ী কারুণ্যধারাময়ী।

পাতু ত্বাং জগদীশ! বিশ্বসুমতাকল্যাণ-পুণ্যব্রতং

নিত্যারোগ্যমনন্তমায়ুরতুলাং সিদ্ধিং বিধত্তাং চ তে ॥১৩॥

শ্রীপঞ্চমী-পুণ্যদিনেঽত্র দত্তং

কৃতজ্ঞ-সঙ্গীত-সমাজ-সভ্যৈঃ।

শ্লোকাত্মকং প্রীতিসুধাভিষিক্তং

গৃহাণ ধীমন্নুপহারহারম্ ॥১৪॥

॥ শ্রীজয়োঽভ্যুদয়োঽস্তু ॥

ওঁ তৎসৎ।

অনুবাদ।

মঙ্গলাচরণ।

দস্যু রত্নাকর, যাঁহার করুণা-কণা লাভ করিয়া, যোগীশ্বর, ঋষিকুলেশ্বর ও জগতের আদিকবি হইয়াছিলেন, সেই ভারতী, শাশ্বত জ্ঞানময় তেজে মোহ-তিমির সংহার করিয়া, আমাদের হৃদয়-কমলে বাস করুন। ১।

হে সৌম্য জগদীশচন্দ্র! আজি তোমার উদয়ে জননী ভারতভূমির মস্তক আবার উন্নত হইতেছে। তোমার ন্যায় বিশ্বোজ্জ্বল সন্তানকে জগদীশ্বর অনশ্বর করুন।২।

তুমি ভগবৎকৃপায় যোগদর্শী মহর্ষিগণের দিব্য প্রভাব লাভ করিয়াছ, ধন্যা তোমার রত্নগর্ভা জননী! তোমার ন্যায় রত্ন লাভ করিয়া আমরাও ধন্য! ।৩।

দুর্জ্জয় তেজোরাশি বিদ্যুৎকেও তুমি নিজ প্রতিভাবলে বশীভূত ও বহুবিধ বিশ্বহিত কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া, নিশ্চয় বিশ্ববিধাতার প্রীতি-ভাজন হইয়াছে। ৪।

"ভারত-সন্তানগণের প্রতিভা নাই, উহারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্ভাবনে অক্ষম"—নিজ জন্ম-ভূমির এ কলঙ্ক মোচন করিয়া তুমি আমাদের গৃহ-দেবতা হইয়াছ। ৫।

বিদ্যা, বিনয়, প্রতিভা ও সাত্ত্বিকতাদি গুণে তুমি শিক্ষিতগণের শীর্ষস্থানীয়। এ দেশের বিদ্যার্থি-গণ তোমার বিশ্বজনীন পদবী অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হউক। ৬।

জগতের সমস্ত বস্তুই, প্রাণময় পরমাত্মার সত্তায় অনুপ্রাণিত,—এই আর্ষ সত্য তুমি প্রত্যক্ষ দেখাইয়া, সকলের নিকট ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় বিভূতি উদ্ঘাটিত করিয়াছ! ।৭।*

* এ বিষয়ে জগদীশ্বরের উক্তি, যথা ;—It was when I came upon the mute witness of those self-made records and perceived in them one phase of pervading Unity, that bears within it all things ; the mote that quivers in ripples of light, the teeming life upon our Earth, and the radiant suns that shine above us—it was then that I understood for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago :—

"They who see but one in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs Eternal Truth, unto none else, unto none else."

(Dr. Bose's lecture, given at the Royal Institution, May 10th, 1901.)

গিরিরাজ সুমেরু যেমন নিবিড় জলদজাল ভেদ করিয়া উচ্চতম স্থানে উত্থিত, তুমিও তেমনি পথের অশেষ বিঘ্নরাশি ভেদ করিয়া চরমোন্নতি লাভ কর। হে সাধো! ঈশ্বর-ভক্তি তোমার চির-সঙ্গিনী হউক। ৮।

দীনদয়াময় ভগবানের কৃপায় তোমার ন্যায় রত্নের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হউক, ভারতবর্ষ আবার সমস্ত জগতের আচার্য্য-পদ অধিকার করুক। ৯।

যাঁহারা জগতে বিজ্ঞানবিদ্যার গৌরবে উন্নত-শীর্ষ, সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও আজি সসম্ভ্রমে তোমার সম্মান করিতেছেন দেখিয়া হর্ষভরে আমাদের চিত্ত বিহ্বল হইতেছে, এবং আমাদের নয়ন হইতে বেগে আনন্দাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। ১০।

ঘোর অন্ধকারে দিব্য আলোকের ন্যায় তোমাকে দেখিয়া আজি জননী ভারতভূমির হৃদয় শত শত আশায় উচ্ছ্বসিত ও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইতেছে। ১১।

দুরবগাহ বিজ্ঞান-সিন্ধু-গর্ভ হইতে তুমি অতি যত্নে যে সকল সনাতন তত্ত্ব উদ্ধার করিতেছ, তাহাই জগতের অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ঐশ্বর্য্য; সে ঐশ্বর্য্যের নিকট কোটি কোটি মণিরত্নের প্রভা পরাভূত। হে ভারতমাতার সর্ব্বস্বধন! জগদীশ! তুমি ভুবনে অক্ষয় জয়লক্ষ্মী লাভ কর। ১২।

যিনি ক্ষরস্বরূপা ও অক্ষরস্বরূপা; যিনি চিন্ময়ী ও মৃণ্ময়ী শক্তি; যিনি পূর্ণানন্দময়ী সর্ব্বমঙ্গলা; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া যাঁহার করুণা-ধারা প্রবাহিত; হে জগদীশ! সেই তারা ব্রহ্মময়ী মা তোমাকে বিশ্বের সুমহৎ ব্রতে দীক্ষিত দেখিয়া তোমাকে অক্ষয় আরোগ্য, অনন্ত আয়ু ও অতুল সিদ্ধি দান করুন। ১৩।

হে ধীমন্! আজি শুভ শ্রীপঞ্চমীর বাসরে কৃতজ্ঞ ভারত-সঙ্গীত-সমাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত, প্রীতি-সুধা-সিক্ত এই শ্লোকময় উপহার মাল্য তুমি গ্রহণ কর। ১৪।

অনন্তর কুচবেহারের মহারাজা বাহাদুর —সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ বাক্যে জগদীশ বাবুর গুণবর্ণন করিয়া সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে পট্টবস্ত্রযুগল ও বহুমূল্য শাল প্রভৃতি উপহার দেন। তৎপরে রবীন্দ্র বাবু সাহিত্য-সেবকদিগের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা করিলে ডাক্তার বসু বিনয়নম্র মধুর বচনে উত্তর দিয়া বলেন, —"আমি কি রূপে আপনাদের কার্য্য করিতে পারি ও এই স্নেহের উপযুক্ত হইতে পারি, তাহা আমাকে আপনারা শিখাইয়া দিন।"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রমুখ মহোদয়গণ মধ্যে মধ্যে সুললিত সঙ্গীত দ্বারা সকলের মন মুগ্ধ করেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত অভ্যর্থনা-সঙ্গীত নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

জয় তব হোক জয়!
স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে
যশোমালা অক্ষয়।
বহুদিন হ'তে ভারতের বাণী
আছিল নীরবে অপমান মানি,
তুমি তারে আজি জাগায়ে তুলিয়া
রটালে বিশ্বময়।
জ্ঞানমন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি
যে নব আলোক-শিখা,
তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে
দিল উজ্জ্বল টীকা।
অবারিত-গতি তব জয়-রথ

ফিরে যেন আজি সকল জগৎ।
দুঃখ দীনতা, যা' আছে মোদের
তোমারে বাঁধি না' রয়!

অনন্তর সকলে পরস্পরে পরস্পর প্রেমালিঙ্গন ও প্রীতি সম্ভাষণাদি পূর্ব্বক সভার কার্য্য শেষ করিলেন।

মহাপুরুষ কবীর।

মহাপুরুষগণ দেশের গৌরবস্বরূপ, মানব সমাজের আদর্শ স্বরূপ। তাঁহারা ঘোর তিমিরাবৃত দুস্তর ভবার্ণবে পথভ্রান্ত পথিকের পক্ষে আলোকস্তম্ভ স্বরূপ। যে দেশে তাঁহাদের আবির্ভাব হয়, সে দেশ পবিত্র হয়; তাঁহাদিগের পদবী অনুসরণ করিয়া মানবসমাজ উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে; পাপী তাপী নরনারী তাঁহাদিগের উপদেশানুগামী হইয়া নব-জীবন লাভ করে। যে সকল মহাপুরুষের গৌরবে ভারতভূমি গৌরবান্বিত, কবীর তাঁহাদিগের মধ্যে একজন।

মহাপুরুষগণের জন্মসম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কিম্বদন্তী প্রচলিত দেখা যায়। কবীরের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে যে, স্বীয় বিধবা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার মাতামহ একদিন রামানন্দের নিকট গমন করেন। কন্যাটীকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। "পুত্রবতী হও" বলিয়া তাহাকে তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই আশীর্ব্বাদের গুণে কন্যাটীর গর্ভসঞ্চার হইল। যথা সময়ে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। শিশুটীর মুখশ্রীতে সূতিকাগৃহ উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিল।

একে যুবতী, তাতে পতিবিহীনা; সুতরাং প্রচ্ছন্নপ্রসবা মাতা বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। পুত্র লইয়া কি করিবেন, তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অপযশ ভয়ে তাঁহাকে পুত্রের মায়া ত্যাগ করিতে হইল। অনন্তর পথের ধারে সদ্যঃপ্রসূত পুত্রটীকে রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

"রাখে কৃষ্ণ, মারে কে!!" একজন জোলা সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। একটী সদ্যঃপ্রসূত শিশু পথপার্শ্বে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার মায়া হইল। তাহাকে গৃহে আনিয়া তিনি পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং অপত্যনির্ব্বিশেষে কবীর তাঁহা-দিগের গৃহে লালিত পালিত হইলেন। শশিকলার ন্যায় তিনি দিন দিন বৃদ্ধি প্যাইতে লাগিলেন। তাঁহার অনিন্দ্য মুখ-কান্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রতিবেশীরা তাঁহাকে কোলে করিয়া সুখী হইত। জোলা তাঁহাকে অল্প বয়স হইতেই স্ব-জাতীয় ব্যবসায় শিক্ষা দেন।

জোলার গৃহে কবীরের বাল্যজীবন এইরূপে অতিবাহিত হইল। সাধুবাক্য আছে, "সংসর্গজা দোষগুণাঃ ভবন্তি।"

কিন্তু এই উক্তির যাথার্থ্য সকল সময়ে ও সকল স্থানে দৃষ্ট হয় না। কোকিল-শাবক বায়স-নীড়ে বায়স-শাবকসহ প্রতিপালিত হইলেও বায়সের স্বভাব প্রাপ্ত হয় না— দৈত্যপুরীতে দৈত্য শিশুগণসহ সম্বর্দ্ধিত হইয়াও প্রহ্লাদ দানব-স্বভাববিশিষ্ট হন নাই—মুসলমানের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াও কবীর মুসলমান ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন না। তাঁহার মতিগতি বৈষ্ণব ধর্ম্মাভিমুখী হইল।

"ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু"—ধর্ম্মই সুখ ও শান্তি লাভের একমাত্র উপায় জ্ঞানে কবীর শিষ্যত্ব গ্রহণের মানসে রামানন্দ স্বামীর নিকট গমন করিলেন। কিন্তু রামানন্দ নীচজাতীয় বোধে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অনন্তর তিনি ভগ্নচিত্তে গৃহপ্রত্যাগত হইলেন। কি করিয়া রামানন্দের শিষ্য হইবেন, মনে মনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব বলিতেন, "যখন সময় হয়, তখন আপনাপনি সব যুটে যায়।" একদিন কবীর কাশীর মনিকর্ণিকার ঘাটে শুইয়া আছেন। অল্প রাত্রি থাকিতে রামানন্দ স্বামী গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইলেন। পূর্ব্বদিকে উষার অরুণরাগ তখনও দেখা দেয় নাই। শাখোপরে বসিয়া পাখী তখনও প্রভাতী গান ধরে নাই। স্নানের জন্য রামানন্দ যেমন ঘাটে নামিবেন, কবীরের গাত্রে তাঁহার পদস্পর্শ হইল। শব ভাবিয়া তিনি শশব্যস্তে "রাম কহ, রাম কহ" বলিয়া উঠিলেন। স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া কবীর গৃহে আসিলেন। অনন্তর মস্তক মুণ্ডন ও মালা তিলক ধারণপূর্ব্বক হৃদয়ভাণ্ডারে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ধনুর্ব্বাণধারী জানকীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহারই ধ্যানে ও নামগুণগানে নিমগ্ন হইলেন।

কবীরের মতি গতি দর্শনে তাঁহার পিতা মাতা, আত্মীয় কুটুম্ব এবং প্রতিবেশিগণ বিস্মিত হইল। সকলেই ভাবিল যে, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে; নিশ্চয় তিনি পাগল হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কিসের জন্য পাগল, তাহারা তাহা কিরূপে বুঝিবে?

কবীর রামানন্দের শিষ্য হইয়াছেন, এই কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে একদিন রামানন্দ তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন "আমি আবার তোমায় কবে মন্ত্র দিলাম?" রামানন্দ যবনের মুখদর্শন করিতেন না। চিকের আড়াল হইতে তিনি উক্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলে কবীর বলিলেন, "ঠাকুর! আপনার মন্ত্র কি, রাম নাম না আর কিছু?" রামানন্দ বলিলেন, "রাম নামই মন্ত্র" কবীর সে দিনকার ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমি ঘাটে শুইয়াছিলাম; আপনিই ত আমার মাথা ঠুকিয়া "রাম কহ রাম কহ" বলিয়াছেন। মন্ত্র আর কি প্রকারেই বা দেয়?" অনন্তর রামানন্দ চিকের আড়াল হইতে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরমহংসদেব বলিতেন, "মন্ত্র আর কি? মন তোর গুরু। মন তোর কর্ত্তা। মনই

সব।” মনই কবীরের গুরু হইল—মনই তাঁহার উপদেষ্টা হইল। মনের ঐকান্তিকতার গুণেই তিনি সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া পরে রামানন্দের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য হইয়া উঠিলেন। মনের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! ইহার অভাবে কিছুতেই কিছু হয় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী নিম্নলিখিত পদে তাহার আভাস দিয়াছেন,—

গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবের তিনের দয়া হ'ল।
একের দয়া না হতে জীব ছারে খারে গেল॥

ফুলের সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে মৌমাছিরা আপনা আপনিই আসিয়া যুটে, তাহাদিগকে আর খবর দিতে হয় না! কবীরের ধর্ম্মভাবের কথা ক্রমে সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইল। ধর্ম্মপিপাসু অনেক লোক তাঁহার কাছে জুটিল। তাঁহার গৃহে ভক্তের হাট বসিল। সমাগত সাধু, বৈরাগী ও ফকিরের দলে তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গণ লোকারণ্য হইল। কবির অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি অতি শান্তভাবে ধর্ম্মসাধন করিতেন। লোক-সমাগম তিনি ভাল বাসিতেন না। সাধনাবস্থায় সাধকের গৃহে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সমারোহ বাঞ্ছনীয় নয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে “নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।” কবীরের ভজন সাধনে ক্রমে ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। এদিকে সাধন বিনা তিনি থাকিতে পারিতেন না। কিসে তাঁহার গৃহে এই জনতা, এই লোকসমারোহ বন্ধ হয়, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। উপায় স্থির হইল! পরমহংসদেব বলিতেন “লোক পোক—অর্থাৎ লোককে পোকার মত ভাবিয়া লোকাপবাদে ভীত হইয়া ধর্ম্মসাধনে বিরত হইবে না। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—এ তিন্ন থাকতে নয়।” কবীর লোকাপবাদকে ভয় করিতেন না। সম্মান বা অসম্মানের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। সাধন ভজনই তাঁহার প্রকৃত সম্পদ ছিল।

একদিন তিনি একটী বেশ্যার স্কন্ধে এক হস্ত অর্পণ এবং অন্য হস্তে জলপূর্ণ একটি পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দর্শনে সকলেই বিরক্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিল। কবীরও নিশ্চিন্ত হইয়া নির্জ্জনে থাকিয়া সাধনভজনে অধিকতর মনোনিবেশ পূর্ব্বক সিদ্ধি লাভ করিলেন। পরম হংসদেব বলিয়াছেন, “দুগ্ধে মাখম আছে, কিন্তু মন্থন চাই। কাটের মধ্যে অগ্নি ও তিলের মধ্যে তৈল আছে, তদ্রূপ এই দেহের মধ্যে ঈশ্বর আছেন, সাধন চাই। নির্জ্জনে তাঁকে ডাক—দেখা দাও বলে, তাঁর দর্শন পাইবে।”

একদিন কবীর পথে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন যে, এক স্থানে এক যোড়া চাকি ঘূর্ণিত হইতেছে। তাহার মধ্যগত কোন বস্তুই অখণ্ড নির্গত হইতেছে না; সবই চূর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া বলিলেন, হায়! হায়!! এই পৃথিবীতে আসিয়া কেহই আর নির্ব্বিঘ্নে যায় না। সকলেই

পাপ তাপে অবসন্ন ও দুঃখভগ্ন হৃদয় লইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে। সংসারের কীলকস্বরূপ ভগবান্‌কে যাহারা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকে, তাহারাই কেবল রক্ষা পায়।" মানবের তিনি কিরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, জীবের দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় কিরূপ ব্যথিত হইত, পর-দুঃখে তাঁহার প্রাণ কিরূপ কাতর ছিল, এই ঘটনা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পরমহংসদেব বলিতেন, বাউল যেমন দুই হস্তে বাদ্য বাজায় এবং মুখে হরিনাম গান করে, তেমনি হে সংসারী মানব! তুমি হাতেতে কার্য্য কর এবং মুখেতে হরিবল। কাপড় বুনিয়া কবীর জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কাপড় বুনিবার সময়ে নলী চালাইতে চালাইতে তিনি "সীতা-রাম সীতারাম" ভজন করিতেন। কাম (কাজ) ও নাম, এক সঙ্গে তাঁহার দুই চলিত। ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্ব্বক তিনি নিষ্কাম ভাবে সংসারে অবস্থান করিতেন। হরিনামই তাঁহার প্রকৃত ধন ছিল। তিনি যে কর্ম্ম করিতেন, তাহা কেবল লোক-শিক্ষার জন্য। মহাপুরুষদিগের আদর্শ জীবন যেরূপ হওয়া উচিত, কবীরের জীবন ঠিক্ তদনুরূপই ছিল।

একদিন তিনি একখানি কাপড় বুনিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় করিতে গেলেন। তাঁহার হাতে কাপড় খানি দেখিয়া একজন বৈষ্ণব তাহা চাহিল। এ দিকে তাঁহার ঘরে কিছুই নাই। কাপড় খানি বেচিয়া যাহা পাইবেন, তাহাতেই সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। নতুবা ঘরের সকলকে উপবাস থাকিতে হইবে। বৈষ্ণবকে তিনি বলিলেন "বাবা! কাপড়ের আধ-খানা লইলে চলিবে না?" বৈষ্ণব তাহাতে অসম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন "আমার সব্‌টা চাই।" তাহাকে কাপড় খানি দিয়া তিনি মাতার তাড়ানার ভয়ে এক স্থানে লুক্কায়িত রহিয়া রাম নাম জপ করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদ যথার্থই বলিয়াছেন,—

যে জন কালীর চরণ করেছে স্থূল।
সহজে হয়েছে তার বিষয়ে ভুল॥

আখ্যান আছে, ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্র কবীরের মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বলদের পৃষ্ঠে অনেক দ্রব্য চাপাইয়া তাঁহার গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। অনন্তর কবীর গৃহে উপস্থিত হইলে ছদ্মবেশধারী শ্রীরাম-চন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন।

হিন্দু ও মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। বিষ্ণুভক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি সকলের পূজ্য ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই তাঁহার শিষ্য হইল। তিনি জাতি ও বর্ণ-ভেদের বিরোধী ছিলেন। কোনও ধর্ম্ম-গ্রন্থকে তিনি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্র-দায়ের নাম কবীরপন্থী। কবীর বলিয়াছেন,

মন্‌কা ফেরৎ জনম গয়ো গয়ো ন মনকা
ফের।
কর্‌কা মন্‌কা ছোড় কর মন্‌কা মনকা
ফের॥

অর্থাৎ জপমালার গুটিকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে জীবন গত হইল, কিন্তু হৃদয়ের ঘোর বিগত হইল না। অতএব হাতের গুটিকা পরিত্যাগ করিয়া মনের ঘূর্ণন কর। কবীরপন্থীরা গলদেশে তুলসীমালা পরিধান এবং হস্তে তুলসী কাষ্ঠ নির্ম্মিত জপমালা ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের মতে এ সব বাহ্য অনুষ্ঠানে কোন উপকার নাই; অন্তঃশুদ্ধিই একান্ত কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর অপেক্ষা আত্মশুদ্ধির প্রতি অধিক মনোনিবেশ করিতে কবীর সকলকে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিয়াছেন :—

১। দেহ পরিষ্কার করিয়া এবং কাপড় ধোয়াইয়া কি হইবে? দেহ পরিষ্কার করিলে মনের ময়লা যাবে না। মনের ময়লা না গেলে, কুপ্রবৃত্তি সমূহ দূর না হইলে, প্রকৃত অবস্থা পাইবে না।

২। গঙ্গায় স্নান করিলে, একাদশী করিলে, তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিলে, নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, তবুও ভগবানের প্রেমে তোমার হৃদয় নিমগ্ন হইল না; তবে আর কি হইল?

২। যে জন কাবায় গিয়াছে, হাজী হইয়াছে, বোলেস্তাঁ গুস্তাঁ সমগ্র পাঠ করিয়াছে, অথচ যাহার মনের কপটতা ক্ষীণ হয় নাই ও ভগবৎপ্রেমে শির অর্পিত হয় নাই, তাহার কাবা গমনেই বা কি হইল, হাজীপদে অধিরোহণেই বা কি হইল, পণ্ডিত ও পারদর্শী হওয়াতেই বা কি হইল?

৪। তুমি জীবের রক্ত পবিত্র বল, তুমি জীব ঈশ্বরের সৃষ্ট বল; কিন্তু মাংসের লোভে তুমি জীবহত্যা না করিয়া আর থাকিতে পার না। তুমি যাহা ভাল বল, তাহার আচরণ কর না। শুধু ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানে কি হইবে?

কবীর ১৫০৫ সম্বতে একাদশী তিথিতে নাগর নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন। দেহ সৎকার লইয়া তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। এমন সময়ে দৈববাণী হইল "শবাবরণ উন্মোচন কর।" অনন্তর শবাবরণ উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল যে, কয়েকটী মাত্র ফুল পড়িয়া আছে, শব নাই। বিবাদ মিটিল। হিন্দুরা অর্দ্ধেক ফুল লইয়া দাহ করিল—অপরার্দ্ধ লইয়া মুসলমানেরা সমাধিস্থ করিল। হিন্দুরা যেখানে ফুল দাহ করিয়াছে, পরে তথায় বহু অর্থব্যয়ে এক সুবৃহৎ চৌরা নির্ম্মিত এবং মুসলমানেরা যে স্থানে ফুল সমাধিস্থ করিয়াছে, তথায় এক বৃহৎ সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। উক্ত উভয় স্থানই কবীরপন্থীদিগের প্রধান তীর্থস্থল। দেশ দেশান্তর হইতে কবীরপন্থী সাধক ও ভক্তেরা বৎসরের নির্দ্দিষ্ট দিনে তথায় একত্রিত হইয়া মহাপুরুষ কবীরের ভাবে উন্মাদিত হইয়া থাকেন।

অনেকেই বোধ হয় একটী কিম্বদন্তী অবগত আছেন যে, তৈলপায়িকা নিরন্তর সোণাপোকার চিন্তা করিয়া ক্রমে ক্রমে সোণাপোকা হইয়া যায়। চিন্তা কার্য্যের প্রসূতি—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি

তাদৃশী।” বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে, মানুষ চিন্তার প্রতিকৃতি; অহরহ যেরূপ চিন্তা করে, মানুষ সেই প্রকার স্বভাব ও মতিগতি প্রাপ্ত হয়। বাইবেলে আছে, whatever man thinks, he is— অর্থাৎ মানুষ যেমন চিন্তা করে, সেইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কবীরের বিমল চরিত্র ও তাঁহার ভগবৎ-প্রেমানুরঞ্জিত জীবনের মধুর কথা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া আমাদের দেশে অনেকের চিত্ত ধর্ম্মপ্রবণ হইয়াছে—সংসারের জ্বালা ও যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের আকাঙ্ক্ষায় লোকচক্ষুর অন্তরালবর্ত্তী নির্জ্জন স্থানে অবস্থান এবং স্বভাবজাত গিরি-গুহায় আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক কবীর দেবের অনুধ্যানে ও তাঁহার উপদেশানুমোদিত সাধুজীবন যাপনে অনেকেই তাঁহার দেব-প্রকৃতি লাভ করিয়াছে—তাঁহার সরল জীবনের ছায়া অনেক নীচকুলোদ্ভূত নিরক্ষর ব্যক্তির জীবনে প্রতিফলিত হইয়া তাহাদিগের জীবনকে সরস করিয়াছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেন, মহাপুরুষের চিন্তায় মানুষ মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করে। মানবীয় চরিত্রে মহাপুরুষদিগের কার্য্যের এতাদৃশ প্রভাব দর্শন করিয়াও লোকে মহাপুরুষের চিন্তা ছাড়িয়া বেদ-বেদান্ত আলোচনা করিতে চায়। “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা” এই প্রাচীন মহাবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া মহাপুরুষদিগের প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করিতে কবে আমরা শিখিব? কবে সেই সুদিন আসিবে, যে দিন বাঙ্গালী বাক্য ছাড়িয়া কার্য্যে মন দিবে, মহতের সম্মাননা করিতে শিখিবে, বঙ্গের ঘরে ঘরে “বীর-পূজার” প্রতিষ্ঠা হইবে!!!

শ্রীঅনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী।

কয়েকটী মূল পদার্থ।

কার্ব্বণ—সংযুক্ত হইবার ও ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিবার শক্তি কার্ব্বণের যেরূপ অধিক, এরূপ আর কোনও মূল পদার্থেরই নাই। ইহা ভিন্ন জীব ও উদ্ভিদ্ শরীরের গঠন সম্ভবপর নয়। হীরক ও গ্রাফাইট নামক ধাতব পদার্থে কার্ব্বণের বিশুদ্ধাবস্থা দৃষ্ট হয়। বহুমূল্য হীরকখণ্ড ক্রিষ্টল Crystalline (দানা-বাঁধা) আকারের বিশুদ্ধ কার্ব্বণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সর্ব্বপ্রকার কয়লা কার্ব্বণের রূপান্তর মাত্র।

সল্‌ফর—ইহার অন্য নাম ব্রিমষ্টোন। ইহা ভঙ্গপ্রবণ, পীতবর্ণের ক্রিষ্টল অর্থাৎ দানা-বাঁধা আকারের কঠিন পদার্থ এবং জল অপেক্ষা দুইগুণ ভারী। ইহার এক আশ্চর্য্য গুণ এই যে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তাপ প্রদান করিলে ইহা তরল হইয়া যায় এবং তৎকালে ইহাকে সহজেই

এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালিতে পারা যায়। কিন্তু তাপের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলে এই দ্রব গন্ধক পুনরায় ঘন হইয়া উঠে। আরও অধিক তাপ প্রদান করিলে ঐ ঘনীভূত গন্ধক পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় তরল হয়। যখন তাপের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হয়, তখন ইহা ফুটিতে থাকে এবং বাষ্পাকার ধারণ করিয়া বায়ুতে মিলিত হয়। অল্প তাপ প্রভাবে দ্রব গন্ধক যদি জলে ঢালিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা পূর্ব্বের ন্যায় ভঙ্গপ্রবণ পীতবর্ণ কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। দ্রব গন্ধকের তাপ পরিমাণ যদি এত অধিক হয় যে, তাহা ফুটিবার উপক্রম করে, তবে সেই অবস্থায় তাহাকে জলে ঢালিয়া দিলে ইহা স্বচ্ছ পাটকিলা রঙ্গের পদার্থে পরিণত হয়। এই পদার্থ দিয়া অঙ্গুলির সাহায্যে নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারা যায় এবং ইহা টানিয়া সূতা প্রস্তুত করাও সহজ হইয়া উঠে।

ফস্ফরাস—ইহা অর্দ্ধস্বচ্ছ কোমল পদার্থ এবং জল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ভারী। ইহাকে দেখিলে হঠাৎ মোম বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। ইহা অক্‌সিজানের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের অস্থি নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণরূপে পরিণত হয়। ইহাতে ভূমির উৎপাদিকা শক্তিরও বৃদ্ধি হয়। ইহা সহজেই দ্রব হয় ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। বাতাসে উন্মুক্ত ভাবে রক্ষা করিলে ইহাহইতে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ ধূম্র উৎপন্ন হয়। অন্ধকারে ঐ ধূম্র আলোকময় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার গন্ধ রশুনের গন্ধের ন্যায়। যে পরিমাণ তাপে জল ফুটিতে থাকে, তাহার অপেক্ষা অনেক অল্প তাপে ইহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং প্রজ্বলন কালে ইহা হইতে উজ্জ্বল শিখা ও শ্বেতবর্ণ ধূম্র উৎপন্ন হয়। ফস্ফরস অতি সহজেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সুতরাং বিশেষ সতর্ক ভাবে ইহার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

সিলিকন্—ইহা সর্ব্বদাই অক্‌সিজানের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠস্থ প্রস্তর ও খনিজ পদার্থে ইহার প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। সকল প্রকার জলেও ইহার অস্তিত্ব অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

যে কয়েকটী মূল পদার্থের বিষয় উক্ত হইল, সে সমস্তই অধাতব মূল পদার্থ। ধাতব ও অধাতব মূল পদার্থের যে পার্থক্য আছে, তাহার মধ্যে একটী এই, ধাতব মূল পদার্থগুলি তাপ ও তড়িৎ-পরিচালক এবং এক প্রকার ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

আর্য্য-রমণী

ভারতবর্ষ চিরকাল নারীজাতিকে সম্মান করিয়া আসিতেছে। স্ত্রী পূজার্হা —দেবতাস্বরূপা। ভারতবর্ষের দেবতার মধ্যে স্ত্রী দেবতা আছেন। প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে ইলা, ভারতী, ইন্দ্রাণী, অগ্নায়ী, শচী, মহী প্রভৃতি অনেক দেবীদিগের নাম ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাণেও কত দেবীর নাম আছে, যাহাদিগকে অদ্যাপি ভারতবাসীরা পূজা করেন। বেদে সবিতা বা ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়, কিন্তু পুরাণে সরস্বতী জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং বীণাবতী অর্থাৎ সংগীত শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী। বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতা সকল যদিও কল্পনা মাত্র, কিন্তু কেবল পুরুষ দেবতার কল্পনা না করিয়া স্ত্রী দেবতা কল্পনা করা হইয়াছে। পরমেশ্বরের করুণাগুণকে জননী নাম দিয়া নারী জাতিকে সর্ব্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রেই পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়াই সম্বোধন করা হইয়াছে, মাতা শব্দের উল্লেখ বেদ কিম্বা বাইবেলে নাই। খ্রীষ্টমাতা মেরিয়াম্ নূতন ধর্ম্মবিধিতে উচ্চ পদবী লাভ করিয়াছেন এবং রোমান কাথলিক সম্প্রদায় তাঁহাকে দেবতুল্য সম্মাননা করেন, তথাপি তিনি ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। ঋগ্বেদে নারী ঋষি মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের রচয়িতা অম্ভৃণ নামক ঋষির কন্যা। সেই সূক্তে পরমাত্মার বিষয় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাহইতে তৎকালীন স্ত্রীজাতির তত্ত্বজ্ঞান ও উচ্চ শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়।

অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাগ্দেবী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিতেন এবং আপনাকে ব্রহ্মসত্তাতে পরিপূর্ণ দেখিতেন। তিনি অষ্টমন্ত্রাত্মক একটী সূক্ত রচনা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল ;—

আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি; আমি আদিত্যদিগের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে বিচরণ করি। আমি মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীদ্বয়কে ধারণ করি।

আমি সমস্ত জগতের রাষ্ট্রী; আমি উপাসকদিগকে ধন দান করি; আমি * * সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি; আমি যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেবতারা আমাকে প্রপঞ্চজগতে অন্তর্যামীরূপে সর্ব্বত্র দর্শন করেন; আমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া সকলের আশ্রয় হইয়াছি।

যিনি অন্ন ভোজন করেন, যিনি প্রাণধারণ, শ্বসনক্রিয়া করেন, যিনি দর্শন করেন, যিনি শ্রবণ করেন, তিনি আমার সাহায্যে তত্তৎ কর্ম্ম করেন, আমাকে যাহারা এই প্রকারে অন্তর্যামী রূপে জানে না, তাহারা

এই সংসারে হীনতা প্রাপ্ত হয়। যে বিদ্বন্! আমার কথা শ্রবণ কর, আমি যাহা বলিতেছি শ্রদ্ধার যোগ্য।

দেবতা ও মনুষ্যগণ যাহার শরণাগত হয়, তাঁহার বিষয় আমিই উপদেশ প্রদান করি। যাহাকে ইচ্ছা আমি বলবান্ অথবা বুদ্ধিমান্, বা ঋষি করিতে পারি।

আমি পিতা আকাশকে প্রসব করিয়াছি। সেই আকাশ এই জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান! সেই স্থান হইতে সমস্ত ভুবনে বিস্তারিত হই। আপনার উন্নত দেহ দ্বারা এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি।

আমি তাবৎ ভুবন নির্ম্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ যে, দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে। (ক্রমশঃ)।

ঈশ্বরের নামাবলী

প।

পক, পক্ষপাতহীন, পঙ্ক্তিপঙ্ক্তিপাবন, পঙ্গুবন্ধু, পঞ্চতত্ত্বাতীত, পঞ্চমহাযজ্ঞেশ্বর, পঞ্চাগ্নিসাধিত, পটীয়স্, পঞ্চপ্রাণপ্রাণ, পঞ্চভূতপাল, পঞ্চাননারাধ্য, পটু, পণ্ডিত, পতি, পতির পতি, পতিতপাবন, পতিত-বন্ধু, পতিতজন-নিস্তারণ, পণ, পথ্য, পথ-প্রদর্শক, পদার্থশ্রেষ্ঠ, পদ্মযোনিযোনি, পর, পরং, পরম, পরমদয়াল, পরমদেব, পরম ধন, পরমপিতা, পরমমাতা, পরমবন্ধু, পরমপুরুষ, পরব্রগতি, পরম প্রার্থনীয়, পরম-সুহৃদ্, পরমাত্মা, পরমাদ্বৈত, পরমায়ু-বিধাতা, পরমারাধ্য, পরমার্থ, পরমেশ্বর, পরমেষ্ঠী, পরলোকবন্ধু, পরশরতন, পরমং-পরস্তাৎ, পরাগতি, পরাক্রান্ত, পরাৎপর, পরায়ণ, পরিকীর্ত্তিত, পরীক্ষিত, পরি-চারক, পরিচালক, পরিতোষণ, পরিণাম, পরিণামদর্শী, পরিপালক, পরিপোষক, পরিত্রাণদাতা, পরিত্রাতা, পরিতাপহারী, পরিদর্শক, পরিপূত, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ-মানন্দং, পরিরক্ষক, পরিবেষ্টা, পরিবেষ্টক, পরীক্ষক, পরোক্ষদর্শী, পর্য্যাগাৎ, পরিশেষ, পর্য্যবসান, পরিশুদ্ধ, পবিতা, পবিত্র, পরা-গত, পরিতুষ্ট পরিমাণাতীত, পরিমাণ, পর্য্যবেক্ষক, পাতিত্যনাশন, পাপভারহরণ, পামরত্রাতা, পারেরকর্ত্তা, পারগ, পারত্রিক-গতি, পারদর্শী, পালক, পালনকর্ত্রী, পাচন, পাশনাশহেতু, পাষণ্ডদলন, পাষাণবিগলিত-কারী, পিশুনদমন, পীড়িতাশ্রয়, পুঙ্খানু-পুঙ্খদর্শক, পুঙ্গব, পুণ্য, পুরস্কারক, পুরাতন, পুরুষপ্রধান, পুরুষোত্তম, পূজনীয়, পূজার্হ, পূজিত, পূজ্য, পূত, পূরণ, পূর্ণ, পেষক, পোষ্টা, প্রকট, প্রকাণ্ড, প্রকাশক, প্রকৃত, প্রকৃতীশ্বর, প্রক্ষালক, প্রখর-জ্যোতিঃ, প্রখ্যাত, প্রগাঢ়, প্রচণ্ডতেজঃ, প্রচেতা, প্রচ্ছন্ন, প্রজাপতি, প্রজাপাল,

প্রজাসৃজ্, প্রজেশ, প্রজ্ঞ, প্রণতবৎসল, প্রতাপান্বিত, প্রতিকূলতাহরণ, প্রতিদ্বন্দ্বি-হীন, প্রতিপত্তিশালী, প্রতিপাদক, প্রতি-পালক, প্রতিফলদাতা, প্রতিভূবিহীন, প্রতিযোগিতা-রহিত, প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিষ্ঠা-ভাজন, প্রতীতিলব্ধ, প্রত্যয়সিদ্ধ, প্রত্যা-দেশক, প্রথম, প্রথমকারণ, প্রথমপূজ্য, প্রথমসেব্য, প্রদীপ্ত, প্রদ্যোতক, প্রধান, প্রধাননায়ক, প্রপঞ্চাতীত, প্রপন্ন, প্রফুল্ল, প্রভব, প্রভবিষ্ণু, প্রভাবাপন্ন, প্রভু, প্রমাণাতীত, প্রমাদরহিত, প্রযত্নলভ্য, প্রযোজক, প্রয়োজনসাধক, প্রলয়কর্ত্তা, প্রলোভনীয়, প্রবর, প্রবর্হ, প্রবীণ, প্রশমন, প্রশস্ত, প্রশান্ত, প্রসন্ন, প্রসবিতা, প্রসাদদাতা, প্রসাধক, প্রসূ, প্রসূতি, প্রহরী, প্রহর্ত্তা, প্রহ্লাদক, প্রাজ্ঞ, প্রাণ, প্রাণনাথ, প্রাণবন্ধু, প্রাণসখা, প্রাণদাতা, প্রাণিহিতকারী, প্রাণপ্রাণ, প্রাণেশ, প্রাণেশ্বর, প্রাপক, প্রামাণিক, প্রায়শ্চিত্ত-বিধাতা, প্রার্থনীয়, প্রার্থিতধন, প্রিয়তম, প্রিয়দর্শন, প্রীতিমান্, প্রীতিপ্রস্রবণ, প্রেষ্ঠ।

নূতন সংবাদ

১। সার জন উডবরণের স্মৃতিচিহ্নের জন্য ১০,০০০৲ টাকার অধিক উঠিয়াছে।

২। ফাল্গুন মাসে ইংলণ্ডে এক ভয়ানক ঝড় হইয়া অনেক গৃহ ভগ্ন এবং অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

৩। সোসাইটী অব্ থীষ্টস্ নামক সভা কয়েকটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করিতেছেন, তাহার দ্বারা ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপানে শিল্পশিক্ষার সহায়তা করিবেন। ৩টী ছাত্র এই তিন স্থানে প্রেরিত হইবে।

৪। কলিকাতার কলেক্টর রায় চন্দ্র-নারায়ণ সিংহ বাহাদুর পেনসন-যোগ্য হওয়াতে আলিপুরের ডেপুটীকলেক্টর বাবু মহানন্দ গুপ্ত তাঁহার পদে মনোনীত হইয়াছেন।

৫। এবার মহাকালী পাঠশালার বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ মহা সমা-রোহে কলিকাতার টাউনহলে সম্পন্ন হইয়াছে। লেডী কর্জ্জন স্বহস্তে পারি-তোষিক বিতরণ করেন। ছোট লাট প্রভৃতি বড় বড় লোক উপস্থিত ছিলেন।

৬। গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা মতে ব্রাহ্ম-বালিকা বিদ্যালয়ের সহিত একটী শিক্ষ-য়িত্রী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। শিক্ষা দানের জন্য ৬০৲ টাকা বেতনের একজন অধ্যাপিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতি মধ্যে ৪ জন ছাত্রী জুটিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে ৪৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন।

৭। গত ২১এ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেসন সভায় লর্ড কর্জ্জন উপস্থিত ছিলেন। ভাইস চান-সেলার র‍্যালে সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের

কমিশনের রিপোর্টের সপক্ষে বক্তৃতা করেন। এবার একটী মাত্র খ্রীষ্টান বালিকা বিএ উপাধি পাইয়াছেন।

৮। বিশ্ববিদ্যালয়াবলী কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনার্থ টাউনহলে সেনেটের তিনটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা কমিশনের অধিকাংশ অনুরোধের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন।

৯। ডিউক অব কনট সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

১০। আমেরিকার ভেনজুয়েলার গোল-যোগ শেষ হইয়াছে। ক্ষতিপূরণের টাকা পাইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বিপক্ষদের জাহাজগুলি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

১১। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মিঃ পরাঞ্জিপে ও সুধাংশুমোহন বসু এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১২। এডেনে এক রুষ গুপ্তচর কেল্লার ফটো লইতেছিল, ধরা পড়িয়াছে।

১৩। হলণ্ডে সর্পচর্ম্মে জুতা শেলাই ও বই বাঁধান হইতেছে। ইহা খুব মজবুত হয়।

১৪। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম সোমপ্রকাশের সুবিখ্যাত ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্মরণার্থ তাঁহার বাসগ্রামে একটি পুস্তকালয় ও পাঠাগার সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের সাহায্য দান করা কর্ত্তব্য।

১৫। পঞ্জাবে সেণ্টবিড্‌স কলেজ নামে মহিলাদিগের জন্য এক কলেজ হইবে এবং তাহা সিমলা কন্‌ভেণ্টে স্থাপিত হইবে। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ইহার গৃহ-নির্ম্মাণার্থ প্রচুর সাহায্য দান করিয়াছেন। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার এবং শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার শ্রেণী খোলা হইবে। পঞ্জাবে উচ্চ স্ত্রী-শিক্ষায় এই প্রথম আয়োজন, ইহা সফল হউক আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। Triad—অর্থাৎ দিল্লী দরবারের তিনটী দান, মূল্য ৶০ আনা। মান্দ্রাজের জন নর্টন এল এল ডি লর্ড কুর্জনকে পুস্তিকাকারে এই পত্র খানি লিখিয়াছেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের স্তুতি ও বাঙ্গালী দেশহিতৈষীদিগের প্রতি শ্লেষোক্তি অনেক আছে। লেখক অনেক বিভিন্ন বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ছাত্রদের নীতি শিক্ষা ও সাধারণ লোকের উন্নতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ হৃদ্য।

২। সে কালের লোক—মূল্য ⁄০ আনা। ইহাতে বাইবেল-বর্ণিত গল্প সকল বিশুদ্ধ সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সুপাঠ্য এবং ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার অনুকূল।

৩। সেবিকার অর্ঘ—শ্রীমতী জগৎ-তারিণী দাসী প্রণীত ; পশ্চাৎ সমালোচ্য।

বামারচনা।

কলঙ্ক

কলঙ্ক কে তোরে ছুঁইতে চায়?
তোরে হেরি সবে দূরে পলায়!
দানবে মানবে ঘৃণিছে সবে,
করে সমাদর কে তোরে কবে?
শারদ-শশাঙ্ক পরশে তোর,
ঘৃণিত-লাঞ্ছিত যেমতি চোর।
তুই দুষ্ট কীট সুগন্ধি ফুলে,
সাধুও পতিত ক্ষণেক ছুঁলে।
অকলঙ্ক দাস আদর পায়,
কলঙ্কিত প্রভু কেহ না চায়।
ভাল ভালবাসা ভাল কি রয়,
একবার তোরে যদি পরশয়?
গো-দুগ্ধেতে চোনা, বনাতে উই,
বসন্ত মলয়ে ঝটিকা তুই।
অমৃতে গরল, কুমীর জলে,
অস্পৃশ্য কলঙ্ক সাধে কি বলে?
ওই যে দরিদ্র সড়কে পড়ে,
সেও যে রে তোরে ছুঁইতে ডরে
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আকুল-প্রাণ
মুমূর্ষুও তোরে না দেয় স্থান,
তুই মানবের যশের কালী,
সুখের সংসারে দুখের ডালি,
নির্ম্মল বসনে কালিমা যেন,
পবিত্র জীবনে তুই রে হেন।
কাপড়ের দাগ ধুইলে যায়,
রে কলঙ্ক, তোরে ছাড়ান দায়।
রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন তরে
গোকুলে গোপাল কত না করে!
রাজা দশরথ তোরিত ডরে,
অকালে পরাণ ত্যেয়াগ করে।
তো' তরেই হয়ে প্রণয়ে বাম,
প্রাণাধিকা প্রিয়া ত্যজিল রাম।
তাইরে না চাই ছুঁইতে তোরে,
ছুঁসনে কলঙ্ক ছুঁসনে মোরে!
নারীর যৌবন বিষম বড়,
তা'পর কলঙ্ক বড়ই দড়।
কলঙ্কিনী নারী কুলের পাপ,
মরণ মঙ্গল, বাঁচিয়া তাপ।
যাক্ এ জীবন, যৌবন যাক্,
কোন সুখ মম কভু না থাক্?
তবু তোরে ছুঁয়ে নাচাই সুখ,
দেখিব না তোর ও পোড়া মুখ।

শ্রীব্রজবালা রায়

সমর্পণ।

সমর্পিনু আজি দেব! রাজীব চরণে
এই সুকুমারে মোর, রক্ষা কর তুমি,
বিনাশিয়া সর্ব্ববিধ বিঘ্ন পরমাদ,
ভাগ্যহীন চির মোরা সংসার ভবনে;
একটী রতন বক্ষে ধরেছিনু সাধে,
তারেও হরিল কাল। পূর্ণিমার চাঁদে
গ্রাসিল জলদ যেন শারদ গগনে।
আজি সভয়ে গো তাই অভয় ভাবিয়া

শরণ লইনু পদে। যে অপূর্ব্ব বলে
শূন্য পথে সর্ব্ব লোক রেখেছ বাঁধিয়া,
পালিছ বিশ্বেরে নিত্য স্তন্য অন্ন জলে ;
সেই মৃত্যু-বিজয়িনী শক্তি সঞ্চারিয়া
দাও রক্ষা-লিপি খানি বাঁধিয়া এ গলে।

শ্রীমতী—

বসুধা-ভূষণ

আয় ছুটে কোলে আয় বসুধা-ভূষণ,
তোর চাঁদ মুখ দেখে, শান্তি পাই শত দুঃখে,
থাকিতে পারিনে তব না দেখি বদন।
তুই যেরে আমাদের হৃদয়ের ধন,
তোর "দিদি" "দিদি" বোলে, শত বিঘ্ন যাই ভুলে,
ছুটে গিয়ে চাঁদ মুখে করিরে চুম্বন।
যিনি করেছেন ভাই তোমায় সৃজন
চিরকাল তিনি তোরে, রাখিবেন কোলে করে,
করিবেন তিনি তোর কুশল সাধন।
দীর্ঘজীবী হয়ে ভাই থাক এ ভুবনে,
গুণে গুনবান্ হও, চিরকাল সুখে রও,
মন যেন থাকে তব ঈশ্বর-চরণে।

সুরুচিবালা।

শতদল।*

শতদল শতদল হৃদয়ের বোন !
আমাদিগে ছাড়ি তুমি গিয়েছ কোথায় ?
এখানে আমরা করি অশ্রু বরিষণ,
দেখিতে পাওনা নাকি থাকি অমরায় ?
রাঙ্গা মাসীমার দশা হেরিয়া নয়নে,
পৃথিবীতে থাকিবারে ইচ্ছা নাহি হয়,
মায়ের এমন কষ্ট দেখিছ কেমনে ?
তুমিত ছিলেনা বোন এমন নিদয় !
কত আদরের তুমি ছিলে সবাকার,
ছিলে তুমি সকলের হৃদয়ের ধন,
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তুমি ছিলে মাসীমার,
সকলকে ছাড়ি কোথা করিলে গমন !
ঘর দ্বার শূন্য করি গিয়েছ কোথায়,
শূন্য শূন্য দেখি ঘর তোমার বিহনে।
আয়রে সোনার বুড়ি ! আয় আয় আয়,
তোমাকে ছাড়িয়া মোরা থাকিব কেমনে ?
পড়িয়া রয়েছে তব পুতুলের ডালা,
দিন রাত কত খেলা খেলিয়াছ তুমি,
আরত তেমন তর করনারে খেলা,
তোমার গুণের কথা ভুলিব না আমি !
আর মানা করিব না, যাও শান্তিধাম,
দাদা আছে, মামা আছে সেই সুরলোকে,
সোণার ভুপেনো* তথা লভিছে বিরাম,
আরো কত জন আছে পরম পুলকে।
এক ভিক্ষা বিভু ঠাঁই এই মোর আছে—
"হে দেব, করুণাসিন্ধু, অনাথসহায় !
বুড়িরে রাখিও তুমি সদা কাছে কাছে,
এ অভাগী তব পদে এই ভিক্ষা চায়।"

কুমারী সুরুচিবালা দাসগুপ্তা।

* শতদল—মামত বোন। ভূপেন—মামাত ভাই।

Registered No. C. 134

No. 476. April, 1903.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক.

।উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ। ৪৭৬ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩০৯। এপ্রেল, ১৯০৩। | ৭ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সূচীপত্র

কলিকাতা।

৬নং কলেজ ষ্ট্রীট বাইলেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵৹, পশ্চাদ্দের বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 476. April, 1903.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪০ বর্ষ। ৪৭৬ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩০৯। এপ্রেল, ১৯০৩। | ৭ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লর্ড কুর্জনের যাত্রা—রাজপ্রতিনিধি গত ২৫এ মার্চ্চ সদলে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিম যাত্রা করিয়াছেন।

চেম্বার্লেনের জয়জয়কার—চেম্বার্লেন সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকা পরিদর্শনপূর্ব্বক ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়াছেন। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর এবং সর্ব্বসাধারণ তাঁহাকে মহোল্লাসের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

পোপের জুবিলী—রোমান ক্যাথলিকদিগের ধর্ম্মগুরু পোপের জুবিলী উৎসবে ৫০ হাজারের অধিক লোক জমিয়াছিল। এতগুলি শিষ্য একস্থানে জানু পাতিয়া অবনত এবং গুরুদেব তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, এ দৃশ্য বড় সুন্দর।

পরীক্ষার ফল—এ বৎসর ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয় হইতে নিম্নলিখিত-সংখ্যক বালিকাগণ নিম্নলিখিত পরীক্ষা সকলে উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—

নিম্নপ্রাইমারী ৫, উচ্চপ্রাইমারী ২, মধ্য-বাঙ্গালা ও ইংরাজী ৬ জন।

শিক্ষয়িত্রী—১০ জন।

অষ্টমমান ২ জন।

বিক্টোরিয়া স্মৃতি—কলিকাতার বণিকদিগের মতে মত দিয়া লর্ড কুর্জ্জন স্থির করিয়াছেন যে, কেথিড্রল এভিনিউ রাস্তায় বিক্টোরিয়া স্মরণার্থ মন্দির নির্ম্মিত হইবে। হাইকোর্টের জজ ও ব্যারিষ্টারগণও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

সেতুবন্ধ বন্ধন—সিংহল ও ভারতবর্ষের মধ্যে সেতুবন্ধ রামেশ্বর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে, লৌহ-সেতু ও প্রস্তরের

রাস্তা দিয়া এই উভয় দেশকে সংযুক্ত করা হইবে। এ জন্য ২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ভারত হইতে অচিরে স্থলপথে লঙ্কায় গমন সম্ভব হইল।

শৃঙ্গবান্ সর্প—জাপানের উপকূলে এক ধীবরের জালে ৪৮ ফিট দীর্ঘ এক সর্প ধৃত হয়। সর্পিণী তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ৩৯ ফিট। উভয়ের শৃঙ্গ ২ ফিট দীর্ঘ।

বিধবা বিবাহ—ক্রমে সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতায় সম্প্রতি ২টী বিবাহ হইয়াছে। একটীর বর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায়, সুরনগরনিবাসী রাজা প্রতাপাদিত্যের বংশীয়। দ্বিতীয়টীর বর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়, হুগলী জেলার দশঘরার এক পদস্থ ব্যক্তির পুত্র।

পুরীর রাজার দুরবস্থা — গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিতে না পারায় রাজার যে কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। জগন্নাথের সেবার বন্দোবস্ত জন্য গবর্ণমেণ্ট এক কমিটী নিযুক্ত করিতেছেন।

কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি—৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতার রথ্যাসংস্কার করিয়া ইহাকে ইউরোপীয় ১ম শ্রেণীর সহরে পরিণত করা হইবে। এজন্য গবর্ণমেণ্ট ৫০ লক্ষ টাকা দিবেন, করদাতাদিগকে প্রায় দেড় কোটি টাকা দিতে হইবে। অতিরিক্ত ভূমি বিক্রয়ে প্রায় ৩ কোটি টাকা হইবে। আর ঋণ করিতে হইবে ২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। এত ব্যয়ে কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি হইলে ব্যয় সার্থক।

চত্বারিংশ বিবাহোৎসব—ইংলণ্ডেশ্বর এডওয়ার্ডের ও রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রার দাম্পত্যমিলন ৪০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বকিংহাম রাজপ্রাসাদে এক ভোজ হইয়াছে। ঈশ্বর রাজারাণীকে চিরায়ু করুন্।

মৃত্যু—(১) গত ১৭ই মার্চ্চ সুপ্রসিদ্ধ ভারতহিতৈষী কেইন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। এদেশে মাদক নিবারণ এবং গবর্ণমেণ্টের অন্যায় ব্যয় ও শাসনবিভ্রাট দমনার্থ তিনি প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছিলেন। একালে পার্লেমেণ্টে ইহাঁর মত ভারতহিতৈষী দেখা যায় নাই। ইহাঁর মৃত্যু আমাদিগের একটী জাতীয় দুর্ঘটনা। (২) সভাবাজার রাজবংশের শীর্ষস্থানীয় সার মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র ও রাজা রাজকৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বশেষ।

লর্ড কুর্জ্জনের সুব্যবস্থা—লবণের কর মণ প্রতি ৷৹ আনা কমিয়াছে এবং এক হাজার টাকার ন্যূন আয় যাহার, তাহার নিকট ইন্‌কম ট্যাক্স লওয়া হইবে না।

নীতি কণ্ঠহার।

ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমা যজ্ঞঃ, ক্ষমা বেদাঃ ক্ষমা শ্রুতং
য এতদেবং জানাতি, স সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হতি ॥

ক্ষমাই ধর্ম্ম, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই বেদ, ক্ষমাই শাস্ত্র; যিনি ইহা জানেন, তিনি সকলকেই ক্ষমা করিতে সমর্থ হয়েন। ১১।

আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা, সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র! ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা ॥

হে পাণ্ডুপুত্র! আত্মাই পবিত্র নদী, সংযম তাহার পুণ্যতীর্থ ক্ষেত্র, সত্যই তাহার সলিল, চরিত্র তাহার তট, দয়া তাহার তরঙ্গ, তুমি তাহাতে স্নান কর; অন্য জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না। ১২।

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু,
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

নীতিজ্ঞলোকেরা নিন্দাই করুন আর প্রশংসাই করুন, লক্ষ্মীদেবী আসুন বা যান, মরণ অদ্যই হউক কিম্বা যুগান্তরেই হউক, বীরগণ কখনও ন্যায্য পথ হইতে বিচলিত হয়েন না।

প্রীণাতি যঃ সুচরিতৈঃ পিতরং স পুত্রো
যদ্ভর্ত্তুরেব হিতমিচ্ছতি তৎ কলত্রম্।
তন্মিত্রমাপদি সুখে চ সমং প্রযাতি
এতত্রয়ং জগতি পুণ্যকৃতো লভন্তে ॥

সচ্চরিত্র দ্বারা যে পিতাকে সতত সন্তুষ্ট রাখে, সেই পুত্র, যিনি সর্ব্বদাই স্বামীর হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, সেই স্ত্রী; কি সম্পদে কি বিপদে যিনি বন্ধুসমীপে সমানরূপে গতায়াত করেন, সেই মিত্র; পুণ্যবান লোকেরাই এইরূপ পুত্র, স্ত্রী ও বন্ধু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

রথং শরীরং পুরুষস্য দৃষ্টং আত্মা নিয়ন্তেন্দ্রিয়াণ্যাহুরশ্বান্।
তৈরপ্রমত্তঃ কুশলী সদশ্বৈর্দ্দান্তৈঃ সুখং যাতি রথীব ধীরঃ ॥

পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয়সকল অশ্বস্বরূপ। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া বশীকৃত সদশ্ব-যোজিত-রথারূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরম সুখে বিচরণ করিবেন।

যদ্যৎ পরবশং কর্ম্ম তত্তৎ যত্নেন বর্জয়েৎ।
যদ্ যদাত্মবশন্তু স্যাত্তত্তৎ সেবেত যত্নতঃ ॥

আত্মবৎ কর্ম্ম সমুদায় যত্নপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবেক। পরবশ কর্ম্ম সমস্ত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেক।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥

স্বাধীনতাই সর্ব্ব সুখ, এবং অধীনতাই সর্ব্বদুঃখ। সংক্ষেপতঃ সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবেক।

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ ॥

যেমন আপনার প্রাণ প্রিয়, সেইরূপ সকল প্রাণীরই প্রাণ প্রিয়, অতএব সাধু লোকে আত্মবৎ সকল জীবকে দয়া করিয়া থাকেন।

উদাসীনের চিন্তা।

একদা কোনও রাজা সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় মন্ত্রী তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা পারিষদমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন। মন্ত্রী অভিবাদন-পূর্ব্বক রাজসমীপে উপবেশন করিলেন। রাজা রাজকার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে সভাসমক্ষে একটী প্রশ্ন করিলেন। পারিষদবর্গের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে তাহার উত্তর করিতেছেন, মন্ত্রী কিছু কাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া অবশেষে বলিলেন "মহারাজ সংসারে কি অধিকতর মিষ্ট? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সোজা নয়, তবে আমার মতে মধুর বাক্য যেমন মিষ্ট, এমন আর কিছুই বোধ হয় না।" মন্ত্রী এই কথা বলিবামাত্র সভা মধ্যে এক হাসির রোল উঠিল। পারিষদগণ সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন "হাঁ এখন ঠিক উত্তর হয়েছে, এরূপ সুবুদ্ধি না হ'লে আর ইনি মহারাজার মন্ত্রী হবেন কি করে?"

রাজাও মন্ত্রীর প্রদত্ত উত্তরে প্রীত না হইয়া বলিলেন "তোমার কিছু মতিভ্রম হয়েছে, তা না হলে এরূপ উত্তর কর্ব্বে কেন? মধুর বাক্যে এমন কি আছে, যে তা সংসারের সকল মিষ্ট জিনিসের চেয়ে মিষ্ট? পারিষদদের অনেকেই ত ঠিক্ কথা বলেছেন, মিঠাই মণ্ডার চেয়ে আর কি ভাল জিনিষ আছে?" মন্ত্রী নিস্তব্ধ থাকিয়া সকল উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে সুযোগ বুঝিয়া এক সময়ে মহারাজকে ইহার তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন। কতিপয় দিবস পরে মন্ত্রী একদিবস মহারাজকে নিজ বাটীতে ভোজনার্থ আহ্বান করিলেন। তিনি মহারাজের পরিতোষার্থ যত সুখাদ্য এবং সুপেয় সংগ্রহ করা সম্ভবপর, তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন। যথাসময়ে মহারাজ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া মন্ত্রী করযোড়ে রাজসমীপে দণ্ডায়মান থাকিয়া নানাবিধ সুখাদ্য গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজকে অনুরোধ করিতেছেন, এদিকে মহারাজও উপস্থিত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সমস্ত আস্বাদন করিয়া প্রীত হইতেছেন। তিনি ভোজন ব্যাপার পরিসমাপ্তির পর মন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। মন্ত্রী তাঁহার প্রত্যাগমন জন্য কোনরূপ যানের আয়োজন করি[illegible] নাই। মহারাজ যানায়নের জন্য মন্ত্রীকে আদেশ করিবা মাত্র মন্ত্রী কটূক্তি করিয়া বলিলেন "আমার কি গরজ যে আবার যানের ব্যবস্থা করিয়া দিব, এখন যে উপায়ে হয়, চলে যাও।" রাজা মন্ত্রীর এতাদৃশ ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্যে রুষ্ট হইয়া বলিলেন "কি! তুমি আমায় অপমান কর্লে, তোমার মাথা কি ঘুরে

গেছে? পাগল হয়েছ নাকি? সাবধান হয়ে কথা বল, তা না হলে এখনই প্রতিফল পাবে।”

মন্ত্রী—বটে! সাবধান আবার হব কি? তোমার যা শক্তি থাকে কর্ব্বে; আমি তোমার কি ধার ধারি?

রাজা এই বাক্য শুনিয়া আর আত্ম-সংযম করিতে না পারিয়া মন্ত্রীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। মন্ত্রী সুযোগ বুঝিয়া বিনীত ভাবে মহারাজের পদ-প্রান্তে পতিত হইলেন এবং অতীব মধুর স্বরে বলিলেন “মহারাজ! দাসের ধৃষ্টতা মাপ করুন। আমি আপনার দাসানুদাস, আমাকে প্রহার কল্লে আপনারই কোমল করে ব্যথা পাবেন, আমি চিরদিনই ও চরণের আজ্ঞাবহ। যা হুকুম কর্ব্বেন, তা এখনই করিব।” এই বলিয়া মহা-রাজের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেই মহারাজের ক্রোধোপশম হইল। তিনি প্রীত হইয়া বলিলেন “তবে তুমি কিছু পূর্ব্বে এরূপ অশিষ্ট ব্যবহার কচ্ছিলে কেন?”

মন্ত্রী—“মহারাজ এখন দেখিতে পাইলেন সংসারে কি মিষ্টি! আপনাকে নানাবিধ সুখাদ্য সুপের দ্বারা আমি যত না প্রীত করিতে পারিয়াছি, এই কয়টি মধুর বাক্য দ্বারা তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক প্রীত করিয়াছি। এজন্যই এক দিবস আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলিয়া-ছিলাম যে মধুর বাক্যই সকল জিনিসের চেয়ে মিষ্টি, আপনি এবং পারিষদগণ তখন বিচার না করিয়া কতই উপহাস করিয়াছিলেন, তাই আপনাকে বুঝাইবার জন্য আমি ইতিপূর্ব্বে এতগুলি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি।

এইটি একটী আখ্যায়িকা মাত্র, কিন্তু ইহার মধ্যে গূঢ় নীতিতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। এই নীতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত চাণক্যও একশ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা এই:—

“নানা দানং ময়া দত্তং রত্নানি বিবিধানি চ।
ন দত্তং মধুরং বাক্যং তেনাহং শূকরমুখঃ॥”

ইহার অর্থ, আমা কর্ত্তৃক অনেক ধন রত্ন প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু মধুর বাক্য প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া আমার শূকরমুখ হইয়াছে। এক রাজাকে লক্ষ্য করিয়াই এই শ্লোকটি বিরচিত হইয়াছে। রাজা পৃথিবীতে জীবদ্দশায় দানশীল বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু ধন রত্ন দান করিয়াও রসনাকে সংযত করিতে পারেন নাই। অনেক সময় পরুষ বাক্য প্রয়োগে লোকদিগকে ব্যথিত করিতেন, তাই মৃত্যুর পর শূকরমুখ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। স্বর্গের একজন অধিবাসী তাঁহাকে তদ্বিধ-মুখবিশিষ্ট দেখিয়া বিস্মিতান্তঃকরণে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি শ্লোকটি পাঠ করিয়া উত্তর দান করেন।

প্রকৃতপক্ষে বিচার করিতে গেলে পরুষ বাক্য যে কেবল শ্রোতার সমীপেই শ্রুতিকটু বলিয়া দুঃখের কারণ হয় এমত নহে, উহা বক্তারও অবনতির কারণ। ইহা হৃদয়ের প্রেম-স্ফূরণের

ঘোরতর অন্তরায় এবং অন্তরে অশান্তির দাবদাহ জ্বালিয়া দেয়। যে পরুষ বাক্য বক্তা কিংবা শ্রোতার পক্ষে এতদূর অনিষ্টদায়ক, তাহা মানবসমাজে কিরূপে প্রচলিত হইল, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। অনেকে বলিয়া থাকেন পরুষ বাক্য দুষ্ট দমনের বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। পুলিসের দারোগা বাবু বলেন যে, দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ না করিলে অপরাধী দোষ স্বীকার করে না, অনেক সময় সত্য গোপন করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করে। কত গৃহকর্ত্রী বলেন কটুকথা প্রয়োগ না করিলে দাসদাসীদিগের নিকট কাজ পাওয়া যায় না। অলস ও জড়তাপ্রিয় দাস দাসীগণ কেবল দুর্ব্বাক্যের ভয়ে কার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শনে বিরত থাকে। কত পিতা মাতা ও শিক্ষক বলেন দুষ্ট বালক বালিকাদিগকে তিরস্কার না করিলে তাহারা প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করিয়া থাকে। বোধ হয় এই যুক্তি অনুসারেই মানবসমাজে পরুষ বাক্য প্রচলিত হইয়াছে। উল্লিখিত যুক্তির বিষয় ভাবিতে গেলে পরুষ বাক্যকে এককালে মানবসমাজের অকল্যাণকর বস্তু বলা যায় না। ইহা শাসনদণ্ডরূপে পরিচালিত হইলে কথঞ্চিৎ উপকারী। কিন্তু অনেক সময় উহা ক্রোধজ্বলিত অসংযত চিত্তের বহির্ব্বিকাশ মাত্র। এজন্য অনেক স্থলে বক্তার স্বভাব দোষে পরুষ বাক্যের মাত্রাটা প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম করিয়া থাকে। যাহাকে দুইটী কথা বলিবার প্রয়োজন, তাহাকে পাঁচটী কথা শুনান হয়, এবং শ্রোতার মনে আঘাত প্রদান করাই প্রধান লক্ষ্য থাকে, তাহাকে শাসন করিয়া তাহার কল্যাণ সাধন করা গৌণ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। যদি এরূপ অবস্থায় আত্ম-সংযম করা অসাধ্য হয়, তাহা হইলে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া শাসন করিবার চেষ্টা না করাই ভাল। যাহাতে চিত্তের স্থৈর্য্য রাখিয়া কেবল ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য রাখা যায়, তাহার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের পরুষবাক্য বলিবার অভ্যাস হইয়াছে, তাঁহারা আরম্ভ করিবার সময় প্রয়োজন মতে উহা ব্যবহার করিতে গিয়াছেন, কিন্তু পরিণামে উহা অভ্যস্ত হইয়াছে। অভ্যস্ত হইলে প্রয়োজনাভাব হইলেও রসনার অসংযতত নিবন্ধন পরুষ বাক্য স্বতঃ নির্গত হইয়া থাকে। এ অভ্যাস অতি ভয়ানক। ইহাতে অলক্ষিত ভাবে আত্মার দুর্গতি আনয়ন করে এবং শান্তিময় গৃহকেও বিষময় করিয়া তুলে। মধুর ভাষণের ক্ষমতাও ইহা দ্বারা বিলুপ্ত হয়। লোককে মধুর বাক্য দিতে না পারিয়া "শূকর-মুখ" হওয়া কি ঘৃণা ও পরিতাপের বিষয়! আর কিছু দিবার ক্ষমতা না থাকিলেও লোককে মিষ্টবাক্যে সন্তুষ্ট করিতে পারা একটী প্রশংসনীয় গুণ।

শ্রীচ, কি, কুশারি।

চীনদিগের সামাজিক প্রথা।

পাঠক পাঠিকাগণ! আপনারা অবগত আছেন যে চীন দেশ আমাদের ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। ইহা আয়তনে প্রায় ভারতবর্ষের সমান। চীন এক-জন সম্রাটের অধীন, চীনদেশবাসীরা বৌদ্ধ—ভারতের ধর্ম্মে সঞ্জীবিত; সুতরাং ভারতের সহিত চীনের নৈকট্য অনেকাংশে থাকাই সম্ভব। ভারতবর্ষের উত্তরে তীব্বত বলিয়া একটী দেশ আছে; সেই দেশ ও তাতার দেশ চীন সম্রাটের অধীন; তাতার ও তীব্বত সহ চীন দেশ, পৃথিবীর অনেক বৃহৎ দেশ অপেক্ষা আয়তনে ও লোক-সংখ্যায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

চীন দেশে প্রধানতঃ তিন জাতীয় লোক দৃষ্ট হয়—অসভ্য জাতি, চীন জাতি ও মাঞ্চুতাতার। পূর্ব্বকালে চীন দেশে অনেক প্রকার অসভ্য লোক বাস করিত, কিন্তু চীন অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে তাহা-দিগকে পার্ব্বত্য প্রদেশে বিতাড়িত ও বিধ্বস্ত করিয়া সমগ্র চীনে আপনাদিগের স্বত্বাধিকার স্থাপন করিয়াছে। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে একজন অনাহূত ব্যক্তি সদলে আসিয়া চীনের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য এই সময়ে মাঞ্চু তাতারদিগের সাহায্য লওয়া হয়। এই সুযোগে তাহারা আসিয়া পিকিনে বাস করে। অন্যান্য জাতির তুলনায় ইহারা বিশেষ প্রতাপশালী, সুতরাং ক্রমে ক্রমে ইহারা চীনের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। সেই অবধি এই বংশীয়েরা চীনের রাজা হইয়া আসিতেছেন।

মাঞ্চুতাতারদিগের আসিবার পূর্ব্বে চীনেরা লম্বাচুল রাখিত এবং মাথার ঝুটি বান্ধিত। এখন চীনেরা যেরূপ সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া মধ্যস্থলে লম্বাচুল বিনাইয়া রাখে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না—এই মাঞ্চুতাতারদিগের আদেশে উহারা এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের মাথায় চুল না থাকিলে বিশেষ ক্লেশকর ও লজ্জাজনক হইয়া উঠে; এ দেশীয় পুরুষদিগের তেমনি লম্বা চুল না থাকিলে তাহাদিগকে বিশেষ লজ্জা ও ঘৃণার পাত্র হইতে হয়। লম্বা চুল রাখিবার জন্য কাল রেশম কিংবা পরচুলা দিয়া সুদীর্ঘ বেণী বাঁধিয়া রাখে। জগতের লোকের বিভিন্ন আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শোভা-সৌন্দর্য্যানুভবী প্রভৃতি অনুসন্ধান করিলে মানবীয় রুচির বিচিত্রতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। জগতের লোকের সৌন্দর্য্যভোগস্পৃহা বলবতী, সেই স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া মানবসম্প্রদায় জগতের কক্ষে কক্ষে খুঁজিয়া যেখানে মনোমত প্রাণারাম বস্তু পাইয়াছে, সেই-খানে মধুচক্রবদ্ধ মধুমক্ষিকাবৎ রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। কাহারও বদনে, কাহারও চক্ষে, কাহারও চরণে বিশ্ববিধাতা

সৌন্দর্য্যের মধুকলসী ঢালিয়া দিয়াছেন। স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্র পদ চীনদিগের চক্ষে বড় সুন্দর। চরণ যুগল ছোট করিবার জন্য চীনগণ নানারূপ কৃত্রিম প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

চীন বরকর্ত্তা যখন পাত্রী দেখিতে যান, তাঁহার অন্য রূপ দেখিতে হয় না, কন্যার পা দুখানি অতি ছোট দেখিলে তাঁহাকে অসামান্যা সুন্দরী জ্ঞানে বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। চীনদেশের বড় ঘরের বধূরা একগাছি যষ্টি অথবা একটী বালকের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারেন না! পায়ের গোড়ালীর উপর ভর দিয়া চলিয়া থাকেন। চীন কবিরা এই গতি-ভঙ্গিতে বিমোহিত হইয়া শত শত কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন! চরণ যদি ৩ ইঞ্চির অনধিক দীর্ঘ হয়, এরূপ রমণী কবিমুখে 'সোণার পদ্ম' বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকদিগের কেশসংস্কার প্রথা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কোথাও পিছনের দিকে বড় খোঁপা বাঁধিয়া তাহাতে নানারূপ ফুল গুঁজিয়া রমণীরা সৌন্দর্য্যে দীপ্তিশালিনী হইয়া আপনাদের বিলাস-লালসা পরিতৃপ্ত করেন। কোথাও বা বিননী বেণী করিয়া তাহাতে স্বভাবজ কুসুমমালা গ্রথিত করিয়া কামিনীরা আপনাদিগকে সৌন্দর্য্যশালিনী জ্ঞান করেন। বিলাসে ও সৌখীনতায় চীন-রমণীরা ইংরেজ রমণী হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন। চীন রমণী মুখে পাউডার মাখিয়া আরক্তগণ্ড হইতে ভাল বাসেন। কোন কোন ইয়ুরোপীয় পরিব্রাজক ইংরেজ মহিলা হইতে চীন মহিলার রূপের প্রশংসা করিয়াছেন।

চীনেরা ইংরাজদিগের মত আঁটা পোষাক পরিধান করেন না। গ্রীষ্মকালে সাধারণ কাপড়ের ঢিলে জামা ও ইজার ব্যবহার করেন, শীতকালে তুলাভরা জামা প্রভৃতি ব্যবহার করেন। ধনী লোকেরা রেশমী ও পশমী বস্ত্র ব্যবহার করেন। কোন্ তারিখ হইতে কোন্ তারিখ পর্য্যন্ত গ্রীষ্মবস্ত্র অথবা শীত বস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে, সম্রাট তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

চীনদিগের আহারপ্রণালী একরূপ বিস্ময়জনক ব্যপার। ইয়ুরোপীয়েরা যেমন আহারের সময় কাঁটা চামচে ব্যবহার করেন, চীনদিগের আহারপ্রণালী কতক সেইরূপ হইলেও ইহারা কাঁটা চামচের পরিবর্ত্তে বাঁশের এক প্রকার কাঠী ব্যবহার করিয়া থাকে। বাম হাতে একটী ছোট পাত্রে খাদ্যদ্রব্য মুখের নিকট ধরিয়া অপর হস্তে কাঠী দ্বারা তাহা এত ত্রস্ত ভাবে মুখে ফেলিয়া দেয় যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদিগের ন্যায় চাউল, তরিতরকারী, মৎস্য, মাংস ইহাদিগের প্রধান খাদ্য। উহাদিগের অখাদ্য প্রায় কিছুই নাই, উহারা আর্সুলার বক্ষ, কুকুর, বিড়াল, ইন্দুর প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কাল বিড়ালের মাংস পাইলে ইহারা আর কিছুই চাহে না।

গব্য দুগ্ধ এমন সুন্দর পদার্থ, উহারা কিছুতেই তাহা পান করিবে না। রোগ হইলে স্তনদুগ্ধ-পান বিধি আছে। কাল বিড়াল অপেক্ষা আর একটী সুখাদ্য খাদ্য আছে, যাহা চীনেরা অত্যন্ত আদরের সহিত গ্রহণ করে। এক প্রকার তাল-চঞ্চু পক্ষীর বাসা আছে, ইহা চীন দেশে অতি মূল্যবান পদার্থ। এই বাসা মাপিয়া তাহার যত ওজন হয়, সেই পরিমাণ রৌপ্য দিয়া চীনেরা তাহা ক্রয় করে। এই বাসা হইতে এক প্রকার 'সুরুয়া' প্রস্তুত হয়, তেমন খাদ্য বুঝি জগতে আর নাই।

চীন রাজকর্ম্মচারীদিগকে ইংরেজেরা "মন্দারিণ" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই কর্ম্মচারীরা দুই ভাগে বিভক্ত—বিচার-বিভাগীয় এবং সেনা-বিভাগীয়। ইহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিহ্ন আছে। বিচারবিভাগের কর্ম্মচারিগণের বুকের ও পিঠের দিকে পাখীর ছবি এবং সেনাবিভাগীয়দিগের পোষাকে পশুর ছবি থাকে। টুপিতে পার্থক্যসূচক বোতামও থাকে। সম্রাটের পোষাক সাদাসিধা। রাজচিহ্নস্বরূপ তাঁহার টুপিতে কেবল মাত্র একটী মুক্তা থাকে।

চীনদিগকে "বিননীশূন্য" বলিলে ইহারা ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠে। "বিননীশূন্য" গালি আমাদের দেশীয় নাক-কাটা কান-কাটার মত। দুষ্ট বালকেরা কখন কখন একের বেণীর সহিত অপরের বেণী বাঁধিয়া দিয়া রঙ্গ করে।

চীনেরা চা পান করে। চাসামস্ত-নামক এক প্রকার মদ্য ও আফিংএর ধূম পান ইহাদিগের জাতীয় কদভ্যাস। চীনেরা গুলির নেশাতেও সিদ্ধ। তাহাদের গুলির আড্ডা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে ইহার কৌতুকাবহ বর্ণনা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করা যায় না। আফিম ও গুলি সেবনই চীনজাতির অধঃপাতের কারণ।

বসন্তে মায়ের আহ্বান।

"আয় আয় ছুটে গেহ-কাজ ফেলে,
ছুটে আয় তোরা পরাণের ধন,
তোদের লাগিয়ে সেজেছি আমি
আজি এ বসন্তে নয়ন-মোহন।"
"নদীকে দিয়েছি তরঙ্গ বাহু—
সুশীতল জল হৃদয়ে তার,
আকাশে ক'রেছি অমল ধবল
শান্ত জোছনা হীরক-হার!"

"পাদপে দিয়েছি নবীন পল্লব ;—
লতায় লতায় ফুলের মেলা ;
আমার আদেশে প্রকৃতি সুন্দরী
আনন্দে খেলিছে নূতন খেলা।"
"গৃহে তুলে দিছি নবীন শস্য,
আমার মঙ্গল-আরতি রাজে ;
তোমাদের তরে সেজিছি আমি
যেখানে যা সাজে—মোহন সাজে।"

"ছুটে এস বাছা! হৃদয়ের ধন,
মায়ের তোরা জুড়াবি বুক ;
তোদের ক্ষুধায় অন্ন তুলে দিব,
তৃষ্ণায় পানীয়—বিশ্রামে সুখ।"
"শান্ত জীবনের শান্ত হাসিটী,—
ভরিয়া গিয়াছে ভবনে ভবনে ;—
(ওই) আম্রবণ-ঘেরা শতেক কুটীর
ধ্বনিয়া উঠিছে আমার গানে।"
"জগতে দিয়েছি মঙ্গল আশীষ—
ঘরে ঘরে ফিরে মলয় বায়,
মঙ্গল গানে, মঙ্গল ধ্যানে
নবীন জীবন স্রোত বহে যায়।"

* * *

আয় আয় তোরা ছুটে আয় আয়,
যে আছ যেখানে দূর দূরান্তরে,
মায়ের মধুর মোহিনী মূরতি
দেখ এ বঙ্গে নয়ন ভরে।

শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ

হারজিত।

১

বিনয় বড় চিন্তায় পড়িয়াছেন। তাঁহার প্রাণের বন্ধু সুশীলচন্দ্র নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন :—

"ভাই বিনয়, তুমি এ পূজার ছুটীতে কোথায় যাইতেছ? কত দিন দেখা হয় নাই, আমায় মনে আছে ত? এখানে একবার আসিবার promiseটা বোধ হয় ভুলে যাও নাই। লাহোর হইতে কি করাচী বহুদূর? আর এক কথা তোমায় পূর্ব্বপত্রে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এখানে এক ঘর নূতন বাঙ্গালী আসিয়াছেন। তাঁহারা আমাদেরই স্বজাতি এবং ব্রাহ্ম। শ্যামাপদ বাবুর কন্যা নলিনী অতুলনীয়া সুন্দরী। তাঁহাকে আসিয়া তোমার দেখা উচিত। আমায় দেখিতে আস বা না আস, একবার তুমি তাঁহাকে দেখিতে আসিতে ভুলিও না। এখানেই আজ বিদায়— তোমার সুশীল।"

সুশীলচন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র উভয়ে বাল্যকাল হইতে একত্রে স্কুলে ও কালেজে পাঠাভ্যাস করিয়াছেন। তাহা ব্যতীত উভয়ে অভিন্নহৃদয় বন্ধু। কালেজ ছাড়িয়া বিনয় লাহোরে প্র্যাক্‌টিস করিতেছেন। সুশীলচন্দ্র বি এল ফেল হইয়া মার্চ্চেণ্টের কাজ করিতেছেন। তাঁহার পিতা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, করাচিতে তাঁহাদের বিস্তীর্ণ কারবার। সুশীলের সে সাদর নিমন্ত্রণের লোভ ত্যাগ করা বিনয়ের সাধ্যাতীত হইল। পূজার ছুটীতে তিনি করাচিতে উপস্থিত হইলেন।

২

"কি হে তোমার সে সুন্দরীর কি খবর?"

করাচিতে একটি দ্বিতল আবাসের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের মুক্ত বাতায়ন সম্মুখে সুশীলচন্দ্র একটি বেত্রাসনে বসিয়া আছেন। বিনয় সেই আসনের উপর হস্তস্থাপন

করিয়া প্রীতিকৌতুকনয়নে চাহিয়া হাসিয়া এই প্রশ্ন করিলেন।

নতমুখে গম্ভীর কণ্ঠে সুশীল বলিলেন —"সে কথায় আর কাজ নাই।"

"সে কি, সেই জন্য ত সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এখানে আসিলাম।"

"এ কি কথা? তোমার বুঝি আর কোনও কাজ নাই?"

"বাজে কথা ছাড়, আলাপ কবে করাইয়া দিবে তা বল।"

"আলাপ নাই করিলে?"

"কি হে এত বিরাগ কিসের? তোমার হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুঝি প্রসন্ন হন নাই?"

"আমার আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিও না।"

"সত্যি এত দূর? তা হলে গুপ্ত প্রেম ব্যক্ত করে ফেলেছিলে কেন? গোপনে পূজায় কি মন তুষ্ট হল না?"

"সে আর বলে কি হবে?"

"সত্যি ভালবেসেছ?"

"তার প্রতিশোধও পেয়েছি।"

বিনয় তখন পরিহাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সব খুলিয়া বলিবে কি?"

"সে অনেক কথা, তবে এই বলে রাখি, আমার নিরাশ প্রণয়ে প্রতিদানের আশা নাই, শুধু আত্ম-বলিদান।"

"আমায় সে দেবীটিকে একবার না দেখিলে চলিবে না। সেই পাষাণ মূর্ত্তি দেখাবে কি? তোমাকে যে ভাল বাসে নাই, সে হয় অন্ধ, নয় হৃদয়হীনা।"

মৃদু হাসিয়া সুশীলচন্দ্র বিনয়ের প্রতি চাহিলেন। সে বিষাদ-ক্লিষ্ট হাসি দেখিয়া বিনয়ের হৃদয় ব্যথিত হইল। সুশীল বলিলেন "শুধু আমি কেন, অমন অনেককে ফাঁদে ফেলে ভেগে ছেড়েছে। শ্যামাপদ বাবুর মত নিয়ে আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল আমায় কন্যা সমর্পণ করেন। ইতিপূর্ব্বে ছয়টি প্রণয়ী নিরাশ হয়েছেন। আমায় নিয়ে সপ্তম সংখ্যা পূর্ণ হ'ল। এখন ভাই তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ। তুমি যদি প্রতিশোধ নিতে পার, তা হলে আমি সানন্দে বলিব "revenge, sweet revenge"

বিনয় হাসিয়া বলিলেন, "আমায় আবার জড়ান কেন? আমি তোমাদের মত অত রোমিক নই।"

"তাতো নও, কিন্তু সে প্রেমপ্রতিমা চোকে পড়লেই প্রেমের ফাঁদে পড়তে হবে।"

আচ্ছা ভবিষ্যৎটা তুলে রেখে, বর্ত্তমানের প্রেম অভিনয়টা ব্যক্ত করে বল দেখি।"

"তুমি দেখছি আমার সব কথাগুলো না শুনে ছাড়বে না। তবে বলিতেছি, 'শ্যামাপদ বাবুরা আসবার পরেই আমার সহিত আলাপ হইল। ক্রমে খুব ঘনিষ্ঠতা হইল। এখানে ত আর বেশী ঘর ব্রাহ্ম নাই। নলিনীর সঙ্গে আমার সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ হইত। তাঁহারা আমাকে প্রায় প্রত্যহই টেনিসে আহ্বান করিতেন, কখনো রাত্রে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেন।

তাঁহারা যে স্থানে ভ্রমণে যাইবেন, আমি পথপ্রদর্শক, সঙ্গী। নলিনীকে প্রথম দেখার পরেই সে উল্কামুখী বহ্নির ন্যায় আমার হৃদয়কে জ্বালাইয়াছিল। আমি ভাবিতাম বোধ হয় সে আমায় ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি যখন অনিমেষনয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিতাম, সে তাহা দেখিতে পাইলে হাসিত; তাহার সেই মুখের সৌন্দর্য্যে, নয়নের মোহন দৃষ্টিতে, অধরের মধুর হাসিতে আমার মন্ত্রমুগ্ধ প্রাণ কাড়িয়া লইল। অবশেষে একদিন আমি প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। সে দিন সন্ধ্যার সময় আমরা সমুদ্র তীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। শ্যামাপদ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া তটে তটে বেড়াইতেছিলেন। আমি ও নলিনী অন্য দিকে বেড়াইতে বেড়াইতে কিছু দূরে একটী চড়ায় উপস্থিত হইলাম। সে স্থানটি বড়ই সুন্দর, তোমায় একদিন দেখাইব। আমি অধীর ভাবে সেই সৈকতে বসিয়া সমুদ্রের নীল জলরাশির প্রতি চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর আত্মবিস্মৃতের মত উঠিয়া চাহিয়া দেখি নলিনী সেই নীল সিন্ধুর প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে। সহসা অস্তগামী সূর্য্যের কনক কিরণ তাহার মধুর আননে—চূর্ণকুন্তলে ছড়াইয়া পড়িল। আমি আত্মহারা হইয়া তাহার দুইটি হাত আমার হাতে ধরিয়া বলিলাম, 'নলিনী আমি তোমায় ভালবাসি, বল বল তুমি আমার হইবে কি না?' সে বিস্মিত চকিত হইয়া আমার হাত সজোরে ছাড়াইয়া লইল, তাহার মুখে ঘৃণা ও বিরক্তির ছায়া সুস্পষ্ট রূপে প্রভাসিত হইল। সে সরিয়া দাঁড়াইয়া আরক্ত আননে গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,

"সে কি কথা সুশীল বাবু? আমায় ভালবাসেন, আশ্চর্য্য!"

আমি ব্যথিত কণ্ঠে কহিলাম, "কেন তুমি কি এত দিন জান নাই?"

সে কহিল, "তাহা হইলে এখানে আসিতাম না।"

আমি কাতরকণ্ঠে বলিলাম, "তুমি কি আমায় তা হলে ভাল বাস না?"

এই কথায় পাষাণী হৃদয়হীনা উচ্চৈঃস্বরে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি যেন মৃত্যুসঙ্গীতের মত আমার শ্রবণে বাজিতে লাগিল। আমি নিশ্চল নীরব ভাবে বসিয়া পড়িলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে শুনিলাম বলিতেছে,

"সুশীল বাবু, আমি চলিলাম, আমার অদৃষ্ট ভাল। এ বৎসরে ছয় জন suitors হয়েছিলেন, আপনাকে নিয়ে সপ্তম সংখ্যা পূর্ণ হল। আমায় ক্ষমা করিবেন। আপনাকে ব্যথা দিবার আমার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমি আপনাকে ভাল বাসি নাই, বাসিতে পারিব না। অতএব এ কথা আর উত্থাপন করিবেন না। যদি কখনো পুনরায় এ কথা উত্থাপন করেন, তাহা হইলে আমি কথা কহা পর্য্যন্ত বন্ধ করিব।" তাহার কথার সুরে যেন হাসির তার বাজিতেছিল।

পদশব্দে বুঝিলাম চলিয়া গেল। শুনিলে ত তার পর আর কি? বিফল প্রণয়ে নিরাশ যন্ত্রণা। আশ্চর্য্য! বাঙ্গালীর ঘরে এমন ,কখনো শুনি নাই। এখন তুমি যদি প্রতিশোধ নাও ত বুঝি।"

বিনয়েন্দ্র ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দেখা যাবে। কিন্তু তখন ত তুমি আমায় duel এ (দ্বন্দ্বযুদ্ধে) আহ্বান কর্ব্বে না?';

"কখনো না, আমি সুখী হব। কিছু না, শুধু যদি তুমি তোমার ভালবাসা দেখিয়ে তার ভালবাসা আকর্ষণ করে, শেষে তেমনি করে হেসে উপেক্ষা করে ফেলে যেতে পার"—

একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিনয় বলিলেন, "ছি!"

বিনয়ের হৃদয়-অন্তঃপুরে একটি মোহিনী ছায়া ফুটিয়া উঠিতেছিল।

৩

তাহার পরদিন সুশীলচন্দ্র বিনয়কে লইয়া শ্যামাপদ বাবুর বাসায় উপস্থিত। শ্যামাপদ বাবু সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ড্রইং রুমে লইয়া চলিলেন। নলিনী তখন পিয়ানোতে গাহিতেছিল—

"নিমেষের তরে সরমে বাঁধিল,
সরমের কথা হল না"

সহসা পিতার আহ্বানে ও অপরিচিত কণ্ঠস্বরে ফিরিয়া চকিতে চাহিল। সেই চকিত দৃষ্টি, সুন্দর আননের আরক্তিম আভা বিনয়ের চক্ষের পুত্তলী ঝলসিয়া হৃদয়ে চিত্রিত হইয়া গেল।

সুশীলচন্দ্র বলিলেন, "এই আমার বন্ধু বিনয়েন্দ্র দত্ত।"

নলিনী মধুর হাসিয়া বলিল (বিনয় ভাবিল কি মধুর হাসি, এ হাসি যে প্রাণ-পূর্ণ, সুশীল ভুল বুঝিয়াছে) "আপনার সহিত আলাপ ছিল না বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই সুশীল বাবু আপনার কথা বলেন।"

বিনয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তিনিই ত আমায় সেই লাহোর হইতে এই সুদূর করাচিতে টানিয়া আনিলেন।"

"আপনার করাচি কেমন লাগিতেছে?"

"খুব ভাল, সমুদ্রতটে এমন দেশ আর কাহার না ভাল লাগিবে?"

"আপনি কত দিন থাকিবেন?"

"বেশী দিন নয়"—

সুশীল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, "সে কি কথা বিনয়, promiseটা মনে আছে ত? এখনো তিন সপ্তাহ বাকি আছে।"

বিনয় হাসিয়া বলিলেন, "সে তখন দেখা যাবে।"

"দেখা দেখি নয়, থাকিতেই হবে।"

সে দিনের আলাপাদির পরে, শ্যামাপদ বাবু তাঁহাদিগকে পরদিন চা'তে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই প্রকারে বিনয়ের সহিত নলিনীর প্রায় প্রত্যহই দেখা হইতে লাগিল। বিনয় মুগ্ধ, আর নলিনী? বিনয়ের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল কি? নলিনী সুশীলের সহিত অসঙ্কোচে কথা কহিত, কতবার হাসিত, কিন্তু তাহার বিনয়কে এত লজ্জা কেন? সে কখনো

বিনয়ের সহিত বেশী কথা কহিতে পারিত না। কখনো সে বিনয়ের মুখ পানে চাহিত না। যদি সহসা কখনো উভয়ের চক্ষের দৃষ্টি মিলিত হইত, তাহা হইলে নলিনীর চক্ষের পল্লব পড়িয়া যাইত, কপোলে লাজরক্ত আভা ফুটিয়া উঠিত! সরমে অনুরাগে যে সে মুখের পরিবর্ত্তন হইত, তাহা অন্যে না দেখিলেও বিনয়ের চক্ষুর অগোচর থাকিত না। সমালোচক যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকল দিক্ দেখিয়া সমালোচনা করে, বিনয় সেইরূপ সুশীলের বিশ্বাসের সমালোচনা করিতেন। সুশীলের প্রতি কথায় যেন অবিশ্বাস হইত। ভাল বাসায় মানুষকে অন্ধ করে, বিনয় অন্ধ হইয়া ভাল বাসিয়াছিলেন, প্রতিদানের আশা মাত্র তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হয় নাই। কিন্তু যে প্রেম-বহ্নির ইন্ধন তাঁহার গোপন হৃদয়তলে জাগিতেছিল, তাহার উত্তাপ কি সে নলিনী পুষ্পের হৃদয় স্পর্শ করে নাই? আর সুশীলচন্দ্র তিনি কি কিছু বুঝিতেন না? নলিনীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিবার তাঁহার অবসর ছিল না। তাঁহার হৃদয় প্রেম-প্রতিশোধে পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি যে প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ে তাহাকে ভালবাসিতে গিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রেম অকালে কঠিন বাক্যে দলিত হইয়াছিল। তিনি সেই প্রকার নলিনীর হৃদয় দলিত করিতে একান্ত অধীর হইয়াছিলেন। সেই জন্য বিনয় ও নলিনীর কথা বার্ত্তার সময় সুশীল সর্ব্বদা অন্য দিকে থাকিতেন। কিন্তু হায়! বুঝিতেন না সূর্য্যমুখী সূর্য্যের প্রতিই চাহিয়া থাকে। সে তাহার স্বভাব, তাহাকে তাহা শিখাইতে হয় না।

বিনয়ের ছুটী ফুরাইয়া আসিল। আর দুই দিন মাত্র বাকি। শ্যামাপদ বাবু সেখানকার কয়েক জন বন্ধুকে picnic এ (বনভোজনে) আহ্বান করিলেন। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী একটি দ্বীপের মত স্থানে বনভোজন হইবে স্থির হইল। বিনয়ের লাহোর ফিরিবার পূর্ব্ব দিনে এই picnic হইবে নির্দ্দিষ্ট হইল।

সে দিন সকালে সুশীল বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, এখন কেমন বোধ হচ্ছে?"

বিনয় একটু বিস্মিতের মত ভান করিয়া বলিলেন, "কি?"

"নলিনীকে কেমন বোধ হইতেছে?"

"আমার ওসব সংবাদে কাজ কি? আমি ত পরশু চলে যাব"—

"তবু এ বছরে কি অষ্টম সংখ্যা পূর্ণ হবে না?"

"সে আশা আর নাই।"

"তবু হৃদয় ক্ষত না অক্ষত?"

বিনয় হাসিয়া গান ধরিলেন,—

"তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে,
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে।"

সুশীল সে পরিহাসের কণ্ঠস্বরে একটু

ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "তোমার ঠাট্টা রাখ।"

সে দিন দুই বন্ধুতে শ্যামাপদ বাবুর picnicএ যোগ দিতে গেলেন। সমস্ত দিন গোলমালে কাটিয়া গেল। আহারাদির পর সকলে বিশ্রাম করিতে বসিলে নলিনীকে গান গাহিতে অনুরোধ করা হইল। সে দিন শুধু সে সারাক্ষণ হস্তে একটা কার্য্য লইয়া ব্যস্ত ছিল। তাহার সহিত গল্প করিবার কাহারো সুযোগ হয় নাই। তাহাকে যখন গান গাহিতে অনুরোধ করা হইল, সে অন্যমনস্ক ভাবে দু একটি গান গাহিয়া যখন গাহিল,—

"এমনি করে
তারো কি কাঁদে প্রাণ আমারো তরে"

তখন মনে হইল তাহার সমস্ত হৃদয় যেন সঙ্গীতে বাজিতেছে। সে গানের সুর শুনিয়া সুশীলচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, "এ ত হৃদয়হীনার গান নহে। তবে নলিনীর হৃদয় কাহার?'

সম্মুখে সমুদ্রের জল রাশিতে যেমন শান্ত ভাব বিরাজমান, বিনয়েন্দ্রের আননেও সেই প্রকার শান্ত প্রীতিপূর্ণ ভাব বিরাজিত হইয়াছিল। সুশীলচন্দ্র একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতেন যে চক্ষে নূতন জ্যোতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, আননে নূতন শ্রী ফুটিয়া উঠিল। এই গানটি শেষ করিয়া আর নলিনী গান গাহিলেন না। গৃহে ফিরিয়া যাইবার ব্যস্ততা ও আয়োজন হইতে লাগিল। সকলেই উঠিয়া সমুদ্রের কূলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কেবল বিনয় ও নলিনী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই খানে বসিয়া রহিলেন। সহসা অস্তগামী সূর্য্যের কনক কিরণ আসিয়া উভয়ের আননে পড়িল। বিনয় আত্মবিস্মৃত, নলিনীর প্রতি চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিলেন, "নলিনী।"

পূর্ব্বে আলাপের ঘনিষ্ঠতা নাই, কখনো দুইজনে বেশী কথা বার্ত্তা কহেন নাই, অথচ যেন চির-পরিচিতের মত নাম ধরিয়া ডাকিলেন। নলিনী, একবার চকিতের মত চাহিয়া, নতমুখে বালুকা লইয়া খেলিতে লাগিল। পুনরায় বিনয়েন্দ্র বলিলেন, "নলিনী, আমার একটি কথা শুনিবে কি?"

সেই আরক্ত-লজ্জা-নত মুখ তুলিয়া, নলিনী বলিল, "কি বলিবেন?"

"তুমি সুশীলকে কেন ভাল বাস নাই?"

মুহূর্ত্তের মধ্যে নলিনীর মুখের ভাবান্তর হইল, সে রোষ-বিকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আপনার সে কথায় আবশ্যক?"

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিলেন, "আছে বলিয়াই ত জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"কেন সুশীল বাবু কি আপনাকে তাঁর হইয়া বলিতে বলিয়াছেন?"

"যদি তাই হয়"—

"তাঁর দ্বিতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ হবে।"

"কেন?"

"আমি জানি না।"

"তবে তুমি কি আর কাহাকেও ভাল বাস?"

নলিনী দুই হস্তে আপনার লাজরক্ত মুখখানি ঢাকিয়া রহিল। সহসা বিনয়

উঠিয়া তাহার মুখ হইতে হস্ত সরাইয়া নিয়া বলিলেন, "আমার একান্ত অনুরোধ বল, নহিলে সুশীল বেচারী"—

নলিনী আর সহিতে পারিল না। সযত্নে রুদ্ধ অশ্রুজলে দুই চক্ষু ভরিয়া উঠিল, অশ্রু কপোলে গড়াইয়া বিনয়ের হাতে ঝরিয়া পড়িল। তখন বিনয় আর কি করিবেন? ব্রজেন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হইলেন। তাহার পর উভয়ে বিস্মিত হইয়া উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আর ভাষায় প্রয়োজন? নলিনীর হৃদয়ের শূন্য আসনে দেবতা প্রতিষ্ঠিত হইল। বিনয়ও আপনার হৃদয়ের প্রতিমাকে বাহিরে লাভ করিলেন।

সকলেই বাড়ী যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া গেছেন দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিনয় উঠিলেন, বলিলেন, "আমি কালই চলে যাব, সুশীলকে এ কথা জানাতে পার্ব্ব না।"

নলিনী বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন?"

"সে অনেক কথা, পরে হবে। তবে সে তার প্রেমকাহিনী আমায় বলেছিল, ও বলেছিল তার প্রেমের প্রতিশোধ নিতে।"

"সে কেমন?"

"তোমার ভালবাসা আকর্ষণ কর্ত্তে এসে যে জালে আমায় জড়িয়েছিলে, আমার কি আর ফিরিবার পথ ছিল। আমার শুধু মনে হত, 'ঐ আঁখিরে কি আর রেখেছে বাকিরে'।"

"তোমার এত ঠাট্টা কেন?"

আচ্ছা অন্যকেও ত এই কষ্টটা দিয়েছ? আজ যদি আমায় নিরাশ হতে হত তা হলে?"

"আবার অন্যের কথা? আমি কি কর্ব্ব বল? আমি কি অন্যের ভালবাসা চেয়েছিলাম, না কাকেও ভালবাসা জানিয়েছিলাম?"

"ও সত্য আসল কথাটা মনে ছিল না। আমায় ত তুমি এখনো বল নাই যে, ভালবাস?"

সে মিনতিপূর্ণ চক্ষের দৃষ্টিতে বিনয়ের চক্ষে সমস্ত সংসার নবীন মাধুর্য্যময় হইয়া উঠিল। আবার হাসিয়া বলিলেন, "না তা হবে না, তবু বল একবারটি।"

"আমি এ জীবনে আর কাকেও ভাল বাসি নাই।"

"তা হবে না, কাকে ভালবাস?"

"তুমি কি জান না?"

"তবু"—

নলিনী প্রীতিভরে একবার বিনয়ের দিকে চাহিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল,—"তোমাকে—আর কাহাকেও নয়।"

"আর তা হলে কারো অধিকার নাই। কিন্তু আমায় কি দেখে ভাল বাসলে? আমি সামান্য"—

"থাক ওসব কিছু বলিতে হবে না। আমি জানি না কেন তোমাকে ভাল বাসিলাম।"

"বেচারী সুশীল!"

"সে দোষ কি আমার?"

"আহা! তার মনোনীত রত্ন আমি কোথা থেকে এসে কেড়ে নিলুম।"

'কেড়ে নেবে কেন ? আমার প্রাণে কারো অধিকার ছিল না। আজ আমি স্বেচ্ছায় তোমায় সর্ব্বস্ব দিলাম। এখন তোমার ইচ্ছা হয় এ কথা নিয়ে, আমায় পরিহাস করে চলে যাও। তোমার বন্ধুকে তুষ্ট কর্ব্বার জন্য আমাকে চরণে ধূলার মত দলিত করে প্রতিশোধ নিয়ে যাও, তবু আমি আর কারো হব না''—

আকুলকণ্ঠে বিনয় ডাকিল "নলিনী !"

অশ্রুজড়িত-কণ্ঠে নলিনী বলিল, "সেই জন্য ত এসেছিলে।"

"কখনো তা নয়। আমি সেই প্রথম মুহূর্ত্তে দেখেই আমার প্রাণ মন তোমায় সঁপিয়া দিয়াছি।''

সম্মুখে শ্যামাপদ বাবুকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "তোমার বাবা আসিতেছেন, আর অন্য কথার সময় নাই। নলিনী আজ তাঁকে বলিব, মনে থাকে যেন তুমি আমার। আর কারো অধিকার নাই।"

পিতাকে আসিতে দেখিয়া সলজ্জে নলিনী সেখান হইতে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে একবার মাত্র বিনয়ের প্রতি চাহিল, বিনয় আত্মহারা।

৫

সেই দিন রাত্রে সকল বন্ধু বান্ধবকে শ্যামাপদ বাবু ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আহারাদির পর সকলে আসিয়া ড্রইং রুমে বসিলেন, এবং নলিনীকে গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। নলিনীর হৃদয় সুখে পূর্ণ, সে সেদিন অনেক গান গাহিয়া, এই গানটি গাহিল,—

"তবু মনে রেখো"

সে গানের সুরে যেন জীবন্ত বিষাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই "তবু মনে রেখো" গানটি যেন সহস্র বন্ধনে বিনয়ের হৃদয়কে সুদৃঢ় ভাবে বন্ধন করিল। সমস্ত জগৎ সংসারে যেন শুধু "তবু মনে রেখো" ধ্বনি হইতে লাগিল। বিনয়ের হৃদয়ের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে যেন সেই একই সুর বাজিতে লাগিল, "তবু মনে রেখো।" অন্যের অলক্ষ্যে বিনয় উঠিয়া শ্যামাপদ বাবুর বসিবার কক্ষে গিয়া, সলজ্জ ভাবে তাঁহাকে আপনার হৃদয়ের কথা জানাইলেন—তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন—

"নলিনীর মত না হ'লে আমি এখন কিছু বলিতে পারি না। সে এখন বড় হ'য়েছে, নিজে পছন্দ না করে"—

বিনয় বলিলেন, "তাহার অমত হবে না।"

শ্যামাপদ বাবু বিরক্তির কণ্ঠে বলিলেন, "সে কি, আমার মত না নিয়েই তুমি তার মত নিয়েছ ?"

বিনয় নিরুত্তর।

সহসা শ্যামাপদ বাবু হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন, "ধনুর্ভঙ্গ পণ ভাঙ্গাতে পেরেছ, সে জন্য তোমাকে শত ধন্যবাদ, ঈশ্বর তোমাদিগকে সুখী করুন।"

'আপনার মত না নিয়ে নলিনীর নিকট আমি এ বিষয়ের প্রস্তাব ক'রেছিলাম, সে জন্য ক্ষমা করুন। কিন্তু আমি নলিনীর অযোগ্য হ'লেও, প্রাণপণে তার উপযুক্ত হবার চেষ্টা কর্ব্ব। আপনিও

আমার অবস্থা জানেন। সুশীলও সব জানে। তাতে আপনার বোধ হয় কোনরূপ আপত্তির কারণ নাই।

"থাক, ওসব কথায় কাজ নাই। আমি খুব আনন্দিত হইয়াছি। অনেক গুলো সম্বন্ধ এসেছিল, কিছুতেই সম্মত হয় নাই। বেচারী সুশীল—

"এখন এ কথা কাকেও বলিবেন না। আমি যাইবার পরে জানাইবেন।"

"কেন?"

"আমি সুশীলের কষ্ট দেখিতে পারিব না।"

"তুমি কি পূর্ব্ব হইতে জানিতে?"

"হাঁ।"

"তবু তুমি উহাকে বিবাহ করিতে অগ্রসর হইয়াছ?"

বিনয় নিরুত্তরে মৃদু হাসিল।

অন্যান্য কথার পরে বিবাহ আগামী ফাল্গুন মাসে হইবে স্থির হইয়া গেল। বিবাহের পূর্ব্বে সকলে কলিকাতায় যাইবেন। সেই স্থান হইতে শুভ কার্য্য সমাধা হইবে।

বিনয় পুনরায় ড্রইং রুমে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সকলে বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। নলিনী গৃহের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সুশীল বলিলেন, "এই যে বিনয়, এতক্ষণ কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়েছিলে?"

বিনয় বলিলেন, "কাল চলে যাব, তাই শ্যামাপদ বাবুকে বলতে গিয়েছিলাম।"

তাহার পর চকিতে নলিনীর দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি মিলিত হইল। সে দৃষ্টিতে সহস্র লোকের মাঝখানেও গোপন আলাপ হইয়া গেল। সকলে গৃহের বাহিরে গমন করিলে পর বিনয় নলিনীকে দ্রুতকণ্ঠে কহিলেন, "তোমার বাবাকে বলিয়াছি।"

আগ্রহে নলিনী বলিল, "কি বলিলেন?"

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিলেন, "তিনি সম্মত হইয়াছেন, আগামী ফাল্গুন মাসে"—

"থাক আর বলিতে হবে না।"

সুশীলচন্দ্র বাহির হইতে বিনয়কে ডাকিলেন, "বিনয় কি করিতেছ, এসো না, বাড়ী যাবার কথা কি মনে নাই?"

বিনয় যাইবার সময় বলিলেন, "চিটি দিও, মনে রেখো।"

নলিনীর দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আবার বিনয় আত্মহারা, ছুটিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন প্রত্যূষে বিনয় লাহোর চলিয়া গেলেন। তাহার দুই দিন পরে সুশীলচন্দ্র আপনার শয়ন-প্রকোষ্ঠে বসিয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি পড়িতেছেন—

"ভাই সুশীল, তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে কি না জানি না। আমি বোধ হয় তোমার ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু ভাই, আমার কোনও দোষ নাই। তুমি নলিনীর ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া আমায় তাহার প্রতিশোধ লইতে বলিয়াছিলে। আমি প্রতিশোধ লইতে যাইবার পূর্ব্বেই নলিনী তাহার শোধ লইয়াছে। সে

আমায় ভাল বাসিয়াছে। আমাকে তাহার হৃদয়ের কথা জানাইয়াছে, আমিও তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি নাই। শ্যামাপদ বাবু এ বিবাহে সম্মত হইয়াছেন, আগামী ফাল্গুন মাসে আমাদের বিবাহ হইবে। আশা করি, তুমি পূর্ব্বের সকল কথা ভুলিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে।

তোমার স্নেহ-ভিখারী বিনয়।"

এ পত্র পড়িয়া সুশীল বজ্রাহতের মত হইয়া, সহসা আপনার মনে হাসিয়া উঠিলেন। নলিনী যে একজনকে ভাল বাসিয়াছে, এক জনের জন্য কাঁদিয়াছে, ইহাতেও যেন হৃদয় তৃপ্ত হইল। দিন কত তিনি শ্যামাপদ বাবুর বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিলেন। অবশেষে বিনয়ের ভাবী স্ত্রীকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে যাইতেন। তাহার পর বিনয়ের বিবাহে সুশীলচন্দ্র যেমন পরিশ্রম করিলেন, এমন কেহ করে নাই। বিবাহের সময় বিনয় ও নলিনীকে মহামূল্য উপহার দিয়াছিলেন। সকলেই সর্ব্বদা সুশীলচন্দ্রকে এই গানটি গাহিতে শুনিতেন—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কবে ধরা পড়ে কে জানে?
গরব সব হায়! টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।"

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বিবিধতত্ত্ব-সংগ্রহ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের শেষ)।

১৬। সমস্ত ইয়োরোপে যত প্রকার ফুলের গাছ উৎপন্ন হয়, এক নিউসাউথ্ ওয়েলস্ প্রদেশে তদপেক্ষা অধিক প্রকার ফুলের গাছ বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহা পৃথিবীতে নন্দনকানন।

১৭। ময়ূরের পুচ্ছ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের ডার্বিশায়ার ও উইলট্ শায়ার নামক প্রদেশ-বাসিগণের একটী অদ্ভুত সংস্কার দেখা যায়। তাহারা বিশ্বাস করে যে, গৃহস্থের বাটীর মধ্যে যদি কোন প্রকারে একটী ক্ষুদ্র ময়ূরপুচ্ছও বায়ু-নিক্ষিপ্ত হইয়া বা অন্য কোন প্রকারে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই গৃহস্থের নানা অমঙ্গল হয়—ধন নাশ, রোগ, মৃত্যু ইত্যাদি দুর্ঘটনার জন্য তাহারা সদাই প্রস্তুত থাকে।

১৮। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশে অতি দরিদ্র ও নীচ শ্রেণীর লোক-দিগের মধ্যেও বিদ্যার চর্চ্চা দেখা যায়। ভৃত্য, মাদুর ও পাদুকা ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক হইতেও অনেকেই ঐ সকল দেশে পরে গ্রন্থকার, বক্তা ও রাজনৈতিক পণ্ডিত হইয়াছেন। কিছুকাল হইল লণ্ডনের এক ফিরিওয়ালার বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়া অনেক সদ্বিদ্বান্ ব্যক্তি বিস্মিত

হইয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি সপ্তবিংশতি বৎসর কাল ফিরিওয়ালার কাজ করিতেছে এবং এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে দিবসে আহার-কালে এবং রাত্রিতে বিশ্রামসময়ে বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারীর তুল্য বিদ্যা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। বিদ্যা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যক্তি নিজের হীন ব্যবসায়ের প্রতি কিছুমাত্র বীতরাগ হয় নাই। ইংরাজদিগের ইহাই একটী প্রধান গুণ যে, জ্ঞানের জন্যই তাঁহারা জ্ঞানানুশীলন করিতে জানেন।

১৯। দুষ্ট প্রকৃতির অশ্বগণকে শিষ্ট করিবার জন্য ইয়োরোপের অশ্ব-শিক্ষক-গণ একটী অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে ঘোটক জাতি সুগন্ধের ঘ্রাণ পাইলে তন্ময় হইয়া যায় এবং তখন তাহাদের দুষ্টামির কোন লক্ষণই দেখা যায় না। কিন্তু এক অশ্ব যে সুগন্ধে মুগ্ধ হয়, অপর একটী অশ্ব যে সেই সুগন্ধেই মুগ্ধ হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই। কোন্ দুষ্ট অশ্ব কোন্ সুগন্ধের বশ, তাহা আবিষ্কার করাই কিছু কষ্টসাধ্য। কিন্তু একবার তাহা স্থির করিতে পারিলে দুষ্ট অশ্বকে শিষ্ট করা অতি সহজ হইয়া উঠে।

২০। ফ্রান্সে মৎস্য ধরিবার একটী নূতন কৌশল অবলম্বিত হইতেছে। ছিপের অগ্রভাগে ক্ষুদ্রাকার দর্পণ বিলম্বিত থাকে। তাহা এত হালকা যে, জলের উপর ভাসিতে থাকে। যখন মাছ চার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দর্পণের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহার প্রতিবিম্ব দর্পণে পতিত হয়; সে দেখে যেন অন্য একটী মৎস্য চার লইতে আসিয়াছে, সুতরাং সেও দ্রুতবেগে চারের নিকট আইসে, আসিলেই ধরা পড়ে। এই কৌশল যে বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছে ফ্রান্সের অনেক মৎস্যজীবী তাহা একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন।

২১। সুইজারলণ্ডের বারন্ নামক নগরের একজন সমৃদ্ধিশালী বণিক্ তথাকার পশুশালাস্থ পশুদিগের প্রতি বড়ই অনুরক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত পশু-শালার ভালুকগুলির প্রতিই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত। মৃত্যুকালে তিনি উইল্ করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি উক্ত পশুশালাস্থ ভালুক-দিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানে ব্যয়িত হইবে।

২২। একজন ইংরাজ চিকিৎসক হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, মানুষ এক হাজার দুই শত বারটী বিভিন্ন রোগের অধীন। এ হিসাব স্থূল হিসাব মাত্র।

২৩। দক্ষিণ আফ্রিকায় একজাতীয় পিপীলিকা দেখা যায়; ইহারা মৃত্তিকার নিম্নে ক্ষুদ্রায়তনের বহুদূরব্যাপী সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া থাকে। সম্প্রতি একজন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ এই জাতীয় পিপীলিকা কর্ত্তৃক প্রস্তুত একটী সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করিয়াছেন। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন ক্রোশ।

২৪। মেক্সিকো উষ্ণপ্রধান দেশ। ঐ দেশের কুক্কুরের গাত্রে লোম দেখা যায় না। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, ঐ দেশের বায়ুর উষ্ণতাই কুক্কুরের লোম-হীনতার কারণ।

২৫। চীন দেশের সৈনিক বিভাগের নিয়মানুসারে প্রধান সেনাপতি নিম্নস্থ সেনাপতিগণকে প্রহার করিতে অধিকারী। প্রধান সেনাপতি নিম্নস্থ সৈন্যাধ্যক্ষকে কখন কখন স্বহস্তে প্রহার করিয়া থাকেন। প্রতীচ্য দেশস্থ সেনা বিভাগ-সমূহের পক্ষে ইহা অতি গর্হিত নিয়ম।

২৬। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, যে দ্রব্যের ওজন পৃথিবীতে অর্দ্ধ সের মাত্র, সূর্য্যে সেই দ্রব্য লইয়া গেলে তাহার ওজন চৌদ্দ সের হইবে।

২৭। ইংলণ্ড লৌহবর্ত্মে সমাচ্ছন্ন। এক লণ্ডন সহরে পাঁচশত রেলওয়ে ষ্টেশন আছে।

২৮। দেখা গিয়াছে যে, গরু ও মেষ স্ব স্ব দলের মধ্যে না থাকিলে কৃশ হইয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সঙ্গিহীন হইলে ইহারা এরূপ অসুখী হয় যে ইহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

২৯। ইল্ নামক মৎস্যের তুইটী হৃৎ-পিণ্ড আছে। প্রতি মিনিটে একটী ষাইটবার এবং অপরটী একশত ষাইটবার স্পন্দিত হয়।

লিথগ্রাফের উদ্ভাবন

লিথগ্রাফের উদ্ভাবনকর্ত্তা সেনিফেলডার (Alois Senefelder) ইং ১৭৭১ অব্দে প্রেগ নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৪ অব্দে মিউনিচ নগরে কালগ্রাসে পতিত হন। অন্যান্য আবিষ্কর্ত্তার ন্যায় ইনিও জীবিত-কালে সাধারণের নিকট বিশেষ কোন রূপ সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর লিথগ্রাফের উপকারিতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিয়া, তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি সাধারণে কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন। বৃহদাকার প্রতিকৃতি হইতে ক্ষুদ্রায়তন কার্ড পর্য্যন্ত লিথগ্রাফের সাহায্যে সাধারণে সহজেই প্রাপ্ত হইতেছেন। বাণিজ্য ব্যবসায়াদি কার্য্যে ইহা যেরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় ইহা ভিন্ন সহজে ও স্বল্পব্যয়ে কার্য্যাদি সম্পন্ন হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। সেনিফেলডারের জীবনী প্রকাশ করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। তিনি কিরূপ অবস্থায় পড়িয়া লিথগ্রাফ উদ্ভাবনের সংকল্প করিয়াছিলেন এবং কিরূপে উক্ত সংকল্প কার্য্যে পরিণত ও ক্রমোন্নত করেন, এই প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

প্রথম বয়সে সেনিফেলডার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়াদি কার্য্য করিতেন। পরে মিউ-নিচ নগরে অবস্থিতিকালে একখানি নাটক

রচনা করেন। এই পুস্তকখানি সাধারণের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় তিনি উৎসাহিত হইয়া অন্য একখানি পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু অর্থসংস্থান ও মুদ্রাকরদিগের অভাবে যথাসময়ে প্রকাশ করিতে না পারায় ত্বরিত বিক্রয়ের সমুদয় আশা নষ্ট হইয়া যায়। স্বয়ং স্বাধীন ভাবে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য করিতে পারিবেন এই ইচ্ছায় তিনি মুদ্রাকরের কার্য্য শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু আর্থিক অনাটন হেতু ঐ কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার পর তিনি বদ্ধাক্ষর (stereotype) প্রথার অনুরূপ এক প্রকার প্রক্রিয়ার বিষয় চিন্তা করেন। একখানি তাম্রফলক, মোম, ভূষা কালী ও সাবান দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার তরল পদার্থে আবৃত করিয়া এই বিষয়ের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। উল্টা ভাবে লিখিতে অভ্যস্ত না থাকায় একেবারে তাম্রফলকের উপর লিখিতে গেলে পাছে মূল্যবান্ ফলকখানি নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে তিনি প্রথমে মসৃণ বেলে পাথরের (sandstone) উপর ঐরূপ লেখা অভ্যাস করেন।

একদা সেনিফেলডার এইরূপ অক্ষর লিখিবার জন্য পাথর মাজিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মাতা এক ধোবার হিসাব লিখিয়া দিবার কথা বলেন। নিকটে কালী কলম না থাকায় তিনি বেলে পাথরের উপর তাহার নব প্রস্তুতীকৃত কালী দিয়া লেখ্য বিষয় টুকিয়া লন। ঐ পাথরের উপর এই সময় (Aqua fortis) আরক ঢালিয়া দিলে কিরূপ হয়, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার ব্যগ্রতা জন্মে। তিনি স্থির করিলেন, যে কালীতে লেখা হইয়াছে, তাহাতে মোম বিদ্যমান থাকায় আরক দ্বারা তাহার কোনও ক্ষতি হইবে না, কিন্তু বেলেপাথর হয় ত উহার প্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে। এইরূপ স্থির করিয়া যাহাতে আরক গড়াইয়া পড়িতে না পারে, এইরূপ ভাবে পাথরের চারিধার উন্নত করিয়া উহাতে আরক ঢালিয়া দিলেন। পাঁচ মিনিট পরে আরক ফেলিয়া দিয়া দেখিলেন পাথরের যে স্থানে অক্ষর, তাহা উন্নত ও অপর স্থান নিম্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল অক্ষরের উপর ছাপিবার কালী দিয়া কাগজ ছাপিয়া দেখিলেন" উহা নিতান্ত মন্দ হয় নাই। ইহা এক্ষণে লিথগ্রাফ আখ্যা পাইবার যোগ্য না হইলেও ইহাতে আবশ্যক অনেক বিষয় ছাপিবার সুবিধা হইয়াছিল। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর ইং ১৭৯৬ অব্দে তিনি এই উপায়ে পরিস্কৃতরূপে চিঠী পত্রাদি ছাপিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তাম্রফলকে অঙ্কিত করিয়া মুদ্রিত করিতে হইলে অধিক ব্যয় হয়, এই জন্য এ পর্য্যন্ত সঙ্গীতাদি সমুদয় বিষয় অক্ষর যন্ত্রে (Letter press) ছাপা হইত। সেনিফেলডারের একজন বন্ধু একখানি সঙ্গীত পুস্তক রচনা করেন। সেনিফেলডার তাঁহাকে বলেন,—"আপনি যদি আমার অবলম্বিত উপায়ে উহা মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে অতি সুন্দর হইবে

অথচ ইহাতে আপনার ব্যয়ও অনেক অল্প পড়িবে।” বন্ধু তাঁহার কথা-মত অক্ষর-যন্ত্রে উহা মুদ্রিত না করিয়া সেনিফেলডারের উদ্ভাবিত উপায়ে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন অতিশয় সুন্দর হওয়ায় তিনি অচিরেই অন্যান্য অনেক ছাপার কার্য্য প্রাপ্ত হন।

সেনিফেলডার প্রথম প্রথম অগ্রে পেনসিল দিয়া পাথরের উপর উল্টা ভাবে লিখিয়া পরে উহাতে স্বকৃত কালী প্রদান করিতেন। ইহাতে অনেক অসুবিধা হয় দেখিয়া তিনি বিলক্ষণ অধ্যবসায় সহকারে অনেক চেষ্টা পরীক্ষার পর এক প্রকার কালী প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। এই কালী দিয়া কোন কাগজের উপর লিখিলে সেই লেখা সহজে প্রস্তরের উপর স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়। এই স্থানান্তরিত লেখা উল্টা ভাবেই উঠিয়া থাকে। ইহার পর গঁদ মিশ্রণের উদ্ভাবন করিয়া তিনি ক্রমে লিথগ্রাফের বর্ত্তমান অবস্থা আনয়ন করিতে সক্ষম হন।

একজন ক্ষমতাশালী বন্ধুর চেষ্টায় সেনিফেলডার বাভেরিয়ার কার্টোগ্রাফিক (Cartographic) কার্য্যালয়ে একটী কার্য্য প্রাপ্ত হন। এখানে তাঁহার নবোদ্ভাবিত উপায়ে মানচিত্র অঙ্কিত হইল। বাভেরিয়ার রাজা গুণগ্রাহী ছিলেন, তিনি তাঁহার গুণের পুরস্কারার্থ বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে অন্ন বস্ত্রের চিন্তা দূর হওয়ায় সেনিফেলডার এখানে কার্য্য করিতে করিতে লিথগ্রাফের অনেক উন্নতি সাধন করেন এবং ১৮১৮ অব্দে লিথোগ্রাফী সম্বন্ধে একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

ঈশ্বরের নামাবলী।

ফ

ফকীরের দৌলত, ফলগ্রাহী, ফলদাতা, ফলবিধাতা, ফলাস্ত, (Father) ফাদার, ফিকিরী, ফুটন্তজ্যোতিঃ, ফুলবনশোভিনী, ফুল্লকুসুমশোভা।

ব।

বন্দনীয়, বন্ধনহরণ, বন্ধু, বরণীয়, বরাভয়দাতা, বলবান্, বলবিধাতা, বলী, বলিষ্ঠ, বহুজ্ঞ, বহুশক্তিশালী, বহুদর্শী, বহুপ্রদ, বহুমূল্য, বহুরূপ, বহুগুণধর, বান্ধবশ্রেষ্ঠ, বালবৃদ্ধসম্বল, বাসগৃহ, বাসনাপূরণ, বিকারহীন, বিঘ্ননাশন, বিধি, বিধাতা, বিধানকর্ত্তা, বিন্দুর বিন্দু, বিপত্তারণ, বিপদবারণ, বিপদ্ভঞ্জন, বিপদুদ্ধারণ, বিভু, বিরাট, বিপুলবিক্রম, বিপুলসুখসদন, বিশ্বজনমোহন, বিশ্বনাথ, বিশ্বপতি, বিশ্বপাতা, বিশ্বমাতা, বি[illegible] বিশ্বেশ্বর, বুদ্ধ, বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিবিধাতা, [illegible] বুবুধান, বুভুক্ষাহীন

বৃহৎ, বৃহতের বৃহৎ, বেদনাহারী, বেদনাবিহীন, বেদাতীত, বোধক, বোদ্ধা, বোধনীয়, বোধিলব্ধ, ব্যথানিবারক, ব্যথিতহৃদয়সান্ত্বন, ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞানদাতা, ব্রহ্মধন, ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মযোনি, ব্রহ্মসনাতন, ব্রহ্মাণ্ডপতি, ব্রহ্মাণ্ডপালক, ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, ব্রহ্মাভয়ং।

ভ।

ভকতজীবন, ভক্তবৎসল, ভক্তাধীন, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, ভক্তিরসসঞ্চারী, ভক্তিলভ্য, ভক্তের প্রাণ, ভক্তের জীবনধন, ভগবান্, ভগ্নাত্মার বন্ধু, ভজনলভ্য, ভদ্র, ভদ্রক, ভণ্ডদলন, ভয়নিবারণ, ভয়ভঞ্জন, ভয়হরণ, ভয়ানাং ভয়ং, ভয়াপহ, ভরণপোষণকর্ত্তা, ভর্গ, ভর্ত্তা, ভব, ভবতারণ, ভবকাণ্ডারী, ভবাম্ভোধিপোত, ভবার্ণবতরী, ভবিষ্যৎদর্শী, ভাগবতসিদ্ধ, ভাগ্যবিধাতা, ভাবিবিঘ্নহরণ, ভারহর, ভারগ্রাহী, ভাল, ভাবগ্রাহী, ভাবন, ভাবুক, ভাব্য, ভাষাতীত, ভাস্বর, ভিক্ষার ঝুলি, ভিক্ষাদাতা, ভিত্তি, ভীম, ভীতিনিবারক, ভীরুভয়ত্রাতা, ভীষণ, ভীষণং ভীষণানাং, ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা, ভুবনমোহন, ভুবনপালক, ভুবনপতি, ভুবনেশ্বর, ভুবন-পাবন, ভূতনাথ, ভূতভাবন, ভূতভৃৎ, ভূতাত্মা, ভূতিনিধান, ভূধরধরধর, ভূষণ, ভূরিদাতা, ভূমা, ভেদাভেদরহিত, ভেলক, ভেতৃ, ভেদ্য, ভেদক, ভৈরব, ভোক্তা, ভোগাভিলাষ-বর্জ্জিত, ভোগ্য, ভৌমিক, ভৌতিকাতীত, ভ্রমনাশন, ভ্রমাতীত, ভ্রান্তিহরণ, ভ্রষ্টশোধন, ভ্রষ্টারি।

মহীশূর মহারাণী কলেজ

মহীশূরের উচ্চবংশীয় বালিকাদিগের উচ্চশিক্ষার জন্য ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ২০ বৎসরের অধিক হইল মহীশূরের বর্ত্তমান রাজমাতা মহারাণীর যত্ন ও উৎসাহে এই বিদ্যালয়টী স্থাপিত হয়। এ বৎসর ইহা হইতে দুইটী ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন; এরূপ সুফল দাক্ষিণাত্যের পক্ষে যেরূপ নূতন, সেইরূপ অতীব আনন্দকর।

মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা চামরেন্দ্র উদয়ার বাহাদুর অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তিনি তাঁহার রাজ্যে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতিসাধনার্থ বিশেষ ব্যবস্থা করেন। এ বিষয়ে তাঁহার দরবার বক্সী নরসিংহ আয়েঙ্গার তাঁহার দক্ষিণহস্ত ছিলেন এবং স্ত্রী-শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হইয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করেন। তিনি অতি কার্য্যদক্ষ লোক এবং তিনিই উদ্যোগী হইয়া মহারাণীর সম্মতিক্রমে তাঁহারই নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮১ হইতে ১৮৯১ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসর কাল ইহা একটী কমিটীর তত্ত্বাবধানে চলিয়াছিল, তৎপরে মহীশূর গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে

চলিতেছে। ২৮টী বালিকা লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়, ১৯০২ সালের ১লা জুলাই এই সংখ্যা বাড়িয়া ৩৭৮ জন হইয়াছে। ইহার উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী ও তত্ত্বাবধায়িকার অভাবে প্রথম প্রথম পুরুষ শিক্ষকদিগের দ্বারা অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। এখন বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রী সুশিক্ষিতা হইয়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছেন। প্রথমে বেথুন কলেজের বর্ত্তমান লেডী প্রিন্সিপাল শ্রীমতী কুমুদিনী দাস বি এ এবং পরে শ্রীমতী সরলা ঘোষাল বি এ বঙ্গরমণীদ্বয় সাদরে আহূত হইয়া এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। মহারাণী তাঁহাদের প্রতি প্রভূত সৌজন্য ও সহৃদয়তা প্রকাশ করেন। এক্ষণে কেম্ব্রিজ নিউহাম কলেজের একটী গ্রাজুয়েট ইহার অধ্যক্ষ—তাঁহার নাম মিস গ্রেস এল পেলথর্প। আমরা এই বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ লেডী গ্রাজুয়েটদ্বয়কে অভিনন্দন করি এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নতি দেখিতে চাই।

এই বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে প্রথমে দেশীয় কানারী ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হইত, এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষা নিম্নশ্রেণী হইতেও চলিতেছে। হিন্দু বালিকাদের শিক্ষণীয় বিষয় সকলও শিক্ষা দেওয়া হয়, যথা—রন্ধন, শিল্প, সূচিকার্য্য, ড্রইং, বস্তুবিদ্যা (কিণ্ডার গার্টেন), তৌর্য্যত্রিক। গান বাদ্য প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুরমণীদিগের বিশেষ শিক্ষণীয় ছিল। বিরাটরাজকন্যা উত্তরার অর্জ্জুনের নিকট নৃত্যগীত শিক্ষা ইহার প্রমাণ। মধ্যে এই বিদ্যার অপব্যবহার হইয়া ইহা কেবল ব্যবসায়ী নর্ত্তকী শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ ছিল। মহারাণী-কলেজের একটী সুশিক্ষিতা ছাত্রী বরদার মহারাণী ও রাজপরিবারস্থ অঙ্গনাদিগকে বীণাবাদন শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়ের সুব্যবস্থায় সম্ভ্রান্ত পরিবারে গানবাদ্য চর্চ্চার বিস্তার হইতেছে।

১২ বৎসর পূর্ণ হইলেই ছাত্রীরা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া লেখা পড়ায় বিসর্জন দিতেন, এত দিন ইহার প্রতিবিধানের উপায় ছিল না। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষক ও গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া একটী মহৎ অভাব পূর্ণ হইয়াছে। স্ত্রীলোকগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া উপাধি পরীক্ষা দিবার অধিকারিণী হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই বিদ্যালয়ের কল্যাণ ও উন্নতি প্রার্থনা করি। স্ত্রীলোকেরা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়া এক দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌরব লাভ করুন, অন্য দিকে গৃহলক্ষ্মী হইয়া গৃহধামকে সুখ ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ পুণ্যধামে পরিণত করুন।

পঞ্চোপাদান।

জন্ম, শিক্ষা, সঙ্গ, সাধনা ও ব্রহ্মকৃপা—মনুষ্যজীবনের পূর্ণ গঠনের পক্ষে এই পাঁচ উপাদানের প্রয়োজন। ইহার এক একটী আংশিক সহায়; কিন্তু সমুদায় গুলি একত্র মিলিলে পূর্ণ সহায়তা লাভ হয়।

১। জন্ম—পিতামাতার গুণ সন্তানে বর্ত্তে। পিতা মাতা সাধুপ্রকৃতি হইলে সন্তানও সেইরূপ হইবে আশা করা যায়। জন্মাবধি যে শুদ্ধ, যাহার চিত্তের গতি সাধুতার দিকে, ধর্ম্মসাধন তাহার পক্ষে অনুকূল। শুকদেবের আখ্যায়িকা এইরূপ যে, তিনি শৈশব হইতেই তাপস। প্রহ্লাদ বালক অবস্থাতেই হরিভক্ত। ইহার কারণ কথিত আছে—তাঁহার মাতা যখন তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, তখন দেবগণ কর্ত্তৃক হৃত হন। এই সময় প্রহ্লাদ-জননী দেবগৃহে নারদ ঋষির নিকট ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হন। ওয়াসিংটন, সার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি মাতৃগুণে মহৎ লোক হন। রঘুবংশ, কুরুবংশ প্রভৃতিতে পিতৃপুরুষদিগের সাধু দৃষ্টান্তে সন্তানেরা মহৎ ও সাধু হইয়াছে দেখা যায়। সুজাত সন্তান অন্যান্য কারণে মন্দ হইতে পারে, কুজাতও সেই সেই কারণে ভাল হইতে পারে।

২। শিক্ষা—মানবচরিত্র গঠনের ২য় প্রকৃষ্ট উপায়। এই শিক্ষা গুরূপদেশ, পুস্তকাধ্যয়ন বা কার্য্যগত শিক্ষা দ্বারা হইতে পারে। "জন্মনা জায়তে বিপ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।" আডিসন বলিয়াছেন "শিক্ষা প্রস্তররাশি হইতে সুন্দর মূর্ত্তি খোদিয়া বাহির করে।" গুরু যেমন শিষ্য তদনুরূপ হইয়া থাকে। তিরোজিওর শিষ্যগণ বঙ্গেতিহাসে অমোঘ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। সুশিক্ষার দ্বারা জন্মের দোষ খণ্ডন হয়, কুশিক্ষা দ্বারা সুজাত সন্তানও বিকৃত হইয়া যায়।

৩। সঙ্গ—সংসর্গ যে মনুষ্যের চরিত্রের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ম্যাথিউ, মার্ক প্রভৃতি অশিক্ষিত বর্ব্বর জেলেমালারা খ্রীষ্টের সংসর্গে পুণ্যাত্মা হইয়াছেন। সৌভরী নামক এক ঋষির উপাখ্যান আছে, তিনি জলে ডুবিয়া যোগ করিতেন, মৎস্যদিগের দৃষ্টান্তে সংসারী হইয়া ঘোর দুর্গতি প্রাপ্ত হন। এক এক মহাপুরুষ ও সাধু মহাত্মা তাঁহাদিগের সঙ্গিগণের হৃদয়ে মহাপ্রাণতার সঞ্চার করিয়াছেন। তুলসীদাস যে বলিয়াছেন "কয়লাকো ময়লা ছুটে যব আগ করে প্রবেশ।" ইহা অতি সত্য কথা। ভক্ত হরিদাসের হাওয়ায় এক বেশ্যা হরিভক্তি-পরায়ণা সন্ন্যাসিনী হয়।

৪। সাধনা—জন্ম, শিক্ষা, সংসর্গের যে কিছু দোষ ও ত্রুটি থাকে, সাধনা দ্বারা তাহা পূর্ণ হয়। সক্রেটিস্‌কে দেখিয়া

একজন জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন, ইহার মত দুরাত্মা আর নাই। ইহাতে তাঁহার শিষ্যগণ তাহাকে মারিতে উদ্যত হন, কিন্তু সক্রেটিস নিবারণ করিয়া বলেন "জ্যোতিষী ঠিক্ বলিয়াছেন, আমার প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ কুপথগামিনী, আমি চেষ্টা দ্বারা দমন করিয়া রাখি।" এই সাধনা দ্বারাই দস্যু রত্নাকর প্রেমিক মহর্ষি বাল্মীকি হইয়াছিলেন। সেন্ট পল যে পুণ্যাত্মা বলিয়া খ্যাত তাঁহার আত্ম-কথা এই—"সয়তান আমাকে সাতবার পরাস্ত করিল, আমি আবার সাতবার তাহাকে পরাস্ত করিলাম।" কি সংগ্রাম!! বিশ্বামিত্র কি কঠোর সাধনাবলে ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন!

৫। ব্রহ্মকৃপা—ইহা কিন্তু সকল উপায়ের আদি, মধ্য, অন্ত। সুজন্ম হওয়া ব্রহ্মকৃপা-সাপেক্ষ। সুশিক্ষা ও সদ্গুরু লাভ করা তাঁহারই কৃপার অধীন। সৎসঙ্গ দৈবানুকূল্য ব্যতীতও ঘটিয়া উঠে না। আর সাধনপথের ঘোর সংগ্রামে দণ্ডায়মান হইয়া সেই সংগ্রাম অতিক্রমপূর্ব্বক সিদ্ধি লাভ করা ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন অসম্ভব। মানুষের দুর্ব্বলচিত্ত—দুর্ব্বল শক্তি সাধনার পরীক্ষার নিকট সহজে পরাস্ত হয়। এই জন্য ভগবৎসাধনায় যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ব্রহ্মকৃপা হইলে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, সাধুর উপদেশ শ্রবণে সামর্থ্য জন্মে, সৎসঙ্গ আপনা হইতে জুটিয়া যায় এবং ঈশ্বরের দুর্জ্জয় শক্তি সাধকের সম্মুখস্থ পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্নবাধাকে চূর্ণ করিয়া দেয়। আর যদি জন্মদোষ, শিক্ষা-দোষ, সঙ্গদোষ ও সাধনার ত্রুটি থাকে, এক ব্রহ্মকৃপা সে সকলের সংশোধন ও পূরণ করিয়া থাকে।

আমরা সংসারকে যদি সত্য ধর্ম্মের স্থান করিতে ইচ্ছা করি এবং আপনাদিগকে ও সন্তানসন্ততিগণকে যদি সাধু ও ধার্ম্মিক করিবার বাসনা করি, তবে অনুকূল অবস্থা সকল আনয়ন করিতে হইবে। সুসন্তানের জন্য পিতা মাতাকে আগে ভাল হইতে হইবে, সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সৎসঙ্গের হাওয়া যাহাতে যথেষ্ট থাকে তাহার উপায় করিতে হইবে এবং রাজা রামমোহন রায় যেরূপ বলিয়াছেন "বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে" এক দিকে ধর্ম্মবুদ্ধির আদেশ পালন আর এক দিকে আত্মসংযম দ্বারা সাধনা করিতে হইবে। "যে চায় সেই পায়" মহাপুরুষের অমোঘ বাক্য। আমরা এই সকল উপায়ে ব্রহ্মলাভ ও ধর্ম্মলাভে যদি প্রার্থী ও একান্ত যত্নশীল হই, তাহা হইলে সাধনার সুফল ফলিবে এবং অবশেষে ব্রহ্মকৃপা সহায় হইয়া যাহা কিছু অপূর্ণ থাকিবে, তাহা পূর্ণ করিয়া দিবে।

ঘটে যার সুজন্ম, সুশিক্ষা, সুসাধন,
সুসঙ্গ, ঈশ্বর-কৃপা—ধন্য সে জীবন।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৫শে মার্চ্চ বেলা ২টার সময় হঠাৎ ঘূর্ণাবায়ু উত্থিত হইয়া রঙ্গপুর নগরের মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। গৃহ ও বৃক্ষ পতনের সহিত অনেকগুলি লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে।

২। গত মার্চ্চ মাসে জর্ম্মণি ও ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে ভূমিকম্প হইয়াছে বিসুবিয়াস পর্ব্বতে আবার অগ্নুৎপাতের লক্ষণ।

৩। গত ২৩শে মার্চ্চ লাহোরে হরিদ্রাবর্ণের বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

৪। ১লা এপ্রিল হইতে বারাকপুর ২৪ পরগণার একটী অতিরিক্ত মহকুমা রূপে গণ্য হইয়াছে।

৫। সিংহলের সৈন্যাধ্যক্ষ হেকটর ম্যাকডোন্যাল্ যিনি "খার্টুমের বীর" বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং বুয়ার যুদ্ধেও বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তাঁহার বিরুদ্ধে কোনও গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি পারিসের এক হোটেলে আত্মহত্যা করিয়া সামরিক আদালতের বিচার এড়াইয়াছেন।

৬। জর্ম্মণির সাম্রাজ্ঞী সম্রাটের সহিত অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলেন, হঠাৎ অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়াছেন। প্রাণের আশঙ্কা নাই।

৭। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত স্থানীয় কৃষকদিগের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শনার্থ দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতেছেন। বোম্বাইবাসীরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

৮। রাজকুমার কনট সস্ত্রীক ইংলণ্ডে পৌছিয়াছেন। যুবরাজ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

৯। মহারাজা সার নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের স্মরণার্থে টাউনহলে এক সভা হয়। ছোটলাট সভাপতি হইয়া সহৃদয়তাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন।

১০। পিকিনে ইউরোপীয় ধরণে এক বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ হইবে, তাহাতে এক সহস্র কুঠারী থাকিবে। ব্যয় ৫ লক্ষ টাকা।

১১। কৃষ্ণদাস বালমুকুন্দদাস অভিষেককালীন সম্রাটের মূর্ত্তির এক প্রতিমূর্ত্তি মান্দ্রাজে স্থাপনার্থ প্রদান করিয়াছেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর গত ৮ই এপ্রেল ইহার আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন।

১২। আগামী ৩০ মে বিলাতে ইংলণ্ডেশ্বরের জন্মোৎসব হইবে; সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে ৯ই নবেম্বর হইবে।

১৩। আগামী ৩০এ চৈত্র হরিদ্বারে মহাকুম্ভ মেলা হইবে। মেলায় ইতিমধ্যে অসংখ্য লোকের সমাগম হইতেছে।

১৪। সোমালিল্যাণ্ডের যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই। পাগলা মোল্লা ক্রমাগত সরিয়া যাইতেছে, ইংরাজ সৈন্য তাহাকে ধরিতে পারিতেছে না।

১৫। গত ১৫ই চৈত্র সূর্য্যগ্রহণ এবং ২৮এ চৈত্র চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে।

বামারচনা।

প্রকৃতির শোভা।

বাসন্তী পূর্ণিমা রেতে মনের আবেশে
বসিলাম একাকিনী জানালার পাশে,
"চাহিয়া গগন পানে"
হেরি তারাগণ সনে
হাসিতেছে শশধর প্রফুল্ল-আনন,
হাসিতেছে দশ দিকে নিখিল ভুবন।

কিবা শোভা নেহারিনু নাহি যায় বলা,
প্রকৃতি আপন রূপে আপনি বিহ্বলা,
অমিয় ছড়ায়ে গায়
বহিছে মৃদুল বায়,
স্নিগ্ধতায় সবাকার জুড়াইছে প্রাণ,
শান্তিময় চরাচর—শান্তি করে দান।

কতই মাধুরী আহা হেরি চারিধার,
বিভু-প্রেমে মগ্ন সবে হয়ে অনিবার
মোহন সাজেতে সাজি,
নদী, সিন্ধু, তরুরাজি,
অসীম সৌন্দর্যে ভরা বিশ্ব চরাচর,
কি বা মনোহর বেশে সেজেছে সুন্দর!

কি বা শোভা ধরিয়াছে বন উপবন,
সোণায় রঞ্জিত লতা পাতা অগণন।
মাঝে মাঝে থেকে থেকে
অধরে অমিয় মেখে
গাহিছে ললিত তানে শ্যামা পাপিয়ায়।
শুনিয়ে সে গীতি আহা হৃদয় জুড়ায়!

গগনে নয়নে হেরি সুবিমল ইন্দু,
চকোর তৃষিত প্রাণে চায় সুধা-বিন্দু,
ঝিল্লিরবে ঝিঁঝিঁগণ
ডাকিতেছে ঘন ঘন,
মাতিয়ে বিভুর প্রেমে সবে এক প্রাণে,
গাইছে তাঁহার নাম সুমধুর তানে।

হেরিয়ে প্রকৃতি-শোভা, হৃদয় আমার
আনন্দে উঠিছে নাচি নাচি অনিবার।
এ জগত মাঝে যত
নানা শোভা মনোমত,
যে সৃজিলা, সুধাময় চরণে তাঁহার
প্রীতিভরে করি আমি কোটি নমস্কার।

দয়াময়! প্রেমময়,
আজি এই সুসময়,
ব্যাকুল হৃদয়ে প্রভু ডাকি গো তোমায়,
রেখ পদতলে তব দীন তনয়ায়।

শ্রীসৌদামিনী সেন গুপ্তা।

রাজা ও ঋষি।

(আলেকজেণ্ডার ও ডাইয়োজেনিস।)

একদা প্রভাতবেলা আলেকজেণ্ডার গেলা
ডায়োজেনিসের দরশনে,
সাধু সে পরম যোগী, সশরীরে স্বর্গভোগী,
হেরে ধরা প্রেমের নয়নে!

ষড় রিপু করি জয় তেজস্বী শুদ্ধ-হৃদয়,
সাধনায় রত বার মাস,
চাহিলে তাঁহার পানে সহজেই প্রাণ টানে
মনে জাগে ভকতি-উল্লাস।
দেখিলে তাঁহার হাসি হেসে উঠে ধরাবাসী,
শাখে বসি ডাকে পাখিগণ,
সকলেই করে আশা—তাঁর পূর্ণ ভালবাসা,
সবে তাঁর প্রেমের ভাজন।
কাননের পশুগুলি আনন্দেতে হেলি দুলি
প্রেমভরে কাছে যদি আসে,
গায়ে সাধু হাত দিয়া খেলায় তাদের নিয়া,
সন্তানের মত ভাল বাসে।
প্রশান্ত হৃদয়মাঝে সতত সন্তোষ রাজে,
প্রাণে বহে প্রেম-প্রস্রবণ,
শত্রু বলি নাই কেহ, এ জগৎ নিজ গেহ,
উদার এমনি তাঁর মন!
স্বার্থ তাঁর কাছে চুর, পাপ তাঁর ভয়ে দূর,
না জানে অভাব কারে বলে,
তাঁর পানাহার তরে নদী হ্রদ সরোবরে
থাকে নীর, গাছে ফল ফলে।
সমীর পরশ দিয়া জুড়ায় তাঁহার হিয়া,
আলো দেয় রবি শশী তারা,
রাজাদের রাজাগুলি যেন তাঁর পদ-ধূলি,
ভাবিলে নয়নে বহে ধারা!

শীতে রৌদ্র সেবিবারে গৃহের একটী ধারে
উপবিষ্ট ছিলা মহাজন,
দাঁড়াইলা সেকন্দর রোধিয়া রবির কর
কাছে তাঁর আসিয়া তখন।
সাধুমূর্ত্তি নিরখিয়া গলিল পাষাণ হিয়া,
উথলিল ভকতি-সাগর।
সেই শির সমুন্নত আপনি হইল নত
সাধুর সে চরণ-উপর।
নিবেদিলা নরবর ভক্তিভরে অতঃপর,
আমি দেব! এ রাজ্যের স্বামী,
প্রকাশ' আমার কাছে কি তব অভাব
আছে?
এখনি মোচন করি আমি।
"নাহি অন্য প্রয়োজন," কহিলেন তপোধন,
"শুধু এক প্রার্থনা আমার,—
দুটি পা দাঁড়াও সরি, রৌদ্র উপভোগ করি,
অভাব নাহিক কিছু আর।"
"আমি রাজ-অধিরাজ, কহিলেন মহারাজ,
কেন বিশ্বে হইলাম হায়!
যোগ-উপাসনা ল'য়ে এ ডাইয়োজেনিস
হ'য়ে
ফুটিতাম যদি এ ধরায়!"

শ্রীসুভাষিণী দেবী।

বিদায় ভিক্ষা।

(৫ মাস হিমাচল শিরে আতিথ্য গ্রহণান্তে।)

(হে) সদাব্রত! তব গেহে আশ্রয় দিয়েছ,
বিদগ্ধ এ প্রাণে শান্তি কত না ঢেলেছ।
যতই তোমার অই বরাঙ্গ হেরেছি,
"ভাল কেন হই না গো?" তাহাই
ভেবেছি॥
পিতৃহীনে তুষিয়াছ শীতলতা দানে।

মনে রেখো হতভাগ্য অধম সন্তানে ॥
হে বন্ধো ! বিশাল তব দেহে স্তরে স্তরে
যুগের কাহিনী লেখা অমোঘ অক্ষরে ॥
যত পড়ি "ধিক্" বলি মানবজীবন—
দুদিনের তরে গড়া বিষাদ-কানন।
ভুলে যাও অধমের অত্যাচার যত।
আশ্রিতের হাতে হায় ব্যথা পেলে কত !
ভুল ভ্রান্তি সবে করে—মানব দুর্ব্বল,
ক্ষমা দেবতার গুণ, প্রেম নিরমল।
ক্ষমিও আবিল কণা যদি দিয়ে থাকি,
আতিথ্য লভিয়া বন্ধো ! দিব নাকো ফাঁকি ॥
স্বরগ শুভ্রতা দিয়া প্রভু দয়াময়
পাঠালেন ভবে। হায় ! তাঁহারি আশ্রয়
লভিয়া সহেছি কত ক্লেশের তুফান !
হিমাচল ! তুমি স্থির সদত সমান।
আছ অতি সন্নিকটে—শোন নিবেদন—
বিদায়ের অশ্রু ফোঁটা করি বিসর্জ্জন
অযোগ্য অতিথি—করি বিদায় প্রার্থনা,
"ভাল কেন হই না গো" তাহাই ভাবনা ॥
পাষাণ তোমার দেহ—হৃদয় নির্ঝর
ঝর ঝর রবে ঢালে সুধা নিরন্তর ॥
যে পবিত্র হাতে তব বরাঙ্গ নির্ম্মাণ।
হয়েছে তাঁহারি হাতে সৃজিত এ প্রাণ ॥
ভাল যদি হই, আসিব হে পুনরায়,
নতুবা এ শেষ দেখা তোমায় আমায়।

শ্রীমতী—

বসন্ত পূর্ণিমা।

শোভিয়াছে নিশীথিনী কি চারু ছটায়।
নির্ম্মল সরল শান্ত হৃদয়ের প্রায়।
নাহিক আঁধার বিন্দু,
উথলি অমিয়া সিন্ধু
[illegible]য়াছে ভাসায়ে আজ বিশাল জগত,
[illegible]জি যেন একাকার স্বরগ মরত।
[illegible]নাক ইরম্মদ ঝলসি অম্বর।
[illegible]াদিমায় বেড়ি তারকা নিকর
[illegible] মাতায়ে মানবপ্রাণ,
গাহিছে সৌন্দর্য্য-গান
ছড়াইয়া স্বরগের আনন্দ অপার,
ঢালিছে ধরণীবক্ষে অমৃত আসার।
নাহি আজি শোক তাপ বিন্দু হাহাকার,
দিতেছে প্রকৃতি সুধাসিন্ধুতে সাঁতার।
সকল অভাব চূর্ণ,
ধরা আজ শান্তিপূর্ণ,
এ অমিয়া সিন্ধু ভেদী পবিত্র ওঙ্কার
জাগায় মানব-বক্ষে স্বর্গ-সমাচার।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী,
পূর্ব্বস্থলী।

নবব[illegible]
যুধিষ্ঠি[illegible]

১৩০৯ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

২। নারীচরিত ও নারীজাতির সৎকীর্ত্তি।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

৪। ইতিহাস ও জীবনচরিত।

৫। দেশ ভ্রমণ।

৬। বিজ্ঞান।

৭। পুরাণ কথা ও উপন্যাস।

৮। পদ্য।

৯। গৃহচিকিৎসা ও গৃহকর্ম্ম।

১০। বিবিধ।

১১। গ্রন্থাদি সমালোচনা।

১২। সাময়িক প্রসঙ্গ।

১৩। নূতন সংবাদ।

১৪। বামারচনা।